১৩৮৫ – ১৩৮৬
(1978 - 1979)

...ী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

...প ক :
...সদ আনন্দ
...ও জানানন্দ
...সম্পাদক
...শুভোষ ঘোষ

একচল্লিশ বর্ষ
প্রথম সংখ্যা
ফাল্গুন
১৩৮৫

GANNON DUNKERLEY & CO. LIMITED

MERCHANTS, ENGINEERS, CONTRACTORS
&
WATER TREATMENT SPECIALISTS

★

: REGISTERED OFFICE :

CHARTERED BANK BUILDING
FORT, BOMBAY-400023

★

: REGIONAL OFFICE :

23A, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-700001.

★

Grams : SUBSTANCE : : Phone : 22-0261 (4 Lines)
Telex : 021-7519 GNON IN

★

BRANCHES AT
AHMEDABAD, COIMBATORE, MADRAS,
NEW DELHI, BANGALORE, HYDERABAD.

নিবেদন

'বিশ্ববাণী' পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাদিগের কাছে নিবেদন এই যে ফাল্গুন ১৩৮৫ থেকে নূতন ৪১তম বর্ষ শুরু হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের পূর্ব্বের ৪০তম বর্ষের চাঁদা এখনও বাকী আছে তাঁদের বিশ্ববাণী পাঠানো সম্ভব হবে না, বকেয়া চাঁদা পাঠালে পুনরায় বিশ্ববাণী পত্রিকা পাঠানো হবে।

আরও জানাই যে, ছাপাখানা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় ফাল্গুনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে বিলম্ব হ'ল। পরবর্তী সংখ্যাগুলিও প্রকাশ করতে কিছু বিলম্ব হতে পারে। এই বিলম্বের জন্য বিশ্ববাণীর কর্তৃপক্ষ দুঃখিত হলেও এব্যাপারে তাঁদের কিছু করার নেই। এছাড়া ছাপার খরচ, বাঁধাইয়ের খরচ, কাগজের মূল্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় সবদিক বিবেচনা ক'রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ বিশ্ববাণীর গ্রাহকমূল্য ১৲ টাকা মাত্র বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং বিশ্ববাণীর বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য বর্তমান (৪১তম) বর্ষ থেকে ১১৲ টাকার পরিবর্তে ১২৲ টাকা পাঠাতে হবে। যাঁরা ইতিমধ্যে পূর্ব্বের ১১৲ টাকা হারে বর্তমান বর্ষের গ্রাহকমূল্য জমা দিয়েছেন তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ তাঁরা যেন সুবিধামত সময়ে বাকী ১৲ টাকা পাঠিয়ে বিশ্ববাণীর কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেন। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহক চাঁদা যথাক্রমে ১১৲ টাকা ও ৬৲ টাকা হারে অগ্রিম জমা দিতে হবে। আশা করি বিশ্ববাণীর সহৃদয় পাঠকবর্গ বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে বর্ধিত হারে বার্ষিক মূল্য পাঠাতে সম্মত হবেন।

ইতি—

বিনীত

স্বামী পরমাত্মানন্দ

সি. এম. ডি. এ. কি কি করে

১। **জলসরবরাহ।**

অর্থাৎ পানীয় জলের সুব্যবস্থা

মহানগরীর ৫৪০ বর্গমাইল এলাকায় ১০ লক্ষ লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুরোনো ওয়াটার ওয়ার্কসের শক্তি বৃদ্ধি করে নতুন ওয়াটার ওয়ার্কস বসিয়ে, গভীর নলকূপ খুঁড়ে এবং বিরাট ও ছোট আকারের পাইপের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল বিস্তীর্ণ এলাকায় পৌঁছাচ্ছে।

২। **পথ ও পরিবহন।**

কলকাতার আশে পাশে চলাচলের সুবিধার জন্য বড় বড় রাস্তা যেমন তৈরী হচ্ছে, তেমনি অনেক রাস্তা চওড়াও হচ্ছে। এ ছাড়াও আছে ব্রীজ, সেতু, ফ্লাইওভার বা উড়ালপুল, সাবওয়ে ইত্যাদি নির্মাণ। রাস্তায় আলোর ব্যবস্থাও সি, এম, ডি, এ, করে।

৩। **নালা নর্দমা।**

বৃহত্তর কলকাতার এক বিরাট এলাকায় নতুন নালা-নর্দমা খুঁড়ে জল-মগ্নতার প্রকোপ কমাবার চেষ্টা হচ্ছে। এ ছাড়াও আছে নালা-নর্দমা এবং খালের সংস্কার, মল নিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৪। **বস্তী উন্নয়ন প্রকল্প।**

মহানগরীর সমস্ত বস্তীতেই পানীয় জল, পাকা রাস্তা, পাকা পায়খানা এবং বিজলীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া আছে মিউনিসিপ্যালিটি এবং অঞ্চলগুলিতে স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু রাস্তা নালা নর্দমা, আলো ইত্যাদির কাজ।

৫। **নতুন উপনগরী।**

অন্তত তিনটি জায়গায় নতুন উপনগরী স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই সব কাজ শেষ হলে বেশ কিছু লোক শুধু বাসস্থান নয়, রুজি-রোজগারেরও সুযোগ পাবেন।

৬। **এছাড়া সি, এম, ডি, এ, নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন, বর্তমান প্রাথমিক স্কুলগুলির সংস্কার, স্বাস্থ্য প্রকল্প, উদ্যান এবং খেলার মাঠ তৈরী এবং কলকাতা থেকে খাটাল সরিয়ে নতুন বুদ্ধ উপনগরীতে পুনর্বাসনের কাজ কিছু কিছু করে থাকেন।**

গত আট বছরে যে কাজ হয়েছে তার পরিচয় অনেকে পেয়েছেন। অনেক কাজ এখনও বাকী। সব কিছু জানতে হলে এমনকি সমালোচনা করতে হলে লিখতে হবে, সি, এম, ডি, এ, জনসংযোগ বিভাগে, ঠিকানা : ৩।এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা ৭০০০১৭।

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	১০·০০
মরণের পারে	১৪·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	যন্ত্রস্থ
যোগশিক্ষা	যন্ত্রস্থ	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	৬·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	যন্ত্রস্থ
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	৪·০০	আত্মজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ (৫ম নূতন সংস্করণ)	৬·০০

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ		তীর্থরেণু (বর্ধিত ২য় সংস্করণ)	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	যন্ত্রস্থ	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্ধ	যন্ত্রস্থ
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	১৭·০০	পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ (প্রথম ভাগ)	১৬·০০	সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	১২·০০
ঐ (দ্বিতীয় ভাগ)	১৪·০০	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা	১০·০০	পত্রে উপদেশ	যন্ত্রস্থ
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সংস্করণ)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৭·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	১৫·০০
লোকগুরু অভেদানন্দ	২·৫০	হিমালয়ের তীর্থপথে	১০·০০
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০১	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
গীতা	৬·৫০	ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরামার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশন বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮৫০)

১১-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিস্টার্ড নং ১০৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

ফাল্গুন, ১৩৮৩

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

: উপদেষ্টামণ্ডলী
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

: সহায়কমণ্ডলী
স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

: প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
: প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
: কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
: সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

মুদ্রণ :
শ্রীপার্বতীচরণ রায়
দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯।এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবতগীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'যোগশিক্ষা' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম. এস. সি., এম. বি. (কলিকাতা), ডি. টি. এম. (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে

আমরা পশ্চিমবঙ্গের শিশুদের ও
তাদের স্নেহশীল পিতামাতাদের
সাদর সম্ভাষণ জানাই
এদের সকলের জন্যেই আমাদের বহু
আকর্ষণীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা আছে
৪৬৩টি শাখার মাধ্যমে
আমরা জাতির সেবায় নিয়োজিত।

●

নিম্নলিখিত শাখা-অফিসগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন :—

১৪, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা
ফোন : ২২-১১৮৮, ২২-১১৮৯
২২-৩৬৭২, ২২-৩৬৯০
এবং ২২-৯০৫৮

●

৪, সিনাগগ স্ট্রীট
ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা
ফোন : ২৬-৬৭০১, ২৬-৬৭০২
এবং ২৬-৯৮৭৭

●

২০৩, রাসবিহারী এভিনিউ
বালীগঞ্জ, কলিকাতা
ফোন : ৪৬-০৪২৬

●

শীঘ্র আরও নতুন শাখা খুলিবে

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ বিকানীর এণ্ড জয়পুর

(ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া'র সহযোগী)

বিশ্ববাণী

ফাল্গুন, ১৩৮৩

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	নববর্ষ	১	
২।	শ্রীরামকৃষ্ণপ্রণামঃ	২	শ্রীমানমোহন রায়
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : দয়ানন্দ সরস্বতী	৩	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৪।	যুগাবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	৮	ডক্টর হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
৫।	স্বামী অভেদানন্দ (জীবন-নাট্য)	১৪	শ্রীবিমল ভূষণ
৬।	সঙ্গীতে সাহিত্য ও রসের সার্থকতা	১৮	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৭।	ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২৩	স্বামী প্রভানন্দ

বেনারসী সিল্ক সাড়ী পোষাক

শৈলালাল মণিলাল স্টোর্স

১৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট - কলি-১২

(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)

বহুবাজার ৩৫-৮৬৩৭ ○ শ্যামবাজার ৫৫-২০০৭

কাশ্মিরী শাল বিছানা হোসিয়ারী

রেজিষ্টার্ড ব্রেণ্ড নেম

শান্তিরস সালসা

ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে

বাত বেদনায় অব্যর্থ

সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

কেশ্ত এণ্ড কোং

৭০১/৭ এ, আপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চঃ-৩১/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

Space Donated By :—

A WELL WISHER

Please Contact :—

D. BANERJEE & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fiting, C.I. Detachable Joints for A C. Pressure Pipes and C.I D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35. Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005.
Gram : PLAINED

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206. Calcutta-700005.
Telephone : 55-6172

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন ঃ ৫৫-১৬১৩

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
৮।	দেবীতীর্থ ক্ষীরভবানী	২৮	শ্রীমতী শক্তা ঘোষ
৯।	বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম	৩১	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
১০।	দেবশর্ম্মার আত্মত্যাগ	৩৩	অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্র নাথ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী
১১।	কসে ধারায় এস ভগবান (কবিতা)	৩৭	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত
১২।	আধুনিক শিক্ষার জনক ডেভিড হেয়ার	৩৮	শ্রীরতন দাশগুপ্ত
১৩।	শতবর্ষের আলোকে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি	৪০	শ্রীরণজিৎ কুমার সেন
১৪।	প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কালবিচার	৪৫	শ্রীজয়ন্তজিৎ রায়
১৫।	রূপান্তরের পথ	৪৯	ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র
১৬।	গ্রন্থ-সমালোচনা	৫৩	

With best Compliments of :—

BRITISH ELECTRICAL & PUMPS PRIVATE LTD.

4 B. B. D. BAG EAST, CALCUTTA-700 001

Grams :	Telex :	Phones :
'BHOWMKAL'	021-2426	22-7826, 27, 28 & 23-8711

With the Compliments of :—

CHATTERJEE BROTHERS

DEALERS IN EVERYTHING ELECTRICALS

Dealers of Philip's Light and Radio

Distributors : **Venus Water Heater, 22.7168**

7, POLLOCK STREET, CALCUTTA-700001

টনিক থেকে আই-ড্রপ—
লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের আমরা পারিবারিক বন্ধু

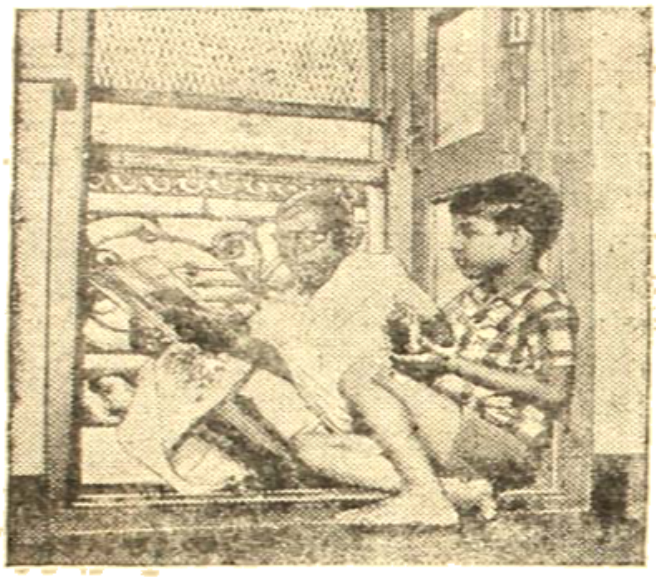

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্‌—
লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে যুগিয়ে চলেছে উৎকৃষ্ট ওষুধ

'পরখে ঠেকায় আসল বন্ধু চেনা যায়'—যে কেউ প্রবাদ অনুযায়ী আমাদের যাচাই ক'রে নিতে পারেন। শুধু অনেকদিন ভাগ্যবানদের কাছে নয়, এদেশের উচ্চ মধ্য গৃহস্থের কাছে ছোটবড় সকলেরই আমরা পারিবারিক বন্ধু। বুড়ো ঠাকুরদার জন্যে যেমন আই-ড্রপ, তেমনি বাচ্চা নিশুর জন্যে টনিক—আমরা যুগিয়ে থাকি। তাছাড়াও আমরা তৈরি করি বিস্তর রোগের আধুনিক ওষুধপত্র—সকলের সাধ্যে কুলোয় এমন দামে।

এ কাজে আমরা হাত দিই সেই ১৯৩৬ সালে। অধ্যবসায়ী কয়েকজন বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ আর ভেষজতত্ত্বজ্ঞ দেশের সাধারণ মানুষকে ওষুধ যোগাবেন ব'লে গড়ে তুলেছিলেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড। ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন আর বিলিব্যবস্থায় নিজেদের প্রথম সারিতে দাঁড়ানো—এই ছিল তাঁদের ব্রত।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড আপনাদের সেবায়

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

—ফ্রাঙ্ক ডোরাক-অঙ্কিত

স্বামী অভেদানন্দ

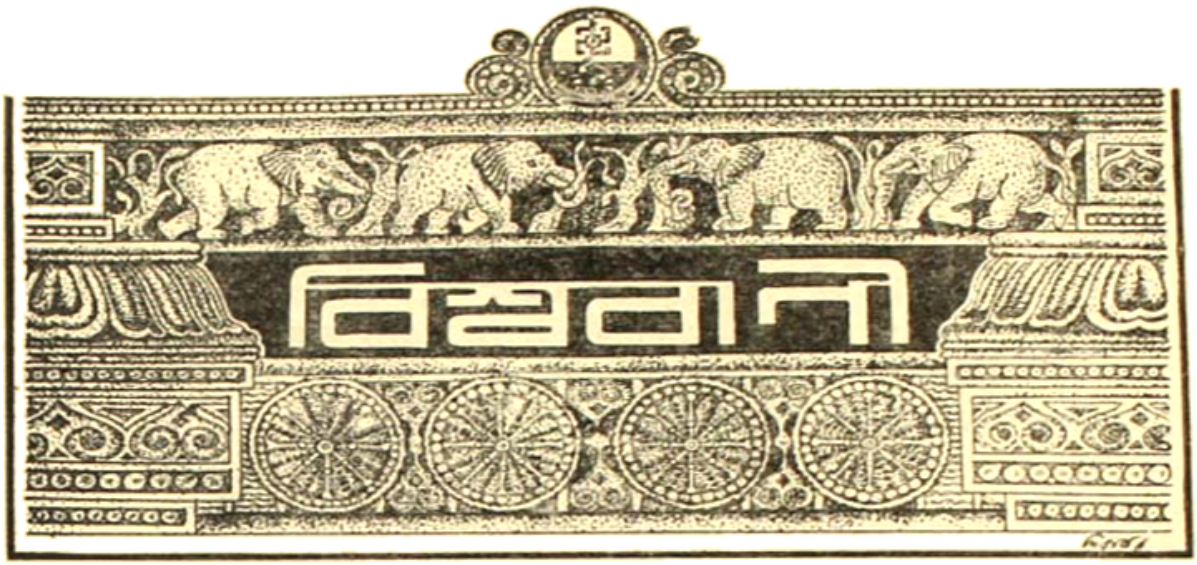

একচল্লিশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা | ফাল্গুন ১৩৮৪

নববর্ষ

প্রতিবছর ফাল্গুনে-সংখ্যায় বিশ্ববাণী বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বর্ধিত কলেবরে বিশ্ববাণী যেন নতুন ইঙ্গিত নিয়ে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ভারতের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য তথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শের প্রচার ও প্রসার আমাদের আদর্শ। আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই বিশ্ববাণী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে তাঁর আচার্যদেবের অমরবাণী তথা ভারতের চিরন্তন আদর্শ ছড়িয়ে দিতে। সেই থেকে বিশ্ববাণী তার দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালনে সচেষ্ট থেকেছে সর্বক্ষণ। নানা বাধাবিপত্তি উত্থান-পতনের মধ্যেও সে কল্লোলিনী স্রোতস্বিনীর মত এগিয়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে। কাছের আর দূরের অগণিত ভক্ত, বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক, সহৃদয় ব্যক্তি আমাদের এই চলার পথে সাহায্য করেছেন।

একদিন যিনি ছিলেন এঁর কর্ণধার অবতারপার্ষদ সেই মহাপুরুষ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ স্থূলদেহে না থাকলেও তাঁর আশীর্বাণী আমাদের সাথে রয়েছে সর্বক্ষণ। তিনি এসেছিলেন লোককল্যাণের উদ্দেশ্যে, আর এই বিশ্ববাণী ছিল তারই একটি অঙ্গ। অতীতে ও বর্তমানে বিশ্ববাণী এই আদর্শ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রয়োজনে পরিবর্তন পরিবর্ধনও করতে হয়েছে অনুরাগী পাঠকদের অনুরোধে, পরিমার্জিত করা হয়েছে যুগোপযোগী ক'রে। আশাকরি ভবিষ্যতে বিশ্ববাণী তার এই জয়যাত্রা বজায় রাখতে পারবে।

নতুন বর্ষ শুরু হয়েছে। কিন্তু এই নতুনকে আমরা দেখবো ঋতু-পরিবর্তনের মতই। একটি বর্ষ বিশ্বপ্রবাহিণী অনন্তসমুদ্রেরই একটি তরঙ্গ—সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই আর একটি রূপ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবই তিনি। আগামী বছরের বিশ্ববাণী নিয়ে আসুক এই সর্বশক্তিমানের মঙ্গলবার্তা।

মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ ঈশ্বরলাভের আনে সার্থকতা। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববাণী আমাদেরকে পরিচালিত করবে সর্বক্ষণ। প্রসিদ্ধ দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী ও সন্ন্যাসীদের রচনা সকলসময়ই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে সাহায্য করেছে। আগামী দিনেও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না এই আশা রাখি। যাঁরা অকৃপণ হস্তে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদেরকেও জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

●

ওঁ

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রণতিঃ ॥

শ্রীমণিমোহন রায়

ক্ষুদিরামাত্মজং দেবং চন্দ্রমণিসুতং পরম্।
জগদ্গুরুং ত্রিলোকেশং পরব্রহ্ম নমাম্যহম্ ॥
রাম-কৃষ্ণ-যুগরূপং নরদেহধৃতং প্রভুম্।
ভবরোগহরং বৈদ্যং দীননাথং নমাম্যহম্ ॥
প্রেমময়ং কৃপাসিন্ধুং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।
সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিনং ভগবন্তং নমাম্যহম ॥
ত্যক্তকামকাঞ্চনং হি বিষয়াশংসোর্ব্বিম্।
মায়াধীশং জগন্নাথং সদ্গুরুং প্রণমাম্যহম্ ॥
যুগাবতারং বরিষ্ঠং যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকম্।
সৃষ্টিস্থিতিলয়করং নরবরং নমাম্যহম্ ॥
লোককল্যাণরতং ব্রহ্ম নির্গুণং ত্রিগুণান্বিতম্।
সর্ব্বগং ত্রিতাপহরং গদাধরং নমাম্যহম্ ॥
সদাব্রহ্মস্থলীনং দেবং পতিতপাবনং হরিম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরীহং নিরঞ্জনং নমাম্যহম্ ॥
যোগেশ্বরীস্নেহস্নাতং তোতাপুরী সুদীক্ষিতম্।
সর্ব্বধর্ম্মমতসিদ্ধং যোগীরাজং নমাম্যহম ॥
স্বরূপমসমাসীনং কৃতসারদাসান্নিধিম্।
অধমতারণং দেবং সদাশিবং নমাম্যহম্ ॥
সনাতনং পরাৎপরং নিত্যং ব্রহ্মসংস্থিতম্।
ভবার্ণব কর্ণধারং পরমেশং নমাম্যহম্ ॥
কামারপুকুরোদ্ভবং সচ্চিদানন্দস্বরূপম্।
শ্রীবিকুলীলাবিগ্রহং রসরাজং নমাম্যহম্ ॥

বিশ্বজননয়নানন্দং ভক্তহৃদয় রঞ্জনম্ ।
শরণাগতাশ্রয়ীভূতং রামকৃষ্ণং নমাম্যহম্ ॥
সত্যসম্বং সদানন্দং শ্রবণারামং পরমেশ্বরম্ ।
ত্যাগীবরং বিশ্বাধারং পরমহংসং নমাম্যহম্ ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুং ঈশং যোগমার্গপ্রদর্শিনম্ ।
নিরীশ্বরং নির্বাসনং আত্মারামং নমাম্যহম্ ॥
পরতত্ত্বং মহাপ্রাজ্ঞং সদাবন্দ্যং পুরুষোত্তমম্ ।
নিরহঙ্কারং নির্মোহং জনার্দনং নমাম্যহম্ ॥
জন্মাদিং অনাদিঞ্চ সর্ব্বসন্তাপহারিণম্ ।
যোগমায়াসমাশ্রিতং প্রাণেশং প্রণমাম্যহম্ ॥

●

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঞ্জনে : দয়ানন্দ সরস্বতী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পূর্বভাষ :

'দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদান্তিক জন ।
কাশীর মঠের তাঁর চেলা অগণন ॥
শ্রীপ্রভুর সমাধি অবস্থা দেখিয়া ।
বিস্ময়ে কহিলা বেদা আক্ষেপ করিয়া ॥
শাস্ত্রপাঠিগণে করে ঘোলের ভক্ষণ ।
মহাপুরুষেরা খান কেবল মাখন ॥'—পুঁথি, ৫৫২-৫৫৩

শ্রীরামকৃষ্ণলীলাঞ্জনে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী একটি স্বনামখ্যাত চরিত্র । ভারতবিখ্যাত যে-সকল ধর্মপ্রবক্তা, সমাজ-সংস্কারক ও খ্যাতিমান পণ্ডিতের সঙ্গে পরমহংসদেবের মিলন ঘটেছিল, ইনি তাঁদেরই অন্যতম ।

'লীলাপ্রসঙ্গ', 'কথামৃত', 'পুঁথি' প্রভৃতি প্রামাণ্য ও আকর গ্রন্থসমূহে কথাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী সম্পর্কিত কিঞ্চিৎ বিবরণী ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ঐ বৃত্তান্তগুলির অধিকাংশই স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত । যা হোক, বর্তমান নিবন্ধে সেই সকল প্রামাণ্য তথ্যেরই সযত্ন সংগ্রহে 'লীলাবৃত্তান্ত' পরিবেশিত হ'ল ।

পরিচিতি :

'দয়ানন্দ সরস্বতী আর একজন ।
সাধুদের মধ্যে তাঁর খ্যাতি বিলক্ষণ ॥
দেবভাষা সংস্কৃত বিশেষিয়া জানা ।
উহাতেই কথাবার্তা তর্ক আলোচনা ॥
জ্ঞানমার্গী বেদান্তের পথে মতে গতি ।
শিষ্য চেলা বহু আর্য-সমাজাধিপতি ॥'—পুঁথি, ১৪৫

'আর্যধর্ম'-প্রচারক ও 'আর্যসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম ভারতের সর্বত্রই সুপরিচিত। ইনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াওয়াড়ে এক সম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে এঁর নাম ছিল মূল শঙ্কর। ইনি ভারতীয় প্রাচীন-পদ্ধতিতে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন এবং কখনই ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসেন নি। সংস্কৃত ভাষায় ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র তথা বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি এঁর প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। বিশুদ্ধ সংস্কৃতে ইনি অনর্গল ভাষণ দিতে পারতেন। গুজরাটি এবং হিন্দী ভাষারও এঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল।

মূল শঙ্কর মাত্র ২২ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণের পর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হন। পরিব্রাজক অবস্থায় ইনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সাধু সন্তের সংস্পর্শে আসেন। এই রূপে ইনি মথুরায় স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতীর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর জীবন শিক্ষা ও মতাদর্শে সবিশেষ প্রভাবিত হন।

স্বামী দয়ানন্দ বৈদিক প্রাচীন হিন্দুধর্মমতে, অর্থাৎ আর্যধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু সমাজে প্রচলিত পৌরাণিক ধর্মাচরণসমূহ ও ধ্যান-ধারণাদিকে ইনি একেবারেই আমল দিতেন না। ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই ছিলেন এঁর একমাত্র উপাস্য। ইনি হিন্দুধর্মে প্রচলিত অবতারবাদ, সাকার আরাধনা, নানা দেবদেবীর অর্চনা, প্রতিমাপূজা ও পুরোহিততন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী বেদকেই হিন্দুর, তথা আর্যজাতির একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র ব'লে বিশ্বাস করতেন। অবশ্য, বেদাঙ্গ এবং বেদান্তকেও ইনি মান্য করতেন। তবে, বেদের (অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণের) প্রামাণিকতাই ছিল এঁর নিকট সর্বাধিক। বস্তুতঃ ইনি বেদকে কেবল হিন্দুরই নয়, অন্য সকল ধর্মেরও ভিত্তিস্থানীয় বলে জ্ঞান করতেন। এজন্য ইনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে, সমস্ত নরনারীই বেদপাঠে অধিকারী ব'লে প্রচারও করেন। বেদ ভিন্ন হিন্দুর অপর ধর্মশাস্ত্র সমূহের প্রতি এঁর আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না। মনু স্মৃতি ব্যতীত স্মৃতিশাস্ত্র এবং অষ্টাদশ পুরাণাদিকেও ইনি গ্রাহ্য করতেন না।

স্বামী দয়ানন্দ-প্রচারিত হিন্দুধর্ম আমাদের প্রচলিত হিন্দুধর্ম হ'তে বহুলাংশে পৃথক ছিল। তথাপি ইনি সর্বদাই নিজেকে হিন্দু ব'লে ঘোষণা করতেন এবং কখনই নিজেকে কোনও নতুন ধর্মমত বা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ব'লতেন না। এঁর উপদেশ ছিল—'বৈদিক ধর্মে ফিরে যাও'। ইনি মনে ক'রতেন, হিন্দুরা মূর্তিপূজা এবং পৌরাণিক ধর্মাচরণসমূহ পরিত্যাগ না ক'রলে, কখনই একজাতি, একপ্রাণ ও একতায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবেন না।

হিন্দুসমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনকল্পে স্বামী দয়ানন্দ ঐ সমাজে প্রচলিত বর্ণবৈষম্য ও বংশানুক্রমিক জাতিভেদ-প্রথার আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন। ইনি বিশ্বাস ক'রতেন ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষাই আমাদের সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। এজন্য ইনি হিন্দুদের প্রাচীন ভারতীয় প্রণালীতে শিক্ষিত ক'রে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। ঐ অভিপ্রায়ে ইনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে আর্য বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দুনারী-সমাজের প্রগতি-সাধনেও যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। ইনি পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার দাবি করেন এবং মেয়েরাও বেদপাঠ এবং

তার চর্চা ও আলোচনার অধিকারিণী, ব'লে প্রচারও করেন। ইনি বাল্যবিবাহের একান্ত বিরোধী ছিলেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিধবাবিবাহও অনুমোদন করেন। স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকল্পেও এঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ঐ অভিপ্রায়ে ইনি পাঞ্জাবের জলন্ধরে একটি মহিলা আশ্রম এবং সেই সঙ্গে শিক্ষালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্তিত ধর্মান্দোলন এবং সমাজ-পুনর্গঠন সম্পর্কে এঁর চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালীর যথার্থ রূপটি এঁরই রচিত 'সত্যার্থ প্রকাশ' (১৮৭৫ খ্রীঃ)-গ্রন্থে সবিস্তার লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়।

আর্যধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বামী দয়ানন্দ প্রায় সমগ্র ভারত পর্যটন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে সনাতনী পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা-সমাবেশে শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্কও করেন। ইনি একজন অসাধারণ বাগ্মী এবং বিচার-দক্ষও ছিলেন। যা হোক, ৺কাশীধামের পণ্ডিতগণের সঙ্গে বিচার-সভায় (১৮৬৯ খ্রীঃ) বিচার-বিতর্কের পর, এঁর খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ইনি যখন স্বীয় ধর্ম-মত প্রচারকল্পে ক'লকাতায় আসেন (১৮৭২-৭৩ খ্রীঃ), সেই সময় ইনি এখানে ব্রাহ্মনেতা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গেও মিলিত হন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য ধর্মমত প্রতিষ্ঠায় পাঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সাফল্যলাভ করেন। ঐ সকল স্থানের দেশীয় রাজা-মহারাজা এবং জমিদারগণ অনেকেই এঁর শিষ্য হন। ইনি বোম্বাই-এ সর্বপ্রথম (১৮৭৫ খ্রীঃ) 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। মাদাম ব্লাভট্স্কি প্রতিষ্ঠিত ভারতের থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গেও ইনি একযোগে বেশ কিছুকাল (১৮৭৪-১৮৮১ খ্রীঃ) কাজ করেন। এঁর উদ্যোগে ও প্রেরণায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'আর্যসমাজ'—আশ্রম, মঠ, ছাত্রাবাস, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়। গো-হত্যা নিবারণকল্পেও ইনি বিশেষ তৎপর ছিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে ইনি 'গোরক্ষিণী সভা'ও প্রতিষ্ঠা (১৮৮২ খ্রীঃ) করেন। তার প্রায় এক বৎসর পরে (১৮৮৩ খ্রীঃ) ৬০ বৎসর বয়সে এই মহাত্মার দেহত্যাগ হয়।

লীলাবৃত্তান্ত :

[প্রস্তাবনা]

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে পরমহংসদেবের মিলন একবার না—একাধিকবার ঘটেছিল, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃতে' পরিবেশিত—শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত বৃত্তান্তে কেবল সিঁথির উদ্যানেই (১৮৭২-৭৩ খ্রীঃ) তাঁদের উভয়ের সাক্ষাৎকারের মাত্র একবারের বিবরণী লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু 'পুঁথি'তে—ঠাকুরের দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণকালে (১৮৬৮ খ্রীঃ)—৺কাশীধামে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীসহ তাঁর মিলনের একটি মনোহর চিত্রও বর্ণিত রয়েছে।

* * * * * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তীর্থভ্রমণ-বিবরে 'কথামৃতে' আছে—"ঠাকুর দুইবার তীর্থে গমন করেন। প্রথমবার মাকে [চন্দ্রমণি দেবীকে] সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সঙ্গে শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে ও মথুরবাবুর কর্মচারী পুত্র। তখন সবে কাশীর রেল খুলিয়াছে। তাঁহারা

অবস্থানান্তরের ৫।৬ বৎসরের মধ্যে। তখন অহর্নিশি প্রায়ই সমাধিস্থ বা ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। এবার বৈদ্যনাথ দর্শনান্তর ৺কাশীধাম ও প্রয়াগ দর্শন হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃঃ।

"দ্বিতীয়বার তীর্থগমন ইহার ৫ বৎসর পরে, ইংরাজী জানুয়ারী ১৮৬৮ খৃঃ। মথুরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দাসীর সঙ্গে। ভাগিনেয় হৃদয় এবার সঙ্গে ছিলেন। এ-যাত্রায় ৺কাশীধাম, প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করেন।"—কথামৃত ১ম, (উপক্রমণিকা), পৃঃ ৫-৬।

• • • • • •

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ৺কাশীধামে স্বামী দয়ানন্দসহ শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ সাক্ষাতের বিবরণীটি 'লীলাপ্রসঙ্গ' এবং 'কথামৃতে' কোথাও লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, সিঁথির উদ্যানে তাঁদের মিলনের বৃত্তান্তটিরও উল্লেখ 'পুঁথি'তে কোথাও নাই। যাহোক, আমরা উভয় বিবরণীই অনুধ্যানে চরিতার্থ হব।

[কাশীধামে মিলনের বিবরণী]

'ঠাকুরের রীতি সাধু-সন্তে মান দান।
দয়ানন্দে একদিন দেখিবারে যান ॥
... ...
বেদ-বেদান্তালোচক নানাগুণ তাঁর।
দুনিয়ার লোকে কাছে তত্ত্ব-আশে যায় ॥
পুণ্য-দরশন তেঁহ পুণ্যবান বটে।
শিক্ষার্থী শিষ্যেরা বহু বাস করে মঠে ॥
সরল প্রাণেতে করে তত্ত্ব অন্বেষণ।
তাই আজি তাঁর কাছে প্রভুর গমন ॥
সরলতা যেথা হোক, যে কোন পন্থীর।
সেই প্রভুর প্রিয় তথায় হাজির ॥
এই ধারা বরাবর দেখি শ্রীপ্রভুর।
যেন তিনি জগতের সবার ঠাকুর ॥'-পুঁথি, ১৪১-৪৬

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেবার (১৮৬৮ খৃঃ) কাশীধামে অবস্থানকালে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে দর্শন করার জন্য একদিন এঁর মঠে উপস্থিত হন। সেখানে এঁর একজন সন্ন্যাসী শিষ্য অগ্রণী হয়ে তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলোচনা আরম্ভ করেন। সেই সন্ন্যাসীটিও ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ও বিচার-দক্ষ সুপণ্ডিত। আচার্য দয়ানন্দের মত তিনিও ছিলেন ঈশ্বরের নাম-রূপ এবং সাকার তত্ত্বের ঘোর বিরোধী। তাঁর সঙ্গে তত্ত্ব-আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ঈশ্বরের সাকারভাব ও বিচিত্র লীলা-মহিমার স্বপক্ষে, নিজ অনুভবসিদ্ধ যত কথাই বলেন, তিনি কূট তর্কে সমস্তই 'অলীক' এবং 'মায়ার খেলা ব'লে উড়িয়ে দেন।

'বাক্ বিতণ্ডায় সাধু অতি বিচক্ষণ।
অনর্থ তর্কের দ্বন্দ্বে পক্ষ সমর্থন ॥
তর্কবিদ্যাবিশারদ তর্কেতে চতুর।
তাতেই খণ্ডন যত কহেন ঠাকুর ॥'—পুঁথি, ১৪৬

সেই বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বীয় বাক্ চাতুর্যে, যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্বপূর্ণ কথাগুলি নিরর্থক খণ্ডন ক'রতে থাকেন, তখন তিনি (ঠাকুর) নিজ মহিমময় স্বরূপ ধারণ করেন। ৺জগদম্বার ভাবাবেশে সহসা তিনি আবিষ্ট হয়ে পড়েন। এইরূপে অর্ধবাহ্যদশায় তিনি সেই তার্কিক পণ্ডিতকে বলেন,—'আমি এতকাল প্রাণ, মন সব ঢেলে দিয়ে জগন্মাতার যে, এত আরাধনা ও সাধন-ভজন ক'রলাম ; আর তাঁর কৃপায় যে-সব অতীন্দ্রিয় অনুভব-অনুভূতি এবং প্রত্যক্ষ দর্শনাদি লাভ ক'রলাম, সেগুলো কি সমস্তই প্রতারণা, প্রবঞ্চনা এবং মিথ্যা ?'

'এত যে করিনু আমি দিয়ে প্রাণ মন।
জগমাতা অম্বিকার সাধন-ভজন ॥
তত্তদ্ভূত অনুভূতি দরশনাবলী।
প্রতারণা প্রবঞ্চনা মিথ্যা কি সকলি ॥'—পুঁথি, ১৪৬

তারপর ঠাকুর নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে—'এই দেখ দেহ' ব'লেই দণ্ডায়মান হন এবং সন্ন্যাসী তাঁর মধ্যে বেদান্তশাস্ত্রবর্ণিত—কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ, ষট্‌চক্রভেদ ও গভীর সমাধি অবস্থা প্রত্যক্ষ ক'রে অপার বিস্ময়ে হতবাক্ হন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে, বেদান্তাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরমতম অবস্থার আশ্চর্য প্রকাশ দর্শনে, সেই পণ্ডিতের সর্বাঙ্গে অদ্ভুত শিহরণ, পুলক ও স্বেদ-কম্পন প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব-বৈভবের উদ্গম হয়। তখন তিনি নিজেকে আর সংবরণ ক'রতে পারেন না। তিনি কম্পিত কলেবরে ও সজল নয়নে—সমাধিমগ্ন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ ভূলুণ্ঠিত হন।

আচার্য স্বামী দয়ানন্দজী আশ্রমে আগন্তুক মহাপুরুষের আশ্চর্য সমাধি আবেশের সংবাদ শুনে পরম পুলকিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং এঁকে অনুসরণ ক'রে এঁর শিষ্যরাও অনেকে সেখানে আগমন করেন।

'দয়ানন্দ অনিমিষে দেখি নিরখিয়ে।
প্রভুর সমাধি-বেশ বিশেষ করিয়ে ॥
অবাক্ হইয়া কহে অন্তর সরল।
বেদ-বেদান্তাদি মোরা পড়েছি কেবল ॥

কিন্তু তার ফল দেখি এই মহাজনে।
সার্থক জীবন মহাত্মার দরশনে ॥
জীবন্ত প্রতিমা যাহা বেদান্তে বাখান।
দেখিয়া পাইনু আজি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ॥

শাস্ত্র-গাথা পণ্ডিতেরা করিয়া মন্থন।
ঘোলাংশ কেবলমাত্র করে আস্বাদন ॥
সার অংশ মাখনের অধিকারী এঁরা।
সচল বিগ্রহ-বেশী এই মহাত্মারা ॥'—পুঁথি, ১৪৬

শ্রীশ্রীঠাকুরের অদ্ভুত সমাধি অবস্থা দর্শনে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী একান্তই বিমোহিত হন। তাঁর আড়ম্বরশূন্য বহোচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন, সুমধুর চরিত্র এবং সরল অথচ গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথা-বার্তাও এঁকে সবিশেষ আকৃষ্ট করে। অতঃপর ইনি শিষ্য-সেবকগণের নিকট শ্রদ্ধাভরে পরমহংসদেবের বহু প্রশংসা প্রশস্তিও করেন।

[ক্রমশঃ]

॥ যুগাবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥

ডক্টর হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

যুগের প্রয়োজনেই ভগবানের মর্ত্যাবতার হয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছিলেন যে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হলে তিনি সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টদের বিনাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যে আবির্ভূত হন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে গ্লানি জমেছিল তা থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল যুগাবতারের। তাই যুগের প্রয়োজনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

১২০০ অথবা ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি নুদিয়া বা নবদ্বীপ জয় বা লুণ্ঠন করার পর থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে মুসলমান আধিপত্য বিস্তার, নির্বাধ হত্যা, দেবমন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস, ধর্মান্তরীকরণ ও অত্যাচারের ইতিহাস। সমকালীন সাহিত্যে তাই অত্যাচারের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। একদিকে বিধর্মী শাসকের অমানুষিক অত্যাচার আর একদিকে সমাজের সংকীর্ণতা অন্ধতা ও কুসংস্কার জনিত অবক্ষয়। পণ্ডিতবর্গের ভক্তিহীন নীরস তর্কচর্চা, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত, সদম্ভে বিষহরির পূজা, মদ্য মাংস নিয়ে যজ্ঞপূজা, বিকৃত বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়া সাধনার ফেনিল মত্ততা, উচ্চবর্ণের চাপে পিষ্ট নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজের সকরুণ ক্ষীণ আর্তনাদ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ বহুব্যাধিগ্রস্ত মানবদেহের মত মৃত্যুর প্রহর গুণছিল। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব এই যুগসংকটের ঘোরতর আবর্তের মধ্যে।

আধুনিক অর্থে শ্রীচৈতন্য সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। যে অর্থে রামমোহন বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারক সে অর্থে শ্রীচৈতন্যকে সমাজ সংস্কারক বলার কোন যুক্তি নেই। মহাপ্রভু সচেতনভাবে সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হন নি,—সমাজের কোন কুৎসিৎ ব্যাধি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা বা তদুদ্দেশ্যে কোন আইন প্রণয়ন করার চেষ্টা তিনি করেন নি,—সেরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। শ্রীচৈতন্য ছিলেন অন্তরঙ্গ ভাবের মহাসাধক। তিনি কখনও কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হয়ে থাকতেন, কখনও পার্ষদবর্গের সঙ্গে হরিনাম গান করেছেন অথবা কাব্যে পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করেছেন। জীবনের অর্ধাংশ তিনি যাপন করেছেন নীলাচলে এবং শেষ ছয় বৎসর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ছিলেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যুগাবতার; যুগের প্রয়োজনে তাঁর আবির্ভাব। ধর্মহীন, ভক্তিহীন নীতিহীন শ্রেণী বৈষম্যময় বিধর্মী শাসকের অত্যাচার উৎপীড়নে ভীতত্রস্ত হিন্দুসমাজের কাছে তিনি বরাভয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে এবং নেতৃত্বে সেদিনের শাসকশ্রেণীর উৎপীড়নে ন্যুব্জপৃষ্ঠ নবদ্বীপের হিন্দুগণ নূতন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল,—দুর্বল ভীরু হিন্দুসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মেরুদণ্ড খাড়া করে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এমন ঘটনা মুসলমান অধিকারের পরে বঙ্গদেশে আর কখনও ঘটে নি। অত্যাচারী কাজীর বিরুদ্ধে অভিযান নেহাৎই দুর্বলের অন্তঃসারশূন্য আস্ফালন ছিল না। বৃন্দাবন দাস কাজী দলনের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা একটি আত্মপ্রত্যয়শীল জাতির দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত রোষবহ্নির প্রদীপ্ত প্রকাশ। বৃন্দাবন লিখেছেন—

কেহো ঘর ভাঙ্গে কেহো ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহো লাথি মারে কেহো করয়ে হুঙ্কার॥

আম্রপনসের ডাল ভাঙ্গি কেহো ফেলে।
কেহো কদলির বন ভাঙ্গি হরি বোলে ॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া ॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
হরিবোলে নাচে সব ভূমিমূলে দিয়া ॥
একটি করিয়া পত্র সর্বলোকে নিতে।
কিছু না রহিল আর কাজীর বাড়ীতে ॥
ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বোলে অগ্নিদেহ বাড়ির ভিতর ॥
পুড়িয়া মরুক সর্বগণের সহিতে।
সর্ববাড়ী বেঢ়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে ॥ (চৈ. ভা. মধ্য ১০ অঃ)

প্রবল প্রতাপান্বিত গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সম্বলবন্ধ নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থান প্রাগাধুনিক যুগে বাঙ্গালাদেশে অথবা ভারতবর্ষে ঘটেছে বলে আমরা জানি না। এই নিরস্ত্র গণশক্তির কাছে অত্যাচারী শাসক শক্তিকে মাথানত করতে হয়েছিল। অথচ এই আন্দোলনের পশ্চাতে জাতিধর্মের বৈরিতা ছিল না, হিংসা ছিল না। ভারতেতিহাসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস গণ-আন্দোলনের এই সূত্রপাত।

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার অন্যতম কীর্তি অমিতাচারী দুর্বৃত্ত জগাই ও মাধাই-এর সম্পূর্ণ পরিবর্তনসাধন ও বৈষ্ণবীকরণ। গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চা অনুসারে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু নারোজী নামে এক দস্যু দলপতি ও বারমুখী নামে এক বারাঙ্গনাকে অসৎপথ থেকে সৎপথে আনয়ন করেছিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চা এবং কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত অনুসারে দক্ষিণাত্যের অনেক পণ্ডিত ও তার্কিক বৌদ্ধ তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর মত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এইরকম কয়েকটি ঘটনায় সমাজে মহাপ্রভুর ব্যাপক গভীর প্রভাব প্রমাণিত হয় না। বাঙ্গালাদেশে ত বটেই, বাঙ্গালা দেশ ছাড়াও উড়িষ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, সম্ভবতঃ আরও কোন কোন অঞ্চল শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লোকোত্তর দিব্যজীবন আপামর জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছিল। পতিত দুঃখী আর্তের জন্য মহাপ্রভুর ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। পাপীতাপী দুঃখী আর্ত মানুষকে নির্বিচারে কোল দিয়ে, তাদের দুঃখে বিগলিতচিত্ত হয়ে সকলকে প্রেমধর্ম তথা কৃষ্ণনাম বিতরণ করে ভক্তিশূন্য দেশে প্রেমধর্মের বন্যা এনেছিলেন তিনি। তাঁর প্রেমধর্মের বন্যায় উচ্চনীচ ধনীনির্ধন হিন্দু-মুসলমানের বাধধান ভেসে গিয়েছিল খড়কুটোর মত। হরিভক্ত যবন হরিদাস মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ হয়েছিলেন। যবন হরিদাসের তিরোভাবের পর মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁর সৎকার করেছিলেন। হরিদাসকে তিনি বলেছিলেন, "তোমারে যে শ্রদ্ধা করে সে করে আমারে।" (চৈ. ভা. মধ্য. ১০ অঃ) তাই বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবে মরে ॥ (তদেব)

জয়ানন্দ বলেছেন—

"বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাহিক সংসারে।
বৈষ্ণবের হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্বদা বিহরে॥ (চৈ. ম. উৎকল—২৬)

নবদ্বীপে অবস্থানকালেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিত্যানন্দ অবধূত ও হরিদাসকে আদেশ করেছিলেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বোল কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বহি আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥ (চৈ. ভা মধ্য ১০ অঃ)

প্রভুর আজ্ঞায় দুই ভক্ত ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম বিতরণ করে চললেন—

আজ্ঞা পাই দুইজনে চলে ঘরে ঘরে।
বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই একমন॥
এই মত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে॥ (তদেব)

পতিতের ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ দীনদুঃখী ভক্তজনের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। ঘোলা চেচা শ্রীধরের ঘরে ভাঙ্গা লোহার বাটিতে জল পান করে তিনি দরিদ্রের মর্যাদা অত্যুচ্চে স্থাপন করেছেন। তিনি সরবে ঘোষণা করলেন—

চণ্ডালেহো মোহোর শরণ যদি লয়।
সেহো মোর মুঞি তার জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও যদি মোরে না-লয় শরণ।
সেহো মোর নহে সত্য বলিলুঁ বচন॥ (তদেব)

লোচনদাস ঠাকুর যথার্থই বলেছেন,—

করুণা সাগর প্রভু সদয় হৃদয়।
আর্তজন দেখি প্রভু তখনি দ্রবয়॥ (চৈ. ম. মধ্যখণ্ড).

সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে বলেছিলেন—

যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইয়া কালি তাহার দুয়ারে॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন॥
সন্ন্যাসীরে সর্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার॥

সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি খুলে দেখো কে মোহোরে মারে ॥ (চৈ. ভা. মধ্য. ২৫ অঃ)

গোবিন্দদাসের কড়চায় সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহাপ্রভু বলেছেন একই কথা।

বলে সর্বজীবে শিক্ষা দিব সন্ন্যাস করিয়া।
দণ্ড ভূল করিয়া ফিরিব সব গ্রাম।
সর্বজীবে উদ্ধারিব দিয়া হরিনাম ॥
• • • •
নাহি রব ঘরে মুহি সন্ন্যাস করিব।
নতুবা কিরূপে সর্বজীব উদ্ধারিব ॥ (সো. ক. পৃঃ ৫)

সন্ন্যাসোত্তর জীবনে নীলাচলে অবস্থানকালেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দীন দরিদ্র অধম পতিতের দুঃখের কথা ভোলেন নি। এদের মুক্তিদানের উদ্দেশ্যেই যে তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু তিনি ত অন্তরঙ্গ ভাবরসে নিমগ্ন। তাই তিনি নিত্যানন্দকে বাঙ্গালাদেশে প্রেরণ করেছিলেন দীনদরিদ্র পতিতকে প্রেমরত্নফল বিতরণের উদ্দেশ্যে।

প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি আছি নবদ্বীপে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে ॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি ॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার ॥
ভক্তিরসদাতা তুমি তুমি সর্বারিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে ॥
এতেকে আমার বাক্য সত্য যদি চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন ॥ (চৈ. ভা. অন্ত্য. ৫ অঃ)

নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরে ধারণ করে গার্হস্থ্য আশ্রম স্বীকার করেছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং, তাঁর পত্নী জাহ্নবা দেবী এবং পুত্র বীরভদ্র জনে জনে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম বিতরণ করে মহাপ্রভুর পতিতোদ্ধার ব্রত সার্থক করে তুলেছিলেন।

পরম কারুনিক শ্রীচৈতন্যদেব পরধর্মদ্বেষী অত্যাচারী যবনদের কথা ভেবেও কাতর হয়েছিলেন। তাঁর অন্তর এঁদের জন্যও কেঁদেছিল। তিনি নীলাচলে হরিদাসকে বলেছিলেন—

হরিদাস কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহাদুরাচার ॥
ইহা সবার কোন মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার ॥ (চৈ. চ. অন্ত্য ৩ অঃ)

মুসলমান সমাজের উপর শ্রীচৈতন্যের প্রভাব কতখানি কার্যকরী হয়েছিল বলা কঠিন, তবে তাঁর অলৌকিক শক্তি মুসলমান সমাজকেও আকর্ষণ করেছিল। গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ্ মহাপ্রভুর ঐশী শক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবনযাত্রার অভিলাষে যখন গৌড়ের পথে যাত্রা করেছিলেন নীলাচল থেকে তখন এক যবনপতি প্রভুর কৃপালাভে ধন্য হয়ে উড়িষ্যার সীমান্ত থেকে যবনরাজ্যের অধিকারসীমা পিঠলা পর্যন্ত মহাপ্রভুর নির্বিঘ্ন উত্তরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই যবন রাজা সম্ভবতঃ হোসেন শাহের অধীনস্থ কোন সামন্তরাজা বা শাসনকর্তা ছিলেন। মথুরা-বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রয়াগের পথে এক পাঠান ধনী প্রভুর শরণ নিয়ে তাঁর কাছ থেকে রামদাস নাম পেয়ে কৃতার্থী হয়েছিল। (চৈ. চ. মধ্য. ২৮ পরি)। বিজুলি খান নামে এক তরুণ পাঠান মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে বৈরাগী হয়েছিল।

পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্বত্র গাহিয়ে বুলে মহাপ্রভুর কীর্তি ॥
সেই বিজুলি খান হৈল মহাভাগবত।
সর্বতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব ॥ (তদেব)

যবন হরিদাসের শ্রীচৈতন্যদেব যে মহত্তম মর্যাদা দিয়েছিলেন তাতে সর্বজাতিধর্ম-নিরপেক্ষ সকল মানুষের প্রতি তাঁর অযাচিত অকৃপণ করুণাধারা বর্ষণের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় পাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ আত্মরক্ষা করতে পারে নি। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বহু বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ শ্রীগৌরাঙ্গের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের পরিচয় দেয়।

জীউ জীউ মেরে মনচোর গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা ॥

পদটির ছন্দোময়তা সাহা আকবর মহাপ্রভুর প্রেম যাচ্ঞা করে বলেছেন—

ঐছন শহংকে বাহু বলিহারী।
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী।

কবিলাল মাহুদ সোনার গৌরাঙ্গের যে বিবরণ দিয়েছেন তা যে কোন শ্রেষ্ঠবৈষ্ণব কবির রচনার সমতুল্য—

সোনার মানুষ নদে এল রে।
শুভসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে ॥

* * * * *

সোনার মানুষ, সোনার বরণ, সোনার নূপুর সোনার চরণ।
চারিদিকে সোনার কিরণ ছুটছে আলোকিত করে।
কত লোহার মানুষ সোনা হল গৌর অবতারে ॥

এই ধরনের উৎকৃষ্ট পদরচয়িতা কবিদের পদে ভণিতা না থাকলে মুসলমান কবি বলে চেনাই কঠিন। সৈয়দ মর্তুজা নামে আর এক ভক্ত কবিকে ডঃ সুকুমার সেন সুকৌশলে ও বৈষ্ণব মহান্ত দুইই বলেছেন। (বা. সা. ই. এর কথা পৃঃ ৫৩৬)।

মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে হরিভক্তি-পরায়ণে চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তত্ত্ব বৈষ্ণবের কোন জাতি নেই, তাঁদের একটিই জাতি বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব—সেই স্মৃতিশাস্ত্রশাসিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিচালিত সংকীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার, এ রীতিমত বৈপ্লবিক চিন্তা। হিন্দু সমাজে বহির্গমনের পথ অবশ্য খোলা, কিন্তু প্রবেশের দ্বার একটিও খোলা ছিল না। হোসেন শাহ্ বাদশা হওয়ার পর বেগমের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত পূর্বজীবনে তাঁর প্রচেষ্টা ও কর্তব্য-চ্যুতির অপরাধে প্রহরারকর্তা সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশ করেছিলেন। সুবুদ্ধি রায় বারানসীর পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চেয়েছিলেন। পণ্ডিতকুল ফুটন্ত ঘি পান করে মৃত্যুবরণকেই সুবুদ্ধি রায়ের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বলে নির্দেশ দিলেন—"তপ্ত ঘৃত খাইয়া ছাড় প্রাণে।" কী ভয়ংকর প্রায়শ্চিত্ত। যে পণ্ডিতসমাজ একদা রাজা গণেশের পুত্র যদু ইসলামধর্ম গ্রহণ করলে যদুকে পুনর্বার হিন্দুসমাজে গ্রহণের উদ্দেশে রাজা গণেশের দ্বারা অনুষ্ঠিত স্বর্ণধেনুদান যজ্ঞে উপস্থিত থেকে এবং স্বর্ণধেনু সহ বিপুল দান গ্রহণ করে যদুকে সন্তুষ্ট চিত্তে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেছিলেন তাঁদেরই একাংশ সুবুদ্ধি রায়কে পরামর্শ দিলেন তপ্তঘৃতপানে প্রাণত্যাগ করতে। সুবুদ্ধি রায় পণ্ডিতদের পরামর্শ গ্রহণ না করে মহাপ্রভু কাশীতে এলে তাঁর পরামর্শ চাইলেন। মহাপ্রভু সুবুদ্ধিকে কৃষ্ণনাম জপ করে পাপমুক্ত হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

প্রভু কহে ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাবে॥ (চৈ. চ. মধ্য. ২৫ অঃ)

এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী জাতিবর্মনাশের সহজ সমাধান সে যুগে অপ্রত্যাশিত ও বটেই অসম্ভাবিত ছিল। তাই পণ্ডিত দুঃখীর নিকট প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরিত্রাতা বরাভয়দাতা ভগবানরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর হরিনাম মহামন্ত্রের ছত্রছায়ায় হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সকলেই আশ্রয় পেয়েছিল। বাঙ্গালী হিন্দু-বৌদ্ধ বিনষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের উদারতম মহত্তম আশ্রয় লাভ করে। যবন হরিদাস, যবন রাজ্যের মন্ত্রী সর্বত্যাগী রূপ-সনাতন, রাজবেশী সন্ন্যাসী রায় রামানন্দ, উৎকলবাসী শিখী মাইতি, কানাই খুটিয়া, বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য গৃহী অদ্বৈত শ্রীবাস, অবধূত নিত্যানন্দ, পণ্ডিত দামোদর, উৎকলাধীশ প্রতাপরুদ্রদেব, নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভাষাভাষী অসংখ্য মানুষ এক প্রেমধর্মের পতাকাতলে সম্মিলিত হয়েছিলেন,—উঁচনীচ ছোট বড় জ্ঞানী মূর্খ সব ভেদের সংকীর্ণ গণ্ডী অবলুপ্ত হয়ে এক মহামানবতার শাশ্বত রূপ প্রকটিত হয়েছিল একটিমাত্র অসামান্য পুরুষকে কেন্দ্র করে। এর থেকে বড় সাম্যবাদ আর কি হতে পারে? তাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে প্রচলিত অর্থে সমাজ সংস্কারক বলা না গেলেও তাঁর থেকে বড় সমাজ সংস্কারক আর কে আছেন?

মহাপ্রভুর প্রায় দুহাজার বছর পূর্বে বুদ্ধের অবতার ভগবান বুদ্ধ এদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন জরা মরণগ্রস্ত জীবের দুঃখে বিগলিত হয়ে আর্তমানবের ত্রাণকর্তা হিসাবে, আর এযুগে দুই সহস্র বছর পরে দুর্গত মানবের পরম নির্ভর হিসাবে পাপীতাপীর মুক্তিদাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

●

স্বামী অভেদানন্দ

(জীবন-নাট্য)

শ্রীবিমলভূষণ

প্রথম দৃশ্য

[রসিক মাষ্টার মশায়ের বাড়ি। বাজার ও কিছু জিনিসপত্রনিয়ে রসিকের প্রবেশ]

রসিক। ছোট বউ, ও ছোট বউ। কোথায় গেলে গো!

[বসে কোঁচার খুঁটে মুখ মুছলেন]

[নয়নতারার প্রবেশ]

নয়ন। কি হ'ল! ওমা, একি কাণ্ড! এত সব আনলে কেন বল তো! খেতে তো তিনটি প্রাণী। কালী, তুমি আর আমি। আর-সব ছেলেপুলেরা তাদের মামার বাড়ী গেছে না ক'দিন।

রসিক। তা বটে। কি জানো ছোট বউ, বাজার করতে গিয়ে—মনটা কেমন খচ্-খচ্ করতে লাগল। মনে হ'ল—তোমার দাদারা তোমার ছেলেপুলেদের কি ভালোই না বাসে। খাওয়া-দাওয়া আদর-যত্নে অস্থির ক'রে তোলে সবাইকে। তা, কালী যে এবার গেল-না কিছুতেই। তাই ভাবলুম যে, মামার বাড়ীর মত আদর-যত্ন নিজের বাড়ীতে তো আর হয় না। তবে, খাওয়া-দাওয়া একটু হোক না। তাই আনলুম।

নয়ন। তা বেশ করেছ। কিন্তু, ওকথা বল কেন গো? যত্ন বা আদর কি ওরা এখানেই কম পায়।

রসিক। [উঠে দাঁড়িয়ে উদাস ভঙ্গীতে] কি জানি ছোট বউ। মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় যে, সন্তানের প্রতি বাপের যতটুকু আদর-যত্ন করা উচিত, লক্ষ্য রাখা উচিত, সেটা বোধ হয় আমি পারি না। আর, সেই জন্যেই আমার অমন হীরের টুকরো ছেলে বেহারী কত সহজে আমায় ছেড়ে চ'লে যেতে পারল।

নয়ন। [এগিয়ে এসে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে] আবার তুমি ওই-সব নিয়ে মন খারাপ ক'রছ? আমার যে কথা দিয়েছিলে সব ভুলে গেলে!

রসিক। [দীর্ঘশ্বাস ও ম্লান হাসি) না ছোট বউ, কিছুই ভুলি নি। তোমায় দেওয়া কথাটা যেমন সর্বদা মনে রাখবার চেষ্টা করি, ঠিক তেমনি, মা-হারা ছেলে আমার বেহারীর সব স্মৃতিই আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। কিছুতেই মন থেকে তা তাড়াতে পারি না। বিশেষ ক'রে—রবিবার এলেই সে কথা বেশী মনে পড়ে।

নয়ন। কেন গো?

রসিক। খৃষ্টানদের নিয়ম আছে যে, প্রতি রবিবার চার্চে যেতে হয়। আর, সেখানে তাদের সব দোষগুটি স্বীকার করতে হয়। আমার কেবল মনে হয় যে, যে-বাপ তার মা-মরা ছেলেটাকে বুক দিয়ে আগ্‌লে রেখে এত বড়টি করেছিল—সেই ছেলের, নিজের ধর্ম ত্যাগের সঙ্গে বিনা দোষে সেই বাপকেও ত্যাগ ক'রে যাবার কথাটা ওই সময়ে একবারও কি মনে পড়ে না?

নয়ন। পড়ে গো পড়ে, নিশ্চয় পড়ে। এমন বাপের কথা কেউ ভুলতে পারে।

রসিক। পারে ছোট বউ, পারে [দীর্ঘশ্বাস], প্রথম প্রথম আমিও ভাবতুম যে, একদিন-না-একদিন বেহায়া তার ভুল বুঝে আমার কাছে ফিরে আসবে। বেশ কিছুদিন অপেক্ষাও করেছিলুম। কিন্তু সে ফিরে এল না। তখন মনে হল—"আর কেন? কার জন্যে এ পৃথিবীতে থাকব!" তাইতো শেষ করতেও গিয়েছিলুম এ—

নয়ন। [স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে] ওগো, আর ও কথা বোলো না। চুপ কর, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। [উদ্দেশ্যে প্রণাম] মা'র অসীম দয়া—

রসিক। হ্যাঁ গো, মা'র দয়াই বটে! নয় তো কে ফেরালো আমায়! জানো ছোট বউ, আজো সেই কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাই। নির্জন গঙ্গার ঘাটে কে যেন বলছে—"কি করছিস! আত্মহত্যা মহাপাপ। ফিরে যা। আবার ঘর সংসার কর। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।" ফিরে এলুম। তোমায় পেলুম। এদের পেলুম। কিন্তু—তবু—

নয়ন। না গো, না। আর কোনো 'তবু' নয়। তুমি কোথায় সবাইকে শিক্ষা দাও, জ্ঞান দাও। আর তুমিই এমন করছ?

রসিক। তা বটে। কিন্তু—

নয়ন। আর কিন্তু নয়। ভালোকথা, তুমি কোথায় যে যাবে বলেছিলে? যাও, ঘুরে এসো। দেরী কোরো না। এসেই চান ক'রে খেতে বসবে কেমন? আমিও ততক্ষণে রান্নাবান্না সেরে রাখি।

রসিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, চৌধুরীমশায়ের বাড়ী একটা মিটিং আছে বটে।

নয়ন। তো যাও, ঘুরে এসো। দেরী করছ কেন গো!

রসিক। এই যাই! তা কালী কোথায়, তাকে দেখছি না যে।

নয়ন। আছে কোথাও। কিন্তু, তুমি আবার দেরী করছ?

রসিক। না, না, ঠিক আছে, আমি ঘুরে আসছি। [প্রস্থান]

নয়ন। [উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে] দুগ্গা, দুগ্গা।

[লক্ষ্মীর মার প্রবেশ]

লক্ষ্মীর মা। দিদি।

নয়ন। [চেয়ে দেখে] ওমা, লক্ষ্মীর মা যে. কি খবর ভাই।

ল-মা। বড় বিপদে প'ড়ে তোমার জ্বালাতে এসেছি দিদি।

নয়ন। সে কি কথা? কি হয়েছে বল।

ল-মা। [ইতঃস্তত ক'রে] দুটো টাকার বড় দরকার!

নয়ন। ওমা, এই কথা। আমি ভাবলুম-কি জানি কি! দাঁড়া ভাই, আমি এখনি আসছি। [প্রস্থান] [ভজার প্রবেশ]

ভজা। মা-ঠান্ গো. সব্বোনাশ হয়েছে। [লক্ষ্মীর মাকে দেখে] ও, তুমি খুড়ি মা। মা-ঠান কোথায় গেল গো?

ল-মা। দিদি ভেতরে গেছে। কিন্তু, কি হয়েছে রে ভজু?

ভজা। আচ্ছা, বাবুকে দেখেছ খুড়ি-মা?

ল-মা। তিনি তো বেরিয়ে গেলেন।

ভজা। বেরিয়ে গেছে ? তবু ভালো। কিন্তু আমি এখন কি করি ?

ল মা। কি হয়েছে না জান্‌লে কি ব'লি,বল তে !

ভজা। কি হয়েছে ? কালীদাদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ল মা। কা'কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ?

ভজা। কালীদাদাবাবুকে গো, কালীদাদাবাবুকে।

ল-মা। সে কি ? কি ব'লছ তুমি ?

ভজা। ঠিক্‌ই বল্‌ছি গো খুড়িমা, ঠিক্‌ই বল্‌ছি আমি।

ল-মা। সব জায়গাগুলোয় খোঁজ করেছ ?

ভজা। কোনো জায়গাটি খুঁজতে বাকি রাখিনি। কোথাও যে পেলুম নি গো।

ল-মা। তা হ'লে উপায় ?

ভজা। উপায় পাইনি ব'লেই তো প্রাণটা আকুলি-বিকুলি করছে গো খুড়িমা। [কান্না]

ল-মা। চুপ কর ভজু, চুপ কর। ওই দিদি আসছে।

ভজা। এ্যাঁ ? [তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে নয়নতারাকে দেখে পাশে সরে গেল]

[নয়নতারার প্রবেশ]

নয়ন। কিছু মনে করিস নি ভাই লক্ষ্মীর মা, একটু দেরী হয়ে গেল, এই নে [টাকা দিয়ে ও ভজাকে দেখে] ও মা, ভজা তুই এখন এখানে ? কাজ টাজ নেই ?

ভজা। [মুখ ঢেকে] আছে।

নয়ন। আছে তো এখানে এলি যে। [ভজার কান্না] কি হল, কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন ? দেশ থেকে চিঠিপত্তর এসেছে বুঝি কিছু ?

ভজা। [মুখ আড়াল ক'রেই] না।

নয়ন। তবে কান্নার কি হ'ল ! কালীর সঙ্গে হয়েছে বুঝি কিছু !

ভজা। [ফিরে দাঁড়িয়ে] মা-ঠা'ন গো, তা হ'লে তো বেঁচে যেতুম। তেনাকেই যে খুঁজে পাচ্ছি নি গো।

নয়ন। এ্যাঁ ? কি বল্‌লি ? [ব'সে পড়বেন ও লক্ষ্মীর মা ধরে ফেলবেন]

ভজা। হ্যাঁ গো মাঠা'ন। সে যে 'এখ্‌নি আস্‌চি' ব'লে সাতসকালে বেড়াতে বেরুল, তারপর এতখানি বেলা গাড়িয়ে গেল, তেনার আর ফেরবার বার হ'ল নি।

নয়ন। কি হবে লক্ষ্মীর মা ?

ল-মা। কি আবার হবে। তুমি এত উতলা হ'য়ো না দিদি।

নয়ন। আমি উতলা হইনি রে। কিন্তু, ও'কে কি ব'ল্‌ব বল্‌ তো ?

ল-মা। জামাইবাবু ফিরতে ফিরতে কালী ঠিক ফিরে আসবে। [ভজাকে] তুমি সব জায়গাগুলোয় একবার ভালো ক'রে খুঁজে এসো না ভজু।

ভজা। কি যে বল খুড়িমা। খুঁজতে কোথাও বাকি রেখেছি আমি ?

নয়ন। তাহ'লে কি হবে ? [হতাশায় কেঁদে ফেলবেন]

ল-মা। [সান্ত্বনা দিয়ে] কেঁদে না দিদি, কেঁদো না। কালী এখনি ফিরে আসবে, তুমি দেখো। অত ভেঙে পড়লে কি চলে ?

নয়ন। ওরে, নারে, না। আমি ভেঙে পড়িনি। শুধু ভাবছি—

[রসিকের প্রবেশ]

রসিক। এই দেখো ছোট বউ, আমি দেরী করি নি, তাড়াতাড়িই ফিরছি [হঠাৎ চারিদিক দেখে, থেমে-একটু পরে] কি ব্যাপার ছোট বউ, তোমার শরীর-খারাপ করল নাকি ?

নয়ন। [মুখ ঢেকে] না।

রসিক। তবে, ব্যাপার কি ? কিরে ভজা, কি হয়েছে বল্ না ?

ভজা। [ভীতকণ্ঠে] বাবুগো, কি বলি দিকিনি। কালীদাদাবাবুর—

রসিক। কি, কি—কি হয়েছে ? কালীদাদাবাবুর কথা কি ব'ল্লি ?

ভজা। তেনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে নি যে গো বাবু।

রসিক। কি বল্‌ছিস্ তুই ?

ভজা। এতবড় কথা কেউ মিথ্যে ক'য়ে বলতে পারে না কি গো ?

রসিক। সব জায়গায় খোঁজ নিয়েছিস ?

ভজা। সে আর বাদ রেখেছি না কি ? কোথাউ পেলুম নি।

নয়ন। ওগো, এঁকি হ'ল ? বাছা আমার ডুবে গেল না তো ? [কান্না]

রসিক। ছিঃ ছোট বউ, ওসব কথা বলতে আছে ? দেখছি, আমি খুঁজে দেখছি।

নয়ন। [চোখ মুছে] হ্যাঁ গো, আমার ঘাট হয়েছে। তুমি খুঁজলে নিশ্চয় তাকে পাবে।

রসিক। ছোট বউ, কালীর জন্যে যে তুমি মা কালীর পায়ে বুক চিরে রক্ত দিয়েছিলে। মা তোমায় এত বড় দুঃখ দিতে পারেন না। এ সবই আমায় বরাতে হচ্ছে। সন্তানের কারণে বারবার এত যন্ত্রণা পাচ্ছি। কিন্তু এ-জীবনে জ্ঞানতঃ তো কখনো কোন অন্যায় করেছি বলে মনে পড়ে না।

নয়ন। ও সব বোলো না গো। মনে নেই—ও যখন হ'ল ওর সর্বাঙ্গ ছিল নাড়ীতে জড়ানো, নিঃশ্বেষ পর্যন্ত পড়ছিল না। তুমিই তো ওর নাড়ীর বাঁধন খুলিয়ে ওকে বাঁচিয়েছিলে। এবারও একটু খুঁজে দেখলে, তুমিই কালীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

রসিক। এ্যাঁ ? তুমি বলছ ? বেশ। কিন্তু কোথায় খুঁজি বল তো ?

নয়ন। আমি বল্‌ব ?

রসিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ বল না।

নয়ন। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে এক সাধু আছেন না ? তাঁর ওখানে একবার খোঁজ নাও না।

রসিক। কোথায় ? দক্ষিণেশ্বরে ?

নয়ন। হ্যাঁ। কালী আমাকে কদিন আগে জিগ্যেস করেছিল দক্ষিণেশ্বরে কি করে যেতে হয়।

রসিক। কিন্তু, দক্ষিণেশ্বরের সাধুর কথা কালী জান্‌ল কি ক'রে ?

নয়ন। ওই যে ওর বন্ধু যজ্ঞেশ্বর, সেই ওকে তাঁর কথা বলেছে।

রসিক। বুঝেছি। জানো ছোট বউ, একে বলে বরাত। বেহারীটা ধর্ম ধর্ম ক'রে স্বধর্ম ছেড়ে চলে গেল। আবার কালীরও যখন ধর্মবাতিক দেখলুম তখন

কত চেষ্টা করেছি তাকে ওপথ থেকে ফেরাতে। এমন কি গীতা পর্য্যন্ত সরিয়ে রেখেছি। কিন্তু, 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' একথাটাই মনে পড়ে নি।

নয়ন। এত সব ভেবো না গো। ওঠো তো। দেখ, কালীকে ঠিক ফিরিয়ে আনতে পারবে।

রসিক। বেশ, যাচ্ছি। [লক্ষ্মীর মাকে দেখে] কি কাণ্ড! বৌমাকে কেন এতক্ষণ আটকে রাখলে?

ল-মা। না, না তাতে কি?

নয়ন। তাই তো। [লক্ষ্মীর মাকে] মিছিমিছি দেরী হয়ে গেল তোর লক্ষ্মীর মা।

ল-মা। কিছু দেরী হয় নি দিদি।

নয়ন। না, না, তুই আয় ভাই। দরকার হ'লে ডেকে পাঠাব, কেমন?

[লক্ষ্মীর মার প্রস্থান]

রসিক। ভজা, একটা গাড়ী ডেকে আনতো, বলবি দক্ষিণেশ্বরে যাব।

ভজা। এজ্ঞে কর্তা, আনলুম বলে। তবে আমিও যাব কিন্তু।

রসিক। তুইও যাবি? বেশ। [ভজার প্রস্থান]

নয়ন। দেখ দিকি এতখানি বেলা গড়িয়ে গেল? তোমার কিছু খাওয়া হল না। একটু মিষ্টি আনছি। মুখে দিয়ে তবে বেরোবে কিন্তু। [প্রস্থান]

রসিক। না, না, ছোট বউ, শোনো। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে পেট আমার ভরে গেছে। আর কিছু খাবার দরকার হবে না।

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য ও রসের সার্থকতা ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(এক)

সঙ্গীত অলঙ্কারবিহীন ও প্রাণহীন বস্তু নয়, সঙ্গীত ললিতকলা, সুতরাং সঙ্গীতের যেমন ব্যাকরণ আছে, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস আছে, তেমনি আছে রস ও ভাব বা রস-ভাবের অভিব্যক্তি। তাই শিল্পী যতই আঙ্গিক, বাহ্য-উপকরণ প্রভৃতির প্রয়োগ সঙ্গীতে করুন না কেন, যতক্ষণ না তিনি তার সাহিত্যের সঙ্গে রস ও ভাবের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ ও অনুভব না করছেন ততক্ষণ সঙ্গীত সার্থকভাবে প্রকাশিত হয় না এবং সঙ্গীতের প্রাণপুরুষেরও জাগরণ হয় না। সেজন্য পাশ্চাত্য রসতত্ত্ববিদ্ ও সৌন্দর্যসেবী মিসেস ল্যাঙ্গার বলেছেন: "Experiments made with vocal music are entirely unreliable since words and pathos of the human voice are added to the musical stimulus." সুতরাং সঙ্গীতে সাহিত্যের উপযোগিতা যেমন আছে তেমনি আছে রসের বা রসানুভূতির। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলছেন— আকাশচারী মুক্ত বিহঙ্গ যেমন তার দুটি পাখার সাহায্যে স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে, তেমনি সঙ্গীতের সার্থক ও সুষ্ঠু প্রকাশ হয় কথার সঙ্গে সুরের মিলনে। কথা ও

সুরে গড়ে তোলে সঙ্গীতের অর্ধনারীশ্বরের রূপ—যে রূপ অপরূপভাবে পুরুষ-প্রকৃতির মিলন-সহায়তায় বিশ্বচরাচরের গঠনকে সার্থক ও সম্পূর্ণ ক'রে তোলে।

ভারতদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে রূপ ও ভাবের যুগ্মরূপের কথা স্বীকার ক'রে বলেছেন—রস সঙ্গীতের প্রাণ। তাই কথা ও সুর থাকলেও সঙ্গীতে যদি রসের সঞ্চার না থাকে তবে তাকে যথার্থ সঙ্গীত বলতে পারি না।

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীতের সাহিত্যকে সাধারণত 'পাঠ্য' বলা হোত। পাঠ্য কিনা 'গেয়-সাহিত্য' বা 'পদ-সাহিত্য'। অধ্যাপক রিচার্ডস্, হাড্‌সন, ব্রাডলে প্রভৃতি সাহিত্য-সমালোচকগণ সাহিত্যের সঙ্গে সমান আসন দিয়েছেন তার উপকরণ শব্দ বা ধ্বনি, বাক্য প্রভৃতিকে, কেননা শব্দ ও বাক্যের সমবায়েই সাহিত্যের রূপ সৃষ্টি হয়। রিচার্ডস সাহিত্যকে symbolic বা suggestive language বলেছেন। তাঁর অভিমতে 'all speech is intended to serve for the communication of ideas', language বা ভাষা তাই সাহিত্যের প্রতীক। মিসেস ল্যাঙ্গারের বক্তব্যও তাই। তিনি 'সঙ্গীতের সাহিত্য' বলতে সঙ্গীতের ভাবপ্রকাশক ভাষা বলেছেন। রিচার্ডসের বক্তব্যটিকে আরও স্পষ্ট ক'রে এখানে বলা দরকার। তবে রিচার্ডসের বক্তব্যটিকে মিসেস ল্যাঙ্গার তাঁর 'Philosophy in a New Key'—অর্থাৎ 'দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা'-গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, শব্দ বা word নির্দিষ্ট কোন মানুষের সুপ্ত ভাবসম্পদকে জাগ্রত করে ও প্রকাশ করে—'symbolizes feelings and ideas of a man।' তাই সঙ্গীতের সাহিত্য বলতে সঙ্গীতের শব্দের ও পাঠ্যের মর্মকথা বা সঙ্গীতশিল্পীর মধ্যে সুপ্ত বা লুক্কায়িত থাকে তাকে প্রকাশ করা বোঝায়, সেজন্য সাঙ্গীতিক ধ্বনি ও শব্দের সমবায়ে সাহিত্যের অর্থ হ'ল সঙ্গীতশিল্পীর অন্তরের কথা ও অনুভূতি ও তারই প্রকাশক ভাষা। রসসঞ্চার সেই ভাব ও অনুভূতিকে আরও স্পষ্ট ও প্রদীপ্ত করে।

ভারতের দার্শনিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা ঐ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, ধ্বন্যালোককার আনন্দবর্ধন, বিশ্বনাথ কবিরাজ, লোল্লাট, শঙ্কুক, মহিমভট্ট, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রভৃতি ধ্বনিশাস্ত্রী ও আলঙ্কারিকরা তাই ধ্বনি ও রস-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁদের গ্রন্থে। এখন যদি প্রশ্ন উঠে যে, ভাষার আলোচনায় সাহিত্য প্রভৃতির পর পুনরায় রসের আলোচনার সার্থকতা বা প্রয়োজন কি?—তা হলে বলি, মানুষের শরীর যতই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হোক না কেন—সেই শরীরে যদি লালিত্য ও কমনীয়তা না থাকে তবে সৌন্দর্যের দৃষ্টি ও সৃষ্টিক্ষেত্রে তা প্রশংসনীয় নয়। তাই সুন্দর তাকেই বলি—যার বাহির ও অন্তর বা বাহ্যিক-আন্তরিক লালিত্যের মধ্যে একটি সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের প্রকাশ থাকে। সঙ্গতি, সমপ্রকৃতি ও মিলনই যথার্থভাবে শান্তি ও সৌন্দর্যের সার্থক প্রকাশকে প্রাণবান করে।

এখন সৌন্দর্য, সঙ্গতি ও লালিত্যের দিক থেকে সঙ্গীত ও ভাস্কর্য এ'দুটি শিল্পের সামান্য-কিছু নিদর্শন দিলে বলা যায় যে, তুরুষ্ক-প্রভাবিত তোড়ি বা তোড়িকা-রাগিণী পারস্য বা পারসিক-প্রভাবিত খাম্বাজরাগিণী অপেক্ষা কিছুটা রসোদ্দীপ্ত ও চঞ্চল। আবার ধ্যানস্তিমিতনেত্র শান্ত-সমাহিত ভৈরবরাগের মহিমোজ্জ্বল চিত্র মালবকৌশিকরাগ অপেক্ষা স্তিমিত, প্রশান্ত ও সুন্দর। সে'রকম গ্রীকো-রোম্যান মূর্তিশিল্পের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

অঙ্গসৌষ্ঠবকে লাঞ্ছিত ক'রে ব্রাহ্মণ্যধর্মপ্রভাবিত ইন্দ্র ও ব্রহ্মার মতো বৌদ্ধ-অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়ের কমনীয় ভাবোজ্জ্বল মূর্তি, বা গান্ধারশিল্পে বা মথুরাশিল্পে পদ্মাসনে সমাসীন গৌতম-বুদ্ধের প্রশান্ত-মহিমান্বিত-ধ্যানমূর্তি প্রসাদগুণে পরমশ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্যদিকে খোটানে পারস্যপ্রভাবিত বোধিসত্ত্বের মূর্তিতে কমনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্ররসের প্রকাশই স্পষ্ট দেখা যায়। সুতরাং ভারতীয় শিল্পদৃষ্টির সঙ্গে অন্যান্য দেশের শিল্প-দৃষ্টির বেশ একটি পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করি। সেজন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ exhibition ও revelation-এর মধ্যে সীমারেখা স্বীকার ক'রে বলেছেন: "Indian art is never an exhibition but a revelation," কেননা exhibition-এর গরিমা তার অপরিমিত বহুলত্বের জন্য, আর revelation-এর গর্ব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে ও সামঞ্জস্যমাধুর্যে। সেজন্য সৌন্দর্য ও রসানুভূতির দিক থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের তুলনা নাই। পাশ্চাত্য-সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞ হ্যাভ্লকও একথা স্বীকার করেছেন।

রাগ-রাগিণীদের রসোজ্জ্বল ভাবমূর্তিগুলির মধ্যে যেমন বিচিত্র ভাবাভিব্যক্তির পার্থক্য আছে, তেমনি সার্থক শিল্পীরা কাব্যসঙ্গীত ও বাস্তুকলার কিংবা চিত্র ও ভাস্কর্যের মধ্যেও কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য স্বীকার করেছেন রস-ভাবাভিব্যক্তি'র দৃষ্টিকোণ থেকে। এ' সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করি ডক্টর দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য-লিখিত 'কাব্যতত্ত্বালোক' (১৯৭২) গ্রন্থ থেকে। ডক্টর দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখেছেন: চিত্র ও ভাস্কর্যকে বাস্তুকলার অন্তর্গত বলে দেখেছেন ভারতীয় আচার্যরা। ভাস্কর্য ও চিত্রের ভাব বা রস-সম্পর্কে সেজন্য তাঁরা একেবারে উদাসীন নন। "ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রে রজোগুণাত্মক ব্রহ্মার গায়ের রঙ হ'ল লাল, ব্রহ্মার চারটি মুখ ব্যঞ্জিত করছে চারটি বেদকে, কমণ্ডলু বোঝাচ্ছে বিশ্বকে, সাতটি হংস ব্যঞ্জিত করছে সাতটি জগৎকে (লোককে)। ভাস্কররা মন্দিরের গায়ে বিভিন্ন মূর্তি এঁকে এঁকে রসসৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তাতে রসৌচিত্যও স্বীকৃত হয়েছে, কেননা শৃঙ্গার, হাস্য, শান্ত-ভিন্ন অন্য রস বাস্তুগৃহে অথবা রাজ-প্রসাদে ব্যঞ্জিত করার কোন অবকাশ নেই, কিন্তু সভাগৃহে অথবা মন্দিরে সব রকম রসধ্বনিরই অবকাশ আছে। রাজা ভোজ 'সমরাঙ্গনসূত্রধার'-গ্রন্থে যেমন বলেছেন: 'রসানামথ বক্ষ্যোম দৃষ্টীনামিহ লক্ষণম্। তদায়ত্তা যতশ্চিত্রে ভাবাভিব্যক্তিরঞ্জায়তে॥' তাই যে চিত্র কোন ভাব এবং রসের উদ্রেক করতে পারে না, সেই চিত্র চিত্রই নয়। চিত্রের থেকে ভাবাভিব্যক্তি হবে, এই ভাবাভিব্যক্তি আবার রসের উপরে নির্ভরশীল। বিষ্ণুধর্মোত্তর ও সমরাঙ্গনসূত্রধারের মতে নাট্যসূত্রের উপরে চিত্রের ভিত্তি। চিত্র হ'ল নাট্যেরই একটি দৃশ্য এবং নাট্য হ'ল চিত্রেরই অনুক্রম। বিষ্ণুধর্মোত্তরের মতে নাট্য যেমন অনুকরণ, চিত্র ও তেমনি অনুকরণ।১ নৃতত্ত্বজ্ঞ এবং রসদৃষ্টি যেমন নৃত্যে প্রয়োজন, তেমনি চিত্রেও প্রয়োজন। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণের চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়ে বিভিন্ন চিত্ররচনার যে সূত্র পাওয়া যায় তাতে ব্যঞ্জনারও সন্ধান পাওয়া যায়। এ'বিষয়ে অবশ্য পাশ্চাত্য সৌন্দর্যসেবীদের মতের সমর্থন পাওয়া যায়। চিত্র এবং ভাস্কর্যের ব্যঞ্জনা অস্পষ্ট হলে তাকে স্ফুট ক'রে তোলার জন্য কাব্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। হয়তো এই কথা মনে রেখেই আলঙ্কারিক কুন্তক 'বক্রোক্তিজীবিত'-গ্রন্থে লিখেছেন: 'তস্মাদেব চ কাব্য কাব্যোপকরণ কর্মণাং চিত্র চিত্রোপকরণ চিত্রকরনোস্

১। এই অনুকরণ-সম্পর্কে পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল বলেছেন যে, সৌন্দর্য বা সৌন্দর্যতত্ত্ব Nature বা প্রকৃতিরই নিছক অনুকরণ। এ' বিষয়ে *Hegel's Aesthetics* দ্রষ্টব্য।

প্রথমমেব প্রতিপাদিতম্'। তাই কবিদের কাব্যের এবং কাব্যোপকরণের সাম্য প্রতিপাদিত হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও চিত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন—'ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গ, কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা—suggestiveness. এই ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হয়ে যায়; যা বলে তার চেয়ে বেশী বলে। এটিই ব্যক্ত ও অব্যক্তের মাঝখানকার সাঁড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দিষ্ট ভঙ্গীর দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্টি হয়' (বিচিত্র প্রবন্ধ, পৃ ২৩১)।

তাছাড়া ব্যক্তিত্বের প্রভাব, দৃষ্টি ও রুচির জন্য এক বাস্তুশিল্প বা স্থাপত্যের গঠন ও সৌষ্ঠবের মধ্যেই বিভিন্নতার সৃষ্টি হতে পারে এবং বিভিন্ন যুগের মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, প্রাসাদ প্রভৃতিই তার নিদর্শন। চালুক্য, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন প্রভৃতি শিল্পে ; আবার দক্ষিণে পল্লব, চোল, হয়শালা প্রভৃতি শিল্পে ; পুনরায় মোগল, পাঠান প্রভৃতি যুগেও বিভিন্ন রকম স্থাপত্যশিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের আকার, প্রকার ও শৈলীর বিভিন্নতায়। সামান্য-ভাবে উদাহরণ দিলে বলা যায়, সম্রাট আকবর ও সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালেই বিভিন্ন স্থাপত্যশিল্পে বিভিন্ন রুচি ও শৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায়।[১] হিন্দুমন্দিরশিল্পের সঙ্গে বৌদ্ধ কিংবা জৈন-মন্দিরশিল্পের এবং গুহামন্দিরশিল্পেও অনেক পার্থক্য চোখে পড়ে। সেই রকম বিভিন্ন যুগে রচিত কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির আঙ্গিকে ও প্রকাশে বৈচিত্র্যের প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেজন্য যখনই কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে ও সঙ্গীতে আমরা কিছু কিছু বা অনেক-কিছু পার্থক্যের নিদর্শন পাই এবং সেই সকল পার্থক্যের বা অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের নিদর্শন অনুসন্ধান করি, তখনই বুঝতে হবে যে, আঙ্গিক, শৈলির ও রচনা প্রভৃতির বিচিত্র গঠন ও প্রকাশের দিকে লক্ষ্য না ক'রে সামগ্রীকভাবে আমরা রসগত ও ভাবগত ঐক্য বা অনৈক্য তাদের মধ্যে কিভাবে আছে সেই সবের আলোচনা করি। সামগ্রীক দৃষ্টিকোণ থেকেই অবশ্য সেই সব আলোচনার সার্থকতা নিহিত।

তেমনি কাব্য ও সঙ্গীতকে নিয়েও তুলনা করা চলে শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে। জার্মান দার্শনিক হেগেল সঙ্গীতকে কাব্যের নিকট-সম্পর্কীয় বলেন :—"most newily affiliated to poetry." সঙ্গীতে স্বরবর্ণের প্রাবল্য হয়তো অধিক, কিন্তু কাব্যে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের হরগৌরীর মিলন থাকে। তবে সঙ্গীতে ও স্বরসৌন্দর্যের প্রকাশ ও সমাবেশ অধিক,

---

১. স্থাপত্যশিল্পবিদ্ প্রদ্ধেয় নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় আকবর ও সাজাহানের স্থাপত্যসৌধ-নির্মাণে বিভিন্ন প্রকৃতি, দৃষ্টি ও রুচির নিদর্শন নিয়ে Indian Culture-পত্রিকায় *The Architecture of Akbar and Shahjahan : A comparative study* বিষয়ে লিখেছেন :—"The contrast between the architecture of Akbar and that of Shahjahan is so striking that it cannot fail to impress even the most casual visitor watching the buildings of these two Emperors at close quarter..... Akbar's Indian style exhibits him as a true nation builder, whereas Shahjahan's buildings indicate a change in the imperial policy, and an incline towards bigotry and persecution.....Just as Akbar's mind and genius can be studied at Sikri, Shahjahan's personality and taste can be judged from his buildings inside the Agra Fort, or at Delhi.....These form a reflex of their mind and character."

মনের নির্বাচন-রূপ দৃষ্টি ও চারিত্রিক প্রভাব ও প্রকাশ নিয়ে, কাব্য ও সাহিত্যের সৃষ্টিক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও বিভেদের রূপ গড়ে তোলে।

কিন্তু কাব্যে ভাষাসুষমার প্রাধান্য অধিক। তবে সঙ্গীতে যেমন শব্দ বা নাদের প্রাধান্য, কাব্যে তেমনি নাদের নয়, ধ্বনিরই প্রাধান্য। সঙ্গীত-সম্পর্কে বলা হয়েছে—'গীতং নাদাত্মকম্', আর কাব্য-সম্পর্কে বলা হয়েছে—'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য'। তাছাড়া কাব্যের ও সঙ্গীতের ভাব ও আবেগের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা প্রার্থক্য আছে। সঙ্গীতের স্বর ও সুর, বা কথা ও সুর প্রত্যক্ষভাবে ভাবের দ্যোতক, কিন্তু কাব্যে কতকগুলি শব্দরূপকে প্রকাশ ক'রে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে হয় ভাবদ্যোতনার জন্য। তবে বলা চলে যে, সঙ্গীতের মাধুর্যকে কাব্য বিশেষভাবে উপেক্ষা করে না। মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন: 'ন চ তানি প্রযোজ্যানি হতশোভানি তানি হি। ব্যাপ্ত প্রতিষিদ্ধানি গীতকে তানি যোজয়েৎ'। অভিনবভারতী'-কার আচার্য অভিনবগুপ্ত তাই বলেছেন: "যানি বাক্যেস্তু ন ব্রুয়াৎ তানি গীতৈরুদাহরেৎ', অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা যাকে বলা যায় না, গীতের দ্বারা তাকে বলা যায়। গীত বা সঙ্গীত তাই কাব্য-অপেক্ষা সুদূরস্পর্শী বা অন্তরস্পর্শী, অর্থাৎ যাকে বলা যায় সঙ্গীতের গমনাগমন অন্তঃপুর পর্যন্ত! সেজন্যই সঙ্গীতের স্বর ও সুরের সাহায্যে রসিক স্থাপত্যের মতো শিল্পের সীমাকে অতিক্রম করেন—যদিও সঙ্গীতের চাইতে কাব্যের বিষয়বস্তু অনেক বেশী ও ব্যাপক। তবে কাব্যে শব্দের সঙ্গে অর্থের সার্থকতা থাকে। তাই শব্দের ব্যঞ্জনা এবং কাব্যিক কল্পনা একেবারে অবাধ গতিসম্পন্ন হতে পারে না, পক্ষান্তরে সঙ্গীতে শব্দ এবং অর্থ এ'রকম দৃঢ়-ভাবে সন্নিবদ্ধ নয়। সঙ্গীত কোন বিশেষ রূপেরই অনুকরণ করে না, আবার শিল্প-হিসাবে সঙ্গীত কোন বিশেষ ব্যক্তিগত লৌকিক উপযোগ সিদ্ধ করে না। এজন্য কাব্যের মতো শিল্প হিসাবে সঙ্গীতেরও সার্থকতা আছে (কাব্যতত্ত্বালোক, পৃ ৩৩)। সুতরাং একথা ঠিক যে, ভাব ও রসকে বাদ দিয়ে কোন শিল্পই সার্থক হতে পারে না।

তাছাড়া শব্দ, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে রীতি, সাত্ত্বিকাদি বৃত্তি, ধ্বনি, ব্যঞ্জনা প্রভৃতির উপকারিতা আছে রসের ও ভাবের প্রকাশকে পূর্ণ ও সার্থক ভাবে সৃষ্টি করার জন্য এবং সেজন্য নাট্যশাস্ত্র, ভাবপ্রকাশন, সাহিত্যদর্পণ, শৃঙ্গারতিলক, সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্ প্রভৃতি গ্রন্থে ভরত, সারদাতনয়, বিশ্বনাথ কবিরাজ, ধাররাজ ভোজ, প্রভৃতি আচার্যরা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন বেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রীতির ক্ষেত্রে পাঞ্চালী, গৌড়ী, শৌরসেনী প্রভৃতি, বৃত্তির ক্ষেত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক প্রভৃতি গুণ এবং ভাষার ক্ষেত্রে প্রাকৃত, সংস্কৃত, দ্রাবিড় প্রভৃতির কথা নাট্য ও সাহিত্যস্রষ্টারা উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া রস ও অলঙ্কার নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, ভট্টলোল্লাট, মধুসূদন সরস্বতী, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রভৃতি—সেকথারও উল্লেখ করেছি।

তবে মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির ক্ষেত্রে সংস্কৃত, প্রাকৃত, দেশভাষা, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দু, রাজস্থানী প্রভৃতি যেকোন ভাষারই উপযোগিতা আছে। ভাব ও অনুভূতির ক্ষেত্রে ভাষা, ধ্বনি ও সাহিত্যের উপযোগিতা আসলে রসসৃষ্টির জন্য, কেননা রসই ভাষা, ধ্বনি ও সাহিত্যের প্রাণ ও শক্তি। তাছাড়া শব্দলালিত্য বা শব্দসুষমাও সাহিত্যের ও সঙ্গীতের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তবে সকল-কিছু লালিত্য ও সুষমার পিছনে থাকে রস ও তার অকুণ্ঠপ্রকাশ।

মোটকথা রস শুধু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নয়, কাব্য, সাহিত্য, নাটক ও সকল-কিছু শিল্পকার্যের প্রাণস্বরূপ। রসকে তাই ভরত ও অন্যান্য শাস্ত্রকাররা কারণ, নির্যাস বা extract বলেছেন। রসকে বস্তুহিসাবেও গণ্য করা হয়েছে। নারদ নারদীশিক্ষায় ও

শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে প্রতিটি স্বরের শ্রুতিতে, স্বরে ও রাগে রসসত্তার উল্লেখ করেছেন। দীপ্তা, আয়তা, মধ্যা, করুণা প্রভৃতি শ্রুতি বা জাতিশ্রুতির নামগুলি রসেরই বোধক ও নির্দেশক। বহু আলঙ্কারিক রসকে ব্রহ্মানুভূতির সমগোত্রীয় বলে উল্লেখ করেছেন। দার্শনিক মধুসূদন সরস্বতী 'ভক্তিরসামৃত'-গ্রন্থে 'রসো বৈ সঃ' কথার ইঙ্গিতে বলেছেন 'ব্রহ্মস্বাদসহোদরা'। বিশ্বনাথ কবিরাজ ও পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের কথাও তাই। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ছিলেন সম্রাট সাজাহানের সভাপণ্ডিত। তিনি তাঁর অসামান্য 'রসগঙ্গাধর'-গ্রন্থে রস বা রসবস্তুকে চিতিসত্তা 'চৈতন্য' বলেছেন। সুতরাং রস শুধু সঙ্গীতেরই নয়, সকল-কিছু বস্তুর যে প্রাণ ও আধার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

●

॥ ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

: বেদান্তের আলোকে

স্বামী প্রভানন্দ

উনিশশতকের নবোন্মেষের উষালগ্নে রাজা রামমোহন উজ্জ্বল প্রভাতী তারার মত সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সনাতনী জীবনধারার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে ইউরোপবাসীদের চিত্তভূমিতে উদ্ভূত হয়েছিল বিভিন্ন মতবাদ। এসকলের কিছু কিছু সাতসাগর পেরিয়ে ভারতবর্ষের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-সমাজের মানসচেতনো অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিদেশজাত নবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও রামমোহন প্রমুখ দেশের দিকপালগণ দেশের ভবিষ্যৎ সংগঠনে সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, চারিত্র্যনীতির নিয়ামক হিসাবে 'ভারতধর্মের' আশ্রয় নিয়েছিলেন, ভারতীয় ভাবধারায় সম্পৃক্ত অধ্যাত্মবিদ্যার মধ্যে জীবনসুধা অন্বেষণ করেছিলেন। রামমোহন-জন্মশতাব্দী-জয়ন্তীর প্রাক্সভানুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধানিবেদন করে বলেছিলেন: "Rammohan belongs to the lineage of India's great seers, who age after age, have appeared in the arena of our history with the message of Eternal Man. India's special genius has been to acknowledge the divine in human affairs, to offer hospitality to all that is imperishable in human civilization, regardless of racial and national divergence." ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদ অধ্যাত্মবিদ্যার প্রাণদ পীযূষধারা দিয়ে ভারতবাসীকে সঞ্জীবিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন রামমোহন।

ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার মুকুটগৌরব অদ্বৈতবেদান্ত। বিশ্বকোষ লিখেছে: "ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ বলা যায়। সগুণব্রহ্মকে সাকার, নিরাকার এবং উভয়রূপক বলা যায়। ইহারই নাম ঈশ্বর। ... নির্গুণ-ব্রহ্মকে নির্বিশেষ নিরাকার.....পরব্রহ্ম বলা হয়। নির্গুণ-ব্রহ্ম জ্ঞেয় বা উপাস্য হন না। সগুণ-ব্রহ্ম জ্ঞেয় বা উপাস্য হন। সগুণ-ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ হয়। নির্গুণ-ব্রহ্ম অসঙ্গ, তাহার সহিত সম্বন্ধও সম্ভব হয় না।.....শ্রুতিমধ্যে সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ ব্রহ্মের কথা বলা

হইয়াছে।"[১] প্রধান উপনিষদ হতে নির্গুণবোধক শ্রুতি এগারোটি উদ্ধৃত করা হয় ; সগুণব্রহ্ম-বিষয়ক উদ্ধৃতিও প্রায় সমসংখ্যক।

কিন্তু উনবিংশতকের প্রথম তিনপাদে বাঙ্গালার বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌দের অদ্বৈতবেদান্ত-সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় ব্যাখ্যাধারণা বর্তমান কালের পাঠককে বিস্মিত করে। রাজা রামমোহন হতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত অদ্বৈতবেদান্তের উত্তরণের কাহিনী বিস্ময়কর কিন্তু সুস্পষ্টভাবে যুগমানস-বিবর্তনের প্রতিফলক।

শতাব্দীর অন্তে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তদর্শনের তাৎপর্য-সম্বন্ধে বলেছেন : "ইহা বেদ নামে খ্যাত প্রাচীন সুবিশাল আর্যসাহিত্য হতে উদ্ভূত। বহু শতাব্দী ধরিয়া সংগৃহীত এবং সংকলিত সেই বিশাল সাহিত্যে যে-সব উপলব্ধি, তত্ত্বালোচনা, বিশ্লেষণ এবং অনুধ্যান সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা যেন তাহা হইতেই প্রস্ফুটিত একটি সুকোমল পুষ্প। ইহা-সম্পূর্ণ-রূপে নৈর্ব্যক্তিক।.....বেদান্তের সহিত কোন ধর্ম বা দর্শনের বিবাদ নাই। বেদান্ত একটি মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়াছে এবং বেদান্ত দাবী করে যে, উহা পৃথিবীর সব ধর্মমতের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এই তত্ত্বটি হইল এই যে, মানুষ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। .....মানুষ যেন ক্ষুদ্র আধারে আবদ্ধ, অথচ সতত-প্রসারণশীল একটি অনন্ত শক্তিমান স্প্রীং এর মতো। পরিদৃশ্যমান সমগ্র সামাজিক ঘটনা পরম্পরা এই মুক্তিপ্রয়াসেরই ফল। .....নৈতিকতা, সততা ও পরোপকার বলিয়া যাহা কিছু আমাদের নিকট পরিচিত, তাহাও ঐ একত্বেরই প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।.... এই ঐক্যেরই প্রকাশকে আমরা প্রেম ও করুণা নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং ইহাই আমাদের সমস্ত নীতিশাস্ত্র ও সততার মূলভিত্তি।.....রাত্রির মৃদু শিশিরসম্পাতে যেমন শস্যক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, ঠিক তেমনি অতি ধীরগতিতে এবং অলক্ষ্যে এই অধ্যাত্মদর্শন মানবের কল্যাণার্থ সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে।" অদ্বৈতবেদান্ত অনুসারে চারিদিকে দৃশ্যমান বস্তুসকল, সকল জগৎ-ই এক সত্তাস্বরূপের বিবর্তনমাত্র। অদ্বৈতবাদের মূলকথা ব্রহ্মের অবিকার চৈতন্যসত্তাই একমাত্র সত্য ও নিত্য এবং ব্রহ্ম ভিন্ন অপর সকল কিছুই অসত্য। অসত্য কিনা পরিণামী ও বিকারী। অপরিণামী নিত্য-সত্যব্রহ্ম কিরূপে জগৎ-রূপে পরিণত হন, এ রহস্যের কারণ 'অধ্যাস'। অধ্যাস হচ্ছে 'অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ'। যা যা নয়, তাকে তাই বলে জানার নাম অধ্যাস। চলমান, অনিত্য পরিণামী সংসারকে সত্য ও নিত্য বোধ করার কারণ অধ্যাস। অধ্যাসই মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, ভ্রম, মিথ্যাজ্ঞান ইত্যাদি। দেশ কাল নিমিত্তের মধ্য দিয়ে দেখার ফলেই চির-অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মকে জগদ্‌রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। অদ্বৈতমতের যুক্তিবাহী সিদ্ধান্ত হচ্ছে মানুষমাত্রেই প্রকৃতপক্ষে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত, জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই 'মহতো মহীয়ান' ব্রহ্মের সচল বিগ্রহ বৈ ত নয়। জীব শিব। মানুষই নারায়ণের প্রতীক।

ভারতীয় সমাজ নানাকারণে অদ্বৈততত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ ও ব্যাপক ব্যাবহারের ফলভাগী হতে পারেনি। বরঞ্চ অনেক সময়ে সে-মহান আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত আচারণ করে গ্লানির পূতিগন্ধপূর্ণ বন্ধ জলাশয়ে হাবুডুবু খেয়েছে। উনিশ শতকের প্রারম্ভে সমাজের চতুর্দিকে বন্ধ বিষাক্ত আবহাওয়ার পরিবেশ। রাজধানী কলকাতা-সম্বন্ধে হুতোম লিখেছেন,

১. 'বিশ্বকোষ: ২য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড/পৃ: ৭১৮-২৯

২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২৩-৩০

"রাঁড় বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।" সেই জীর্ণদীর্ণ সমাজকে গ্লানিমুক্ত করার শুভ সংকল্প গ্রহণ করলেন রামমোহন। ঈশোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকাতে তাঁর বহু দূর পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন, "being thoroughly convinced of the lamentable errors of my countrymen, have been stimulated to employ every means in my power to improve their minds and lead them to the knowledge of a purer system of morality.[৩] হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য হিন্দুধর্মের মূলগ্রন্থ বেদ বেদান্তের দেশীয় ভাষায় অনুবাদ ও প্রচারের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। বেদান্তগ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি লিখেন, "বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকে এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে একপ্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক।" রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল "সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্মের" মহৎ উপাসনার প্রচার করা। "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের" প্রচার রামমোহন বেদান্তগ্রন্থে আহ্বান জানালেন, "এক ব্রহ্ম বিনা অপরে উপাসনা করিবেক না।"

ধর্ম রামমোহনের জীবনদর্শনের মূলধারা স্বীকার করে নিলেও রামমোহনের প্রকৃত ধর্মমত সন্দেহের কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন। এ-সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। অদ্বৈততত্ত্ব-বোধক গানের রচয়িতা রামমোহনের লোকাশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন অভিমত ও কার্যকলাপ, এমন কি বেদান্তের উপযোগিতার বিরোধী উক্তি অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। ইদানীংকালে জনৈক গবেষক লিখেছেন, "রামমোহন স্পষ্টতঃ নিজের মত বুঝিয়ে না দিলেও কে জানে তাঁরই অগোচরে তাঁর জীবনদর্শন তৈরী করেছিল কিনা।"[৪] অপর একজন প্রমাণ করেছেন রামমোহন ডিগবি মারফৎ কোলব্রুক সাহেবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, বৈদিক সংহিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, "following Colebrooke he came to the conclusion that monotheism was the message of the entire Vedic literature, including the Samhitas,.....idolatry being a latter corruption of it during the Pauranik period under the influence of the priestly class .....So, in identifying Hinduism with sheer Vedo-Brahmanism and regarding Hindu idolatry as its corruption Rammohan was misled, largely by Colebrooke."[৫] এ সকল আধুনিক গবেষকদের নূতন নূতন তথ্যাদি আবিষ্কার সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে রামমোহনই উপনিষদের সার বেদান্তকে এবং ব্রহ্মসূত্রাশ্রিত অদ্বৈততত্ত্বকে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সুরক্ষিত কুক্ষি হতে মুক্ত করেছিলেন, বেদান্তের প্রাণদ বলদ শক্তিধারায় দেশবাসীকে উদ্বোধিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে রামমোহনই একমাত্র গঠনকারী আধুনিক সংস্কারক; তিনিই ভারতের জাতীয় ভাবধারা অনুযায়ী বেদান্তের আদর্শকে রূপদানের চেষ্টা করেছিলেন। মোটের উপর তিনি অদ্বৈতকেশরী শঙ্করাচার্যের মত ও পথ অনুসরণ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবজাত মানবমুক্তির আদর্শ, বেন্থামের মানবহিতবাদ প্রভৃতির দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত

৩. The English works of Raja Rammohun Ray, Ed by Jogendra ch. Ghosh, 1885, Vol I, p 86.

৪. ভবতোষ দত্ত: চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ২য় সংস্করণ, পৃ: ৩১.

৫. Niranjan Dhar: Vedanta & Bengal Renaissance, 1977, p. 77-91

হয়েও শাস্ত্র ও যুক্তির ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি শঙ্করানুগামী। 'নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া।' ব্রহ্মবিচারে বুদ্ধিশুদ্ধির দৌড় নেহাত-ই সীমিত। শংকরাচার্য লিখেছেন, "ন অনেন বিধেন শুষ্কতর্কস্য অত্র আত্মলাভঃ সম্ভবতি, শ্রুত্যানুগৃহীতঃ এব হি অত্র তর্কঃ অনুভবাঙ্গতেন আশ্রীয়তে।"[৬] এই যুক্তির সূত্র ধরেই যেন রামমোহন "Abridgement of the Vedanta" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "for the reasoning faculty which leads men to certainty in things within its reach, produces no effect on question beyond its comprehension"[৭] শাস্ত্র ও যুক্তির সুষ্ঠু সমন্বয়ই সত্যের পথ দেখাতে সমর্থ। রামমোহন তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত লিখেছেন "English Translation of Kena Upanished এর ভূমিকাতে। তিনি লিখিছেন, "The best method perhaps is neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other; but by a proper use of the lights furnished by both.....relying on the goodness of the Almighty Power, which alone enables us to attain that which we earnestly and diligently seek for."[৮] ফরাসী এনসাইক্লোপেডিস্টদের মত কঠোর যুক্তিবাদী হয়েও রামমোহন ধর্মসিদ্ধান্তের ব্যাপারে শাস্ত্রের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা মেনে নিলেন। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মধ্যে নাগার্জুন, গৌড়পাদ, শংকরাচার্য শাস্ত্রানুগ বিচারের সমর্থক, রামমোহনও মোটের উপর এই মহাজনদের পন্থানুসারী। তাঁর সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট ঘোষণা দেখতে পাই 'বেদান্তগ্রন্থের' অনুষ্ঠান নামক দ্বিতীয় ভূমিকাতে। তিনি সেখানে লিখেছেন "আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়ের নির্ধারিত পথের সর্বদা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।" পরে আমরা দেখব রামমোহন নিজেই এই সিদ্ধান্ত মানেননি, বিশেষতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে।

উনিশশতকে বেদান্তপ্রচারে রামমোহন শংকরাচার্যের বাণী ও মতের পুনঃপ্রচারক মাত্র মনে করলে রামমোহনের অসাধারণ প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করা হবে। তিনি যুগের প্রয়োজনে এবং নিজের উদ্দেশ্যসাধনে অদ্বৈতবেদান্তকে ব্যবহার করেছিলেন। হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ সংস্কার করার প্রবল তাগিদের সঙ্গে খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রীপ্রমুখ আক্রমণকারীদের উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করার জন্য রামমোহন তর্কযুক্ত ও শক্তিশালী লেখনী অবলম্বন করেছিলেন; বেদান্তদর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য তিনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বেদান্ত-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সকল প্রয়াসের মধ্যে রামমোহনের জীবনীকার মিস কোলেট লক্ষ্য করেছেন, "his continuity with the historic past of India and as the implement enabling him to connect her with a progressive future." ভারতীয় জীবনের মূলধারাটি অনুসরণ করেই রামমোহন জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেই মূলধারার মধ্যে বেদান্তের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

কারো কারো মতে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদ অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার ছিল রামমোহনের লক্ষ্য। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মনে করেন রামমোহন বিশুদ্ধ

৬. বেদান্তসূত্র ২।১।৬ শাঙ্করভাষ্য।
৭. The English works of Raja Rammohan Roy, Ibid, vol I, p. 4-5.
৮. Ibid, vol I, p, 41.

হিন্দুধর্মের উদ্ধাতা। তিনি লিখেছেন, "সদ্য জাগরণোন্মুখ নবীভারতের শঙ্করাচার্য রাজা রামমোহন হিন্দুর মূলভিত্তি অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সংস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।"[৯] শুধুমাত্র তর্কভূষণ মশাই কেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন তাঁর একটি ভাষণে (১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুলাই ইণ্ডিয়ান মিরারে প্রকাশিত) বলেছিলেন, "He (Rammohun) thus professed himself a Hindu—not a Puranic Hindu but a Vedic Hindu, and his religious movement was not organisation of an absolutely theistic church, but simply the revival of primitive Hinduism."[১০] খাঁটি বৈদিক হিন্দু রামমোহন খাঁটি হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান করেছিলেন মাত্র। শুধু কি তাই? কেউ কেউ ধারণা করে বসেছেন যে তিনি অদ্বৈতকেশরী শঙ্করাচার্যকে হুবহু অনুসরণ করেছেন। আবার কেউ বা দাবী করেছেন যে তিনি স্থলবিশেষে শঙ্করাচার্যের সংশোধন করেছেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, "এই বেদান্ত বা শ্রুতিসমূহের আলোচনায়, রামমোহন বিশেষভাবে শঙ্করভাষ্যকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার বেদান্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ গ্রন্থাদিতে ইহার প্রমাণ প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যমান। অনেক পণ্ডিতের মতে রামমোহন হুবহু শঙ্করকে কেবল অনুসরণ করেন নাই, পরন্তু অনেকস্থলেই শঙ্করকে সংশোধন করিয়াছেন।··· কিন্তু জীবের নিকট মুক্তিলাভের পরেও ব্রহ্ম সাধনীয় থাকিয়া যান। এইরূপ দু-চারিটি উক্তি হইতে যাহারা রামমোহন দ্বারা শঙ্কর-ভাষ্য সংশোধিত হইয়াছে প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর, আমরা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত দুঃসাহসী ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?"[১১]

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে রামমোহন বেদান্তপ্রতিপাদ্য যে অদ্বৈততত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন তার স্বরূপ কি? রামমোহনের সাম্প্রদায়িক জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে রামমোহন কোন বিশেষ শাস্ত্রবাদী বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন না। "তিনি (রামমোহন) সর্বশাস্ত্র হইতে একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিষ্কাশন করিলেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তাঁহার উপাস্য দেবতা এবং 'সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং' তাঁহার একমাত্র আদিশাস্ত্র।"[১২] আরও কয়েকধাপ এগিয়ে সাম্প্রদায়িক কয়েকজন লেখক দেখাবার চেষ্টা করেছেন রামমোহন হতে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে ধর্ম ও দর্শনের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ধ্যানধারণা অব্যাহত রয়েছে। এই মতে রামমোহন বেদান্ত ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র হতে দেখিয়েছেন যে সগুণ ঈশ্বর, যিনি বিশ্বসংসারের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা, তিনি পারমার্থিক সত্যও বটে। রামমোহন তাঁর The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness গ্রন্থের ভূমিকায় ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখেছেন, a Supreme Superintending Power, the Author and Preserver of this harmonious system, who had organised and who regulates such an infinity of celestial and terrestial objects." তাছাড়াও ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডীডে রামমোহন ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখেছেন, "the Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver

৯. Commemoration Volume of the Rammohan Ray Centenary celebration, 1933, Part II, P 239.

১০. Ibid, Part II, P. 186.

১১. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার নবযুগ পত্রাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ৩৩

১২. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : মহাত্মা রাজা রামমোহনরায়ের জীবনচরিত, বেঙ্গল পাবলিশিং পৃঃ ৫২৯

of the Universe." রামমোহনের এই সগুণ নিরাকার ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে শঙ্করাচার্যের নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মবস্তু হতে ভিন্ন। কট্টোর ব্রাহ্মমতাবলম্বী শ্রীপীযূষকান্তি দাস প্রমাণ করেছেন যে, ব্রহ্ম ও জীব সম্বন্ধে রামমোহনের ধারণা শঙ্করাচার্য হতে নিশ্চিত সুস্পষ্ট ও ভিন্ন। রামমোহন বেদান্তগ্রন্থে ৩৮ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "যেখানে কহেন যে পরমাত্মা সেই আমি যে আমি সেই পরমাত্মা এইরূপ ব্যতীহারে অর্থাৎ বিপর্যয় করিয়া কহিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু জীবকে পরমাত্মার সহিত অভেদ জানিলে পরমাত্মাকেও সুতরাং জীবের সহিত অভেদ জানিতে হয় অতএব ঐ ব্যতীহার বাক্যের তাৎপর্য কেবল ঈশ্বর আর জীবের অভেদ চিন্তন হয় এমত নহে।" তাছাড়াও রামমোহন বেদান্তগ্রন্থে ৫৫ সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "পরমেশ্বর আর জীবে ভেদ আছে যেহেতু জীবের সত্তার দ্বারা পরমেশ্বরের সত্তা না হয় বরঞ্চ পরমেশ্বরের সত্তাতে জীবের সত্তা হয় আর ঈশ্বর অপর বস্তুর ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়েন কিন্তু কেবল উত্তম জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন।" এই লেখকের মতে রামমোহন জীবকে ব্রহ্ম হতে অভেদ জ্ঞান করলেও জীব ও ব্রহ্ম কখনই সমধর্মী বিবেচনা করতেন না। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ইদানীংকালের একজন প্রধান প্রবক্তা দিলীপ বিশ্বাসের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি মনে করেন যে রামমোহন শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্তকেই গ্রহণ করেছেন। তৎসত্ত্বেও শঙ্করাচার্যের সঙ্গে অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে তাঁর মতপার্থক্য ঘটেছে: (ক) রামমোহন উপাসনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন; (খ) রামমোহনের মতে ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ গৃহস্থের অধিকারের, অন্তর্ভুক্ত এবং এবিষয়ে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর একচেটিয়া অধিকার নেই; ও (গ) সম্ভবতঃ শাঙ্করবাদ ও তন্ত্রের প্রভাবে তিনি মায়াকে ঈশ্বরের সৃজনীশক্তিরূপে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।[১৩]

●

॥ দেবীতীর্থ ক্ষীরভবানী ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

ক্ষীরভবানীর ইতিহাস বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ ও বহুস্মৃতিজড়িত। তীর্থ-পরিভ্রমণকারীদের নিকট এই তীর্থ পরম আদরের বস্তু।

শ্রীনগর হইতে গন্ধরাম প্রায় সাড়ে বারো মাইল উত্তরে এবং এই স্থানটি শ্রীনগর হইতে ১০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখানকার চতুর্দিকের দৃশ্য মনোরম। দেখিলে মনে হয় কবি-কল্পিত সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী গন্ধরবল নাগরীর কথা।

বহুপূর্বে ক্ষীরভবানী ও অন্যান্য তীর্থস্থানে যাইতে হইলে স্থলপথেই যাইতে হইত। বর্তমানে অবশ্য বহু রাস্তাঘাট নির্মিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল স্থানে বা তীর্থক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। শ্রীনগর ও কাশ্মীরের চতুষ্পার্শ্ব তুষারমণ্ডিত বড় বড় পর্বত থাকায় বিক্ষিপ্ত বহু প্রস্রবণ সৃষ্টি হইয়াছে এবং বলিতে গেলে প্রায় ৩০০টি প্রস্রবণ এদিকে সেদিকে আঁকিয়া-বাঁকিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তবে কিছু কিছু প্রস্রবণ এখন বিলুপ্তপ্রায়।

১৩. Narendra Kr. Sinha (Ed): The History of Bengal (1757-1905), Cal. Uni., p. 564.

আরও আশ্চর্যান্বিত হইতে হয় যে, ঐ সকল প্রস্রবণ কোন কোন দেব-দেবীর নামে নামাঙ্কিত বা উৎসর্গীকৃত এবং প্রতিটি প্রস্রবণের নামের শেষে 'নাগ' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে—যেমন ভেরীনাগ, অনন্তনাগ, কোকরনাগ, শেষনাগ প্রভৃতি। ঠিক এইরূপ একটি প্রস্রবণের নাম 'ক্ষীরভবানী'। ক্ষীরভবানী প্রস্রবণটি যেইস্থানে অবস্থিত তাহার চতুষ্পার্শ্বের স্থান বা অঞ্চলটির নাম তুলামুলা'। গন্ধরবল (গন্ধর্বল) হইতে তিন মাইল উত্তরে এই তুলামুলা ছোট গ্রামখানি অবস্থিত এবং দেখিতেও সুন্দর। তুলামুলা স্থানটি জলাভূমিতে ভাসমান এবং দেখিতে একটি উদ্যান বা স্বর্গের মতো। ইহার চারিদিকে শস্যশ্যামল ধান্যক্ষেত্রে পূর্ণ আর চিনার বৃক্ষশ্রেণীতে পূর্ণ ও শোভিত। ক্ষীরভবনীর চত্বরের চতুষ্পার্শ চিনার প্রভৃতি বিচিত্র রকমের বৃক্ষদ্বারা শোভিত।

দেবী ক্ষীরভবানীর উদ্ভব-সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তাহাদিগের মধ্যে দুই-একটি মাহাত্ম্যময়ী কাহিনীর কথা এখানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রামায়ণে আছে যে, লঙ্কাধিপতি দশানন রাবণ পার্বতী তথা শ্যামার আরাধনা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লাভে বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন। কোন সময়ে নাকি ক্রোধের বশবর্তী হইয়া রাবণরাজ শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মী সতীলক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করেন ও সেইজন্য দেবী পার্বতী ('শ্যামা') ক্রুদ্ধা হইয়া রাবণরাজকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। পরে দেবী পার্বতী রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া হনুমানকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে (পার্বতীকে) এবং তাঁহার সঙ্গে ৩৬০টি বিষধর সর্প বা নাগ লইয়া শাদীপুর সাতীশে (কাশ্মীরে) প্রতিষ্ঠা কর। হনুমানও আদেশ পাইয়া পার্বতী ও অন্য সকলকে লইয়া উত্তরদিকে কয়েকটি ছোট ছোট গ্রামবিশিষ্ট স্থানে তাহাদিগকে স্থাপন করিলেন। সেই ছোট ছোট গ্রামের নাম ভবানীশ, তঙ্গম, লাড্ডরাম ও ভোবেশ (?) প্রভৃতি এবং সেই সেই স্থানের দেবীকেই ক্ষীরভবানী—'রাজ্ঞীরাজ্ঞী' বলা হয়। ক্ষীরভবানী দেবীর পূজারও প্রবর্তন করা হয় এবং পূজার উপকরণ দুধ, চিনি, চাল ও বিভিন্ন সব্জি। জনশ্রুতি যে, কাশ্মীরে তুলামুলায় রাবণরাজের পিতা পুলস্ত্য ঋষি বসবাস করিতেন। বলিয়া রাখি যে, এইটি একটি উপাখ্যান, তবে এই উপাখ্যানের পিছনে ইতিহাসের উপকরণও লুক্কায়িত আছে।

'তুলামুলা'-শব্দটির সৃষ্টি হইয়াছে সংস্কৃত ভাষা হইতে। যেমন, এই স্থানটি জলাভূমিতে আচ্ছন্ন ও ভাসমান। সেইজন্য ইহাকে বলা হয় 'তুলা' অর্থে সূতা ও 'মূলা' অর্থে মূল্য বা দাম।

এই সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদের প্রচলন আছে—সেইটি কহলনের প্রসিদ্ধ 'রাজতরঙ্গিনী'-গ্রন্থে উল্লিখিত রাজা যজ্ঞাপীড় বা জয়াপীড়ের রাজত্বকালের ঘটনা। 'বিশ্বকোষ'-অভিধানে উল্লিখিত আছে: ২৫৫-৭০ খৃষ্টপূর্বাব্দে রাজা জয়াপীড় পাতঞ্জল-মহাভাষ্য ও স্বরচিত কাশিকাবৃত্তি প্রচার করেন। ইনি স্বয়ং 'ক্ষীর' নামক পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে যে, বিষ্ণু স্বপ্নে তাঁহাকে জলমগ্নোত্থিত দ্বারাবতীপুরী নির্মাণ করিবার জন্য আদেশ দেন। রাজা জয়াপীড় সেইরূপেই (আদেশ মতো) একটি নগর নির্মাণ করেন। ইহা কহলনের সময়ে অভ্যন্তরজলপুর নামে বিখ্যাত ছিল।'[১]

১। এইসকল কাহিনী অনুমানমূলক বলে মনে হয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপাদান ইহার মধ্যে কতটুকু তা বলা কঠিন।

শোনা যায়, ঐ সময়ে 'তুলামূলা' জমী বা ভূমি ব্রাহ্মণদের অধিকারে ছিল। রাজার অত্যাচারে উৎপীড়িত ব্রাহ্মণেরা একদিন রাজার নিকট উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিলে রাজার দেহরক্ষীরা তাহাদিগকে বাঁধা দান করে। তখন জনৈক ব্রাহ্মণ রাজাকে আক্রমণ করিলে রাজগৃহ হইতে একটি সোণার লাঠি রাজার শরীরে পতিত হয়, শরীরে ক্ষত হয় এবং সেই ক্ষত হইতে আরোগ্য না করিয়া রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই সময়ে এক দেবদূত কৃষ্ণ পণ্ডিত নামে একজন ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণকে তুলামূলা-স্থানটিতে অবস্থিত 'ক্ষীরভবানী'-প্রস্রবণটি-সম্বন্ধে স্বপ্নাদেশ দান করিলেন। ধার্মিক ব্রাহ্মণ স্বপ্নেই জিজ্ঞাসা করিলেন—কিভাবে তিনি ঐ প্রস্রবণটি উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবেন। দেবদূত বলিলেন : 'তুমি একটি নৌকা লস্কর শাদীপুরে পর্যন্ত গমন করিবে এবং সেইখান হইতে একটি সর্প তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। এবং যখন তুমি ক্ষীরভবানী প্রস্রবণটির নিকটবর্তী হইবে তখন সর্প যেই স্থানকে ঝাঁপাইয়া পড়িবে সেই স্থানটিই ক্ষীরভবানী প্রস্রবণ বলিয়া জানিবে'। দেবদূতের নির্দেশমতো ব্রাহ্মণ নৌকারোহণে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সত্য সত্যই একটি সর্প তাঁহাকে পথ দেখাইয়া যাইতে লাগিল এবং পরিশেষে যে স্থানে সর্পটি ঝাঁপ দিল সেই স্থানটিই ক্ষীরভবানী-প্রস্রবন বলিয়া জানিতে পারিলেন। তিনি তখন দুগ্ধ,চাল, শর্করা, কিসমিস্, নারিকেল ও পুষ্প প্রভৃতি লইয়া বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে পূজা করিলে ঐ প্রস্রবণ হইতেই দেবীর জপ ও বর্ণনামূলক 'মহাত্ম্যও সংস্কৃত শ্লোকে রচিত ধ্যানমন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। ধ্যানমন্ত্রটি হইল—

যা স্বাদশার্কপরিমণ্ডিত মূর্তিরেকা
সিংহাসনস্থিতিমতীমুরগৈ বৃতাং চ।
দেবীং অনন্যগতি রিপুবরতাং প্রপন্নাং
তাং নৌমিভর্গবপসং পরমার্থরাজ্ঞীম্ ॥

অর্থাৎ 'একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ সিংহাসনা সর্পালঙ্কারভূষিতা স্বাদশ-বলয়-পরিমণ্ডিতা ত্রয়লীনা মুক্তিপ্রদায়িণী কাশ্মিরী দেবীকে প্রণাম জানাই।' কাশ্মীরে দেবী ক্ষীরভবানীর আবির্ভাব হইল এবং তাহার স্থানমাহাত্ম্য দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। পরবর্তীকালে উক্ত শ্লোকে যতগুলি অক্ষর ছিল, সেই অক্ষরগুলি দ্বারা ব্রাহ্মণ দেবীর যে স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা আজিও বর্তমান। ক্ষীরভবানী-দেবীর পূজার অধিকারী জাতি-নির্বিশেষে। এখানে হিন্দু, মুসলমান একসঙ্গে পূজা করিয়া থাকে। মুসলমানগণ সর্বদাই শুদ্ধবস্ত্রে ও নিরামিষ ভোজন করিয়া তবে ক্ষীরভবানীকে দর্শন করিতে যায় ও মনে-প্রাণে জাগ্রতা দেবী বলিয়া দেবীকে আরাধনা করে।

সেইখানকার এই প্রস্রবণটিতে একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার জলের রঙ মাঝে মাঝে পরিবর্তন হয় বটে কিন্তু পরিবর্তনের সময় কোন নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নাই। ইহা কখনও গাঢ় রক্তবর্ণ, ঈষৎ রক্তাভ, ফিকে সবুজ, গোলাপী, কমলালেবুর মতো হরিদ্রাভ, কখনও কখনও ফিকে শ্যামবর্ণ, দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র, আবার কখনও বা ধূম্রাভ। যে জলের রঙ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিলে কোন অশুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, সেইজন্য আজপর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক কি কারণে জলের রঙের পরিবর্তন হয় তাহা নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। ক্ষীরভবানী-মন্দিরের মতো রহস্যময়ী প্রস্রবণের ইতিহাস ভারতের আর কোন দেশে নাই বলিয়া মনে হয়।

ক্ষীরভবানীস্থানের প্রস্রবণটি সপ্তকোণবিশিষ্ট অসমান আকারের। দেবী ক্ষীরভবানী বা রাজ্ঞীর উত্তর ও দক্ষিণদিক পশ্চিমদিক অপেক্ষা বড়, সেজন্য উহাকে মস্তক ও পূর্বদিককে পাদদেশ বলা হয়। মধ্যস্থানে একটি ছোট দ্বীপের মতো স্থান। পূর্বে সেইস্থানে মন্দির ছিল এবং স্বর্গত মহারাজ প্রতাপ সিং কর্তৃক ইহা পুনর্নির্মিত হইয়াছে। সেইখানকার মন্দিরটি শেষাংশে প্রস্রবণটি জলের শেষসীমা হইতে অর্ধ হস্ত, পরিমিত উচ্চে প্রাচীন মন্দিরের অংশ দেখা যায়। ক্ষীরভবানীতে আষাঢ়ের সপ্তমীতে ও জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লা অষ্টমীতিথিতে একটি বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তখন সম্প্রদায়ভাবে হিন্দু-মুসলমান জাতি-নির্বিশেষে সকলে উপস্থিত হইয়া ক্ষীর, কিস মিস্, নারিকেল, বাদাম, ফুল ও বাতিসহযোগে দেবীর পূজা অর্চনা করিয়া থাকেন। পরিশেষে বলি, ক্ষীরভবানীদেবী ও মন্দিরের সহিত বিশ্বপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যস্মৃতি জড়িত।

●

॥ বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম ॥

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম মূলতঃ বিশেষ কোনও বৈষ্ণব দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহার প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি গুহ্য সাধনার উপর যাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল। সেই গুহ্য সাধনাই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের সহিত যুক্ত হইয়া এক একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কখনও ইহা আসিয়া তন্ত্র সাধনার রূপ গ্রহণ করিয়াছে, কখনও বা বৌদ্ধ সহজিয়ার রূপান্তর ঘটিয়াছে, কখনও বা বৈষ্ণব ধর্মের সহিত মিলিত হইয়া বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে।[১] নর-নারীর পরস্পর মিলিতভাবে একটি ধর্ম সাধনার ধারা ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসে কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। এই সাধনা বিভিন্ন পরিণতিতে তান্ত্রিক সাধনা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা ও বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা, বাউল সাধনা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। এই ধর্ম সাধনা বাহির হইতে যতই পরস্পর পৃথক বলিয়া মনে হোক্ আসল সাধন বিচারে সকলের ভিতরেই একটি গভীর ঐক্য অনুভূত হইবে। সকল সিদ্ধান্তের মূলে চরম লক্ষ্য হইল অদ্বয় পরমানন্দ স্বরূপ। আর এই অদ্বয় আনন্দ তত্ত্বই হইল পরম সামরস্য। এই আনন্দ তত্ত্বের মধ্যে রহিয়াছে দুইটি ধারা—অদ্বৈততত্ত্ব কিন্তু এই দুইটি ধারাতেই অস্বীকৃত নয়। অদ্বৈত তত্ত্বই হইল সেই চরম তত্ত্ব এই দুইটি ধারাই যেখানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় এক অখণ্ড তত্ত্বের ভিতরে গভীরভাবে মিলিত হইয়াছে। ইহাকেই মিথুনতত্ত্ব, যামলতত্ত্ব বা যুগলতত্ত্ব বলা হয়। তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে এই মিথুনতত্ত্বই হইল কেবলানন্দতত্ত্ব, আর এই অদ্বৈত তত্ত্বের দুইটি ধারা হইল একটি শিব, অপরটি শক্তি। তান্ত্রিকমতে এই শিব-শক্তির মিলন জনিত কেবলানন্দই হইল পরমসাধ্য। এই সাধ্য লাভ করিবার জন্য সাধক নিজের দেহের ভিতরেই শিব-শক্তি তত্ত্বকে পূর্ণ জাগ্রত ও পূর্ণ পরিণত

১। Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature—Dr. Sashi Bhusan Das Gupta

করিয়া নিজ দেহের মধ্যেই এই উভয় তত্ত্বের মিলন জনিত অপূর্ব সামরস্য বা আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। এখানেই শিব-শক্তি দুটি ধারার অবসান এবং এই সাধনাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের আচরিত তান্ত্রিক-সাধনা।[১]

এই শিব-শক্তি তত্ত্ব লইয়া বহু প্রকার সাধনার মধ্যে একটি বিশেষ সাধনা হইল নরনারীর মিলিত সাধনা। এই সাধনার সাধকগণের বিশ্বাস, শিব-শক্তির নিত্য তত্ত্বটি স্থূলে পৃথিবীর নর-নারীর ভিতর দিয়া রূপ লাভ করিয়াছে এবং নর-নারী উভয়েই তাহার স্বরূপে শিব-তত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব এই তত্ত্বের অধিকারী হইলেও ইহার ভিতরে আবার বিশেষ করিয়া পুরুষ 'শিবতত্ত্বের ও নারী শক্তিতত্ত্বের প্রতীক। সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম স্তর হইল এই পুরুষ ও নারী উভয়ের ভিতরে সুপ্ত শিবতত্ত্ব ও শক্তি তত্ত্বের পূর্ণ জাগরণ ঘটানো, পুরুষের ভিতর দিয়া শিবতত্ত্ব ও নারীর ভিতর দিয়া শক্তিতত্ত্ব এইভাবে যখন পূর্ণ পরিণত ও পূর্ণ জাগ্রত হইবে তখন পরস্পরের ভিতর দিয়া পরস্পরের হইবে শিব-শক্তি তত্ত্বের আস্বাদন। অর্থাৎ পুরুষ নিজের ভিতর দিয়া শিবতত্ত্বকে পূর্ণ পরিণত এবং পূর্ণ জাগ্রত করিয়া নিজেকে সর্বভাবে শিবরূপে উপলব্ধি করিয়া নারীও নিজের ভিতরে শক্তি তত্ত্বকে বিকশিত করিয়া নিজেকে সাকাৎ শক্তিরূপে অনুভব করিবে। এই পুরুষ ও নারীর উভয়ের স্থূলদেহের প্রতিতন্তুতেও শিব-শক্তির জাগরণ ঘটে, তখন উভয়ের যে মিলন ঘটে তাহা সাধক সাধিকাকে পূর্ণ সামরস্যে পৌঁছাইয়া দেয়। এই পূর্ণ সামরস্য জনিত যে অসীম অখণ্ড আনন্দানুভূতি ইহাই তন্ত্রের ভাষায় সামরস্যসুখ, বৌদ্ধদের ভাষায় মহাসুখ এবং বৈষ্ণবগণের ভাষায় মহাভাবস্বরূপ।

পালরাজগণের রাজত্বকালে বাংলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের খুব প্রসার ছিল। বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে গুহ্য সাধন পদ্ধতি বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল সেই সাধনা এবং হিন্দু তন্ত্রোক্ত সাধনা পদ্ধতি মূলত একই ছিল। সেন রাজাদের আমল হইতে বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ সম্বলিত বৈষ্ণবধর্মের প্রসারলাভ ঘটিতে থাকে। এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের সঙ্গে পূর্বোক্ত গুহ্য সাধনা বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গেও জড়িত হইয়া পড়ে এবং বৈষ্ণব সহজিয়া মত গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ নারী পুরুষের মিলিত এই গুহ্য সাধন প্রণালী বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়া আর এক রূপান্তর ঘটাইল; হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে যাহা ছিল মূলত একটি যোগসাধনা - বৈষ্ণব সহজিয়ার ভিতরে তাহা যোগ সাধনাকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রেম সাধনায় রূপান্তরিত হইল।

প্রাকৃত জগতের একজন পুরুষের যে 'পুরুষরূপ' তাহা হইল তাহার বাহিরের রূপমাত্র। এই বাহিরের রূপকে আশ্রয় করিয়া ভিতরে একটি "স্বরূপ" অবস্থান করে। তন্ত্র মতে মানুষের ভিতরে প্রত্যেকটি পুরুষের বাহিরের রূপকে আশ্রয় করিয়া যেমন অন্তরে আছে শিবস্বরূপ এবং ঐ ভাবেই আছে নারীর মধ্যে 'শক্তিস্বরূপ' তেমনি বৈষ্ণব সহজিয়া মতেও প্রত্যেক মানুষের ভিতরে প্রত্যেকটি পুরুষের রূপের ভিতরে অবস্থান করিতেছে "কৃষ্ণস্বরূপ" এবং প্রত্যেকটি নারীর বাহিরের রূপের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে "রাধাস্বরূপ"। এই সাধনার প্রথম ও প্রধান কথা হইল এই বাহিরের রূপ হইতে উজান বাহিয়া স্বরূপে পৌঁছান। স্বরূপে স্থিতিলাভ করিবার জন্য নরনারীর যে মিলন তাহাই হইল 'প্রেমের লীলা' তাহার ভিতর

১। ক্ষ ক্ষী ক্ষ পুরাবলি ক্ষ কুমার উৎস বা কুমারী

দিয়াই ঘটে বিশুদ্ধ 'সহজ রসের' আস্বাদন। এই যুগল তত্ত্বই হইল বৈষ্ণব সহজিয়াদের পরমতত্ত্ব। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্দাবনের গোস্বামিগণও ছিলেন বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সাধক। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে তান্ত্রিক সাধনায় যেমন সহকারী বা উত্তর সাধিকা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে—সহজিয়া সাধনাতেও তেমনি পরকীয়া গ্রহণের রীতি আছে। সহজিয়াগণের মতে পরকীয়াতে প্রেমের গভীরতা প্রাপ্তি হয়। পরকীয়া অর্থে পরস্ত্রী বুঝাইয়া থাকে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং পরবর্তী কালের বৃন্দাবনের গোস্বামিগণও এই পরকীয়াভাবের সাধক ছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রেমের যে গভীর স্তরভেদ আছে পরকীয়াতত্ত্ব সেই প্রেমেরই বা রসেরই বিশেষ অবস্থা। পরকীয়াতে প্রেমের সর্বাধিক স্ফুরণ। সহজিয়াগণ সকাম ধর্মকে স্বকীয়া এবং নিষ্কাম ধর্মকে পরকীয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাবতীয় বৈধী সাধনা ইহকালে পরকালে সুখ সম্ভোগের বাসনা প্রভৃতি স্বকীয়া পর্যায়ভুক্ত।

কামনা রহিত হইয়া কর্মানুষ্ঠানই পরকীয়া। এজন্য শ্রীরাধিকাদি গোপিকাগণ পরকীয়া ভাবের প্রতীক—আর রুক্মিনী আদি মহিষীগণ স্বকীয়া ভাবের প্রতীক। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবধর্মের সারমর্ম অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব সহজিয়া মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

●

দেবশর্ম্মার আত্মত্যাগ

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী

কাশ্মীরসম্রাট ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমগ্রভারত এবং সমীপবর্তী পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি জয় করতঃ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন বটে; তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই অভিজ্ঞতাও জন্মিয়াছিল যে দিগ্বিজয় অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল। সামান্য একটু অসাবধানতার বা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার ফলে বিজিগীষু রাজার সর্বনাশ হইতে পারে। এই কারণেই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের উদ্দেশ্যে একখানা দলিল সম্পাদন করিয়া নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার কোন বংশধর যেন দিগ্বিজয়ে না যান। ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কুবলয়াপীড় সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পিতার ন্যায় ঐশ্বর্য্য ও গৌরবলাভ করিবার আশায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু মহামন্ত্রী মিত্রশর্ম্মা স্বর্গত ললিতাদিত্যের শেষ ইচ্ছা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন এবং মনের দুঃখে সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে চলিয়া যান। অতঃপর ললিতাদিত্যের অপর পুত্র বজ্রাদিত্য (বাপ্পিরক) এবং আরও পরে সংগ্রামাপীড় সিংহাসনে বসেন। শেষোক্ত দুই রাজাই অল্পদিন রাজত্ব করিবার পর আততায়ীর হস্তে নিহত হন। অতঃপর বাপ্পিরকের কনিষ্ঠপুত্র পরম বিচক্ষণ ও সমরকুশল জয়াপীড় সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক বিনয়াদিত্য উপাধিধারণ করেন। পিতামহের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া রাজা জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং তাহার বিষময় ফলও ভোগ করিতে থাকেন।

বিনয়াদিত্য জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যখন মধ্যভারত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন; তখনই তাঁহার শ্যালক অজয়ন রাজার অনুপস্থিতির সুযোগে কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়া লয়। এই দারুণ দুঃসংবাদ জানিয়া জয়াপীড় ভাঙ্গিয়া পড়েন। অবশেষে

গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীকে বিবাহ করিয়া গৌড়সৈন্যের সহায়তায় তিনি সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। অতঃপর পুনরায় তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং কয়েকটি রাজ্য জয় করিবার পর নেপালজয়ের অভিলাষ করেন। বিপুল সেনাবাহিনী সঙ্গে লইয়া বিনয়াদিত্য জয়াপীড় নেপাল-সীমান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—এক খরস্রোতা নদী অতিক্রম না করিলে নেপালে প্রবেশ করা সম্ভব নহে।

কাশ্মীর সৈন্যেরা আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছে জানিয়া নেপালরাজ আড়ম্বড়ী নদী পারাপারের সমুদয় সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যাবতীয় নৌকা নদী হইতে সরাইয়া নেন। বর্ষাসমাগমে পর্ব্বতে প্রবল বারিপাত হইয়া নদীর স্রোত তখন প্রখরতর হইয়াছে। জয়াপীড় ভাবিলেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূরে আসিয়া নেপাল জয় না করিয়া ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অপমানজনক। তখন সন্তরণের সাহায্যে নদী অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে তিনি হাতী ঘোড়া সহ নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য সেনাবাহিনীকে আদেশ দিলেন। সেনাপতিরা রাজাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে অপরিচিত নদীতে এইভাবে ঝাঁপ দিলে বিপদ ঘটিতে পারে। যদি নদীর স্রোত সহ্য করা না যায়, তাহা হইলে সমস্ত বাহিনীর ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু অতি উৎসাহী রাজা তাহাদের উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। হাতী-ঘোড়াসহ বিশাল বাহিনী নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পার্ব্বত্য নদীর স্রোত কত প্রখর জয়াপীড়ের তাহা জানা ছিল না। খরস্রোতে তাঁহার হাতী ঘোড়া সব ভাসিয়া গেল। হাজারে হাজারে সৈন্য নদীতে ডুবিয়া মরিল। নেপাল সৈন্যেরা নদীর অপরপারে অরণ্য মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যে সকল সৈনিক ও সেনাপতি অপর পারে পৌঁছিতে পারিল, নেপাল সৈন্যের হস্তে তাহাদের মৃত্যু ঘটিল। অধিকাংশ সৈন্য বেগতিক দেখিয়া কোন প্রকারে পিছনের তীরে গিয়া প্রাণ বাঁচাইল। যুদ্ধ করিবার মত সামর্থ্য কাশ্মীর বাহিনীর আর রহিল না। অতি উৎসাহী জয়াপীড় হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তী স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি স্রোতের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং স্রোতের সঙ্গে যুঝিবার মত সামর্থ্য অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে নিজের সমুদয় পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলেন। এইভাবে নিজেকে হাল্কা করিয়া সন্তরণের সাহায্যে অতি কষ্টে তিনি গিয়া অপরতীরে পৌঁছিতে পারিলেন। মহাবীর কাশ্মীর সম্রাট তখন একেবারে নিরস্ত্র। নেপালের সৈন্যেরা এই সুযোগ নষ্ট করিল না। তাহারা নিরস্ত্র রাজাকে বন্দী করিয়া নেপাল রাজের নিকট লইয়া গেল। নেপালরাজ তখন পরম আনন্দে কাশ্মীর সম্রাটকে কাল গণ্ডিকা নামক পার্ব্বত্য নদীর তীরস্থিত এক সুদৃঢ় কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কড়া পাহারায় অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ জয়াপীড় সূর্য্য চন্দ্রের দর্শন হইতেও বঞ্চিত হইলেন। তিনি কোথায় আছেন তাহাও তাঁহার সৈন্যেরা জানিতে পারিল না।

সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গম রাজনীতি-বিশারদ ব্রাহ্মণ দেবশর্ম্মা ছিলেন তখন কাশ্মীরের মহামন্ত্রী। গুপ্তচরের সাহায্যে তিনি জানিতে পারিলেন সম্রাট জয়াপীড়কে হত্যা না করিয়া নেপালরাজ কোন গোপনস্থানে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি নূতনভাবে সৈন্যসংগ্রহ করতঃ সম্রাটের উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহামন্ত্রী দেবশর্ম্মা ভাবিয়া দেখিলেন—যদি তিনি বিশাল বাহিনী লইয়া নেপাল আক্রমণ করেন, তাহা হইলে নেপাল রাজ্য অধিকার করিতে

পারিলেও সম্রাটের জীবন রক্ষা না হইতে পারে। বিপদে পড়িলে নেপালরাজ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সম্ভবতঃ বন্দী কাশ্মীর সম্রাটকে হত্যা করিবে। এইরূপ ভাবিয়া দূরদর্শী দেবশর্ম্মা তখন কৌশলের সাহায্যে কার্য্যসিদ্ধি করিতে চাহিলেন। তিনি নেপালরাজের কাছে এক দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, সম্রাটের মুক্তির বিনিময়ে বিপুল অর্থ তিনি নেপালরাজকে দিবেন। কাশ্মীর সম্রাটের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে নেপালরাজ অবহিত ছিলেন। তিনি বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্য ইত্যাদির বিনিময়ে সম্রাটকে মুক্তি দিতে পারেন বলিয়া জানাইলেন। দেবশর্ম্মা দেখিলেন তাঁহার কৌশল সফল হইতে চলিয়াছে। তিনি তখন পুনরায় দূত পাঠাইয়া বলিলেন—কাশ্মীর সম্রাটের অধিকাংশ ধনরত্ন কোন গুপ্তস্থানে সংরক্ষিত আছে এবং একমাত্র সম্রাট ছাড়া আর কেহ ইহা জানেন না। অতএব তিনি ঐ সংবাদ জানিবার জন্য একবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। নেপালরাজ জানাইলেন—মন্ত্রী দেবশর্ম্মা একাকী গিয়া তাঁহার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। দেবশর্ম্মা জানাইলেন—সম্রাটকে সসম্মানে নিয়া আসিবার জন্য সম্রাটের সেনাবাহিনী নেপালরাজ্যের সীমানার বাহিরে অবস্থান করিবে এবং মহামন্ত্রী দেবশর্ম্মা একাকী নেপালে প্রবেশ করিয়া বন্দী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবেন। নেপালরাজ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে কাশ্মীরের বিশাল বাহিনী সহ মহামন্ত্রী দেবশর্ম্মা নেপালসীমান্তে পৌঁছিলেন এবং অল্প কয়েকজন অনুচরসহ নেপালে প্রবেশ করিয়া রাজা আরমুডীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। নেপালরাজ তখন দেবশর্ম্মার অনুচরদিগকে নিজের কাছে রাখিয়া শুধু দেবশর্ম্মাকে কাশ্মীরসম্রাট জয়াপীড়ের নিকট কারাগারে পাঠাইলেন।

বন্দী জয়াপীড়কে পূর্বেই জানানো হইয়াছিল যে, মহামন্ত্রী দেবশর্মা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। দেবশর্ম্মাকে কারাগারে রাখিয়া পূর্বের কথামত কারারক্ষীরা বাহিরে চলিয়া গেল। তীক্ষ্ণদর্শী দেবশর্মা রাজাকে অভিবাদন করিয়া কারাগারের চারিদিকে উত্তমরূপে তাকাইয়া দেখিলেন। এক পার্শ্বে একটি গবাক্ষ দেখিয়া দেবশর্মা ঐ গবাক্ষপথে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—অনেক নীচে একটি খরস্রোতাঃ নদী প্রবাহিত হইতেছে। তিনি লক্ষ্য করিলেন—তাঁহার সংস্থাপিত শিবির হইতে এই স্থানটি খুবই নিকটে। তখন তিনি জয়াপীড়কে বলিলেন: "মহারাজ! আপনি কি আপনার শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? এই জানালাপথে লাফাইয়া পড়িয়া তো আপনি পলায়ন করিতে পারিতেন।" রাজা উত্তর করিলেন: "মন্ত্রিবর! এই কারাগারটি উচ্চ টিলার উপরে অবস্থিত এবং নদীর জলপ্রবাহ অনেক নীচে। নদীর গভীরতা কতটুকু তাহা আমি জানি না। এই পার্বত্য অঞ্চলটি প্রস্তরময়, এত উচ্চ স্থান হইতে মশকের সাহায্য ছাড়া নদীতে ঝাঁপ দিলে প্রস্তরে আঘাত লাগিয়া মৃত্যু অনিবার্য। এই কারণেই আমি এভাবে পলায়নের চেষ্টা করি নাই।

এই সময়ে রাজার পায়খানার বেগ হওয়ায় তিনি শৌচাগারে প্রবেশ করিলেন। শৌচ সমাপনান্তে কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজা জয়াপীড় যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা অদ্ভুত এবং ভয়াবহ। জয়াপীড় দেখিলেন—কাশ্মীর সাম্রাজ্যের মহামন্ত্রী সেই কক্ষে কড়িকাঠের সঙ্গে নিজের পরিধেয়বস্ত্র বাঁধিয়া গলায় ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। মহামন্ত্রীর মৃতদেহ তখনও কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলিতেছে। মন্ত্রীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া জয়াপীড় তৎক্ষণাৎ তাঁহার ফাঁস খুলিলেন। কিন্তু ততক্ষণে মন্ত্রীর প্রাণবায়ু দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে। জয়াপীড় দেখিলেন—ঘরের মেঝের উপর মন্ত্রীর হস্তলিখিত একখানা পত্র রহিয়াছে। উহা

কুড়াইয়া লইয়া তিনি পাঠ করিলেন। মন্ত্রী লিখিয়া গিয়াছেন—"মহারাজ! এই নির্জন কারাগারে আপনাকে মশক সরবরাহ করিবার ক্ষমতা এই ভৃত্যের নাই। আমার দেহটিকে মশকের স্থলবর্তী করিয়া দিতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই দেহটির সাহায্যে অবিলম্বে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া অপর পারে পৌঁছিবেন। নদীতীরের কাছেই আপনার সৈন্যেরা আপনার আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া যাহা ভাল মনে করেন, করিবেন।"

উচ্চবংশীয় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ রাজনীতিকুশল মহামন্ত্রীর এই আত্মত্যাগে রাজা বিস্মিত ও বিমূঢ় হইলেন। মন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁহার মস্তক অবনত হইল। যুদ্ধে সহস্র সহস্র সৈন্যের মৃত্যু দেখিয়াও যাঁহার মনে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয় না, সেই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জয়াপীড়ের চক্ষু হইতে তখন কয়েকবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বিলম্ব করিবার সময় নাই। মন্ত্রীর এই আত্মত্যাগ তিনি বৃথা হইতে দিলেন না। মহামন্ত্রীর সেই সদ্যোমৃত শবটি নিজের দেহের সঙ্গে বাঁধিয়া অবিলম্বে বলবান যুবক জয়াপীড় গবাক্ষপথে নীচের নদীস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং মৃতদেহটির সাহায্যে সাঁতার দিয়া ভাঁটির দিকে বেশ কিছুদূরে গিয়া অপর তীরে উঠিলেন। তাহার পর নিজ সৈন্যদের শিবিরে উপস্থিত হইয়া সকল কথা প্রকাশ করিলেন।

এইভাবে নিজের বিচক্ষণ রাজভক্ত মন্ত্রীকে হারাইয়া জয়াপীড় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি নদী অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহার বিশালবাহিনীসহ নেপালরাজ্য আক্রমণ করিলেন। জয়াপীড় তখন অতি নৃশংস। তাঁহারই আদেশে কাশ্মীর সৈন্যেরা সমগ্র নেপালরাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া বিপুল অর্থ লুণ্ঠন করিল। এই সকল অর্থ লইয়া মন্ত্রীর আত্মত্যাগের বিষয় স্মরণ করিতে করিতে সম্রাট জয়াপীড় সাশ্রুনেত্রে কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন—আরমুডী নেপালের রাজা ছিলেন না, তিনি তিব্বতরাজের প্রেরিত সেনাপতি। কিন্তু কহলনের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে আরমুডীকে নেপালের রাজারূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। আরমুডী যিনিই হউন না কেন, মহামন্ত্রী দেবশর্ম্মা যে তাঁহার প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই অসাধারণ আত্মত্যাগের ঘটনাটি ঘটিয়াছিল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে।

●

কংস কারায় এস ভগবান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

অমারাত্রির তিমির বিনাশি'
এস ভগবান কংস কারায়
পিতা বসুদেব দেবকী জননী
সেথা যে ভাসিছে অশ্রুধারায়।

দুঃসহ ব্যথা কর অবসান,
এস তুমি আজ এস ভগবান,
আশা-উজ্জ্বল দীপ জেলে দাও
অন্ধ এ দুটি আঁখির তারায়।

বল-দর্পিত দৈত্য নৃপতি
দুঃসহ তার দুষ্ট শাসন,
হে চির চক্রী চক্রে ছেদিয়া
দম্ভ তাহার কর হে নাশন।

অন্যায় আর কুরীতি যত
বিভাবে তোমার হোক অপগত,
করুণকাতর, প্রার্থনা রবে
বক্ষে পেতেছি তোমার আসন।

হে যুগস্রষ্টা সত্যদ্রষ্টা
বন্ধন-ভয় কর হে মোচন,
হীন অন্যায়ে জর্জ্জর ধরা
করিছে নিত্য করুণ রোদন।

পাঞ্চজন্য উঠুক ধ্বনিয়া
এস নারায়ণ নররূপে নিয়া,
নর-নারায়ণে ঘুচাতে বিভেদ
অন্তরে হোক তোমার বোধন।

মহাভারতের হে মহানায়ক
নূতন ভারত গড়িয়া উঠুক,
হে যুগাবতার এস এস অবতরি'
যত গ্লানিভার কলুষ টুটুক।

আবির্ভাবের উজ্জ্বল আলো
মানস-তিমিরে জ্বালো তুমি জ্বালো,
পোহায়ে রাত্রি বক্ষে আমার
তোমার চরণ-পদ্ম ফুটুক।

●

॥ আধুনিক শিক্ষার জনক ডেভিড হেয়ার ॥

রতন দাশগুপ্ত

ইংরাজ রাজত্ব তখনও ঠিক স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলা চলে না। চারিদিকে একটা অবিশ্বাসের ধারা বয়ে চলেছে। সে অবিশ্বাস ধর্ম্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্য্য-কলাপের মধ্যে নিহিত। ইংরাজ এর মধ্য দিয়ে আপন স্বরূপকে প্রকাশ করবার জন্য উন্মুখ, তারা তাদের রুচি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে প্রসারিত করবার জন্য তৎপর হয়েছেন। সে প্রসারণ যাতে এ দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দ্বারা সমর্থিত হয় তার জন্য তাঁদের চেষ্টার ত্রুটী নেই। এমন মানুষ তৈরী করতে হবে, যারা স্বদেশীয় ও বিদেশীদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করতে পারে। তাদের সহযোগীতা ও সহানুভূতি ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। তাদের মানবিক মূল্যের স্বীকৃতি দিতে হবে, যাতে তারা এদেশীয় লোকদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাদের ভাষায়, "We must do our best to form a class who may be interpreter between us and the millions whom we govern, a class of persons Indians in blood and colour, but english in tastes, in opinion, in morals and in intellect." কিন্তু এ শিক্ষার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, যেটা থেকে সন্দেহ আরো উদ্দীপ্ত হ'ল। বিলাতি শিক্ষা অর্থে, খৃষ্টান হওয়া তা না হলে শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। Alexender Duff সাহেব স্পষ্টভাবে এ কথা বলতে কসুর করেননি, 'তিনি বলেছিলেন, Christian faith ছাড়া এটা সম্ভব নয়। High english education, without religion was a blind sucidal policy" কার্য্যত মিশনারীরা এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। উন্নতিমূলক প্রচেষ্টার দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার করেছিলেন। তা ছাড়া এ দেশে স্কুল, কলেজ স্থাপন করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন রীতিতে ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন। তা সত্বেও তাদের উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করানোর দিকে। "কলিকাতার এবং মফস্বলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের ধুম পড়িয়া যায়। ব্রহ্মসভা, ধর্ম্মসভা, সনাতনী প্রগতিবাদী সকল দল ও সমাজের হিন্দুই ইহাতে বিশেষ শঙ্কিত হইলেন। খৃষ্টতত্ত্ব প্রচারের প্রধান বাহন শিক্ষা; খৃষ্টান পাদরীরা কলিকাতায় ও অন্যত্র অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে বঙ্গসন্তানদের প্রথমে আকৃষ্ট করেন। পরে এই সব শিক্ষালয়ই প্রচার ক্ষেত্রে পরিণত হয়।"

অথচ সেকালে আর একটি ধারা এর পাশাপাশি কাজ করেছিল, তারা অবশ্য অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ধর্ম্মান্তরিত হয়েও তারা অন্যের উপর সেই ধর্ম্মকে জোর করে চাপিয়ে দেবার জন্য ব্যাগ্রতা প্রকাশ করেননি। তাদেরই বলা হয়, Brilliant flowers of young Bengal. এরা ধর্ম্ম প্রসঙ্গে কি অভিমত পোষন করতেন তার পরিচয় আছে ডাঃ হোরেশ হেম্যান উইলসন ডিরোজিওকে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে ডিরোজিও যে জবাব দিয়েছিলেন তার মধ্যে। ডিরোজিও ছিলেন এই Brilliant flowers এর মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন। "আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে ছেলেদের ধর্ম্ম বিশ্বাস যদি টলিয়া থাকে, তাহার জন্য অপরাধ আমার নহে। তাহাদের মনে প্রত্যয় জন্মানো আমার সাধ্যাতীত এবং যদি কয়েকজনের আস্তিক্যহীনতার জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তবে অপর সকলের আস্তিকাবোধের জন্য আমার কৃতিত্বও স্বীকার করা উচিত।··· আমি মানুষের অজ্ঞতা ও

মতের অহরহ পরিবর্তন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন, নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আমি কোন নির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করি না। সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা আমাদের মনে এরূপ ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে যে, কোনরূপ গোঁড়ামি করিবার সাহসই আমার নাই। কাজেই আমি কখনই এমন কথা বলিতে পারি না 'এটা ঠিক' আর 'এটা ঠিক নয়'। বিজ্ঞানের বিবিধগবেষণা ও মনিষীগণের নানারূপ চিন্তার ফলে ইহাই বুঝা গিয়াছে যে দিনরাই সর্বোচ্চ জ্ঞান আর এই সর্বোচ্চ জ্ঞানই আমাদিগকে আমাদের অজ্ঞতার কথা নিশ্চয় করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়।" এথেকে বোঝা যায় যে তারা প্রচলিত পথ থেকে তাদের চিন্তাধারাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে উৎসাহিত ছিলেন। তাদের পথ ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক, শিক্ষার মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করা। ডেভিড হেয়ার প্রকাশ্য ভাবে এই ভাবধারার পোষকতা করেছিলেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এই ধারাই প্রগতিশীল ধারা, যার ফলে ভাবীকালের মানুষেরা চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দেবে। তৎকালীন কোন উন্নতিমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে হেয়ারের যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। রাজা রাধাকান্তদেব, রামমোহন থেকে শুরু করে ইয়ং বেঙ্গলদের সঙ্গে সহযোগীতা করতে কার্পণ্য করেননি। এ দেশের সমাজকল্যাণমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিলেন। সামাজিক বৈষম্য বা দেশাচার বা ধর্ম্মের নামে কুসংস্কারে পরিণত হয়েছিল তার মূলোচ্ছেদ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

কিন্তু তিনি বিদেশী, এ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল ছিল যে এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তৎকালীন সমাজ তা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবে না। তাতে তার উদ্দেশ্যও পণ্ড হবে।

তাই দেখা যায় প্রাচ্য বিদ্যা (orientalist) ও পাশ্চাত্য বিদ্যা (Anglicist) সমর্থকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল, যার একদিকে রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ, অন্যদিকে হেস্টিং, মিন্টো প্রভৃতি। ডেভিড হেয়ার এই দুই ধারার পোষকতা করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এই দুইয়ের সমন্বয়ের মধ্যে ইপ্সিত ফললাভ হবে। "David Hare watched with keen interest these clashes of rival ideologies and exerted all his might to evolve a synthesis out of it."

তিনি শিক্ষাকেই জীবনের মূল মন্ত্র হিসাবে বেছে নিলেন। শিক্ষার ভিতর দিয়ে এ দেশের জাগতিক ও মানসিক উন্নতি হবে "Without real education and rational understanding of truth no lasting moral improvement of society is possible. অবশ্য এ শিক্ষা অন্তরের শিক্ষা, যা ভিতর থেকে উপলব্ধি দ্বারা প্রকাশিত হবে। Hare believed that for the true realisation of this aim education must originally & naturally grows from within."

তিনি প্রকৃত খ্রীষ্টান ছিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের যে সার সত্য তার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছিল মানবপ্রেম ও ভালবাসার মধ্যে। সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের শিক্ষার উন্মেষ হয় ভালবাসার দ্বারা। হেয়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কি অকৃত্রিম স্নেহ করতেন তা তাঁর জীবনী পাঠেই জানা যায়। তাঁর বাড়ীটি ছিল শিশুতীর্থ। তিনি বাড়ী বাড়ী ঘুরে তাদের খোঁজ খবর নিতেন। দীর্ঘ দিন কেউ অনুপস্থিত থাকলে তার কারণ অনুসন্ধান করতেন। সমগ্র পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল একান্ত আপনার জনের মত। তিনি বিদেশী একথা কেউ মনে করত না। বাঙালীর চিত্তে তিনি একটা আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে

বাঙালীরা আপন জনের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করেছিল। সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায়, তিনি ৩১শে মে ১৮৪২ সালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পরদিনই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর শবানুগমন করেন তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু রসময় দত্ত, ডাঃ চার্লস ইত্যাদি। তার সঙ্গে অগণিত শিশুরদল যারা তাঁর চার পাশে ঘিরে থাকত। তাঁর মৃত্যুতে দীনবন্ধু মিত্র যে শোকবার্তা প্রেরণ করেন তা নিম্নরূপ—

দেখ মাতা গোল দীঘি
বড় রম্ভ জোর,
বিরাজে দক্ষিণ দিকে
হেয়ারের গোর।
দীন দুঃখী শিশুদের পরম আত্মীয়।
বঙ্গের বদান্য বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয় ॥
বাঙ্গালীর উন্নতির নির্মল নিদান।
যার জন্য করেছেন সর্বস্ব প্রদান ॥

●

শতবর্ষের আলোকে

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী

রণজিৎকুমার সেন

সমালোচকদের দৃষ্টিতে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন রবীন্দ্রানুসারী কবিদের অন্যতম। কিন্তু রবীন্দ্রানুসারী হয়েও স্বীয় প্রতিভাস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মিতা কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উক্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা : 'রবীন্দ্রকাব্যের যা কিছু ভালো, তা নিজের সাধ্যের উপযোগী করে অকুণ্ঠিতভাবে যতীন্দ্রমোহন গ্রহণ করেছেন নিজের অনেক কবিতায়, গোপন করবার কোনো কৌশল অবলম্বন করেন নি। লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস ঠিকমতো গ্রহণ করবার অধিকার অধিকাংশ পাঠকের নেই। খালি চোখে রবির দিকে চাওয়াই যায় না, উপযোগী চশমার প্রয়োজন হয়। সোজা বুদ্ধিতে রবীন্দ্রকাব্যও বোঝা যায় না, উচ্চস্তরের কল্পনাশক্তি ও রসবোধ আয়ত্ত করতে হয়। অথচ আমরা সকলেই যুগধর্মপ্রভাবে রবীন্দ্রকাব্যের অনুরাগী। তার হেতু খুঁজতে গেলে যা বুঝি, তার চেয়ে যা বুঝি না—তার মধ্যে বেশী সন্ধান করতে হয়। এই সন্ধান বিদ্যাও বুদ্ধিযোগে যাঁরা করেন, তাঁদের বলা হয় সমালোচক। কিন্তু মহাকবির সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিরাও রসের মধ্য দিয়ে, কবিতার মধ্য দিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য না হারিয়েও সে কাজ সুন্দরভাবে ক'রে যান। যতীন্দ্রমোহন সেই কবিদের অগ্রণী ও শ্রেষ্ঠ।'

তাঁর ছেষট্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে যতীন্দ্রনাথ তাঁকে কাব্যে প্রীতি জানিয়ে লেখেন—

'হয়নি হয়নি কোনো ভুল, তোমাতে আমাতে নেই ফাঁকি,
ছন্দে গাঁথা নহে বনফুল মোদের হাতের এই রাখী।
যদি ছন্দ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, যদি ফুল লুটে ধূলিতলে,
যদি বসন্তের পুষ্পরথ শ্রাবণ সঙ্কটে নাহি চলে ;
তবুও পথেরই তুমি বন্ধু, তুমি বন্ধু, তুমি মোর মিতা,
—বিপুলা পৃথ্বীর তরে থাক্ নিরবধি তোমার কবিতা।
অতি ক্ষুদ্র কামনা আমার, হে আমার নিত্য স্মরণীয়,
আমি যতদিন র'ব হেথা, ততদিন তুমিও থাকিও।'

কিন্তু তা থাকেননি যতীন্দ্রমোহন। মিতা যতীন্দ্রনাথের পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর স্মৃতিসভায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যতীন্দ্রনাথ যা বলেন, তার সঙ্গে তাঁর এই অন্তরঙ্গ কাব্যমালার অর্থগত যোগটি খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন : 'যতীন আমার বালাবন্ধু ছিল না, বয়সে আমার চেয়ে সাড়ে আট বছরের বড় ছিল। আমার কৃষ্ণনগরের বাসায় এসে আমার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা করে, তখন তার বয়স কিছু কম চল্লিশ হবে। যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি যথেষ্ট। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে একযোগে সে সেদিনের সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা 'মানসী' সম্পাদক। কলকাতার আরপুলি লেনে তার বাড়িতে তখন প্রায়ই সাহিত্যের মজলিস বসে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহে ও বাংলার কাব্যপাঠকগণের শ্রদ্ধায় তখন সে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর আমি ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের নগণ্য অকর্তন পথপরিদর্শক। 'মানসী'তে প্রেরিত আমার 'শিবের গাজন' কবিতাটি পড়ে তার ভাল লেগেছিল। সেইজন্য কৃষ্ণনগরে কোনো কাজে এসে সে আমার ভাঙ্গা বাসায় আমার সঙ্গে পরিচয় করতে এলো! তার অনুরোধে আমি আমার পুঁজি থেকে কয়টি কবিতা তাকে সসঙ্কোচে প'ড়ে শোনালাম। কবিতা শোনবার পর সে আমার 'মিতে' সম্বোধন ক'রে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলো। পরে দেখেছিলাম—হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরা তার একটা দুর্বলতা ছিল। মিতে বলবার হেতু বোধহয় নামসাম্য। সেই দিনই সে আমার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে যে আমি অনেক কনিষ্ঠ হলেও তাকে যেন কোনোদিন 'আপনি' বা 'বাবু' সম্বোধন না করি। সে শপথ আমি বরাবর রেখেছি।'...

এই উক্তির মধ্যে যতীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রমোহনের বুকে জড়িয়ে ধরাকে তাঁর একটি দুর্বলতা ব'লে উল্লেখ করলেও আসলে তৎকালীন গ্রামীন সংস্কৃতির ভাবধারায় এই বাহুবন্ধনে আকর্ষণের নিবিড় আন্তরিকতা ছিল অত্যুজ্জ্বল সুষমামণ্ডিত। মহানগরীতে বাস ক'রেও তিনি সেই গ্রামীন সংস্কৃতির স্বতস্ফূর্ত আবেগ থেকে স'রে এসে 'সফিস্‌টিকেটেড' হতে পারেন নি ; যদি হতেন, তবে 'কাজলা দিদি', 'অন্ধবধূর ব্যথা' প্রভৃতির মতো অন্তস্পর্শী কবিতা সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। আর এই কারণেই মিতার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতায় যতীন্দ্রনাথের লেখনীতে অলক্ষ্যেই ফুটে উঠেছিল : 'বিপুলা পৃথ্বীর তরে থাক নিরবধি তোমার কবিতা।' একথার হয়তো কিছু সমর্থন পাবো কবি নরেন্দ্র দেবের উক্তি থেকে—যেখানে তিনি বলেছেন : ...'হেমন্তের এক নবান্ন উৎসব মুখরিত দিনে কবি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন যমশেরপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ বাগচী পরিবারে। সেদিন তারিখ ছিল ১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ। —নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত এই যমশেরপুর গ্রামের পাশ দিয়ে সেদিন বয়ে যেতো ভৈরব নদের তরঙ্গতাড়িত গর্জনমুখর মৌরিক জলধারা। কবির রচনার মধ্যেও আমরা সেই ভৈরবের

কল্পনাদ, সেই ছন্দমুখর স্বচ্ছ তরঙ্গপ্রবাহ প্রতিবিম্বিত হয়েছে দেখতে পাই। দেখতে পাই নদীমাতৃক বাংলা পল্লীর মধুরসাশ্রিত শ্যামস্নিগ্ধ ছবি, গ্রাম্যবধূর শান্তমধুর রূপ, প্রকৃতির দামাল ছেলেদের বলিষ্ঠ সুন্দর আনন্দময় প্রতিকৃতি।'

তাঁর দেহাবসান ঘটে ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। দু'দিন পূর্বে ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর দেহান্তর ঘটে। রোগশয্যায় এ শোক সহ্য করতে পারেননি যতীন্দ্রমোহন। এই শোকই তাঁকে দ্রুত মৃত্যুতীর্থে এগিয়ে নিয়ে যায়। ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁর সম্পর্কে দৈনিক যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, তা নিঃসন্দেহে যতীন্দ্রমোহনকে কেন্দ্র ক'রে সমসাময়িক বিদগ্ধ কাব্যানুরাগী ব্যক্তিদেরও বক্তব্য। ভাষান্তরে—যতীন্দ্রমোহন ছিলেন বাংলার প্রাণের কবি—পল্লীবাংলার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার পটভূমি আশ্রয় ক'রে তাঁর কবিতাবলী ফুটেছে নির্মল বনফুলের মতো, গন্ধে-সুষমায় যারা প্রত্যেকটি অনবদ্য। উপেক্ষিত পল্লীজীবনের অন্তরালে যে চাষী চাষ করে, জেলে মাছ ধরে, রাখাল গরু চরায়, কুলবধূ ভরা ঘট নিয়ে নম্র লজ্জায় আপন কুটীরে ফেরে, বিরহিনী অন্ধবধূ অশ্রুজল ফেলে, দিঘিহারা বালিকা তার কাজলা দিদির নামে কাঁদে, যতীন্দ্রমোহনের দরদী লেখনী সেই বাংলাকে, বাঙালীকে আন্তরিক মমতায় অঙ্কিত করেছেন। তাঁর ভাষার স্বচ্ছ, ছন্দ সাবলীল, ভঙ্গী অকপট, তাঁর কাব্যে দিব্যমানবতার বাণী নেই, মহান জীবনদর্শন নেই, বৃহৎ বিশ্বতত্ত্ব নেই; ঘরের কথা, ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কথা অকৃত্রিম সরল ভাষায় তিনি বিবৃত করেছেন, সেই বর্ণনার ছত্রে ছত্রে ফুটেছে যার সুস্থ কল্পনা ও স্বচ্ছন্দ মমতার নিবিড় স্পর্শ। 'লেখা', 'রেখা', 'নাগকেশর', 'জাগরণী', 'নীহারিকা', 'বন্ধুর দান', 'মহাভারতী' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর এই বিচিত্র কবিতাবলী গ্রথিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত 'কাব্যমালঞ্চ' গ্রন্থে তাঁর সারাজীবনের সুনির্বাচিত কাব্যসমূহ সংকলিত হয়েছে। এছাড়া 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' নামে তাঁর আর একখানি প্রবন্ধ ও কবিতাসংগ্রহও আছে। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিকুল একদা বাংলা কাব্যসাহিত্যকে নবযুগের প্রাণস্পন্দনে জাগ্রত ক'রে তুলেছিলেন; তাঁরা সকলেই আজ অস্তাচলবাসী। তাঁদের সঙ্গে খাঁটি বাঙালীয়ানার পটভূমিতে বাংলা কবিতা রচনার ঐতিহ্য বোধহয় শেষ হয়ে গেল। এদিক থেকে যতীন্দ্রমোহনের স্থান কোনোদিনই পূরণ হবে না। মানুষ হিসেবে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক, স্বধর্মনিষ্ঠ, কৌতুকপ্রিয় ও আন্তরিকতাসম্পন্ন। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকেই তিনি যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগে গ্রহণ করতেন, তা ইদানীন্তন-কালের শহুরে কালচারে বড় একটা দেখা যায়না। অভিজাত জমিদারগৃহে জন্মগ্রহণ ক'রেও অন্তরের দিক থেকে তিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু ও উৎপীড়িতের সুহৃদ। তিনি মিস্টিসিজ্‌মের প্রচ্ছন্নতা থেকে তাঁর কাব্যকে উদ্ধার করে জনগণের সুস্পষ্ট সহজ আবেগের সঙ্গে তা অনায়াসলব্ধভাবেই মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাই রাবীন্দ্রিক মিস্টিসিজ্‌মের পরিবর্তে রাবীন্দ্রিক গাথা-কাব্যগুলি যতীন্দ্রমোহনের অত্যধিক প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তারই ছায়ানুসরণ লক্ষ করি তাঁর কর্ণের উক্তিতে, যথা—

'নহে, কভু নহে—মানে না কর্ণ গুপ্ত সে অধিকার,—
কর্ণ পুরুষ, পৌরুষে শুধু স্বীয় ইতিহাস তার;
কোথা তার পিতা? মাতা তার নাহি,
একা সে চলেছে সম্মুখে চাহি'—

খলো খোদিত দুর্গম-পথে বীর্যের অভিসার :
ধিক্‌কৃত কোনো দৈব অতীত কর্ণ মানে না তার।'

অথবা দুর্যোধনের উক্তি—

'দূর দিগন্তে সন্ধ্যা সায়রে কালোয় মিলেছে রক্ত রেখা,
নীচে নির্জন প্রান্তর'পরে কা'র ও মূর্তি লুটিছে একা ?
—কে আমি, জানি না ? ভুলি নি সে নাম—রাজা আমি রাজা দুর্যোধন।
কুরুক্ষেত্র শেষ হ'ল নাকি ? কোথা আমি ? এ কি দ্বৈপায়ন ?'

অন্যত্র অন্ধবধূর ব্যথা'র যেখানে তিনি লিখছেন—

'পায়ের তলায় নরম ঠেকলো কি ?
আস্তে একটু চল্‌ না ঠাকুরঝি।
ও মা, এ যে করা বকুল, নয় ?'

অথবা 'কাজলা দিদি'তে লিখছেন—

'বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই ?...'

তা যে বাংলার অন্তর নিষিক্ত ভাষায় কতখানি মর্মস্পর্শী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এমনি আর-একটি 'অপরাজিতা'—

'পরাজিতা তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর 'অ-পরাজিতা' নাম ?
গন্ধ কি তোর বিন্দুমাত্র আছে ?
বর্ণ—সেও ত নয় নয়নাভিরাম।
... ...
কালো আঁখিপুটে শিশির-অশ্রু ঝরে—
ফুল কহে—মোর কিছু নাই কিছু নাই,
তোমরা যে নামে ডাকিয়াছ দয়া ক'রে,
আমি শুধু তাই, তাই—আমি শুধু তাই।
...
মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
পূজা—শুধু পূজা জীবনের মোর ব্রত ;
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
অন্তরযামী—তিনিও তোমারি মত ?'

অন্যত্র 'সুখ-দুঃখ' তুলনা করতে গিয়ে যখন তিনি বলেন—

'জীবন-মরণ একই নীড়ে ফুটে, টুটে,
সন্ধ্যাতারাই শুকতারা হয়ে উঠে।
... .
চণ্ডীদাসের সু-দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া দুঃখ ভোগাই যে চাই !'

তাও যেন তাঁর আপন অভিব্যক্তিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকাশ।

রবীন্দ্র-অনুসারী হয়েও এমনিভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একান্তভাবেই স্বীয় শিল্পীসত্তার অনুসারী। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন তাঁর কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বারাণসীধামে তাঁকে 'কবিকুলেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে বনহুগলীর জমিদার নিমাইচাঁদ মৈত্রের কনিষ্ঠা কন্যা ভাবিণী দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী ছিলেন। একদা তাঁর কিছু রচনা তৎকালীন 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয়, ১৩৪৪ সালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দর্শনে গিয়ে সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। যতীন্দ্রমোহনের পত্নীপ্রেমের মতো স্বদেশ প্রেমও ছিল গভীর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাল থেকে স্বাধীনতা লাভের দিন পর্যন্ত তিনি যেসব দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেন, তা তাঁর 'জাগরণী' গ্রন্থে বিধৃত হয়। বহু স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। তৎকালীন 'মানসী' ও 'যমুনা' পত্রিকার সাময়িক সম্পাদনায় একদা তিনি যে যোগ্যতার পরিচয় দেন, তারই সর্বশেষ পরিচয় পাই তাঁর জীবন সায়াহ্নে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্বাচল' মাসিক পত্রে। ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বি. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত করে সম্মানিত করেন। ১৩৩৮ সালে তাঁর পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্তিসম্বর্ধনায় তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

'আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায়,
নবীন বটে ছিলাম কোনোকালে।
বসন্তে আজ কত নূতন বোঁটায়
ধরলো কুঁড়ি বাণীবনের ডালে॥
কত ফুলের যৌবন যায় চুকে
একবেলাকার মৌমাছিদের প্রেমে,
মধুর পালা রেণুকণার মুখে
ঝরা পাতায় ক্ষণিকে যায় থেমে।
ফাগুন-ফুলে ভরেছিলে সাজি
শ্রাবণ মাসে আনো ফলের ভিড়।
সেতারেতে ইমন উঠে বাজি'
সুর-বাহারে দিক্ কানাড়ার মীড়॥'

যদিও তিনি মাত্র উনসত্তর বছর আয়ুলাভ করেছিলেন, তবু তাঁর ছেষট্টিতম জন্মদিনে দেশবাসী যতীন্দ্রমোহনকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করে তাঁর কাব্যের সুর-বাহারে নতুন ক'রে যে কানাড়ার মীড়ের মূর্ছনা জাগিয়েছিলেন, তা বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও বাংলার কাব্যপ্রিয় চিত্ত থেকে একদিনও বিলীন হয়ে যায়নি। যদিও আজ আন্তর্জাতিক ভাববিপ্লব বাংলা কাব্যের মূলকাণ্ডে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে এবং প্রবীন ও নবীনের দৃষ্টিভঙ্গী ও বাণী সংঘর্ষের ফলে তার টেক্‌নিক ও ফর্মে এসেছে অনিবার্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তবু বায়ুহিল্লোলে মুক্ত বিহঙ্গের ডানা-প্রসারণের মতো এদেশের হৃদয়খানিকে উদার মানসিকতায় মেলে ধরবার দীনতা থেকে আজও সে মুক্ত হতে পারেনি। সেই হৃদয়ের স্পর্শ পেতে বার বার ফিরে যেতে হয় যতীন্দ্রমোহনের কাছে॥

●

॥ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কালবিচার ॥

শ্রীজয়জিৎ রায়

বর্তমান কালে সভ্যজগতে যে কালগণনা-পদ্ধতি প্রচলিত, সেকেণ্ড-মিনিট-ঘণ্টা-দিন-বৎসর-দশক-শতকের এ রীতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতের কালগণনা-পদ্ধতির পার্থক্য রয়েছে। আমরা ইতিহাসের আলোচনায় বর্তমানে এই সার্বভৌম পাশ্চাত্য পদ্ধতিরই প্রয়োগ করে থাকি। কোনো প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হলে আমরা জানতে চাই সেটা কত বৎসর পূর্বের বা কত শতাব্দীর প্রাচীন। বেশী প্রাচীন হলে জানতে চেষ্টা করি, সেটা কত খ্রীষ্টপূর্বাব্দের। এ বিচারে শকাব্দ, কল্যব্দ বা যুগের হিসাব আসে না। সে হিসাবের কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন সারা বিশ্বেই এক সময়-পরিমাপক পদ্ধতি। কিন্তু প্রাচীন ভারতে সময়ের যে পরিমাপ প্রচলিত ছিল, তা আমূল পৃথক। সূর্যসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে :

স দ্বিধা স্থূলসূক্ষ্মত্বান্মূর্তশ্চামূর্ত উচ্যতে
প্রাণাদিঃ কথিতো মূর্তঃ ত্রুট্যাদি অমূর্তসংজ্ঞকঃ।

অর্থাৎ কাল, মূর্ত ও অমূর্ত ভেদে দুই প্রকার। মূর্তকাল স্থূল আর অমূর্তকাল সূক্ষ্ম। প্রাণ থেকে মূর্তকালের গণনা আরম্ভ হয়। অমূর্তকালের গণনা আরম্ভ হয় ত্রুটি থেকে। আধুনিক হিসাবে, এক প্রাণ হচ্ছে প্রায় ৪ সেকেণ্ড পরিমিত কাল এবং এক ত্রুটি হচ্ছে এক সেকেণ্ডের প্রায় ৩৩ হাজার ভাগের এক ভাগ। অমূর্তকাল সম্ভবত জ্যোতিষিক গণনা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হত। আমাদের পক্ষে দরকারি হচ্ছে প্রাচীন ভারতে মূর্তকালের গণনা পদ্ধতি। মূর্তকালের পরিমাপে জ্যোতিষিক আর পৌরাণিক পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এখানে পৌরাণিক কাল-বিভাগই উল্লেখ করা হচ্ছে।

চোখের পলক পড়তে যতটুকু সময় দরকার হয়, তাকে বলা হয় নিমেষ। ১৫ নিমেষে হয় এক কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় এক কলা, ৩০ কলায় এক ক্ষণ, ১২ ক্ষণে এক মুহূর্ত এবং ৩০ মুহূর্তে এক অহোরাত্র বা দিন। ৩০ অহোরাত্রে এক মাস, ৬ মাসে একটি অয়ন, ২টি অয়নে বা ৩৬০ অহোরাত্রে এক বৎসর। দক্ষিণায়ন হচ্ছে দেবতাদের রাত্রি আর উত্তরায়ণ হচ্ছে দেবতাদের দিন। সুতরাং এক মানব-বৎসরে বা আমাদের ৩৬০ দিনে হয় এক দৈব অহোরাত্র বা দিন। ১২ হাজার দৈব অহোরাত্রে চতুর্যুগ গঠিত হয়। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিকে চতুর্যুগ বলে। ৪, ৩, ২, ১ : এই অনুপাতে যথাক্রমে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। ১২ হাজার বৎসরের মধ্যে কৃতযুগ হবে ৪০০০ বৎসর। এরসঙ্গে যুক্ত হবে যত হাজার বর্ষপরিমাণ যুগ, ঠিক তত শত-সংখ্যক সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ। অর্থাৎ কৃতযুগ ৪০০০ বৎসর হলে তার সঙ্গে যুক্ত হবে ৪০০ বৎসরের সন্ধ্যা ও সমপরিমাণ সন্ধ্যাংশ। তাহলে কৃতযুগের মোট পরিমাণ হবে ৪৮০০ দৈব বৎসর। এমনি করে ত্রেতা যুগ হবে ৩০০০+৩০০ +৩০০=৩,৬০০ দৈব বৎসর। দ্বাপর ও কলির পরিমাণ যথাক্রমে ২, ৪০০ এবং ১,২০০ দৈব বৎসর! এই সংখ্যাকে মানব বৎসরে পরিণত করলে চতুর্যুগের কালপরিমাণ এ রকম দাঁড়াবে :

কৃত যুগ—৪,৮০০ × ৩৬০ = ১৭,২৮,০০০
ত্রেতা যুগ—৩,৬০০ × ৩৬০ = ১২,৯৬,০০০
দ্বাপর যুগ—২,৪০০ × ৩৬০ = ৮,৬৪,০০০
কলি যুগ—১,২০০ × ৩৬০ = ৪,৩২,০০০
মানব বৎসরে মহাযুগের কাল পরিমাণ = ৪৩,২০,০০০ বৎসর।

চতুর্যুগের সমষ্টিকে মহাযুগ বলা হয়। ৭১ মহাযুগ যোপে এক একজন মনু রাজত্ব করেন। একজন মনুর সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত কালকে বলা হয় মন্বন্তর। অর্থাৎ একটি মন্বন্তরের কালপরিমাণ হচ্ছে : ৪৩,২০,০০০ × ৭১ = ৩০,৬৭,২০,০০০ বৎসর। ১ হাজার মহাযুগে ব্রহ্মার একটি অহোরাত্রি। ব্রহ্মার একটি অহোরাত্রকে বলা হয় কল্প। প্রতি কল্পের অবসানে জগতের ধ্বংস হয়ে থাকে। একটি কল্পে ১৪ জন মনু রাজত্ব করেন। ব্রহ্মার একদিন বা কল্প ১০০০ মহাযুগের সমান। সুতরাং এক কল্পের কালপরিমাণ হচ্ছে : ৪৩,২০,০০০ × ১০০০ = ৪৩২,০০০০০০ বৎসর. অর্থাৎ চার শত বত্রিশ কোটি বৎসর। প্রতি মন্বন্তরের শেষে পৃথিবী একবার জল প্লাবিত হয়। পৃথিবীতে ছয়টি মন্বন্তর অতীত হয়েছে এবং বর্তমানে সপ্তম মনু বা বৈবস্বত মনুর কাল চলছে। বৈবস্বত মনুর ৭১ টি মহাযুগের মধ্যে ২৭টি মহাযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর বয়স হয়েছে প্রায় একশত ছিয়ানব্বই কোটি বৎসর। বর্তমানে বৈবস্বত মনুর ২৮ তম মহাযুগের অন্তর্গত কলিযুগ চলছে।

যুগ, মহাযুগ, মন্বন্তর ও কল্পের কালপরিমাপে বিভিন্ন পুরাণ ও সূর্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষিক গ্রন্থের মধ্যে আশ্চর্য ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের কালবিভাগ যে অতি প্রাচীনকালে, খ্রীষ্টপূর্বযুগে. ভারতে প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন কারণে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ জাতীয় অতি বিস্তারিত বা অতিরঞ্জিত কালবিভাগ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। যুগ-মহাযুগের অঙ্ককে মেনে নিলে বলতে হয়, শতপথ ব্রাহ্মণ, মৎস্যপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতে উল্লিখিত মহাপ্লাবনের ঘটনাটি ১১ কোটি বৎসরেরও বেশী প্রাচীন। অথবা রামায়ণের রামচন্দ্রের কালকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে হয় ৮ লক্ষ ৭০ হাজার বৎসর পূর্বে। সেইসঙ্গে স্বীকার করতে হয় রামের ১১ হাজার বৎসর রাজত্বের কাহিনী (দশবর্ষসহস্রানি দশবর্ষশতানি চ ॥ আদি ১।৯৭)। কিন্তু আজকের পণ্ডিতদের অভিমত হচ্ছে, নৃতাত্ত্বিক-প্রত্নতাত্ত্বিক ভিত্তিতে মানব-সভ্যতাকে অত দূরে পিছিয়ে নেওয়া যায় না।

তাহলে কোন পথে অগ্রসর হয়ে প্রত্নভারতীয় সভ্যতার কালনির্ণয় করা সম্ভব ? বুদ্ধ পূর্ব যুগে ভারতে যে সভ্যতা ছিল, কী ছিল তার স্বরূপ ? পৌরাণিক কালবিভাগের মত পৌরাণিক কাহিনীগুলিও কি অবিশ্বাস্য ? নাকি পুরাণে বর্ণিত কাহিনী ও চরিত্রেরা ঐতিহাসিক ? রামায়ণের কাহিনী অথবা মহাভারতের যুদ্ধও কি তাই ? বৈদিক সাহিত্য কত প্রাচীন ? বৈদিক আর্যরা কি বহিরাগত ? এ জাতীয় অসংখ্য প্রশ্ন আমাদের মনে গুঞ্জরিত হয়। ভারততত্ত্ববিদ্, পুরাতত্ত্ববিদ্, ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতজনেরা এ সকল প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে স্বতন্ত্র পথে যাত্রা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের মত ও পথের পার্থক্য অনেক। সিদ্ধান্তও সেহেতু বিভিন্ন। মতদ্বৈধের মধ্যে কদাচ নজরে আসে ঐক্য, মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত।

॥ নক্ষত্রলিপি পাঠোদ্ধার ॥

জ্যোতিগণনার ভিত্তিতে যে সকল মনীষী প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কালনির্ণয়ে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বেন্টলী, কোলব্রুক, জ্যাকোবি, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে তিলক একদিকে যেমন স্বাধীনতা

সংগ্রামের বীর যোদ্ধা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, অন্যদিকে আবার একজন খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কালক্রম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিকোণ ও যুক্তি মৌলিক এবং তাঁর এই গবেষণালব্ধ, পরিশ্রমজাত ফসল স্থান পেয়েছে তাঁর 'ওরিয়ন্' ও 'দ্য আর্কটিক্ হোম্ ইন দ্য 'বেদাস্' গ্রন্থদুটির মধ্যে। ভারতে আর্যদের সভ্যতা ও ধর্মের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন হচ্ছে ঋগ্বেদ। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিরই প্রাচীন ইতিহাসের শেষ প্রান্তে রয়েছে পরম্পরাগত রহস্যময় কাহিনী বা পুরাকাহিনী। এ সব অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য এবং আক্ষরিক অর্থে গ্রাহ্য নয়।

সাধারণের মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত যে, পৃথিবীতে মানুষ এসেছে তুষারযুগের পরে এবং মেরু-অঞ্চল মানুষের বাসোপযোগী নয়। ইতিহাস-পূর্ব যুগের মানব-সভ্যতাকে নৃতাত্ত্বিক বিচারে প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগে ত্রিধা বিভক্ত করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ সব যুগের আবির্ভাব ও স্থিতি সমকালীন নয়। গ্রীসের মানুষ যখন লৌহের ব্যবহার শিখেছে, তখন ইতালীর মানুষ বাস করেছে ব্রোঞ্জ যুগে, আবার পশ্চিম ইউরোপের মানুষ তখন প্রস্তর যুগ অতিক্রম করে নি। অন্যদিকে ভূতাত্ত্বিক বিচারে পৃথিবীর ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন, Paleozoic, Mesozoic, Cainozoic, Quarternary প্রভৃতি। এর মধ্যে সর্বশেষ যুগটিকে দু'টি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা, হিমযুগ বা তুষারযুগ এবং হিমোত্তরযুগ। পশ্চিম ইউরোপে প্রত্নপ্রস্তরযুগীয় মানুষ দেখা দিয়েছিল হিমযুগের শেষে। ভূতাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, ৮০ হাজার বছর আগেই হিমযুগ শেষ হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, মাত্র ৮/১০ হাজার আগে হিমযুগ অবসিত হয়েছে, সুরু হয়েছে হিমোত্তর যুগ। হিমযুগে উত্তর ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চল শত শত ফুট ঘন তুষারে আবৃত হয়ে পড়েছিল। প্রত্নপ্রস্তর যুগ এই হিমযুগেরই অন্তর্গত। কিন্তু নব্যপ্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগ হিমোত্তর যুগের অন্তর্ভুক্ত।

আর্য, সেমীয়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতিতে মানুষের শ্রেণীবিভাগ মুখ্যত ভাষাভিত্তিক। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্পর্কে ভাষানির্ভর এই শ্রেণীবিন্যাস প্রযোজ্য হতে পারে না। তাই নৃতাত্ত্বিকগণ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মাথার খুলি বা করোটির পরিমাপ অনুযায়ী মানুষকে শ্রেণীবিন্যস্ত করতে চেষ্টা করেছেন। যেমন, মাথার খুলির প্রস্থ যদি তার মোট দৈর্ঘ্যের ৭৫ শতাংশ বা কম হয়, তবে তাকে দীর্ঘশিরস্ক বা dolichocephalic বলে নির্দেশ করা হয়। আবার প্রস্থ যদি দৈর্ঘ্যের ৮৩ শতাংশ বা তার বেশী হয়, তবে তাকে বলা হবে প্রশস্তশিরস্ক বা brachycephalic। এ ছাড়া মাঝামাঝি একটি শ্রেণীও রয়েছে। এই শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে, ইতিহাস-পূর্ব যুগের ইউরোপে চার রকমের মানুষ বাস করত। বর্তমান ইউরোপে যারা ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গীয় ভাষা ব্যবহার করে, তারা এই চার শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে কোন এক শ্রেণী নিশ্চয় আর্যদের পূর্বপুরুষ। অনেকের মতে, প্রশস্তশিরস্ক মানুষরাই ছিল আর্যদের পূর্বপুরুষ। প্রত্নপ্রস্তর যুগে ইউরোপের লোক পাথর ও হাড়ের জিনিস ব্যবহার করত। তারা ধাতুর ব্যবহার জানত না। নব্যপ্রস্তর যুগের ইউরোপের মানুষ মৃৎপাত্র ও চাকার গাড়ির ব্যবহার জানত। কিন্তু তারাও ধাতুর ব্যবহার জানত না। কিন্তু আর্যেরা ধাতুর ব্যবহার জানত বলে ধরা হয়। আর্যদেরকে ইউরোপের

আদিবাসী বলে গণ্য করলে বলতে হয়, তারা স্বতন্ত্রভাবে তাদের প্রতিবেশীদের চাইতে অনেক উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এটা কষ্টকল্পনা। তার চাইতে এটাই বরং যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় যে, তদানীন্তন ইউরোপের মানুষের অপেক্ষা উন্নততর সভ্যতার ধারক ও বাহক আর্যেরা অন্য কোনো অঞ্চল থেকে ইউরোপে গিয়ে উপনীত হয়েছিল।

বালগঙ্গাধর তিলকের মতে, মধ্য এশিয়া বা ইউরোপ আর্যদের মূল আবাসভূমি ছিল না; ছিল উত্তরমেরুর সন্নিহিত অঞ্চল। সেখান থেকেই তারা এশিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এটা সত্যি যে, সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের কোথাও এমন কথা লেখা নেই যে আর্যেরা ভারতে বহিরাগত। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যেই আবার এমন সব বিস্ময়কর সূত্র রয়েছে, যেগুলিকে আধুনিক ভূবিদ্যা বা জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে এই চমকপ্রদ সম্ভাবনাই ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে, সুদূর অতীতে আর্যদের বাসস্থান ছিল উত্তরমেরুর সন্নিহিত অঞ্চলে। এরূপ অনুমানের স্বপক্ষে তিলক যে সব যুক্তি দেখিয়েছেন, তার মধ্যে প্রধান কটি যুক্তি আলোচনা করার আগে মেরুপ্রদেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা দরকার।

মেরুপ্রদেশ সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা হচ্ছে এই যে, সেখানে প্রবল তুষার ও শৈত্যের জন্য মানুষের পক্ষে বসবাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু মেরু অঞ্চলের আবহাওয়া চিরকাল এরকম ছিল না। মেরুকেন্দ্রিক অঞ্চলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রণিধান করলে দেখা যাবে:

(১) এখানে অধিকাংশ নক্ষত্রকেই সারা বছর আকাশে চক্রাকারে ঘুরতে দেখা যায়। অর্থাৎ অধিকাংশ নক্ষত্রের উদয়াস্ত হয় না। তবে কিছু সংখ্যক নক্ষত্রকে উদিত ও অস্তমিত হতে দেখা যায়।

(২) এই অঞ্চলের বৎসরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, উত্তরায়ণ সংক্রান্তির সময় থেকে প্রায় ছয় মাসব্যাপী দীর্ঘ রাত্রি। অক্ষাংশ অনুযায়ী এই দীর্ঘ রাত্রি ২৪ ঘণ্টা থেকে আরম্ভ করে ঈষদূন ছয় মাস পর্যন্ত বিভিন্ন কাল পরিমাণের হতে পারে। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণায়নের সূচনা থেকে দীর্ঘ রাত্রির অনুরূপ দীর্ঘদিন। বলাবাহুল্য, অক্ষাংশ অনুযায়ী দিনের দৈর্ঘ্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। তৃতীয়ত, বৎসরের বাকী সময়ে সাধারণ দিনরাত্রির আবর্তন। দীর্ঘ রাত্রির অবসানে প্রথম যখন দিনের আবির্ভাব হবে, তখন সে দিন হবে আমাদের পরিচিত সাধারণ দিনের মত সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত। এইদিন রাত্রির তুলনায় ক্ষুদ্রতর হবে, কিন্তু ক্রমশ দিন দীর্ঘতর হতে থাকবে এবং অবশেষে এক সময় মেরু-কেন্দ্রিক অঞ্চলের অক্ষাংশ অনুযায়ী এক মাস, দু' মাস কিংবা পাঁচ মাসের দীর্ঘ দিন উপস্থিত হবে। রাত্রি সম্পর্কেও এরূপ বুঝতে হবে।

(৩) দীর্ঘ রাত্রির অবসানে হঠাৎ এখানে সূর্যোদয় হবে না। প্রথমে আবির্ভাব হবে উষার। অর্থাৎ সূর্য দৃশ্য হবে না, কিন্তু পূর্ব দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে আলোর আভাস। উত্তর মেরুতে এই উষার স্থায়িত্ব হবে দু' মাস। সেখানে দিগন্তের নীচে উষার রক্তাভাকে দিগন্তের চারদিকে ঘুরতে দেখা যাবে। মেরু থেকে কয়েক ডিগ্রীর ভেতরও অনুরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যাবে। মেরু থেকে যতই দূরবর্তী হবে মেরু-কেন্দ্রিক স্থানটি, ততই কমতে থাকবে সেখানকার উষার স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য। উষার শেষে হবে সূর্যোদয়। তারপর আবর্তিত হবে কয়েকটি সাধারণ দিনরাত্রি। তারপর আসবে দীর্ঘ দিন। দীর্ঘ দিনের অবসানে আসবে উষার অনুরূপ সন্ধ্যা। সূর্য অস্তমিত হলে থাকবে ম্লান আলো। স্থান-

বিশেষের অক্ষাংশ অনুসারে উষার মতই হবে সন্ধ্যার স্থায়িত্ব। তারপর সন্ধ্যার ম্লান আলো হবে ম্লানতর। আসবে রাত্রি, আসবে দিন। এ রকম কয়টি দিনরাত্রির পর আসবে দীর্ঘ রাত্রি, যার স্থায়িত্ব হবে অক্ষাংশভেদে কয়েক দিন থেকে কয়েক মাস অবধি।

মেরু-কেন্দ্রিক অঞ্চলের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তনীয়। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে এই সকল বৈশিষ্ট্যবাচক কোনো বর্ণনা বা উল্লেখ দেখতে পেলে এ কথা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত যে, বর্ণিত দৃশ্য বৈদিক ঋষিরা নিজে পর্যবেক্ষণ করেছেন অথবা প্রত্যক্ষদর্শী পূর্বসূরীদের মুখে বর্ণনা শুনেছেন এবং তা ঋষি-পরম্পরায় বিশ্বস্তভাবে রক্ষিত হয়ে এসেছে।

[ক্রমশঃ]

●

॥ রূপান্তরের পথ ॥

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

প্রবৃত্তির বিলুপ্তি ঘটাতে হবে—নাকি রূপান্তর—কোন্‌টা বাস্তবভাবে কাম্য? কোন্‌টা সাধ্য? এই মর্ত্য জীবনের নানান্ সুখ-দুঃখের ঢেউ খেতে-খেতে সমস্ত ভাবুক মানুষই এই প্রশ্নের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কাশীর দুর্গাবাড়ির কাছে নানকপন্থীর মঠে রামকৃষ্ণদেব মোহন্তের প্রভাব দেখেছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'র চতুর্থ ভাগে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বরের আলাপে সে-প্রসঙ্গ আছে। সেখান থেকে এই কয়েক ছত্র তুলে দেখা যাক—

"ন্যাংটা (তোতাপুরী) বললে, কোন রাজা সোনার থালা সোনার গেলাস দিয়ে সাধুদের খাওয়ালে। কাশীতে মঠে দেখলাম মোহন্তের কত মান—বড় বড় খোট্টারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বলছে কি আজ্ঞা।

"ঠিক ঠিক সাধু ঠিক ঠিক ত্যাগী সোনার থালও চায় না, মানও চায় না। তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না। ওঁকে পেতে গেলে যা যা দরকার সব যোগাড় করে দেন।

"আপনি হাকিম—কি বোল্‌বো!—যা ভালো বোঝো তাই ক'রো। আমি মূর্খ।"

এই কাহিনী শুনতে-শুনতে অধর বলেছিলেন—'উনি আমাকে একজামিন করছেন।' অন্যান্য ভক্তেরা ছিলেন। তাঁরাও শুনেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব অধরের কথা শুনে হাসতে হাসতে বলেন—"নিবৃত্তিই ভালো। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।"

কিন্তু প্রথম ধাপেই পুরো 'অবস্তু' ব'লে নিজের জীবশরীর, সংসার ও জীবমন তো অস্বীকার করা চলে না। বরং আস্তে আস্তে রূপান্তরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। হাজরা-কে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ও সব হয়ে গেল! ঐটি দেখতে পাবার জন্যই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণ প্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার হয়। প্রতিমা হয়ে গেলে মাটির ছাঁচটা ফেলে দেওয়া যায়। ঈশ্বরদর্শন হলে শরীর ত্যাগ করা যায়।"

মানুষের বহু হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় কতো বেদ-বেদান্ত, কতো রামায়ণ-মহাভারত রচা হোল। তবু এইসব অনুভবের ধাক্কা পেতে হয় আজও প্রত্যেক মননশীল মানুষকে।

শুক্লযজুর্বেদে সেই পরম-কে বলা হয়েছিল—তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমরা যেন পিতা বলেই বোধ করি। তুমি মঙ্গল স্বরূপ—'নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ'। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বহুশ্রুত উক্তি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে পাই—

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে,
যিনি সকল ভুবনতলে
যিনি বৃক্ষে যিনি শস্যে,
তাঁহারে নমস্কার—
তাঁরে নমি নমি বার বার।

এই নমস্কার হোলো ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি। বৈদী থেকে রাগানুগা ভক্তিতে এগিয়েছে মন। বৈষ্ণব কাব্যের পরকীয়া অনুরাগের দিকটি বিবেচ্য। বাউল, সুফী ইত্যাদি ভাবধারার 'মনের মানুষ' ও সকলের মধ্যে 'এক'-এর অনুভব উচ্চারিত হয়েছে। 'পাপ'-'পুণ্যে'র ধারণাও অনেকদিনের। জীবকে বিনাশ থেকে রক্ষার জন্যে দয়াময়-কে বারবার ডাকা হয়েছে। ঋগ্বেদে এরকম অনেক অংশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ থেকে এই অংশটি দেখা যেতে পারে—

হে বরুণদেব
মানুষ আমরা দেবতার কাছে
যদি থাকি পাপ করে,
লঙ্ঘন করি তোমার ধর্ম
যদি অজ্ঞানঘোরে—
ক্ষমা কোরো তবে, ক্ষমা কোরো হে,
বিনাশ কোরো না মোরে।

অথর্ববেদের ৬।৮।৩ অংশের অনুবাদে সেই রবীন্দ্রনাই লেখেন—

আকাশ-ধরা রবিরে ঘেরি
যেমন করি ফেরে,
আমার মন ঘিরিবে ফিরি
তোমার হৃদয়েরে।

'আমির' বা ব্যক্তিমনের অহং-ভাব কি বিনাপ্রয়াসে দূর হয়? আমরা যাকে 'ভালবাসা', 'মমতা', 'প্রেম' ইত্যাদি বলে থাকি সেও অনেকটাই আমিত্বের এগাকা নয় কি? 'আমিত্ব'-ত্যাগের অভিনয়ে অনেকেই পটু। আবার রামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৪-এ ডিসেম্বরের আলাপ-লিপিতে কথামৃতের মধ্যেই পাই সে-কথা—ঠাকুর বলেছিলেন, শ্রীম লিখে গেছেন—"একজন বহুরূপী সেজেছে 'ত্যাগী সাধু'। সাজটি ঠিক হয়েছে দেখে বাবুরা একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলেনা, উঁহু করে চলে গেল। গা-হাত-পা ধুয়ে যখন সহজ বেশে এলো, তখন বল্লে, 'টাকা দাও'। বাবুরা বললে, 'এই তুমি টাকা নেবে না বলে চলে গেলে আবার টাকা চাইছ?' সে বল্লে, 'তখন সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই।'

রামকৃষ্ণদেব অবতার তত্ত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এই উদাহরণটি দেন। তিনি বলেন—"তেমনি ঈশ্বর যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন।"

কিন্তু মানুষ যদি ঈশ্বর হতে চায়, তাহলে সে কি করবে? গান্ধীজী আততায়ীর গুলিতে নিহত হবার পরে জর্জ বার্নাড শ বলেছিলেন—অতিমর উত্তম হওয়া বড়োই বিপজ্জনক।

'স্বামি-শিষ্য সংবাদ'-এ (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড) শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর প্রশ্ন মনে পড়ে; স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জিজ্ঞেস করেন—"মহাশয়, ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, একথা তিনি আপনাকে নিজ মুখে কখনও বলিয়াছিলেন কি?' বিবেকানন্দ বলেন—'কতবার বলেছেন। আমাদের সবাইকে বলেছেন। তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন তাঁর শরীর যায় যায় তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি, এই সময়ে যদি বলতে পারো 'আমি ভগবান' তবে বিশ্বাস করব—তুমি সত্য সত্যই ভগবান। তখন শরীর যাবার দুদিন মাত্র বাকি। ঠাকুর তখন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।' আমি শুনে অবাক হয়ে রইলুম। (পৃষ্ঠা ৬৫ দ্রষ্টব্য)।

এসব কথার পরেও সংশয়ের নিরসন হয়না। সংশয়ের দংশন থেকে শান্ত বিশ্বাসে পৌঁছুতে পারা কঠিন। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করেছিলেন সে-বিষয়ে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"দুর্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল, অর্জুনও দেখেছিল। অর্জুনের বিশ্বাস হল, দুর্যোধন ভেল্কিবাজি ভাবলে। তিনি না বুঝালে কিছু বলবার বা বুঝাবার জো নেই।··· সার কথা হচ্ছে,—তাঁর কৃপা; তবে লেগে থাকতে হবে, তবে তাঁর কৃপা হবে।" এই কৃপার কি কোনো নিয়ম আছে? স্বামীজী বলেছিলেন—'হ্যাঁ বটে, নাও বটে।' রামকৃষ্ণদেবের নিজের মন্তব্য শুনিয়েছিলেন—ঠাকুর কখনও বলতেন, 'তাঁর প্রতি নির্ভর কর্।—ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে যা'; আবার কখনও বলতেন, 'তাঁর কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' এই কথার ধারাতেই বেদান্তসূত্র থেকে স্বামীজী বলেন—'লোকবত্ত লীলাকৈবল্যং'—'কৃপাটা হচ্ছে তাঁর খেয়াল' – 'এই জগৎসৃষ্টিটাই তাঁর খেয়াল!'

'জীব' মানে শ্বাস-গ্রহণবর্জনের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে যে সত্তা। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ—এই পঞ্চতত্ত্বের সমন্বয় আমাদের ব্যক্তিসত্তা। আত্মা বা বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত সেই ব্যক্তিবোধ, কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের অধিকারী জীবসত্তা নিজের অনন্তসংযোগ নিজেই জানেনা। বাক্-পাণি পাদ-পায়ু-উপস্থ—ব্যক্তির এই সব যন্ত্র ও তার ইন্দ্রিয়-অবলম্বনগুলি বিজ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মন, প্রাণ, শরীর—এদের অন্বিত করে সেই বিজ্ঞান বা বুদ্ধি। কিন্তু আসল আশ্রয়ের আশ্রয় হোলো আত্মা—যার নামান্তর—অনাদি অনন্ত বিশ্বচৈতন্য। এদিকে দৃশ্যমান এই শরীরেরই একদিকে স্থূলদেহ, অন্যদিকে সূক্ষ্মদেহ। সূক্ষ্ম শরীরে মন ও প্রাণ,—আবার কারণ-শরীরে বুদ্ধি বা বিজ্ঞান। এই বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ সকলেই জানেন। কিন্তু এই ধরনের নাম জ্ঞান শ্রেণী-ভাবনা ইত্যাদির চর্চায় কি আত্মলাভ ঘটে? যাকে 'অহং' বলা হয় সাধারণত, তার স্মৃতিশক্তি আছে; সেই স্মৃতিসূত্রে সে নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা গ্রথিত করে রাখে, কিন্তু সব কথা কি মনে রাখা যায়? অনেক ঘটনা ডুবে থাকে মগ্নচৈতন্যে। কিন্তু জীবমানব শুধু দেহ-মন প্রাণের অস্থির সমষ্টিমাত্র নয়। অনন্ত বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক কীরকম, এ-বিষয়ে দার্শনিকরা নানাভাবে ভেবেছেন,—শঙ্করাচার্যের মতে জীবাত্মা-পরমাত্মা অদ্বৈত, রামানুজের মতে জীবাত্মা নিত্য

স্বতন্ত্র হয়েও পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য অভেদ; মধ্বাচার্য বলেন, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার প্রভেদ নিত্যস্থায়ী; সাংখ্যদর্শনে জীবাত্মার অসংখ্যতা স্বীকৃত; উপনিষদেও ব্যক্তিসত্তার অমরতা অস্বীকার করা হয়নি। তবে, বিশ্বচৈতন্য বা সমগ্রতা থেকে যখন আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন বা অনন্বিত ভাবি, সেখানেই অবিদ্যার খেলা চলছে। অহংকার তার লক্ষণ। যদি বলা হয় পরমের নাম 'ঈশ্বর', তাহলে সেই ঐশী বুদ্ধির দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত হতে দেবার পথ চিনে নেওয়া এবং সেই পথে এগিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের যথার্থ নৈতিক ও পরমার্থিক গতিপথ। সে-বিষয়ে আমাদের সংকল্পের স্বাধীনতা আছে,—আমরা জড়পদার্থ বা নিম্নজীবের মতন অবস্থার দাস মাত্র নই।

এই বাক্যটি শেষ ক'রে চোখ তুলে দেখি কাকেরা, চড়ুইরা সব বাসা বাঁধবার জন্যে কুটি কুড়িয়ে এগাছে-ওগাছে উড়ে উড়ে বসছে। ডিম পাড়বে, ডিম ফুটে বাচ্ছা হবে, বাচ্ছারা বড়ো হবে। এইরকম ঘটে আসছে। ফাল্গুন-চৈত্রে সরলে ফুল, সজনে ডাঁটা—আমের মুকুল,—কচি পটোল—এই পুনরাবৃত্তি চলছে, চলবে। মানুষও সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করে,—জনক জননী হয়ে মরে। তারই মধ্যে কেউ কেউ কমবেশি আত্মজিজ্ঞাসু হয়। সংসারের দুর্গে বাস ক'রে কমবেশি নির্লিপ্ত থাকবার চেষ্টাও চলে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর দক্ষিণেশ্বরে সিঁথির সেই পণ্ডিত এসেছিলেন রামকৃষ্ণদেবের কাছে—যিনি কাশীতে বেদান্ত পড়েছিলেন। অনেকদিন তিনি আসেননি কেন, এই প্রশ্ন করেছিলেন রামকৃষ্ণ। পণ্ডিত বলেছিলেন—'আজ্ঞে, সংসারের কাজ। আর জানেন তো সময় আর হয় না।' কথামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডের এই অংশেই পণ্ডিতের মুখে কাশীতে দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-৮৩) সঙ্গে নানা পণ্ডিতের বিচারের প্রসঙ্গ শোনেন,—ধিরোসফি সম্বন্ধে পণ্ডিত ঠাকুরকে তাঁর ধারণা বলতে বলেন। রামকৃষ্ণ বলেন—"ভক্তিই একমাত্র সার – ঈশ্বরে ভক্তি।"

কুকুর-বিড়াল, আম-জাম, বিষয়সর্বস্ব মানুষ সে-ধারণাতেই নেই। রামকৃষ্ণ সেদিন রামপ্রসাদের গান গেয়েছিলেন—

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে?

সেদিন তিনি সাধনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। বলেছিলেন—

"মাখন খেতে ইচ্ছা। তা দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন, করলে কি হবে? খাটতে হয়, তবে মাখন উঠে। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, বললে কি ঈশ্বরকে দেখা যায়? সাধন চাই।"

এইরকম কতো কথা ভারতের সাধুসন্তরা নিজেদের উপলব্ধি থেকেই বারবার জানিয়ে গেছেন। আমরা ফুরসৎ পেলে শুনি – যৎসামান্য সাধুসঙ্গ হয় হয়তো, তারপর চড়ুই, কাক, দোয়েলের মতন সংসারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ধম্মপদ, থেরীগাথা,—সুফী কাউলদের গান, বিবিধ ভক্তিগীতি আমাদের মনে যৎকিঞ্চিৎ ব্যাকুলতা জাগায় হয়তো। ভাবি মারাঠি কবি তুকারামের কথা, বাঙালী রামপ্রসাদের কথা। রবীন্দ্রনাথের বঙ্গানুবাদে বাজে কবীরের গান—

চুড়াটি তোমার
যে রঙে রাঙালে, প্রিয়,
সে রঙে আমার
চুনরি রাঙিয়ে দিও।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'সূফী গাথা' বইখানি বেরিয়েছিল ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারিতে। উৎসর্গ-অংশে তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ ভারতীস্বামীর স্মৃতিবন্দনা করেন এবং ঐ অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখেন—"তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ইসলাম এবং সূফী দীনের মধ্যে এইটুকু পার্থক্য যে ইসলামে কোরাণের স্থান প্রথম এবং সূফী-গাথার (মসনবীর) স্থান দ্বিতীয়, আর সূফী দীনে সূফী গাথার (মসনবী-দীওয়ের) স্থান প্রথম এবং কোরাণের স্থান দ্বিতীয়। যেহেতু মারিফতের (রাগাত্মিকা ভক্তির) স্থান শরিয়তের (বৈধী ভক্তির) উর্ধ্বে, সেইজন্য সূফী গাথাকে প্রাধান্য দান সূফী দীনের পক্ষে দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহার দ্বারা কোরাণের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না।"

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ যতীন্দ্রমোহনের এই বইখানির প্রশংসাসূত্রে লেখেন যে, যতীন্দ্রমোহনের বিশ্বাস—"বৈদিক সাধনার দুইটি শাখা ছিল। তন্মধ্যে একটি শাখা অনুসরণের পুরোহিত ভৃগু বা শুক্রাচার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং দ্বিতীয় শাখা দেবগণের পুরোহিত অঙ্গিরার সহিত সংশ্লিষ্ট। যাহাকে প্রচলিত ভাষায় 'জেন্দ্ আবেস্তা' বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তাহাই তন্মতে ভার্গব-বেদ।" গোপীনাথ কবিরাজ আরো লেখেন—"আবেস্তা চারিটি সংহিতায় বিভক্ত, তন্মধ্যে 'যস্ন' নামক সংহিতাটি মুখ্য। ইহার মধ্যে সতেরোটি সূক্ত জরথুস্ত্রের স্বমুখনির্গত।" এই সূক্ত বা গাথাগুলির ওপরেই সূফী-সাধনার ভিত্তি বলে যতীন্দ্রমোহনের বিশ্বাস। এইসূত্রেই গোপীনাথ কবিরাজের মন্তব্য ছিল—"সূফী-সাধনা প্রেমমূলক রাগমার্গের সাধনা। এই মতে ভগবানকে প্রিয় অথবা প্রিয়ারূপে ভাবনা করিয়া, তাঁহার সঙ্গে মিলনের চেষ্টা প্রধান। লেখকের মতে এই সাধনার মূলে গ্রীক-সংস্কৃতির কোনও প্রভাব নাই; এমন কি বেদান্ত ও ইসলামের প্রভাবও তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে সূফীধর্ম' পুরাতন পারসিক ধর্মের পুনরভ্যুদয়। গাথাতে সূফী সাধনার মূল প্রেম অথবা আত্মসমর্পণ বলিয়া মনে হয়। সাদি এবং হাফেজের কবিতার বঙ্গানুবাদ আছে। মসনবীর বঙ্গানুবাদ নাই। অথচ ইহা সূফী সম্প্রদায়ের গুরুগ্রন্থ, এবং ভক্তিসাধনা সম্বন্ধে পারসিক ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার শ্রেষ্ঠ শ্লোকগুলির সঠীক বঙ্গানুবাদদ্বারা গ্রন্থকার বাঙ্গালী পাঠককে মসনবীর মর্মে প্রবেশ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। কবীর সম্বন্ধেও গ্রন্থকার নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। কবীর রাম ভক্ত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকারের উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা যায়, কবীর শ্রীকৃষ্ণকে গুরু বলিয়া রটনা করিয়াছেন।"

মহামহোপাধ্যায়ের এই প্রশংসাবচনগুলি যতীন্দ্রমোহনের বইটির গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টিতেই পাঠককে আকর্ষণ করে। এই লেখকই ১৯৬১-এর নভেম্বরে 'নানক-গীতা' নামে একটি বই লেখেন। পশ্চিমবঙ্গে গুরু নানকের পাঁচ শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে এই দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিধুশেখর ভট্টাচার্যের ভূমিকা সংবলিত তাঁর ইংরেজি বই 'Prisni' বেরোয় এসব বইয়ের অনেক আগে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। সে যাই হোক, তাঁর প্রথমোক্ত বই 'সূফী-গাথা'র ভূমিকায় তিনি ঋগ্বেদ (৫।৪।১১) উদ্ধৃত করে লেখেন—"মহা শান্তির জন্য রুদ্রকে যজন কর। রুদ্র সাকারও (দেব) বটেন, নিরাকারও (অসুর) বটেন।" ভাগবতের ভক্তিপথের প্রেরণের দিকও তিনি দেখিয়ে দেন।

কিন্তু যে-প্রশ্ন দিয়ে এই নিবন্ধের সূচনা ঘটেছিল, সেই প্রশ্নেই সাধারণ মানুষকে বারবার ফিরতে হয়। সংসারী মানুষ কোন্ পথে এগিয়ে যেতে পারেন? জৈব প্রবৃত্তির বিলুপ্তি নাকি রূপান্তরণ? কোন্‌টি সাধ্য? দুই-ই কি অভিন্ন? [illegible]?

১৯৬১-তে ছাপা 'A Hand book of Sri Aurobindo's Yoga'—লেখক T. D. Chatterjee—তারই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তখনকার বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র লেখেন যে, ষোলোটি অধ্যায়ে প্রবাহিত সেই বইটি তৎকালাবধি প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে ছিল সর্বাধিক সামগ্রিক রচনা। মহাযানী বৌদ্ধ মতে যে বিশ্বব্যাপী সকলের মোক্ষের ওপর জোর দেওয়া হয়, শিশিরকুমার শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগে পতঞ্জলির, তন্ত্রমতের, হঠযোগীদের ও অন্যান্য যাবতীয় যোগাদর্শের সমন্বয়ী আদর্শে সেই মহাযান যোগপন্থা ও যোগলক্ষ্যের মিলের দিকটি দেখিয়ে এই কথা লেখেন যে, অরবিন্দ-যোগ আরো ব্যাপক—শুধু প্রত্যেক ব্যক্তির ও সমগ্র মানবজাতিরই নয়,—সারা বিশ্বের নির্বাণ মাত্র নয়,—শ্রীঅরবিন্দ দিব্যতার উত্তরণের কথা জানিয়ে গেছেন। 'নির্বাণ' নয়; দিব্যতা-ই লক্ষ্য। তান্ত্রিকদের মতো শুধু ভেতরের সত্তার উদ্ভাসন নয়, ওপর থেকে আত্মিক ও অতিমানসিক দ্যুতির অবতরণের দিকটিতেও তিনি জোর দেন। এই অবতরণের ধারণা তিনি গীতা থেকে নিলেও গীতার যেমন বিশেষ পরিস্থিতিতে ধর্মের গ্লানি-ঘটিত গ্রন্থিমোচনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকৃত, অরবিন্দ তদপরিবর্তে এই উপলব্ধি ব্যক্ত করেন যে, বিবর্তনের প্রবাহে প্রত্যেক স্তরেই—জড় থেকে প্রাণে,—প্রাণ থেকে মনে,—এবং তদূর্ধ্বে দিব্যশক্তির অবতরণ ঘটছেই। গীতা-তেও 'যোগ' প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু অরবিন্দ-মতে যোগ শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ বা মিলন নয়,—ব্যক্তিসত্তার কোনোরকম 'লয়' নয়;—ব্যক্তিবোধের পূর্ণ সংরক্ষণ সত্ত্বেও ঐশী অবস্থায় উত্তরণ। অন্যান্য যোগপন্থায় যা নেই, শ্রীঅরবিন্দ-যোগের লক্ষ্য হোলো তাই—শুধু মানুষের নয়, সমস্ত বিশ্বের দিব্যতার রূপান্তরণ। এতে কিছুই বর্জনীয় নয়, সবই রূপান্তরিত করবার আয়োজন। এইসূত্রে শিশিরকুমার দার্শনিক আলেকজান্ডারের প্রসঙ্গ তুলে বলেন যে, আলেকজান্ডারের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ধারণার বেশ কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তিনি দেখিয়েছেন নিম্নপ্রবৃত্তির বিলুপ্তি ঘটিয়েই ঊর্ধ্বতর চেতনায় জাগরণ সম্ভব। পক্ষান্তরে, শ্রীঅরবিন্দ নিম্নপ্রবৃত্তির যোগ্য রূপান্তরণের পথেই ঊর্ধ্বচেতনার অভ্যুদয়ে আস্থাশীল।

'বিলুপ্তি' আর 'রূপান্তর'—ফলের দিক থেকে দুই-ই সাধারণ মানুষের কাছে অভিন্ন মনে হয় না কি? কিন্তু দার্শনিকের দৃষ্টিতে হয়তো এ-দুয়ের মধ্যে স্বীকার্য পার্থক্য আছে। সে যাই হোক্; শিশিরকুমার অতঃপর 'কৃপার' কথা তুলেছেন এবং টি. ডি. চট্টোপাধ্যায়েরই উক্তিতে পণ্ডিচেরির শ্রীমা-র মন্তব্য দেখিয়ে সাধকের প্রথম অবস্থায় নিজের চেষ্টা ও প্রার্থনার আন্তরিকতা দুটি ব্যাপারেই মনোযোগী হবার পরামর্শ দিয়ে মায়ের ওপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'The Mother' বইয়ে লক্ষ্যের দিকটি এইভাবে দেখিয়েছেন—The goal is not to lose oneself in the Divine Consciousness. The goal is to let the Divine Consciousness penetrate into matter and transform it."

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ—শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ মূল্য ২০৲ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে স্মরণ করতে স্বতঃই মনে পড়ে গিরিশ চন্দ্রের কথা। কারণ, এই রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর গিরিশ চন্দ্র রচিত চৈতন্যলীলা দর্শন উপলক্ষেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নমস্কার বিনিময়ের ছলেই সূত্রপাত ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কের। পূর্বে আরও দু'বার শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন ঘটলেও তা সেরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই গিরিশের মনে। আর ঐ দিনেই তিনি "শ্রীগৌরাঙ্গরূপী" সে যুগের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বিনোদিনীকে 'চৈতন্য হোক' বলে আশীর্বাদ করেন তার অভিনয় নৈপুণ্যে ভাবাবিষ্ট হয়ে। সে যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর জীবনে ঘটে গেল এক বিপ্লব সেই সঙ্গে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চেরও। একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে গিরিশ চন্দ্রের পরবর্তী পৌরাণিক নাটক রচনায় যেমন ঘটতে লাগল ভাব-ভাষার পরিবর্তন, অপর দিকে তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ-ধন্যা বিনোদিনীর প্রভাবে পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠা মঞ্চাভিনেত্রী তারা-সুন্দরী, কুসুম ও হরিমতি প্রভৃতির ঘটতে লাগল বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে কন্যা-বৎসলা সম্পর্ক। তার সামগ্রিক ফলশ্রুতিরূপে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটকগুলি ভাবে, ভাষায় ও রূপে-রসে মণ্ডিত হল সাফল্যের চরম শীর্ষে। পরিশেষে আবার 'ব'-কলমার অধিকার দানের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশের জীবনেরও যাত্রা শুরু হল এক পরম পরিণতির দিকে। এক কথায় নাট্যকার, নট-নটী ও তৎকালীন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ সার্থক হয়ে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকবারের পদার্পণে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ" এই আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শ্রীনলিনী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় যেভাবে উপরি-উক্ত মূল ঘটনাবলীর দেশ, কাল, পাত্র-নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন, তথানির্ভর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আকর-গ্রন্থ ও বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের জবানবন্দী হতে উদ্ধৃতি দিয়ে, তা সত্যই প্রশংসাহ। তাছাড়া লেখকের স্বকীয় উপস্থাপনারীতি ও বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গি গ্রন্থখানির রচনা-নৈপুণ্যের সাক্ষ্যবহ। গ্রন্থখানি শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন এবং এজাতীয় পুস্তক পাঠক-নির্বিশেষে সুখপাঠ্য হবে আশা করি। প্রচ্ছদ ও বাঁধাই উত্তম। অধিকন্তু কয়েকখানি আলোক চিত্রে-শোভিত হয়ে গ্রন্থখানির সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে।

—আশুতোষ ঘোষ

বুদ্ধ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ—গ্রন্থকার ও প্রকাশক : শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার, ৮৯, অশোক রোড, গাঙ্গুলী বাগান। পোঃ গড়িয়া ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮] মূল্য দুই টাকা মাত্র। পৃষ্ঠা—৫০।

—বিশ্বের ইতিহাসে ভগবান বুদ্ধ একটি একক অনন্যসাধারন চরিত্র, তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন —প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগের পর্বতপ্রমান সামাজিক গ্লানি দূর করিয়া জনসাধারণকে প্রকৃত আনন্দ ও নির্বাণলাভের পথনির্দেশ করিয়াছিলেন. তাঁহার মহৎ অন্তঃকরন ; সর্বজীবে করুণা, পরার্থে আত্মত্যাগ এবং "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়"-আদর্শে সংঘস্থাপন তাঁহার অপার মহিমারই প্রকাশক মাত্র, সর্বসাধারণের জন্য তিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন সনাতন হিন্দুধর্মেরই এক সহজ এবং সরলীকৃত রূপ—বৌদ্ধধর্ম। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিকৃত আচার-অনুষ্ঠানের নাগপাশ হইতে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন তদানীন্তন সমাজকে।

ভগবান তথাগতের এই সুমহান কর্মজীবনের যথাযথ বিশ্লেষণ আমরা পাই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায়। সিদ্ধ মহাপুরুষের মানসদর্পণে বুদ্ধচরিত্রের সকল দিকগুলি যেরূপ উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে—তাহা অন্যত্র বিরল। কর্মযোগ, প্রত্যক্ষানুভূতি, অদ্বৈত বেদান্তের সহিত বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে ভগবান বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গির এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বোধকরি স্বামীজীর পক্ষেই সম্ভব।

বুদ্ধপ্রসঙ্গে স্বামীজীর উক্তিগুলির এক সুসমঞ্জস সংকলন প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার মহাশয়, একাধিক সংক্ষিপ্ত পাদটীকা রচনা করিয়া তিনি উক্তিগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ধর্মপদের বিভিন্ন শ্লোক, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং যীশুখ্রীষ্টের বাণীগুলি তিনি প্রশংসনীয়ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থটির শেষভাগে গ্রন্থকারের দুইটি মন্তব্যে মর্মাহত হইলাম। বৌদ্ধধর্মের পতন প্রসঙ্গে স্বামীজীর অভিমত আলোচনায় শ্রীযুক্ত সরকার তন্ত্রের বামাচার সাধনার অর্থ করিয়াছেন 'ধর্মের নামে অবাধ স্ত্রীসঙ্গ'। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তন্ত্রে বামাচার অর্থে বাম+আচার এবং বামা+আচার—উভয়ই হইয়া থাকে। ইহাদের কোনটিই ধর্মের নামে "অবাধ স্ত্রীসঙ্গ" নয়। শ্রীযুক্ত সরকার আরও লিখিয়াছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রের বামাচার সাধনকে 'পায়খানার রাস্তা' বলিয়াই বলিতেন। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ কোথাও বামাচার সাধনকে পায়খানার রাস্তা বলেন নাই, বরং কর্তাভজা প্রমুখ নিকৃষ্ট স্তরের সাধনা সম্পর্কেই অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, শুধু শ্রীযুক্ত সরকার কেন, বর্তমানকালে কিছু কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তিও অনুরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা বোধকরি ভুলিয়া যান যে পরমসাধিকা যোগেশ্বরী ভৈরবীর তত্ত্বাবধানে শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শীটি তন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আশা করি গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে শ্রীযুক্ত সরকার এই ত্রুটি অপনোদন করিবেন। বইটির মুদ্রণ ইত্যাদি কার্য সুন্দর।

পরমার্থ সাধন ও সাধুসঙ্গ—শ্রীঅজিত কুমার সেন। প্রকাশিকা—শ্রীমতী উষারাণী সেন। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরন দে. স্ট্রীট্, কলিকাতা—৭৩০০৭৩ মূল্য ছয় টাকা। পৃষ্ঠা ১২৪।

—অধ্যাত্মমার্গের পথিকদের জন্য একটি সুন্দর গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন শ্রীযুক্ত অজিত কুমার সেন মহাশয়। পরমার্থ সাধনকেই যাঁরা জীবনের অবলম্বনরূপে গ্রহন করেছেন তাঁদের কাছে এ ধরনের গ্রন্থের উপযোগীতা ও কার্যকারীতা সর্বাধিক। অতি প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় লেখক আলোচনা করেছেন সাধনার বিবিধ বিষয় যেমন, ঈশ্বরানুরাগ, একাগ্রতা, ব্যাকুলতা, শরণাগতি, বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য, পূজা, জপ, ধ্যান ইত্যাদি। আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রচিত তাঁর এই নিবন্ধগুলি সহজেই চিত্তকে আকৃষ্ট করে। 'সাধুসঙ্গ' পর্যায়ে ভারতের মহান সাধকদের বাণীসম্বলন গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

সামগ্রিক বিচারে বইটি রসোত্তীর্ণ। কিন্তু পরমার্থ সাধনের আলোচনায় গুরুতত্ত্ব অর্থাৎ গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা, দীক্ষার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, গুরুপরম্পরায় বীজমন্ত্র প্রদান ও শক্তিপাত, গুরু ইষ্ট অভেদ তত্ত্ব—ইত্যাদি আলোচিত হলে বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত। প্রসঙ্গত লেখক 'তারকব্রহ্ম নামকে' কলিযুগের মহামন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন এবং সকলকেই ঐ নামজপের প্রস্তাব দিয়েছেন। অতি উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই, কিন্তু গুরুর নিকট সিদ্ধ বীজমন্ত্র প্রাপ্তির তাৎপর্য আলাদা এবং দীক্ষিত ব্যক্তির নিকট স্বীয় ইষ্টমন্ত্রই মহামন্ত্র—পৃথক নামজপের প্রয়োজন নাই। বইটির মুদ্রণ প্রভৃতি কার্য ভালোই। —তপন কুমার পাল।

Statement about ownership and other particulars about

'VISVAVANI'

1.	Place of publication		Shri Ramakrishna Vedanta Math 19B, Raja Rajkrishna St., Cal.-6
2.	Periodicity of Publication	...	Monthly
3&4.	Printer's & Publisher's name	...	Swami Paramatmapanda
	Nationality	...	Indian
	Address	...	19B, Raja Rajkrishna St. Cal-6
5.	Editors name	...	Swami Sadatmananda & Swami Prajnanananda
	Nationality	...	Indian
	Address	...	19B. Raja Rajkrishna St. Cal.-6

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of total capital :—

The monthly magazine is the property of the Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta-6 a philanthropic and charitable institution, which is managed by a Board of Trustees consisting of the following members :—

1.	Swami Sadatmananda	...	19B, Raja Rajkrishna St., Cal.-6
2.	„ Prajnanananda	...	do
3.	„ Sadrupananda	...	do
4.	„ Adyananda	...	do
5.	„ Swarupananda	...	do
6.	„ Parameshananda	...	do
7.	„ Tapasananda	...	do
8.	„ Buddhatmananda	...	do
9.	„ Paramatmananda	...	do
10.	„ Pranabeshananda	...	do
11.	Sri Birendra Nath Roy	...	do

1. *Swami Paramatmananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.*

Swami Paramatmananda
Publisher

Dated, 15th March 1979

একজন বাবু বগি করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়িখানি মন্থর গতিতে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেঁকচাঁদ ঠাকুরের পক্ষীরাজ বংশ, বেতো ঘোড়ার বাবা। সপাসপ্ চাবুক পড়িলেও চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, 'শিরোমনি মহাশয়! আমার গাড়িতে আসুন'। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'বাবু! আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে'।

(রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একাল' থেকে)

কলকাতা/রাজনারায়ণের কলমে

রাজনারায়ণ বসুর কলমে যে-কলকাতার ছবি, সেটা গত শতকের গোড়ার কিন্তু আজকের এই দ্রুতগামিতার যুগেও কলকাতার বহমানুষের মনের কথাটা যেন সেকালের শিরোমনি মশায়ের মতই। শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে, অতএব হাঁটাই শ্রেয়। এই মনোভাবের কারণ কি? কারণ একটাই। যানবাহনের গতিহীনতা। কলকাতা শহরে জনতা বেড়েছে। জনপদ বেড়েছে। জনপথ বাড়ে নি। বাড়ন্ত জনসংখ্যার তুলনায় পথ-ঘাট সংকীর্ণ। তাই প্রতি মুহূর্তেই যানবাহনের গতি মন্থর দ্রুতগামী যানও যেন বেতো ঘোড়ার বাবা।

এই সংকটের একমাত্র সমাধান ভূগর্ভ রেল তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে। কলকাতার মানুষ এগিয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত। আমরা এগিয়ে দিয়েছি শ্রমের মুঠি এই দুয়ের যোগফলে গড়ে উঠবে নতুন কলকাতা। গতি এবং প্রগতির।

MP

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পীর সহায়তা

এবং

গ্রামীণ শিল্পের সামগ্রিক উন্নতির জন্য

খাদি ও গ্রামোদ্যোগজাত শিল্পবস্তু ক্রয় করুন

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

"আমাদের গ্রামীণ হস্ত ও কুটির শিল্পসম্ভারের মান, শিল্পীদের সৃজনশীল প্রতিভা এবং প্রচেষ্টায় যথেষ্ট উন্নত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দামের দিক থেকেও এগুলি সব শ্রেণীর ক্রেতার পক্ষে তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক। এই সব গ্রামীণ শিল্পীদের আরও বেশী উন্নত করে তুলবার জন্য সকলের কাছ থেকে আনুকূল্য ও সক্রিয় উৎসাহ প্রয়োজন। সরকার গ্রামীণ শিল্প ও গ্রামের শিল্পীদের সহায়তায় নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন।

বিভিন্ন উৎসবের সময় এবং নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ যখন নানা রকম দ্রব্যসামগ্রী কিনছেন সেই সময় গ্রামের শিল্পীদের কথা মনে রেখে খাদি ও গ্রামোদ্যোগজাত শিল্পবস্তু ক্রয় করলে হাজার হাজার দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পীকে সহায়তা করা হবে, তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে গ্রামীণ শিল্প সামগ্রিকভাবে আরও উন্নত হবে।"

জ্যোতি বসু

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

আই. সি. এ. ২৮১৮/৭৯

আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়ে, আর আমার ব্যাঙ্ক—এই তিন নিয়ে আমার সুখের সংসার

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই ব্যাঙ্কের ভবনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এক অর্থে ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র অর্থের নয়, এখন জনবিশ্বাসেরও। ইউকোব্যাঙ্কের টাকা জমানোর আবেদনই শুধু নয়, দৈনন্দিন জীবনের নানান কথোপকথনের মাধ্যমেও ব্যাঙ্ক। ছেলেমেয়েদের স্কুলের মাইনে, বিদ্যুতের বিল, ইনসিওরেন্সের কিস্তিসব—এই সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে ইউকোব্যাঙ্কই সাহায্য দেয়।

ইউকোব্যাঙ্ক তাঁদের জীবনের অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছে—ব্যাঙ্কারিক ভাষায়ই।

UCO/CAS-1677 BEN

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

'মনে করো, জুতো হাঁটছে
পা রয়েছে স্থির.....'

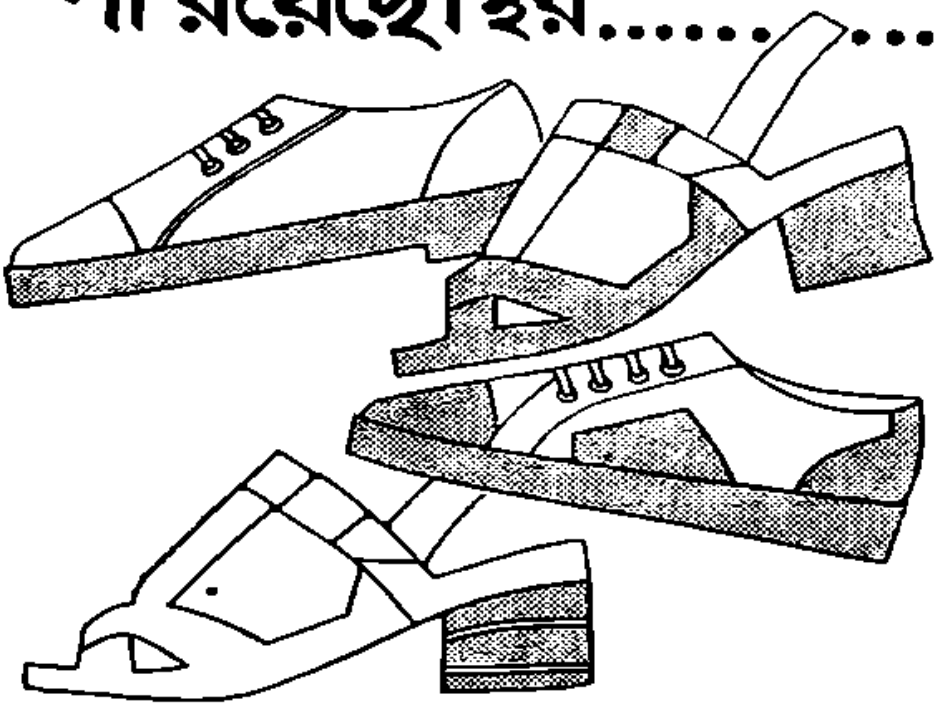

'সে বড়ো সুখের সময় নয়'

লেখক বলেন, আমরাও বলি।
কারণ, জুতোর সঙ্গে পায়ের
কোনরকম ঝগড়াই আমরা হতে
দিতে পারিনা। সেজন্যই আপনার
মনোমত, রুচিমাফিক হালফ্যাশানের
জুতোর জন্য সর্বদা বাটায় আসুন।

Bata

জনগণের প্রতি ক্রমবর্ধমান সেবা

আমাদের
প্রত্যাধিকার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা
দায়ী

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

প্রতিটি ফোঁটাই পুষ্টি যোগায়

কেয়ো-কার্পিনের প্রতি ফোঁটাই চুলের পুষ্টি যোগায়···চুলকে সজীব রাখে। তাইতো আমি রোজ কেয়ো-কার্পিন মাখি। আর কেয়ো-কার্পিনের মনোরম গন্ধের মিষ্টি আমেজ সারাদিন আমায় প্রফুল্ল রাখে।

কেয়ো-কার্পিন
কেশ তৈল

Dey's

দে'জ মেডিকেলের তৈরী

PX/DM/KB-1A/79

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মাস্থলী ইণ্টারেস্ট ডিপোজিট স্কীম ও
বিভিন্ন ডিপোজিট সার্ভিসেস আপনার সঞ্চিতধনকে
অটুট রাখতে সাহায্য করে

- *কারেণ্ট একাউণ্ট*
- *হোম সেভিংস সেফ একাউণ্ট*
- *মাইনর্স সেভিংস একাউণ্ট*
- *ফিক্সড টার্ম ডিপোজিট*
- *রেকারিং ডিপোজিট*
- *১২ মাসের রেকারিং ডিপোজিট*
- *রিটায়ারমেণ্ট বেনিফিট ডিপোজিট একাউণ্ট*
- *মাস্থলী ইণ্টারেষ্ট ডিপোজিট*
- *মাণি মাল্টিপ্লায়ার ডিপোজিট স্কীম*

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

চাই—
চাই—
চাই—

ছেলে মেয়ে বৌয়ের আবদারে ও ইরাম নাজেহাল। বৌয়ের চাই কানপাশা, মেয়ের চাই রঙীন শাড়ী, ছেলের ঝিক্ ঝিক্ পু—রেলগাড়ী। ও ইরাম খুশীমনে সবার সাধ মিটাবে। এই প্রথম উপরি টাকার মুখ দেখলো। আধুনিক পদ্ধতির চাষে ক্ষেতে হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজারের ইউরিয়া আর যৌগিক সার উপযুক্ত পরিমানে দিয়েছে। জমিতে এবার ভাই মা লক্ষ্মী উপচে পড়েছে।

কৃষি প্রগতির প্রতীক

হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

রামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৭২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ,

কলিকাতা-৭০০০৪

ডঃ এম. সি. পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

১৩১ সি, বিধান সরনী,

কলিকাতা-৭০০০০৪।

যাবতীয় পেটের পীড়ায়

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্‌স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩৯৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

'রঘুনাথবিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫, ৫৬

অন্যান্য শাখা : বারাণসী, কটক

কে, এল, দত্ত কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০নং বিধান সরণী হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

With best compliments from :—

The Peerless General Finance & Investment Company Ltd.

ESTD : 1932

Registered Office : "PEERLESS BHAVAN"

3, Esplanade East, Calcutta-700069

MORE THAN 100% OF THE COMPANY'S LIABILITY TO ITS CERTIFICATE HOLDERS ARE KEPT INVESTED IN TRUSTEE AND GOVERNMENT SECURITIES

PHONE : 27-2424 (3 lines)

With best Compliments from :—

THE ORIENTAL METAL INDUSTRIES PVT. LTD.

67, Bipin Behari Ganguly Street, Cal-700012.

Manufacturer of :

'KHAS JANATA' Kerosene Stove
'DIPTI' Brand Hurricane Lantern
'DIPTI' Brand Vitreous Enamelware
AND
'NUTAN' Superior Wick Stoves

(Developed by Research & Development Centre of
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED)

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set	
Christian Science and Vedanta	
Doctrine of Karma	9·00
Divine Heritage of Man	
Epistles	12·00
Great Saviours of the World	15·00
How To Be A Yogi	10·00
Human Affection and Divine Love	4.00
Ideal of Education	3·00
India and Her People	12·00
Life Beyond Death	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00
My Life Story	12·00
Mystery of Death	18·00
Path of Relization	
Philosophy and Religion	
Reincarnation	8·00
Religion of the Twentieth Century	2·00
Religion, Revelation and God	12·00
Self Knowledge	12.00
Science of Psychic Phenomena	8·00
Spiritual Unfoldment	6.00
Swami Vivekananda and His Works	2·00
The Bases of Indian Culture	75·00
The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
The Steps Towards Perfection	2·00
The Vedanta Philosophy	
Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
True Psychology	16·00
Universal Religion and Vedanta	12·00
Yoga Psychology	16·00
Yoga : Theory & Practice	10·00
Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00
Swami Abhedananda in America	6.50
Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda-The Patriot Saint	20.5

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music	
A History of Indian Music	15.00
Christ the Saviour	2.00
Historical Development of Indian Music	65.00
Music of the Nations	35.00
Philosophy of Progress and Perfection	
Sangitasara-Samgraha	7.50
Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	00.30
Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
19B, Raja Rajkrishna Street
CALCUTTA-700 006

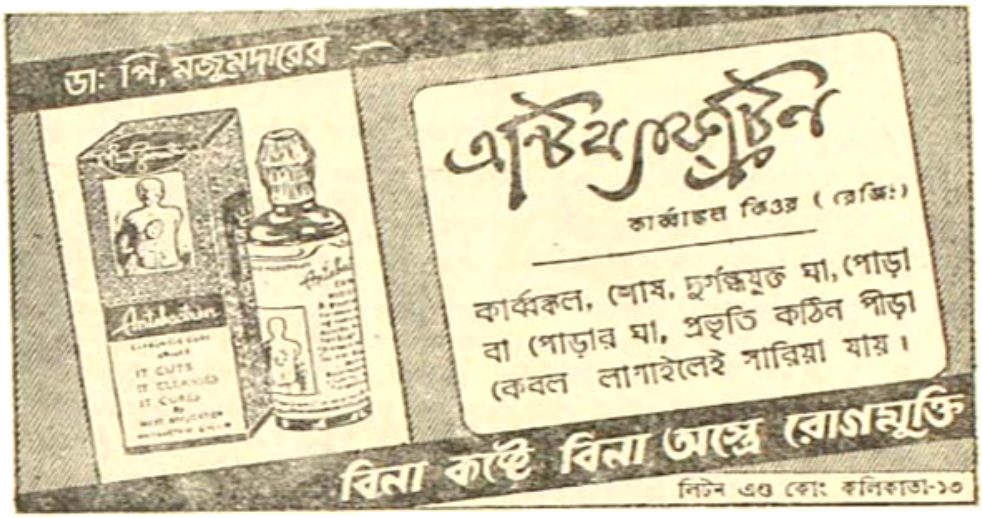

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service ;—

Please Contact :—

ARI & SONS

Manufacturers of : --

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road. Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd Office :

69, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬

ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,

'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC

COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

মনস্তাত্ত্বিকভিত্তিতে
অধ্যাত্মসাধনার অপূর্বগ্রন্থ

"পরমার্থসাধন ও
সাধুসংগ"

গ্রন্থকার :
শ্রীঅজিতকুমার সেন

মূল্য—৬·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :
মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

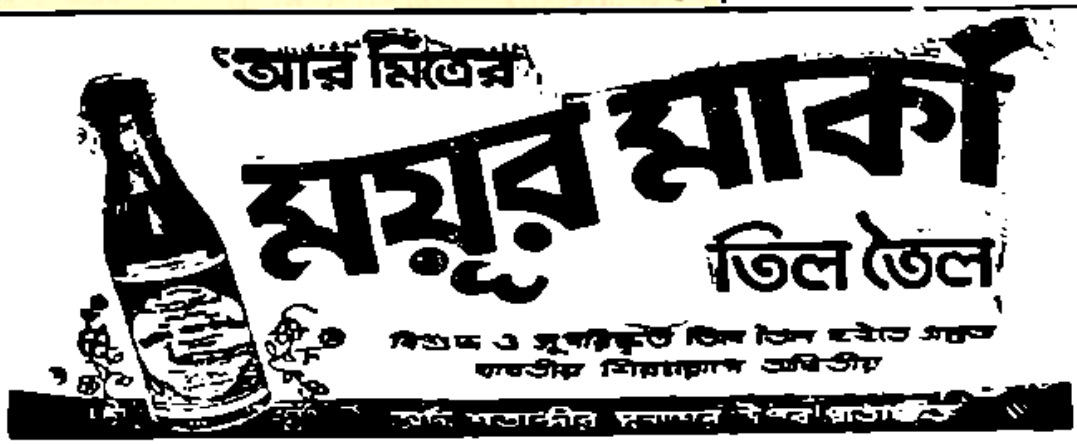

ফোন নং ৩৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর ব্যবসায়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী ● পাটনা ● ধানবাদ ● কটক ● শিলিগুড়ি ● গৌহাটী।

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য-ভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিট্যুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অনূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।
শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ৮ টাকা।
সন্ততী রহস্যত্রয় মূল্য ৪ টাকা।
উক্ত গ্রন্থ একত্রে ১২ টাকার স্থলে ১০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিষ্টস্ এণ্ড পাবলিশার্স
Wire : Similicure ৭০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা (মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ)	২০.০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত	
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)	১৮.০০	ব্যায়ামে বাঙালী	৪.০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১২.০০	বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪.০০	বিজ্ঞানে বাঙালী	৮.০০
		বাংলার ঋষি	৭.৫০
		বাংলার মনীষী	৩.০০
		বাংলার বিদুষী	৪.০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ১৩, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩		ব্যবহারিক শব্দকোষ (প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)	১৫.০০

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে যত্রিন 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।

- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

  বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্ব্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।

- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।

- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারনে পত্র দিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।

- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।

- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।

- চেক 'Visvavani. Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

বি: দ্র:—১৩৮৫ বঙ্গাব্দের ১লা ফাল্গুন থেকে 'বিশ্ববাণী'র নতুন ৪১তম বর্ষ সুরু হয়েছে। এই বর্ষের চাঁদাবাবদ ১২৲ টাকা যাঁরা এখনও পাঠাতে পারেননি তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন নিকটতম সুযোগে তা' পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R.N. 13733/57
ANNUAL SPECIAL NUMBER
41st Year, March 1979, VOL. I

Regn. No. WB/NC-141
PHONE : 55-1800

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

কুক্‌মী

ভারতের সেরা

গুঁড়া মশলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুক্‌মী প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী
ফোন-৩৩-০১১৫
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (ফ্যাইস) প্রাইভেট লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

CALCUTTA UNIVERSITY
9 APR 1979

PRICE Rs. 2·50

Sri Ramakrishna Vedanta Math.
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700006.

মূল্য ২·৫০ টাকা

স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানাত্মানন্দ
সহঃ সম্পাদক
শ্রীঅমৃতোষ ঘোষ

একচল্লিশ বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
চৈত্র
১৩৮৫

দুলালের তালমিছরী

[illegible]

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশন বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮৫০)

১২-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬।

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	১০·০০
মরণের পারে	১৪·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	যন্ত্রস্থ
যোগশিক্ষা	যন্ত্রস্থ	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	৬·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	যন্ত্রস্থ
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	৪·০০	আত্মজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ (৫ম নূতন সংস্করণ)	৬·০০

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ		তীর্থরেণু (বর্ধিত ২য় সংস্করণ)	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	যন্ত্রস্থ	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্দ্ধ	যন্ত্রস্থ
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ (প্রথম ভাগ)	১৬·০০	সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	১২·০০
ঐ (দ্বিতীয় ভাগ)	১৪·০০	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০

মনস্তাত্ত্বিকভিত্তিতে অধ্যাত্মসাধনার অপূর্বগ্রন্থ

"পরার্থসাধন ও সাধুসংগ"

গ্রন্থকার :

শ্রীঅজিতকুমার সেন

মূল্য—৬·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

মহেশ লাইব্রেরী

২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—৭৩

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

'রঘুনাথবিল্ডিংস্'

০২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫, ৫৬

অন্যান্য শাখা : বারাণসী, কটক

ভারতীয় পেটের পীড়ার

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি – ৫৬-২৪৭৪

ফোন ঃ ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

ব্রাঞ্চকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম. সি. পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

১০১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০বং বিধান সরণী হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন ৫৫-২৫৪৯ । ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিস্টার্ড নং ১০৭০৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

চৈত্র , ১৩৮৩

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

: উপদেষ্টামণ্ডলী
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

: প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১১বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

: প্রকাশক ও মুদ্রক :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে
স্বামী পরমাত্মানন্দ
: কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
: সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

মুদ্রণ :
শ্রীপার্থচরণ রায়
দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯।এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

: সহায়কমণ্ডলী
স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনগুপ্ত

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবতগীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'যোগশিক্ষা' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম. এস. সি., এম. বি. (কলিকাতা), ডি. টি. এম. (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. BANERJEE & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fiting, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street, Calcutta-700005.
Gram : PLAINED

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Telephone : 55-6172

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ

প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড,

কলিকাতা-৭০০০৬৭

ফোন : ৫৫-১৬২০

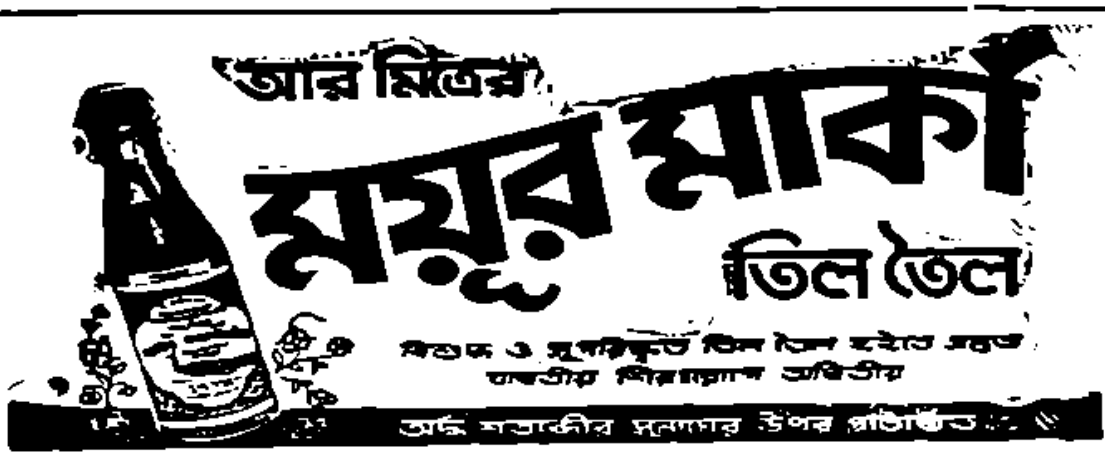

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী ● পাটনা ● ধানবাদ ● কটক ● শিলিগুড়ি ● গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

চৈত্র, ১৩৮০

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৫৭	
২।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গণেঃ দয়ানন্দ সরস্বতী	৬১	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৩।	সঙ্গীতে সাহিত্য ও রসের সার্থকতা	৬৮	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৪।	দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে	৭২	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
৫।	ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ	৭৬	স্বামী প্রভানন্দ
৬।	স্বামী অভেদানন্দ (জীবন-নাট্য)	৮০	শ্রীবিনয়ভূষণ
৭।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	৮৪	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৮।	রাকু ইয়াকী	৮৫	শ্রীদিবাকর সেনরায়
৯।	বিংশ শতাব্দীর ধর্ম— স্বামী অভেদানন্দ (অনুবাদ)	৮৮	শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
১০।	সংঘ-বার্তা	৯০	
১১।	বর্ষসূচী	৯২	
১২।	প্রচ্ছদপট শিল্পী—		শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

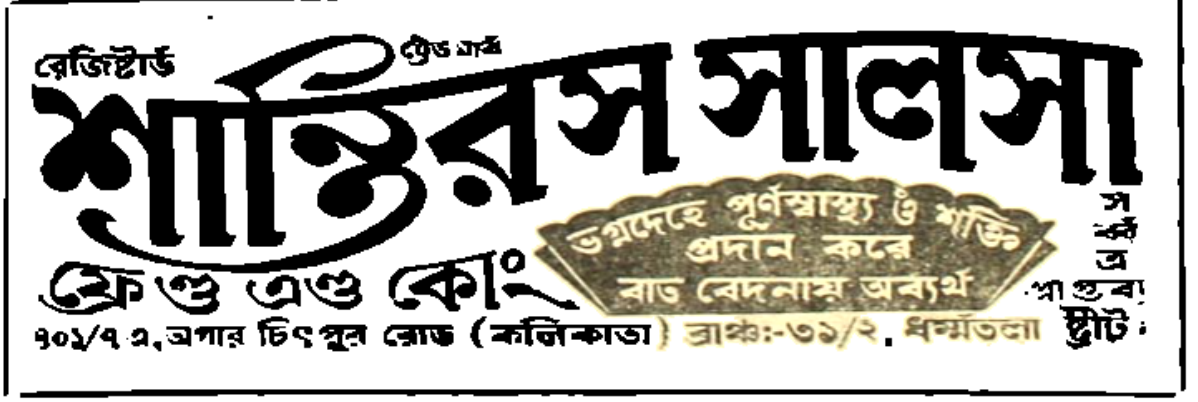

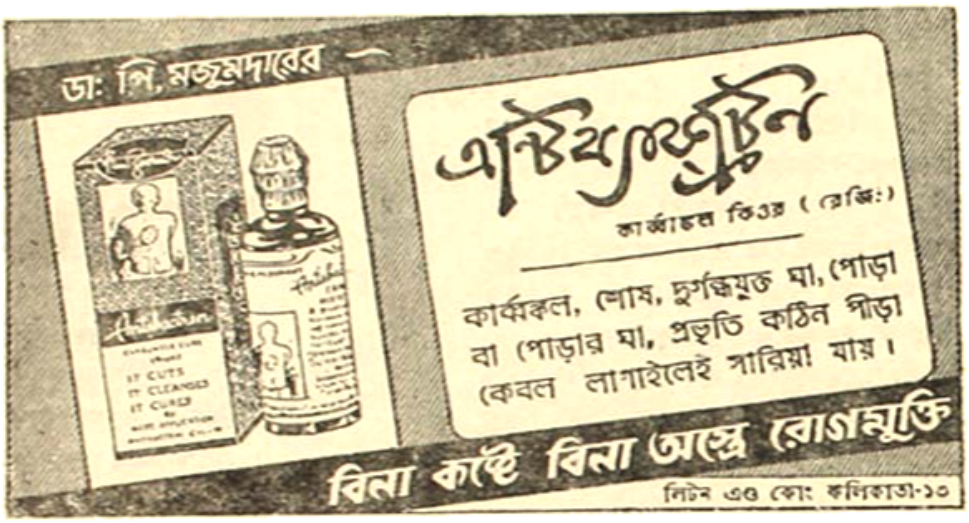

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service ;—

Please Contact :—

ARI & SONS

Manufacturers of : —

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14. Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—3, Principal Khudiram Bose Road. Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

[illegible]

একচল্লিশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | চৈত্র ১৩৮৪

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ ষ্টার-থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দর্শন ॥

"ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি সহাস্যে)—বা, এখান বেশ। এসে বেশ হ'লো। অনেক লোক একসঙ্গে হ'লে উদ্দীপনা হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই—তিনিই সব হয়েছেন।

মাষ্টার। আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে কত নেবে?

মাষ্টার। কিছু নেবে না। আপনি এসেছেন—ওদের খুব আহ্লাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব মার মাহাত্ম্য।

ড্রপ-সিন্ উঠিয়া গেল। এককালে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের উপর পড়িল।..."

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১৭৩-৭৪

শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগে (পৃষ্ঠা ১৭৩-৭৪) বিডন ষ্ট্রীটে অবস্থিত ষ্টার-থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দর্শনের বিবরণ দিয়েছেন—সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীম লিখেছেন: "ঠাকুরের (ঘোড়ার) গাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে ষ্টার-থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। সঙ্গে মাষ্টার (শ্রীম), ধাবুরাম, মহেন্দ্র মুখুজ্যে ও আরও দু'একটি ভক্ত। আরও দু-একটি ভক্তের মধ্যে কালীপ্রসাদও (পরে স্বামী অভেদানন্দ) ছিলেন। একথা আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিজ মুখে শুনেছি। তিনি বলতেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-এর

বহুস্থানেই (প্রসঙ্গেই) মাস্টার মহাশয় আমাকে 'ইত্যাদির মধ্যে ফেলেছেন।' টিকিট কিনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নাট্যালয়ে ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ীর কাছে আসিয়াছেন, অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে উপরে লইয়া গেলেন। গিরীশ পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছেন। তিনি চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া পরম-আহলাদিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ-পশ্চিমের box-এতে বসানো হইল। ঠাকুরের পার্শ্বে মাস্টার বসিলেন। পশ্চাতে বাবুরাম (পরে স্বামী প্রেমানন্দ) ও আরও দু'একটি ভক্ত—আরও দু'একটি (পূর্বেই বলেছি যে, ঐ দু'একটি ভক্তের মধ্যে কালীপ্রসাদ বা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও ছিলেন)।

"নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ। নীচে অনেক লোক। ঠাকুরের বামদিকে ড্রপসিন দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি box-এ লোক হইয়াছে। এক একজন বেহারা নিযুক্ত, box-এর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছে। ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরীশ বেহারা নিযুক্ত করিয়া গেলেন। ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন।" শ্রীম-র বর্ণনা প্রত্যক্ষ। তাঁহার বর্ণনার মাধ্যমে অতীত সেই পুণ্য-দিন ও মুহূর্তের কথা আজও আমাদের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে।

স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাস-সম্বলিত 'গিরিশচন্দ্র'-গ্রন্থে (১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৮৮) লিখেছেন : "১৯শে শ্রাবণ (১২৯১ সাল) ২রা আগষ্ট, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টার-থিয়েটারে (ষ্টার-থিয়েটার তখন ছিল বিডন ষ্ট্রীটে কাষ্ঠনির্মিত খিতল) গিরিশচন্দ্রের[১] 'চৈতন্যলীলা' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নামের উল্লেখও অবিনাশবাবু করেছেন। তাতে নিমাই (শ্রীচৈতন্য) সেজেছিলেন শ্রীমতী বিনোদিনী, নিত্যানন্দ ও পাপ শ্রীমতী বনবিহারিণী প্রভৃতি। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী মহাশয় এই (চৈতন্যলীলা) নাটকের সুমধুর সুর সংযোজনা করেন। ইনি রামাইৎ বৈষ্ণব, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক আহম্মদ খাঁর তিনি প্রধান ছাত্র ও সহরে একজন উচ্চশ্রেণীর গায়ক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বৈষ্ণবী-ঢংয়ে নৃত্য ইঁহার দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত হয়। শ্রীমতী বিনোদিনীর চৈতন্যের ভূমিকায় নৃত্য দর্শনে অনেক সাধুসঙ্গের বিমুগ্ধ হইয়াছিল"।

চৈতন্যলীলা নাটকের প্রথম সুরকার সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বেণীমাধব অধিকারীর নিকটই স্বনামধন্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চাঙ্গশ্রেণীর (ক্ল্যাসিক্যাল) সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। বেণীমাধব অধিকারীকে অনেকে বেণীবৈরাগীও বলেন, কেননা তিনি ছিলেন রামাইৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত। উত্তর-কলিকাতারই তিনি বাসিন্দা। উস্তাদ আহম্মদ খাঁ কিছুদিন আন্দুল মৌড়ীর রাজবাড়ীতে সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতায়ও তিনি বহু ছাত্রকে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। সেই ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন হাবুবাবু ও স্বামী বিবেকানন্দ। হাবুবাবু ক্ল্যারিওনেট (বংশী) বাদনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উস্তাদ আহম্মদ খাঁর কাছে নরেন্দ্রনাথের ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি শিক্ষার আরম্ভ হয়। অবিনাশবাবু লিখেছেন : এই "সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী মহাশয় (গিরিশচন্দ্র-রচিত 'চৈতন্যলীলা'-নাটকের সুমধুর সুর সংযোজনা করেন"।

১। শ্রীশ্রীকথামৃতে আছে 'গিরীশচন্দ্র' এবং অবিনাশ বসু, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি তাঁদের গ্রন্থে লিখেছেন 'গিরিশচন্দ্র'।

অবিনাশবাবু 'চৈতন্যলীলা'-নাটক[২] সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর 'গিরিশচন্দ্র'-গ্রন্থে লিখেছেন : "চৈতন্যলীলা রচনা যেরূপ মধুর এবং ভগবদ্ভক্তি-উদ্দীপক, ইহার অভিনয়ও সেইরূপ প্রাণস্পর্শী ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। চৈতন্যের ভূমিকাভিনয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী[৩] অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এতদ্ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র শ্রীমতী বিনোদিনীর 'আমার কথা'-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন : 'গৌরাঙ্গমূর্তির ব্যাখ্যা 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ রাধা—পুরুষ-প্রকৃতি এক অঙ্গে জড়িত'। এই পুরুষ-প্রকৃতির ভাব বিনোদিনী যখন 'কৃষ্ণ কই—কৃষ্ণ কই' বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইত, তখন বিরহবিধুরা রমণীর আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তম-ভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন। বিনোদিনী অতি ধন্যা : পরমহংসদেব করকমল-দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন—'চৈতন্য হোক'। অনেক পর্বত-গহ্বরবাসী এ আশীর্বাদের প্রার্থী।"

"শুভক্ষণে গিরিশচন্দ্র এই (চৈতন্যলীলা) নাটক লিখিয়া পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী নব্যবঙ্গ ও মুণ্ডিত মস্তক তিলকধারী বৈষ্ণবকে একাসনে বসাইয়া কাঁদাইয়াছিলেন। নাট্যমন্দিরকে এই সময়ে বঙ্গবাসী ধর্মমন্দিরের চক্ষে দেখিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন।.....সুবিখ্যাত সাধক প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 'চৈতন্যলীলা' দেখিতে আসিয়া প্রেমোন্মত্তভাবে দর্শকের আসন হইতে উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকেন।..... ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়ের সুখ্যাতি শ্রবণে দক্ষিণেশ্বর হইতে ৫ই আশ্বিন তারিখে ভক্তসঙ্গে ষ্টারে আসিয়া চৈতন্যলীলা-অভিনয় দেখিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়া যান। অভিনয় সমাপ্ত হইলে জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কেমন দেখলেন?' ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলেন—'আসল নকল এক দেখলাম।' ঠাকুরের পদার্পণে নটনটীগণের জীবন সার্থক এবং রঙ্গালয় ধন্য হয়। থিয়েটারে ঠাকুরের এই প্রথম আগমন।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (২য় ভাগ, পৃঃ ১৭৪) গ্রন্থের শ্রীম গৌরাঙ্গলীলার দৃশ্য বর্ণনা ক'রে লিখেছেন :

"প্রথমে পাপ আর ছয় রিপুর সভা। তারপর বনপথে বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির

২। (ক) 'গিরিশপ্রতিভা'-গ্রন্থে (১৩৩৭) শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও গিরিশ-অনুরাগী গ্রন্থের হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন : "১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'চৈতন্যলীলা' লিখিত হইবার পরে গিরিশচন্দ্রের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র-প্রভাব প্রকটিত হয়। তদবধি তিনি যে সমস্ত নাটক রচনা করিয়াছিলেন (বিল্বমঙ্গল, রূপ-সনাতন, পূর্ণচন্দ্র, নসীরাম প্রভৃতি) প্রায় তাহার সকলগুলিই তদনুভাবে অনুপ্রাণিত। ইহার পর আবার শ্রীনরেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যের যতই প্রচারলাভ করিতে লাগিল—'মায়াবসানে' হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল নাটকেই তিনি সেই যুগধর্মোপযোগী সেবামাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন" (পৃঃ ১৩১)।

(খ) ; রঙ্গভূমি-সম্পর্কে গ্রন্থের হেমেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "রঙ্গভূমি এই বিশাল বিশ্বসংসারের প্রতিকৃতি মাত্র। জাতীয় রঙ্গালয় জাতীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বশস্থিত অঙ্কিত করে। .....আমাদের জাতীয় জীবনের মূলে ধর্ম, পরলোক, ঈশ্বর-নির্ভর প্রভৃতি, আর ইহাই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। যেখানে অতীন্দ্রিয় জগৎ, সেখানেই যেখানে মূক, গিরিশচন্দ্র সেখানে মুখর। এই জন্যই গিরিশচন্দ্রের সকল মুখ্যনাটকেই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, ঈশ্বর-বিশ্বাস, অতীন্দ্রিয়বোধ, ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং মুক্তির কথা।"—গিরিশ-প্রতিভা, পৃঃ ১৩২।

৩। বিনোদিনী দাসী পরবর্তীকালে কলিকাতা 'রামকৃষ্ণ বেঙ্গল মঠে'ও আসতেন এবং মঠের বাটবন্দিদের প্রায় প্রতিদিন দুপুরে খাদ্য বিবেকানন্দের ঘরের পেন্টিংয়ের নীচে বসে থাকতেন। বিনোদিনীর বাড়ী ছিল রামকৃষ্ণ বেঙ্গল মঠেরই উত্তর দিকে রাজাবাগান ষ্ট্রীটের উপর।

কথাবার্তা। ভক্ত বলিতেছেন—'গৌরাঙ্গ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই বিদ্যাধরীগণ আর মুণি-ঋষিগণ ছদ্মবেশে দর্শন করিতে আসিতেছেন —

'ধন্য ধন্য নদীয়ায় এলো গোরা
দেখ, দেখনা বিমানে বিদ্যাধরীগণে, আসিতেছে
হরি-দরশনে।
দেখ, প্রেমানন্দে হইয়া বিভোল,
মুনি ঋষি আসিছে সকল।'

"বিদ্যাধরীগণ আর মুণি-ঋষিরা গৌরাঙ্গকে ভগবানের অবতার-জ্ঞানে স্তব করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের দেখিয়া ভাবে বিভোর হইতেছেন। মাস্টারকে বলিতেছেন—'আহা কেমন দেখো'।"

তারপর বিদ্যাধরীগণের ও মুণি-ঋষিগনের গান ও স্তব—

"পুরুষগণ—কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
স্ত্রীগণ—মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী" —প্রভৃতি।

"তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। Concert (ঐক্যতানবাদ্য) হইতেছে। ঠাকুরের কোন হুঁস নাই।" আমরা পাঠক-পাঠিকাগণকেও এখানে ধ্যাননেত্রে শ্রীম-বর্ণিত চৈতন্যলীলা-অভিনয়ের এই অনবদ্য ভাবপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করার জন্য অনুরোধ জানাই। এই বর্ণনার দৃশ্য স্মৃতিসমুজ্জ্বল। শ্রীম ১৭৬ থেকে ১৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চৈতন্যলীলার বিচিত্র দৃশ্য বর্ণনা করেছেন।

প্রথমে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি এসেছেন। বালক নিমাই সদানন্দে সমবয়স্যদের সঙ্গে গান করছেন—

'কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই।
• • •
কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামারা রাই॥'

নবদ্বীপের গঙ্গাতীর। গঙ্গাস্নানের পর ব্রাহ্মণেরা মেয়ে-পুরুষ ঘাটে বসে পূজা করছেন। নিমাই তাঁদের নৈবেদ্য কেড়ে খাচ্ছেন। অপূর্ব সেই বিবরণ। মণি বা শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসে আছেন ও বলছেন—'আহা'। আবার 'আহা' বলতে বলতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরাম ও শ্রীমকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন—"দেখ, যদি আমার ভাব—কি সমাধি হয়, তোমরা গোলমাল কোরো না। ঐহিকেরা ভং মনে করবে।"

তারপর "নিমাইয়ের উপনয়ন। নিমাই সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন।.....নিমাই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছেন—

'দে গো ভিক্ষা দে।
আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে।'.....

তারপর সকলে চলিয়া গেলেন। নিমাই একাকী। দেবগণ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীবেশে নিমাইকে স্তব করছেন—

'পুরুষগণ – চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমো বামনরূপধারী।
স্ত্রীগণ – গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্জুকুঞ্জচারী।'
• • • •
নিমাই বলে উঠলেন—'জয় রাধে শ্রীরাধে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গান শোনার সময়ে বিরহকাতর নিমাইয়ের মুখে 'জয় রাধে শ্রীরাধে' শুনে সমাধিমগ্ন হলেন। সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের যবনিকা-পতন হ'ল।

তারপর "অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখে শ্রীবাসাদি কথা কহিতেছেন। মুকুন্দ মধুরকণ্ঠে গান গাহিতেছেন—

'আর ঘুমাইওনা মন।
মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন ॥
কে তুমি, কি হেতু এলে,
আপনারে ভুলে গেলে
চাহরে নয়ন মেলে, ত্যজ কুস্বপন ॥
রয়েছো অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দ হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের—তরুণ-তপন ॥'

মোহনিদ্রা থেকে জাগরণের গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীম-র (মণির) নিকট প্রশংসা করছেন। প্রশংসা করারই কথা। একে সুকণ্ঠ-পরিবেশিত গান, তারপর মোহনিদ্রা থেকে জাগরণের আহবান প্রতিটি মানুষের প্রাণে এনেছিল বিদ্যুৎঝলকের মতো শিহরণ! 'আর ঘুমাইওনা মন, মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন'। অচৈতন্যই অজ্ঞান বা মায়া। এই মায়ার আবরণকে বরণ ক'রে মানুষ সত্যকারের কে ও তার স্বরূপ কি, আর কেনই বা তার সংসারে আসা—এ'সকল ভুলে কুস্বপনের ঘোরে আত্মবিস্মৃত মানুষ অনিত্যের সেবায়ই দিবারাত্র অতিবাহিত করে, তাই অন্তরে নিত্যানন্দস্বরূপ আত্মার নিরাবরণ রূপকে সে আর দেখতে পায় না, আর পায় না বলেই তার বন্ধন ও সংসারপ্রবাহে পড়ে অনর্থক যাওয়া-আসা। এরই নাম ভ্রম। এরই নাম অজ্ঞান-অন্ধকার। অথচ চিরন্তন ও চিরপুরাতন চিরসমুজ্জ্বল আত্মা মানুষের অন্তরাকাশে চিরবিদ্যমান। কিন্তু মানুষের মোহনিদ্রার পারে চিরজাগরণরূপ অবিনশ্বর আত্মা বা পরমাত্মার স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা উচিত। এই মোহনিদ্রা থেকে জাগরণের গান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরেও তখন প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। এজন্য তাঁর মুখে প্রশংসার বাণী উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক!

তারপর নিমাইয়ের বাটীতে শ্রীবাসের আগমন। প্রথমে শচীমাতার সহিত দেখা হ'ল নিমাইয়ের। শচীমাতা বেদনাতুর, কেননা প্রিয়তম পুত্র বিশ্বরূপ[৩] সাংসারিক সকল কর্মেই উদাসীন। মুখে কেবলই 'কোথা শ্রীকৃষ্ণ'। শ্রীবাসকে দেখে শচীমাতা বলেন—

'আহা, দেখ দেখ পাগলের প্রায়,
আঁখিনীরে বুক ভেসে যায়,
বল বল এ 'ভাব কেমনে যাবে ?'

শোকাতুরা জননী শচীমাতার কথা শুনে শ্রীবাসও আকুলহৃদয়। শ্রীবাসকে নিকটে দেখে শ্রীবাসের পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে অশ্রুপূর্ণনেত্রে নিমাই[৩] বলেন—

'কই প্রভু কই, মন কৃষ্ণভক্তি হলো,
অধম জনম বৃথা কেটে গেল,
বল প্রভু, কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব,
দেহ পদধূলি—বনমালী যেন পাই।'

৩। নিমাইয়ের আর এক নাম বিশ্বরূপ।

শ্রীবাসের অবস্থাও নিমাইয়ের মতোই। কৃষ্ণপাগল তখন দু'জনেই! বাহ্যজ্ঞান প্রায় দু'জনেরই নাই। কিন্তু নিমাইয়ের মুখে ঐ এককথা—'কৃষ্ণ কই, কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব!' শচীমাতাও অবাক ও আত্মহারা। পুত্রশোক তখন ক্ষণিকের জন্য যেন মন থেকে অন্তর্হিত। নিমাইয়ের কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা-ভাব দেখে শচীমাতা নিস্পন্দ স্থির ও ধীর! শ্রীবাসও তাই!

সেই অপরূপ ও অপার্থিব দৃশ্য দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একেবারে আত্মহারা। শ্রীম-লিখেছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। গদগদ স্বর! গণ্ডদেশ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। একদৃষ্টে দেখিতেছেন—নিমাই শ্রীবাসের পা জড়াইয়া রহিয়াছেন। আর বলিতেছেন—'কই প্রভু, কৃষ্ণভক্তি তো হলো না।"

এরপর গঙ্গাদাসের আগমন। শ্রীম লিখেছেন: "গঙ্গাদাসের কাছে নিমাই পড়িয়াছিলেন।[৫] তিনি নিমাইয়ের বুঝাইতে আসিয়াছেন। শ্রীবাসকে (তিনি অর্থাৎ গঙ্গাদাস) বলিলেন: শ্রীবাস, ঠাকুর, আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপূজা ক'রে থাকি, আপনারা (দু'জনে) মিলে দেখছি সংসারটা ছারখার করলেন"।

গঙ্গাদাসের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিছুটা হাসিমুখে ও কিছুটা গম্ভীরভাবে শ্রীম-কে লক্ষ্য ক'রে বললেন: "এ' সংসারীর শিক্ষা এও করো, ওও করো। সংসারী যখন শিক্ষা দেয় তখন দু'দিক রাখতে বলে।" দু'দিক কিনা ঈশ্বরের দিক, আবার সংসারের দিক—'ত্যাগের দিক, আবার অনিত্য ভোগের দিক। এ'টি দু'নারে পা রেখে নদী পারের মতো। "মাষ্টার (শ্রীম) বলেন—আজ্ঞা হাঁ।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় অভিনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তখন দেখিতেছেন গঙ্গাদাস নিমাইকে বৈরাগ্যের পথে যেতে নিষেধ করছেন। গঙ্গাদাস নিমাইকে বলেন: "ওহে নিমাই, তোমার তো শাস্ত্রজ্ঞান[৫] হয়েছে? তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করো। সংসারধর্ম অপেক্ষা কোন্ ধর্ম প্রধান আমায় বোঝাও। তুমি গৃহী, (সুতরাং) গৃহীর মতো আচরণ না ক'রে অন্য আচরণ কেন কর?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গঙ্গাধরের মুখে অন্যায়-অযথা কথা শুনে চমকিত ও কিছুটা পুলোকিতও হলেন। তিনি শ্রীম-কে লক্ষ্য ক'রে বলেন: "দেখ্‌লে—দুই দিক রাখতে বলছে?" গঙ্গাদাস সুপণ্ডিত হলেও গৃহী, সংসারের ভোগাসক্তি তার কাটে নি। তাই ধর্মরূপ ঈশ্বরদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সংসারকর্মকেও ধর্ম বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু 'যাঁহা কাম, তাঁহা নাহি রাম।' যেখানে সংসারের আসক্তিরূপ বন্ধন, সেখানে ঈশ্বরদর্শন বা আত্মদর্শন অসম্ভব। কিন্তু একথা বোঝে কে? সংসারী মানুষের মনের ভাব ও মুখের কথাও তাই। ভোগমুখী মানুষ আসক্তি ও নিরাসক্তি—সংসার ও ঈশ্বরদর্শন দু'টিই রাখতে চায়, অর্থাৎ দুটির সাধনাই একসঙ্গে করতে চায়। এর কারণ আর কিছু নয়—সংসারের প্রতি সংসারীর একান্ত মমতা ও মায়া। মায়া বিবেকবুদ্ধি নষ্ট করে। এ' রহস্য প্রজ্ঞাচক্ষুষ্মান শ্রীরামকৃষ্ণদেব মনে মনে অনুভব করলেন। নিমাইয়ের প্রতি গঙ্গাদাসের অসঙ্গত ও বিচারবিহীন উপদেশের কথা শুনে তিনি ব্যথিত ও বিচলিত হলেন। তিনি নিকটে উপবিষ্ট শ্রীম-কে লক্ষ্য করে তাই বলেন: "দেখ্‌লে, দুই দিক রাখতে বলছে?" দুই দিক কিনা সংসারের দিক, আবার ঈশ্বরের দিক।

৫। নিমাই গঙ্গাদাসের টোলে ন্যায়শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে সমর নবদ্বীপে 'পণ্ডিত' বলে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন।

এদিকে লীলাভিনয়েও শ্রীরামকৃষ্ণদেব কৃষ্ণপাগল নিমাইয়ের মুখে শুনলেন : "আমি ইচ্ছা ক'রে সংসারধর্ম উপেক্ষা করি নাই। আমার বরং ইচ্ছা যাতে সব বজায় থাকে। কিন্তু —

'প্রভু, কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি
প্রাণ টানে কি করি কি করি,
ভাবি কুলে রই, কুলে আর রহিতে না পারি,
প্রাণ ধায় বুকালে না ফেরে,
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে :'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুনে বলেন—"আহা !"

নিমাইয়ের বেদনাতুর কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরকে স্পর্শ করেছে। নিমাই বলছেন—কারণ কি জানি না, কিন্তু প্রাণের আকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের দিকে। সংসারের চিন্তা সেখানে অবলুপ্ত, কেননা মাতা-পিতা-ভাই-বন্ধু দিয়ে ঘেরা সংসারের আকর্ষণ এক একবার মনকে আচ্ছন্ন করে কর্তব্য-বুদ্ধির প্রলেপ দিয়ে, আবার পরক্ষণেই সেই বৈরাগ্যের কথা অন্তরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে প্রেম-সৌন্দর্যময় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-আকুল করা মূর্তি—'প্রাণ টানে কি করি কি করি'। দোলায়মান হলেও চিত্ত বা মন কিন্তু কৃষ্ণ-অনুরাগে আকুল। ভাবেন—কৃষ্ণছাড়া তাঁর হৃদয়ের ধন আর কিছু নেই। 'তাই ভাবি কুলে রই, (কিন্তু) কুলে আর রহিতে না পারি'। সংসারের আসক্তি ও বন্ধন তখন কৃষ্ণ-অনুরাগের বাতাসে লাঞ্ছিত ও অবহেলিত, সুতরাং 'প্রাণ ধায়' আনন্দ-বৃন্দাবনবিহারী—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। 'তাই বুকালে না ফেরে, সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে'। কূলহীন অসীম অনন্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসাগরে ঝাঁপ দেবার জন্য নিমাইয়ের মন প্রাণ সর্বদাই আকুল, সুতরাং কোন বাধাই সে আর মানে না। ক্ষণিক সাংসারিক আনন্দ তুচ্ছ সেই নিত্য শাশ্বত ও অফুরন্ত কৃষ্ণপ্রেমানন্দসাগরের কাছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মরমী, তাই নিমাইয়ের মরমের কথা তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করেছে। তিনি বিচলিত অথচ শান্ত-সমাহিত। তাই বিশ্বদরদীর সীমাহীন অনন্ত মন ও অনুভূতি নিয়ে তিনি বলেন—'আহা।'

উদ্দীপনাময় চৈতন্যলীলা-অভিনয় চলেছে। নবদ্বীপে প্রাণসখা নিত্যানন্দ এসেছেন। তিনি নিমাইকে অনুসন্ধান করছেন। এমন সময়ে নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল, নিমাই ও নিত্যানন্দের আনন্দমিলন হ'ল। তখন নিমাই বলছেন—

'সার্থক জীবন।
সত্য মন ফলেছে স্বপন,
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ক্রমশই নিবিড় ভাবে ভাবিত হয়ে পড়ছেন। তিনি গদগদ-স্বরে শ্রীম বা মাস্টারকে বলেন : "নিমাই বলছে স্বপ্নে দেখেছি"। জাগ্রতেও স্বপ্নের আবেশ আসা স্বাভাবিক। ভাবজগতের সম্মুখে পার্থিব সংসারের সকল খেলাই স্বপ্নবৎ।[৬] দৃষ্টি তখন অন্তরস্পর্শী। বাহ্যজগৎ বিলীনপ্রায়। শ্রীবাস সকল সময়েই নিমাইয়ের সেই সব আনন্দময় লীলা বা খেলা ভাবাবিদগ্ধ মন নিয়ে প্রত্যক্ষ করছেন। নিমাইয়ের ভাব ও অবস্থা দেখে "শ্রীবাস ষড়ভুজ দর্শন করিতেছেন, আর স্তব করিতেছেন : গৌরাঙ্গের (নিমাইয়ের) ঈশ্বর-আবেশ হইয়াছে।

৬। মাণ্ডুক্য-উপনিষদে এর বিচার আছে। আচার্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যকারিকায় ও আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা নিয়ে অনুভূতিপূর্ণ বিচার করেছেন।

তিনি অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা কহিতেছেন। গৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতাই গান গাহিতেছেন —

'কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণসই !
দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে,
রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ-বই ?'

অচিন্ত্য সেই কৃষ্ণলীলা ! আবার অপরূপ মহিমাময়ী মর্ত্যে সেই গৌরাঙ্গলীলা ! ধূলিময় পৃথিবী যেন তখন স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে ! হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণ-বই বিশ্বসংসারে কিছুই জানেন না, শ্রীগৌরাঙ্গ বা নিমাইও তেমনি, তাই তিনি ভাবঘোরে কেঁদে বলেন— "দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ-বই ?"

শ্রীম এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (২য় ভাগ, পৃঃ ১৮১) লিখেছেন : "শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ ঐ ভাবে রহিলেন। কনসার্ট চলিতে লাগিল। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল"। ইতিমধ্যে খড়দার নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশের "একটি বাবু আসিয়াছেন ও ঠাকুরের চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে দেখে আনন্দে মাতোয়ারা। তাঁর হাত ধরে কত কথা বলছেন। মাঝে মাঝে বলছেন : 'এখানে বসো না, তুমি এখানে থাকলে খুব উদ্দীপন হয়'। "নিমাইয়ের প্রাণসখা নিত্যানন্দের বংশের লোক, সেজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এত আনন্দ ও উদ্দীপন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীম-কে বলছেন : এর লক্ষণ ভাল, একটু নেড়েচেড়ে দিলে চৈতন্য হয়। ওকে দেখতে দেখতে বড় উদ্দীপন হয়। আর একটু হলে আমি দাঁড়িয়ে পড়তুম।"

এতক্ষণ অভিনয়মঞ্চে ঐ সকল ঘটনা। "বর্বনিকা উঠিয়া গেল। রাজপথে নিত্যানন্দ মাথায় হাত দিয়া রক্তস্রোত বন্ধ করিতেছেন। মাধাই কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন, নিতাইয়ের ভ্রূক্ষেপ নাই। গৌরপ্রেমে পরপর মাতোয়ারা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট ! দেখিতেছেন — নিতাই জগাই-মাধাইকে কোল দিবেন।" নিতাই প্রেমভরে জগাই-মাধাইকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন —

'প্রাণ ভরে আয় হরি বলি,
নেবে আয় জগাই মাধাই।
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই।'[১]

গৌরাঙ্গপ্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। অভিনয় সমাপ্ত। ঠাকুরের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ী আনা হ'ল। তিনি তাতে উঠে উপবেশন করলেন। "গাড়ী মহেন্দ্র মুখুয্যের কলে যাইতেছে। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা-আপনি বলিতেছেন : "হা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, জ্ঞান-কৃষ্ণ, প্রাণ-কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, আত্মা-কৃষ্ণ, দেহ-কৃষ্ণ।" আবার বলিতেছেন : "প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন !"

কিছুই আর বাকী থাকলো না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সকলকেই শ্রীকৃষ্ণ বলে দর্শন করছেন। অনন্ত ভাবময় তিনি। অফুরন্ত প্রেমময় তিনি। ভাবের রাজ্যে ও প্রেমের রাজত্বে কোন কিছুই কৃষ্ণ-ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে সাধক অর্জুন যেমন বিশ্বপ্রপঞ্চের সকল-কিছুতেই পরমাত্মা ভগবানকে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও

১। কোন কোন স্থানে আছে : "মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেবনা ?" প্রেমরাজ্যের কথাই আলাদা। সেখানে দেশ-হিংসা ও আপন-পর ভাব নাই।

তাই। সর্বভূতে ও নিজের মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে দর্শন করছিলেন। অপরূপ ও অনবদ্য-আনন্দময় সেই লীলা। সেই লীলা আর এক যুগের। তিনিই প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর সেই অপার্থিব লীলা। লীলার জগতে সকল-কিছু ঘটনা ও সকল খেলা তাই অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য। গিরিশচন্দ্র-রচিত 'চৈতন্যলীলা' দর্শন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর চৈতন্যসাগরে নিমজ্জিত। প্রেমের অভিনয় দর্শন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং প্রেমের জীবন্ত মূর্তি-রূপে বিরাজিত। এখানে তাই স্বীকৃত 'স্বগতঃ' শ্রীম-র চিন্তাটি স্মরণীয় ও বরণীয়। শ্রীম লিখেছেন : "(স্বগতঃ)—ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্য ভাবিতেছেন। চৈতন্যদেবের ন্যায় ইনিও (শ্রীরামকৃষ্ণও) কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারণ করিয়াছেন?" প্রকৃত কথাই তাই যে, নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ-অনুভূতি দিয়ে প্রেম-ভক্তির আদর্শকে বরণ ও প্রস্ফুটিত না করলে কি অপরকে বা বিশ্বজনকে প্রেম-ভক্তির অপরূপ আদর্শ শিক্ষা দেওয়া যায়? পূর্বেই বলেছি যে, 'চৈতন্যলীলা'-অভিনয় দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন নকলে আসলের উদ্দীপনা হয়, যেমন সোনার আতা দেখলে সত্যকার আতাকে মনে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ষ্টার-থিয়েটারে নকল চৈতন্যলীলা দর্শন ক'রে সত্যকার শ্রীচৈতন্য-অবতারের ভাবে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন!*

●

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : দয়ানন্দ সরস্বতী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(দুই)

[সিঁথির উদ্যানে মিলনের বৃত্তান্ত]

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী একবার কলকাতার উপকণ্ঠে সিঁথি অঞ্চলে অবস্থিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নৈনানের প্রমোদ উদ্যানে প্রায় চারমাসকাল (ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ—মার্চ, ১৮৭৩ খৃঃ) অবস্থান করেন। সেই সময়ে একদিন পরমহংসদেব নেপালরাজের প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে ঐ উদ্যানে পণ্ডিত দয়ানন্দকে দর্শন ক'রতে যান।

ইনি সে-সময় একজন সুপণ্ডিতরূপে সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করলেও আর্যধর্ম প্রচারকল্পে কোন সঙ্ঘ (আর্য সমাজ) গঠন করেন নি। যা হোক, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেদিন ঐ উদ্যানে এঁর নিকট উপস্থিত হন, সেদিন সেখানে ব্রাহ্মনেতা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের আসার কথা ছিল। এ-জন্য তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ঐদিন দয়ানন্দজী বিশেষ ব্যাকুলিত ছিলেন।

এ-বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি,—"[দয়ানন্দ] কেশব সেন, কেশব সেন, ক'রে ঘর-বাহির ক'রছে,—কখন আসবে। সে-দিন বুঝি কেশবের যাবার কথা ছিল।"—কথামৃত-২য় ১০।৬।৭৯ [কমলকুটীর, ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ]

'মহাত্মা কেশবচন্দ্র দেব-দেবী এবং যাগ-যজ্ঞাদি মানতেন না, কিন্তু দয়ানন্দ বৈদিক দেবতা এবং যজ্ঞাদিতে বিশ্বাস ক'রতেন। যা হোক, ঐদিন কথা প্রসঙ্গে ইনি উপস্থিত ব্যক্তিদের

*আগামী সংখ্যায় ভক্তপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-লিখিত 'ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র'-গ্রন্থে উল্লিখিত ষ্টার-থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চৈতন্যলীলা দর্শন-বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

ব'লেছিলেন,—"ঈশ্বর এত জিনিস ক'রেছেন, আর দেবতা ক'রতে পারেন না ?"—(কথামৃত-২য়।১১।৩।১৫১)। এ'র এই কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আহ্লাদিত হন।

প্রসঙ্গতঃ পূর্বেই বলেছি যে, স্বামী দয়ানন্দ ঈশ্বরের অবতারলীলায় বিশ্বাস ক'রতেন না। যা হোক, সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গী ভক্তবর বিশ্বনাথ উপাধ্যায় নিজ সংস্কার ও অন্তরের ভক্তি-প্রেরণাবশে, আপন মনে সেখানে মৃদু কণ্ঠে 'রাম' নাম ক'রছিলেন। তা শুনে, ইনি উপহাস ক'রে তাঁকে বলেন,—'তার চেয়ে [বরং] 'সন্দেশ' 'সন্দেশ' বল।"—কথামৃত-২য়।১১।৩।১৫৯

সেদিন স্বামী দয়ানন্দ সংস্কৃতে অনর্গল শাস্ত্রালোচনা ক'রছিলেন এবং ব্যাকরণের নানা সূত্র সহায়ে এক একটি শব্দ বা শ্লোকের ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা ক'রে শুনাচ্ছিলেন এবং কথা প্রসঙ্গে বাংলা ভাষাকে 'গৌড়া-ড ভাষা' নামে অভিহিত করেন।

সেদিনের এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার লিখেছেন,—"দয়ানন্দের কথা-প্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, সিঁতির বাগানে দেখতে গিয়েছিলাম ; দেখলাম—একটু শাঁস হয়েছে ; বুকটা সর্বদা লাল হ'য়ে রয়েছে ; বৈষয়ী অবস্থা—দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই কথা (শাস্ত্রকথা) ক'চ্চে ; ব্যাকরণ লাগিয়ে অনেক কথার (শাস্ত্রবাক্যের) মানে সব উল্টোপাল্টা ক'রতে লাগলো ; 'নিজে একটা কিছু ক'রবো', 'একটা মত চালাবো'—এ অহঙ্কার ভেতরে রয়েছে।"—লীলাপ্রসঙ্গ-পূর্ব ১০৫-১০৬।

যা হোক, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি সরল, সরস ও তত্ত্বপূর্ণ কথাবার্তা শুনে এবং তাঁর মধ্যে প্রকাশিত অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ দর্শনে সাধক ও সুপণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ বিশেষ মুগ্ধ হন এবং সর্বসমক্ষে তাঁর উচ্চ প্রশংসাও করেন।

"আমরা এত এত বেদ-বেদান্ত পড়িলাম, কিন্তু এই মহাপুরুষের চরিত্রে সকল শাস্ত্র-বাক্যের সার্থকতা দেখিতেছি। আমাদের ন্যায় পণ্ডিতেরা শাস্ত্র মন্থন করিয়া কেবলমাত্র ঘোলটাই খাইয়া থাকে। বাস্তবিক ইঁহার ন্যায় মহাপুরুষেরাই মাখনটুকু গ্রহণ করিতে পারেন।"*

"স্বামী দয়ানন্দ তাঁহার শ্রীমুখের অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতিসকল এবং ভাবাবেশে প্রেমানন্দ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমরা কেবল শাস্ত্রের বাক্যাড়ম্বর লইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু এই মহাপুরুষ শাস্ত্রের সারভাগ উপভোগ করিয়াছেন।"†

[কথামৃতে কথোপকথন]

উক্ত উদ্যানে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী সহ ঐ মিলন সম্বন্ধে সিঁথির জনৈক বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের এক দিবসের কথোপকথন কথামৃতে (২য়।১১।৩।১৫৯) লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়।

দক্ষিণেশ্বর। ১৮৮৪ খৃঃ ১১ই অক্টোবর, শনিবার অপরাহ্ণ।

"সিঁথির একটি ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ইনি কাশীতে বেদান্ত পড়িয়াছিলেন, স্থূলকায়, সদা হাস্য মুখ।

"পণ্ডিত আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহিত কথা হইতেছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—কাশীতে অনেকদিন ছিলে, কি সব দেখলে, কিছু বল। দয়ানন্দের কথা একটু বল।

---

* শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত—"শ্রীরামকৃষ্ণ", পৃঃ ৩১৩

† শ্রীদিনেশকুমার রায়কৃত—'শ্রীরামকৃষ্ণ দেব', পৃঃ ৩৯১

"পণ্ডিত—দয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনিত দেখেছিলেন ?

"রামকৃষ্ণ—দেখতে গিছলুম, তখন ওধারে একটি বাগানে সে ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল সেদিন। তা যেন চাতকের মতন কেশবের জন্য ব্যস্ত হ'তে লাগল। খুব পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষাকে ব'লতো, গৌড়াঙ ভাষা। দেবতা মানতো—কেশব মানতো না। তা ব'লতো, 'ঈশ্বর এত জিনিস ক'রেছেন, আর দেবতা ক'রতে পারেন না।' নিরাকারবাদী। কাপ্তেন 'রাম' 'রাম' কচ্ছিল। তা ব'ললে, তার চেয়ে 'সন্দেশ' 'সন্দেশ' বল।

"পণ্ডিত—কাশীতে দয়ানন্দের সঙ্গে পণ্ডিতদের খুব বিচার হ'ল। শেষে সকলে একদিকে, আর ও একদিকে। তারপর এমন ক'রে তুললে যে, পালাতে পথে বাঁচে। সকলে এক সঙ্গে উচ্চৈস্বরে ব'লতে লাগলো—'দয়ানন্দেন যদুক্তং তদ্বেদম্'।" [অর্থাৎ দয়ানন্দ যা বললেন, তা অসার]

উপসংহার

যাহোক, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যে, ঐকালে রজোগুণী, অহংকারী এবং উগ্রভাবাপন্ন ছিলেন, তার উল্লেখ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের বিবৃতিতেও পাওয়া যায়—

"We met not long ago Paramahansa of Dakshineswar and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never-ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being too gentle, tender contemplative, and the latter is sturdy, masculine and polemical."—Indian Mirror, 28th March, 1875.

বঙ্গানুবাদ—অল্পদিন হ'ল আমরা দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছিলাম। তাঁর প্রকৃতির গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি ও সারল্য দর্শনে আমরা বিমোহিত হ'য়েছি। অবিশ্রান্ত তত্ত্বকথা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ যে-সকল রূপক ও উপমাবলী প্রয়োগ করেন, সেগুলি প্রায় সমস্তই তাৎপর্যপূর্ণ এবং মনোহর। তাঁর মনের ভাবসমূহ পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখের ভাবধারার একান্তই বিপরীত। প্রথমোক্ত জন [পরমহংস] বিনীত স্বভাব, কোমল প্রকৃতি এবং ধ্যাননিষ্ঠ। কিন্তু শেষোক্ত জন [দয়ানন্দ] কঠোর স্বভাব, পৌরুষযুক্ত এবং তর্কপরায়ণ। —ইণ্ডিয়ান মিরর, ২৮শে মার্চ, ১৮৭৫ খৃঃ।

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য ও রসের সার্থকতা ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(দুই)

কি কাব্য, কি সাহিত্য, নাটক ও সঙ্গীত—রস ও রসাভিব্যক্তি ছাড়া তাদের রূপ, গুণ, ব্যবহার কোনটিরই সার্থকতা সিদ্ধ হয় না। এখন রস কি ও রস থেকে ভাব ও তার অভিব্যক্তি কেমন ক'রে হয় সে বিষয়ে রসবাদী আলঙ্কারিকরা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া সঙ্গীতে রসের উপযোগিতা ও ভাবের সার্থকতা সম্বন্ধে। কবি ও শিল্পী রসের সৃষ্টি কেমন ক'রে করেন ও তার পরিবেশনকে সর্বসাধারণের মধ্যে কীভাবে সার্থক ক'রে তোলেন সে' সম্বন্ধে আচার্য ভরত ও তাঁর ভাষ্যকাররা ছাড়াও পরবর্তী অলঙ্কারশাস্ত্রীরা বিচিত্রভাবে তাঁদের গ্রন্থে যুক্তি দিয়ে ও সঙ্গতির দিক থেকে সুষ্ঠু-আলোচনা করেছেন। আমরা ডক্টর দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য-লিখিত 'কাব্যতত্ত্বালোক'-গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে এ' সম্বন্ধে বলি যে, 'কবি কেমন ক'রে রস পরিবেশন করেন ও রসিক সেই রসকে কেমন ক'রে উপভোগ করেন—আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থে এবং আনন্দবর্ধনের টীকাকার অভিনবগুপ্ত 'লোচন'-গ্রন্থে বা টীকায় তা পরিস্ফুটভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক বুলার ও জেকবি'র (Büler and Jacobi) মতে, ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালের আলঙ্কারিক। 'রাজতরঙ্গিণী'-কার কহ্লনের মতে আনন্দবর্ধন রাজা অবন্তীবর্মার সভাকবি ছিলেন'।

আনন্দবর্ধন যুক্তি ও শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে সকল কিছুর বিচার করেছেন—যদিও ধ্বনিবিরোধী মহিমভট্ট প্রভৃতি আলঙ্কারিকরা কোন কোন ক্ষেত্রে আনন্দবর্ধনের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে পারেন নি। আনন্দবর্ধন অবশ্য কাব্যবিষয়েই বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন শব্দ ও অর্থের হরগৌরীর সম্মিলনের সার্থকতাকে নিয়ে। ভাষ্যকার অভিনবগুপ্ত নাট্য-শাস্ত্রকার ভরতকে অনুসরণ ক'রে নাটক, নৃত্য ও সঙ্গীতে রসের উপযোগিতার ও রসনিষ্পত্তির সার্থকতা-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তবে একথা ঠিক যে, কি কাব্যে, কি নাটকে ও কি সঙ্গীতে এই সকল বিষয়ের রসবিচারে মানুষকে যথার্থরসের আস্বাদ দিতে পারে না, কেননা রস ও ভাব সম্পূর্ণ অনুভূতির বস্তু। এ' সম্বন্ধে আমরা বিদগ্ধ রস-ভাব-বিচারী স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের 'কাব্যজিজ্ঞাসা'-গ্রন্থে তাঁর মন্তব্যের কথা বলি : "কাব্যের রসবিচারে মানুষকে কাব্যরসের আস্বাদ দেয় না। সে' আস্বাদ দরদী লোকের মন দিয়ে অনুভূতির জিনিস। আলঙ্কারিকদের ভাষায় সে' রস হচ্ছে 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী'। তত্ত্বের পথে আর একটু এগিয়ে গিয়ে আলঙ্কারিকরা বলেন, কাব্যরসাস্বাদী সহৃদয়-লোকের মনের বাহিরে রসের আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ ঐ আস্বাদই হচ্ছে রস। যখন বলা হয় 'রসের আস্বাদ', তখন রস ও স্বাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক ভেদ অঙ্গীকার ক'রে কথা ঐ বলা হয়। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন : 'রসস্য স্বাদ্যতে ইতি কাল্পনিকং ভেদমুররীকৃত্য কর্মকর্তরি বা প্রয়োগঃ',—যেমন আমরা বলি 'ভাত পাক হচ্ছে' ('ওদনং পচতীতিব্যবহারঃ প্রতীয়মান এব হি রসঃ'—অভিনবগুপ্ত)—যদিও পাকের যা ফল তাই ভাত। তেমনি যদিও কথায় বলি 'রসের প্রতীতি বা অনুভূতি', কিন্তু ঐ প্রতীতি বা অনুভূতিই হচ্ছে রস। সহৃদয়-লোকের, অর্থাৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যাদের দর্পণের মতো নির্মল মন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যেন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় ('যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্-বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্মীভবনযোগ্যতা হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ'—অভিনবগুপ্ত)—

এমন দক্ষদী লোকেদের সুকাব্যজনিত চিত্তের অনুভূতিবিশেষের নামই 'রস'। সুতরাং বলা যেতে পারে, কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়—সহৃদয়-কাব্যপাঠকের মন" (পৃঃ ২৪-২৫)। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ঐ এককথা। রসিক ও সহৃদয়-লোক ছাড়া অন্য কের সঙ্গীতরস অনুভব করতে পারেন না।

আবার আনন্দবর্ধনের কাব্যচিন্তা ও রসবিচারক্ষের অনুসরণ ক'রে বলি যে, রস হ'ল শব্দার্থময় কাব্যশরীরের আত্মা বা ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়। সহৃদয়-কাব্যরসিক স্বীকার করেন যে, কাব্যের শব্দ ও অর্থ রসিকের রসবোধকে জাগিয়ে তোলে এবং কাব্যে শব্দ থেকেই রসানুভূতির দিকে সহৃদয়কে অগ্রসর হ'তে হয়। মোটকথা বস্তুর সঙ্গে রসের ইতরেতর একটি সম্বন্ধ থাকে। কবির নৈপুণ্য, প্রতিভা ও সহৃদয়তার গুণে বস্তুও রসরূপে অভিব্যক্ত হ'তে পারে। পূর্বেই বলেছি যে, আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদী, তাই তিনি অভিনব রসের বৈশিষ্ট্য বা বিশেষতাকে ধ্বনিসিদ্ধান্তের দিক থেকেই পরিস্ফুট করেছেন। কিন্তু অভিনবগুপ্তের সিদ্ধান্তকেই রসের বা রসনিষ্পত্তির দিক থেকে সার্থক বলা যায়। আচার্য ভরত বলেছেন, অনুভাব, বিভাব ও ব্যাভিচারিভাব ছাড়া রসনিষ্পত্তি হয় না। অভিনবগুপ্ত রসকে বলেছেন অলৌকিক, আর আনন্দবর্ধন ধ্বনিকে বলেছেন লৌকিক, ফলে উভয়ের মধ্যে কিছুটা মতভেদ সৃষ্টি হলেও নৈর্ব্যক্তিকতার দিক থেকে উভয়ের মতবাদের ও সিদ্ধান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য ও মিল পাওয়া যায়।

এই আলোচনার প্রথমেই আমরা বলেছি যে,কবি কেমন ক'রে রসপরিবেশন করেন ও রসিক কিভাবে সেই রসকে উপভোগ করেন - এটা জিজ্ঞাসার বিষয়। শিল্পীর ক্ষেত্রেও ঠিক ঐ এককথা বলা চলে। তাহলেও ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধনের কথাইবলি এখানে। আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে বলেছেন মানুষের প্রাত্যহিক বা নিত্যদিনের জীবনে রসের প্রয়োজনীয়তা দেখা না গেলেও সহৃদয়ের রসাস্বাদে সাধারণীকরণ থাকায় বিষয় ও বিষয়ীর সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিরই প্রাধান্য থাকে। প্রতিদিনের বাস্তব প্রয়োজনে রসকে কাজে লাগানো না গেলেও রসই কিন্তু মানুষের লৌকিক জীবনকে লৌকিক ক'রে তোলে। রসপ্রতীতির ফলে মানুষের লৌকিকত্ব থেকে অলৌকিকত্বে উত্তরণও কম প্রয়োজনীয় নয়। রস ও রসদৃষ্টির সঙ্গে মানুষের প্রতিদিনের বা নিত্যকার জীবনে তার সামাজিক সত্তার কোন বিরোধ নেই কেননা প্রকৃতপক্ষে রস সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী। রসের মানসিক উপকরণ বা উপাদান মানুষেরই মনের ভাব বা চিত্তবৃত্তি। অনেকে একে চিত্তবিকার বলেন, কিন্তু আসলে চিত্তমধ্যে ভাবের ভিন্ন রূপায়ণই প্রকারান্তরে চিত্তবিকার নামে পরিচিত। কবি বা শিল্পী যখন তাঁর মনের ভাব বা চিত্তবৃত্তিগুলিকে কাব্যের মধ্যে আবদ্ধ করেন তখনই হয় রসের সৃষ্টি। এ' সকল দিক থেকে আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধনের প্রতীতি যে, কাব্য ও শিল্প প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ করতে চায় রস ও ভাবকে। শিল্পের ভাব যেমন শৈল্পিক, ভাবাভিব্যক্তির উপায় বা প্রণালীও তেমনি শৈল্পিক ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি। কাব্য ও কাব্যের প্রকাশ যেমন অবিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ কাব্যের রসকে যেমন কাব্য ছাড়া আর কোন বস্তু দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, শিল্পের বেলায়ও তেমনি, অর্থাৎ শিল্প দিয়েই শিল্পের রসকে প্রকাশ করা সম্ভব, অন্য কিছু দিয়ে তা সার্থক হয় না। সেজন্য কাব্যের বেলায় কাব্যকে অনেক সময়ে ধ্বনিকাব্যও বলে। আনন্দবর্ধনের মতো শৈবাগম-দার্শনিকরা অভিব্যক্তি বা প্রকাশ অর্থে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি স্বীকার করেন। তবে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি একেবারে নূতন-কিছু প্রকাশ করে না, যা পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু তার প্রকাশ ছিল না, তাকেই প্রকাশ করে। তাই দেখা যায়, আনন্দবর্ধন ও

অভিনবগুপ্ত উভয়ের রসসিদ্ধান্তে অভিব্যক্তি ও প্রকাশন—এ' দুটি শব্দের বেশ প্রয়োগ আছে। কিন্তু উভয়ের মূলেই আছে ব্যঞ্জনাকর্ম বা ব্যঞ্জনাব্যাপার।[১]

আচার্য অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের 'লোচন'-ব্যাখ্যায় লাবণ্যের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন যে, অবয়বসংস্থানের দ্বারা অভিব্যক্ত্য অবয়ব থেকেই ভিন্ন ধর্ম 'লাবণ্য' সৃষ্টি হয়। নারীর লাবণ্য ও কাব্যের ব্যঙ্গ্যার্থের সমতা বা সাধর্ম্য এই যে, উভয়ের মধ্যেই চমৎকারকারিতা থাকে। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'-গ্রন্থে বলেছেন : 'স্বাদ ফিরে যায় যার দ্বারা এবং স্বাদু ক'রে তোলে যে-বস্তু সে-বস্তুকে বা রচনাকে বলা হয় লাবণ্য'। তাই লাবণ্যের ইংরাজী প্রতিশব্দ grace বা beauty নয়, লাবণ্য স্বাদে (আস্বাদে) পৌঁছে দেয়। সেজন্য তাকে taste বলা যায়। লাবণ্য চমৎকার-সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে ভাবভঙ্গীতে অর্থে পরিমাণে ও রূপের বিভিন্ন অংশে, তাই তাকে unity-ও বলা চলে। এভাবে quality, balance প্রভৃতি শব্দে লাবণ্যের ভাবই অনেকটা প্রকাশ করে।[২]

রসবিচার-সম্বন্ধে ভারতীয় মনীষীরাও বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যে এসথেটিক বা সৌন্দর্যবিচারের কথা আছে। মুনি ভরত নাট্যের প্রয়োজনে রস ও ভাবের আলোচনা করেছেন নাট্যশাস্ত্রে। ভরত নিজেই প্রশ্ন করেছেন : "রস ইতি কঃ পদার্থঃ ? অত্রোচ্যতে। আস্বাদ্যত্বাৎ" আস্বাদনেই রসের সত্তা ও উপযোগিতা বোঝা যায়। কিন্তু কিভাবে রসকে আস্বাদন করা যায় ? ভরত বলেছেন : "যথা হি নানা-ব্যঞ্জন-সংস্কৃতমন্নং···," অর্থাৎ বিচিত্র ব্যঞ্জনের সাহায্যে যেমন অন্ন ভোজন করলে তৃপ্তিকর আস্বাদনের-সংবেদন জ্ঞান বা মানুষ লাভ করে, তেমনি ভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব প্রভৃতির সাহায্যে রসবস্তুর সত্তা ও সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। তাই ভরত ও অভিনবগুপ্ত দু'জনেই নাট্যের প্রয়োজনে রসের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন—'নাট্যোরসাঃ' অর্থাৎ নাট্যই রস। মোটকথা নাট্যাভিনয় ও সহৃদয়-প্রেক্ষকের অনুভূতি থেকে নাট্যরসের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়।

অবশ্য অভিনবগুপ্ত কাব্যে ও শিল্পে রসের সার্থকতাও স্বীকার করেছেন। আনন্দবর্ধন ভরতের রসতত্ত্বই অনুসরণ করেছেন। ভরতের মতে, স্থায়িভাব—ভাব্য, আর বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব—ভাবক। নাটকের তিনটি মূলতত্ত্ব—বস্তু, নেতা ও রস। বস্তু ও নেতা রসের উপকারক। ভাব ও রস অন্যান্যাশ্রিত, ভাব থেকে রসের অভিব্যক্তি, আবার অনেক সময়ে রস থেকে ভাবের অভিব্যক্তি।[৩]

নাটকের মাধ্যমে অভিনয়ের (নাট্যের) ভাবধারা শ্রোতাদের মনে ছড়িয়ে দেওয়া বা সংক্রামিত করা হয়, সুতরাং ভাব মাধ্যম, কারণ বা বস্তুবিশেষ, আর সে জন্য 'ভাবিত', 'বাসিত' বা 'কৃত' প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে কোন ভেদ নাই, তারা পরিভাষায় পৃথক হ'লেও একই অর্থের প্রকাশক। সুতরাং 'ভাব্য' অর্থে বিস্তৃত, বিকশিত বা সংক্রামিত করা বোঝায়। রস থেকে উদ্ভূত ভাবের অর্থই তাই। ভরতও বলেছেন : "অপি চ ব্যাপ্ত্যর্থম্" কিংবা—

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তো যোঽর্থস্তথানুভাবেন গম্যতে।
বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়ৈঃ ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥

১। দ্রষ্টব্য দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : 'কাব্যালোক' (১৯৭২), পৃঃ ৪২৮-২৯

২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : 'রবীন্দ্রসাহিত্যে বঙ্কচেতনা'-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩। দ্রঃ ভট্টাচার্য : 'কাব্যালোক', পৃঃ ৫-৩

'বিভাব' অর্থে ভরত বলেছেন বিজ্ঞান বা বিশেষজ্ঞান : "বিভাবো বিজ্ঞানার্থম্"। বিভাব, কারণ, নিমিত্ত ও হেতু সমপর্যায়ভুক্ত শব্দ। অনুভাব বিষয়বস্তুকে বোঝার বা গ্রহণ করার বিষয়ে সাহায্য করে। স্থায়ি, ব্যভিচারি ও সাত্ত্বিক ভাব-সম্বন্ধে ভরত বলেছেন স্থায়িভাব আটটি, ব্যভিচারিভাব তেত্রিশটি ও সাত্ত্বিকভাব আটটি। কাব্যরসকে অনুভব করার জন্য এই উনপঞ্চাশটি ভাবের প্রয়োজন হয় : "এবমেতে কাব্যরসাভিব্যক্তিহেতব একোনপঞ্চাশৎ ভাবাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ।" ভরত উল্লেখ করেছেন অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠের সমস্ত অংশকে গ্রাস ক'রে (ব্যেপে) প্রজ্জ্বলিত করে, তেমনি রস থেকে উদ্ভূত ভাব মানুষ কেন—সমস্ত জীবজন্তুর অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করে।[৪] লবণ বা চিনির উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে, কেননা লবণকে বা চিনিকে জলে ফেলে দিলে তা জলের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যায়। রস থেকে উদ্ভূত ভাবও ঠিক তাই।

বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনায় রসের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রসানুযায়ী ভাবের কথা কিছু বলেননি। আমরা অবশ্য 'রসা নব' শব্দ দুটির সম্পর্কে ভাব, বিভাব, অনুভাবাদি সম্বন্ধে আচার্য ভরতের মতেরই পুনরাবৃত্তি করলাম এ'জন্য যে বিষ্ণুশর্মা রসের অপরিচ্ছেদ্য পরিণতি ভাবের কথা উল্লেখ না করলেও সঙ্গীতে ভাব ও তার বিচিত্র বিকাশের উপযোগিতা নিশ্চয়ই স্বীকার করতেন।

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আচার্য ভরত নাট্যশাস্ত্রে ভোজনাস্বাদের সঙ্গে রসাস্বাদের তুলনা করেছেন। তিনি পুনরায় কাব্যাস্বাদেরও তুলনা করেছেন। ভাষ্যকার অভিনবগুপ্তের মতে, ভোজনাস্বাদ রসনেন্দ্রিয়ের ব্যাপার, আর কাব্যাস্বাদ মানসব্যাপার—'তুলনীয় ন রসনাব্যাপার আস্বাদনম্। অপিতু মানস এব'। অভিনবগুপ্ত বলেছেন, ভোজনাস্বাদে ভোক্তা চিত্তবৃত্তি-দ্বারাও আস্বাদন করতে পারেন, কিন্তু রসাস্বাদে সহৃদয়ের চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা প্রয়োজন। উভয়ের সাদৃশ্য এই যে, উভয়ের পরিণতি চর্বণা ও আহ্লাদন (আনন্দপ্রাপ্তি)। অভিনবগুপ্ত বলেন, রস কাব্যার্থের রূপে আস্বাদ্য, কিন্তু নিজে আস্বাদরূপ।[৫]

এথেকে বোঝা যায় যে, ভরতের নাট্যরস অভিনবগুপ্তের সহৃদয়গত রসে পর্যবসিত বা রূপান্তরিত। অর্থাৎ ভরতাদি আচার্য বিষয়গত রসের বিশদরূপে আলোচনা করেছেন ব'লে অভিনবগুপ্ত বিষয়গত রসের পরিবর্তে বিশেষভাবে সহৃদয়নিষ্ঠ রসেরই আলোচনা করেছেন। এজন্য বলা যায়, রসনিষ্পত্তিব্যাপারে সাধারণীকরণ, ব্যঞ্জনাব্যাপার ও ধ্বনি আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তাদি আচার্যদের মৌলিক সৃষ্টি।[৬]

পাশ্চাত্যে প্লেটো, আরিস্টটল প্রভৃতি গ্রীক-দার্শনিক ছাড়া কান্ট, হেগেল, সোপেন-হাওয়ার, হ্যান্‌স্লিক, ক্রোচে, জেল্‌টাইল প্রভৃতি দার্শনিক ও সৌন্দর্যসেবীরা ধ্বনি, রীতি বা স্টাইল, রসধ্বনি, রসাস্বাদবাদ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁরা করেছেন সৌন্দর্য-

---

৪। 'যেঽর্থা হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো-রসোদ্ভবঃ।
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কং নাঠমিবাগ্নিনা।'

৫। ডঃ ভট্টাচার্য : 'কাব্যালোক' পৃঃ ৫০৩

৬। ভারতভাষ সরস্বতীহৃদয়ালঙ্কারে বাসুদেব যা নানাকুপালও অনুসরণ ক'রে রসপর্যায়ে রস ও ভাবের আলোচনা করেছেন। 'হৃদয়ালঙ্কার' 'অভিনবভারতী' অপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক।

বাদের উপর ভিত্তি রচনা ক'রে, এজন্য পাশ্চাত্যে রসবিজ্ঞানকে 'এস্থেটিক্স' (Aesthetics) বা সৌন্দর্যবাদ বলে এবং ভারতে এটির নাম রসাস্বাদ বা রসাস্বাদবাদ। অবশ্য এ' সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করবো এবং সেই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য-মনোবিজ্ঞান (Western Psychology) ও প্রাচ্য বা ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের (Indian Psychology-র) পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও আলোচনা করবো।[১]

॥ দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে ॥

মাদুরা (মীনাক্ষী মন্দির, নায়ক প্যালেস্)

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

লৈশ ভোজন শেষ করে—বিশ্রামের পর ১২শে ডিসেম্বর ট্রেন ছাড়ল রামেশ্বরম্ ষ্টেশন হতে ১১-৫০ মিনিটে মাদুরা অভিমুখে। নিদ্রার আছিলায় পড়ে রইলুম বিছানায় কখন পাম্বান সেতু আসে সেই অপেক্ষায়। সেতুর এপারেই গাড়ী থামল পামবান্ ষ্টেশনে কয়েক মিনিট—বস্ত্রপাতি পরীক্ষার জন্য। তারপর গাড়ীখানি চলতে লাগল সমুদ্রখাড়ির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালার উপরে পামবান্ সেতু অতিক্রম করে। রাত্রি ১২টা। আমাদের কামরার ৪ জনেই গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম সেই দৃশ্য ; অপর যাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই তারাও বলতে লাগলেন একই অভিজ্ঞতার কথা। গাড়ী পৌঁছে গেল মাদুরা ষ্টেশনে সকাল ৫'১৫ মিনিটে।

বিখ্যাত ভাগাই নদীর তীরে ৩৩০' ফুট উচ্চে অবস্থিত এই মাদুরা শহরের অধিকাংশ অঞ্চল। আয়তন ৮॥ বর্গমাইল, জনবসতি পাঁচলক্ষের মত। প্রতিদিন গড়ে ৫০০০ ভক্তযাত্রী বিভিন্ন স্থান হতে আসেন এখানকার বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির দর্শনে। শিল্প-শোভায় মণ্ডিত দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন শহর এই মাদুরা। কোন্ স্মরণাতীত কাল হতেই শহরটি ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। প্রায় দুহাজার বছর পূর্ব হতেই এখানে দ্রাবিড় শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কালের কুটিলা গতিতেও সে ঐতিহ্য ও গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যাঁর নামে বিখ্যাত এই মন্দির সেই মীনাক্ষীদেবী সম্বন্ধে একটি মনোরম আখ্যায়িকা আছে :

"পুত্র লাভের আশায় শৈব-উপাসক বিজয়নগরের রাজা শিবের উপাসনা করে কন্যা লাভ করলেন মীনাক্ষীকে দেবীর অবতাররূপে। মানুষ হলেন তিনি মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মত। রাজ্য পরিচালনা হতে শুরু করে, রণসাজে সজ্জিতা হয়ে সৈন্য পরিচালনা পর্যন্ত করেন সেই কন্যা। একদিন সুন্দরেশ্বর (শিব) এলেন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। বিহ্বল্ হলেন দেবী মীনাক্ষী। আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর কাছে! শেষে উভয়ের মধ্যে হল শুভ পরিণয়।"

১। উল্লেখযোগ্য যে, আমার নূতন প্রকাশিত Music : Its Form, Function and Value (Delhi, 1979)-গ্রন্থে এ'সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী পাণ্ড্য রাজারা। প্রথম শতাব্দীতে এক পাণ্ড্য রাজা রোম-সম্রাট অগস্টাসের সভায় দূত প্রেরণ করেন। মহাপরাক্রমশালী হন পাণ্ড্য বংশ পঞ্চম-শতাব্দীতে। নবম-শতাব্দীতে, চোল, কেরল আর সিংহল আসে পাণ্ড্যের অধিকারে। তাঁদের বাণিজ্যপোত বয়ে নিয়ে যেত পণ্য-সম্ভার সুদূর বিদেশেও। মহাসমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে মাদুরা। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই চোলরাজ পরান্তক অধিকার করেন মাদুরা। স্বাধীনতা হারায় পাণ্ড্য রাজারা পরবর্তী তিনশত বৎসর। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবার স্বাধীন হয় পাণ্ড্য। মাদুরা ফিরে পায় তার পূর্ব গৌরব। পরিণত হয় দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরে। হয়ে ওঠে সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কেন্দ্র।

১৩১১ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুর অধিকার করেন মাদুরা। ধ্বংসে পরিণত হয় শহর। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় কত অসংখ্য মন্দির বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন। রক্ষা পায়না রামেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরও। মালিক কাফুরের কাছে একে একে পরাজিত হন দক্ষিণ ভারতের সব রাজারা। সেই সঙ্গে ধ্বংসলীলাও ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারতের দিকে দিকে।

সৌভাগ্য ভারতের। এই সময় স্থাপিত হয় এক হিন্দু রাজ্য দক্ষিণ ভারতে। হরিহর ও বুক্ক দুই ভাই, নিকটতম আত্মীয় মহীশূরের হোয়সল রাজাদের কাজ করেন, বরঙ্গলের কাকতীয় প্রতাপ রুদ্রের অধীনে। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরা জয় করে বরঙ্গল। পলায়ন করেন দুইভাই, আশ্রয় নেন গিয়ে আনাগুন্ডিতে। নিযুক্ত হন কাজে সেখানকার রাজার অধীনে। মালিক কাফুর অধিকার করেন আনাগুন্ডি। বন্দী হন দুইভাই। তাঁদের নিয়ে আসা হয় রাজধানী দিল্লীতে। উত্তেজিত হয়ে দিল্লীর হিন্দুগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সম্রাটের বিরুদ্ধে।

মুক্তি লাভ করেন দুই ভাই। নিযুক্ত হন আনাগুন্ডির শাসনকর্তা। সহায় হন তাঁদের বিদ্যারণ্য নামে এক খ্যাতিমান পন্ডিত ও জ্যোতিষী। তাঁরই পরামর্শে তুঙ্গভদ্রাতীরে স্থাপিত হয় রাজধানী বিজয়নগরে। হরিহর হন বিজয়নগরের প্রথম স্বাধীন রাজা। রাজত্ব করেন ১৩০৬-১৩৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা বুক্ক অধিরোহণ করেন সিংহাসনে। রাজত্ব করেন ১৩৭১-১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সংস্কার করেন শ্রীরঙ্গম আর মাদুরা মন্দির। এই বংশের শেষ রাজা কৃষ্ণদেব রায়। রাজত্ব করেন ১৫০৯-১৫৩০ পর্যন্ত। তিনিই সমসাময়িক ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা। মন্দিরে, মন্দিরে শোভিত করে তোলেন সমগ্র দক্ষিণ ভারত। এই সব মন্দির বিজয়নগরের স্থপতিদের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্ভার, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্য-শিল্পেরও। উন্নীত হয় বিজয়নগর সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ শিখরে, পরিণত হয় সভ্যতা, সংস্কৃতি আর কৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে। পরিচিত হয় বিজয়নগর এশিয়ার সুন্দরতম নগররূপে।

তারপর ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথ, বিজয়নগরের এক সেনানায়ক অধিকার করেন মাদুরার সিংহাসন, স্থাপিত হয় মাদুরাতে নায়ক বংশ। ১৬২৩-১৬৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদুরার সিংহাসনে ছিলেন তিরুমল নায়ক। সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের। তিনিই নির্মাণ করান মন্দির মাদুরাতে। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নায়করা রাজত্ব করেন মাদুরাতে।

এ-হেন ঐতিহ্যবাহী মাদুরায় পৌঁছে প্রাতরাশ শেষ করে সকাল ৯টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি সাইকেল-রিক্‌শাযোগে এক মাইলের ব্যবধানে "মীনাক্ষী মন্দির" দর্শনে। প্রকৃতপক্ষে,

মাদুরার মন্দির যুগ্ম-মন্দির। সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষী দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরের সমগ্র প্রাঙ্গণটি বেষ্টন করে আছে উচ্চ একটি প্রাচীর। দাঁড়িয়ে আছে চারটি প্রবেশ পথে সুউচ্চ চারটি গোপুরম। তিনটির উচ্চতা ১৩০´ ফুট করে। দক্ষিণেরটি ১৬০´ ফুট। আছে আরও ছয়টি গোপুরম্। তিনটি রয়েছে দ্বিতীয় প্রাকারে, দুটি মীনাক্ষী মন্দির প্রাকারে। আর একটি শোভা করে আছে অষ্টশক্তির প্রবেশ দ্বার। মন্দির দ্বার উন্মুক্ত থাকে প্রাতে ৫টা হতে ১টা পর্যন্ত। অপরাহ্ণ ৪টা হতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত। সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষী মন্দির ছাড়াও আছে দুটি গণেশ মন্দির ও সুব্রহ্মনিয়মের (কার্তিক) মন্দির। মধ্যে শোভা-বর্ধন করছে একটি পবিত্র পুষ্করিণী "Golden Lotus Tank" বা "সুবর্ণ পদ্মের পুষ্করিণী" যার চতুর্দিকে শোভিত সুবর্ণরঞ্জিত স্তম্ভ। প্রথমেই প্রবেশপথে মুগ্ধ হয়ে যাই স্তব্ধ-বিস্ময়ে গোপুরমের অঙ্গ-সজ্জা দেখে। সর্বাঙ্গে খোদিত সহস্র দেব-দেবীর মূর্তি। নিখুঁত, জীবন্ত, রহস্যময় গঠন এঁদের। বামে সর্বনিম্নে তান্ডব নৃত্যরত নটরাজ। কেন্দ্রস্থলে প্রিয়তমা পার্বতীকে নিয়ে মহাদেব। নন্দী-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট শিবরূপও দৃষ্ট হয়। তাঁর একদিকে মূষিক বাহনে গজানন, অন্য পার্শ্বে ময়ূর বাহনে ষড়ানন। সংসারী শিবের একটি চিত্র। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে প্রবেশ করি সুন্দরেশ্বরের মন্দিরে। এখানেও প্রবেশদ্বারে শোভমান অপরূপ স্তম্ভ। আসি মীনাক্ষী মন্দিরের সামনে— অভ্যন্তরে দেখি দেবী মীনাক্ষী সুবর্ণমন্ডিত হস্তদ্বয়ের একটিতে (বাম) তোতাপাখী, অপরটিতে পুষ্প স্তবক ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেম ও অনুকম্পার প্রতীকরূপে। অপরূপমূর্তি।

সুন্দরেশ্বরের মন্দির-সম্মুখেই কামপাথাডি মন্ডপম্ অনুপম স্থাপত্য-শিল্পের খ্যাতি যার দেশে-বিদেশে। এখানে শোভমান স্থাপত্য-শিল্পে সুগঠিত মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের বিবাহবাসর। মন্ত্রপাঠ করছেন ব্রহ্মা ও নারদ। কন্যা সম্প্রদান করছেন স্বয়ং বিষ্ণু। সারি সারি স্তম্ভে শিবের বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্য-মূর্তি ও বিষ্ণুর সকল অবতার মূর্তি। নটরাজ মূর্তিগুলি দৃষ্টে মনে হয় যেন আবার তিনি জেগে উঠেছেন। শিবের ঊর্ধ্বতান্ডব মূর্তি ও তৎপার্শ্বে ভদ্রকালী-মূর্তিদুটির রয়েছে এক বিশেষ আকর্ষণ। অন্য সব মূর্তি দর্শন করেও এ দুটি মূর্তি দেখার তৃষ্ণা জাগে বারবার। মন্দির প্রদক্ষিণ করে অন্তত এখানে এসে দাঁড়িয়েছি দশবার। এই মন্ডপটি হতে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। যেমন মহিমাময় পরিকল্পনা, তেমনি অনবদ্য রূপদান। এক অনুপম সৃষ্টি, সৃষ্টি এক গৌরবময় যুগেরও। নয় কাঞ্চীপুরমে, নয় চিদাম্বরমে, নয় শ্রীরঙ্গমেও, এখানে শুধু এখানেই স্থাপত্যশিল্প পেয়েছে এক পূর্ণ পরিণতি। লাভ করেছে চরম উৎকর্ষ। রেখে গেছেন শিল্পীরা দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আরতিক অন্তে সুন্দরেশ্বরের ভোগমূর্তি পাল্কীতে নিয়ে আসা হয় মীনাক্ষী দেবীর কাছে। আসার সময় প্রতিটি স্তম্ভের কাছে হয় আরতিক। পূর্বে এসময় হতো দেবদাসী-নৃত্য। বর্ণাজ্ঞ তাই ব্যস্ত মন্ডপস্থ শ্রেষ্ঠ মূর্তিগুলির আলোকচিত্র গ্রহণে পাঁচটি টাকা জমা দিয়ে। এই অবকাশে চলে এলুম নিকটস্থ "সুবর্ণ পদ্মের পুষ্করিণী" দর্শনে। পুষ্করিণীটি রয়েছে একটি আচ্ছাদিত তোরণে। মুগ্ধ হতে হয় তার সুষমা দেখে। অপরূপ গঠন এই তোরণ স্তম্ভগুলির। আর অনুপম তাদের অঙ্গভূষণ। যুগ যুগ ধরে নির্মাণ করেছেন

শিল্পীরা। মিশিয়ে দিয়েছেন মনের মাধুরী। সৃষ্টি করেছেন এক অপূর্ব সৌন্দর্য-নিকেতন। চতুষ্পার্শ্বের শোভিত-তোরণে অপূর্ব দর্শন হয়েছে এই পুষ্করিণীটি। এরপর সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপ। শেষ প্রান্তে নটরাজের অপরূপ মূর্তি। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন বিশ্বনাথ নায়কের মন্ত্রী অরিয়নায়কম্। এই মণ্ডপটি বুকে নিয়ে আছে অপরূপ সব স্তম্ভ। সৃষ্টি করেছে এক স্বপ্নলোক, এক-একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে নির্মিত হয়েছে এই স্তম্ভগুলি। তাদের অঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে কত অশ্ব, পৃষ্ঠে নিয়ে কত নর-নারী বিরাজ করছেন কত বিভিন্ন মূর্তিতে কত দেব-দেবী, বিচিত্র ভঙ্গীতে। প্রতীক এক চরম উৎকর্ষের, এক গৌরবময় যুগেরও। তাই অমর হয়ে আছেন এই শিল্পীগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। যা অনুভবের বিষয়, তাকে ভাষায় বর্ণনায় কতই বা বোঝান যাবে। মনের মণিকোঠায় আজও অম্লান হয়ে আছে মাদুরার স্থাপত্য-শিল্পের অপরূপ স্মৃতি। এটি নায়করাজাদের এক অনবদ্য কীর্তি। বিরাট মণ্ডপের দেওয়াল-গাত্রে নানা চিত্র, পুরাণ, রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনী হ'তে। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। সময় সংক্ষেপ, সব খুঁটিয়ে দেখা হয় না। সেই সঙ্গে চিত্রিত আগমশাস্ত্র হতে গৃহীত দেব-দেবী পূজায় ৩৭ প্রকার মুদ্রা ও ৬৭ রকম শৈব-যন্ত্র।

সেখান হতে প্রায় ১॥ ঘণ্টা পরে চলে আসি মন্দির চত্বর অতিক্রম ক'রে দক্ষিণের ১৬০' ফুট উঁচু গোপুরমের বাহিরদ্বারে। সকলে ঊর্দ্ধ মস্তকে দেখতে থাকি সেই গোপুর-অঙ্গের কারুকার্য। সেখানেই দ্বার পার্শ্বে সাতটি সরু স্তম্ভ একত্রে পাশাপাশি সংযুক্ত, তাতে আঘাত করলে সাতটি সুরে বেজে ওঠে। অনেকেই সেটি পরীক্ষা করতে লাগলেন আঘাতের পর আঘাত দিয়ে। একে বলা হয় sounding stone.

মন্দিরের দক্ষিণ-গোপুরম দিয়ে বাইরে এসে পাশের একটি রাস্তা ধরে পৌঁছে গেলুম থিরুমল নায়কের রাজপ্রাসাদের মূল দরজায়। হ্যাঁ, রাজপ্রাসাদই বটে। মুগ্ধ হতে হয় তার পরিকল্পনা ও নির্মাণকার্য দেখে। যে স্তম্ভগুলি ধরে রেখেছে এই রাজপ্রাসাদের বিরাট অঙ্গন-চত্বর ও প্রশস্ত ছাদটিকে তার পরিধি ও ব্যাস তিনজন লোক একত্রে হস্ত-বন্ধনী দ্বারাও বেষ্টন করতে পারবে কিনা সন্দেহ। তারপর কত তার অলিন্দ, কত বড় বড় দীর্ঘাকৃতি সব গৃহ। সংক্ষেপে সব দেখে নিয়ে চলে গেলুম অন্দরমহলে আমোদ-প্রমোদের জন্য নির্মিত নাট্যশালা ও দরবার-গৃহ দর্শনে। সেখানে সজ্জিত অন্তঃপুরিকাদের জন্য বিশিষ্ট সব আসন নাচগান দেখার জন্য। তারই কত পরিপাটি। এসব দৃষ্টে মনে হয় তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু নৃপতিদের নির্মিত যে-কোন রাজপ্রাসাদকে অতিক্রম করে গেছে থিরুমল নায়কের এই রাজপ্রাসাদ—গঠন-শৈলীর দিক থেকে।

সংক্ষেপে দেখে নিই বসন্ত মণ্ডপমও। নির্মাণ-কাজ শুরু হয় পেরুমল নায়কের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে। শেষ হয় ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। বাইশ বছর অতিবাহিত হয় এই মণ্ডপ নির্মাণে। ব্যয় হয় প্রায় এক মিলিয়ন স্টার্লিং। শ্রেষ্ঠ কীর্তি পেরুমল নায়কের। স্থপতি সজ্জিত করেন এই মণ্ডপের সম্মুখভাগ, খোদিত করেন কত সিংহ-মূর্তি। তারা পদদলিত করে কত হস্তী। অশ্বপৃষ্ঠে একদল সৈন্য। স্ফটিক প্রস্তরে নির্মিত এই মন্দির ও স্তম্ভগুলি। দেশ-বিদেশ হতে আসে দলে দলে যাত্রী, দিয়ে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলি-ডালি উজার করে মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরকে কেন্দ্র করে এই সব মণ্ডপ দর্শনে।

আমরাও শিল্পী ও রাজাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে বেরিয়ে আসি মীনাক্ষী মন্দিরের পরিষি হতে।

১২'৫৫ মিনিটে ফিরে এলুম স্টেশনে-রক্ষিত আমাদের নির্দিষ্ট কোচটিতে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর পুনরায় ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে গেলেন রণজিৎ ভাই। নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্রাম নিতে লাগলুম।

●

॥ ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

বেদান্তের আলোকে

স্বামী প্রভানন্দ

(দুই)

রামমোহনের প্রকাশিত রচনাবলীর অবলম্বন ছাড়াও প্রাচীন ব্রাহ্মনেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজার সহকর্মী ও সহমর্মী বন্ধুদের নিকট হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করে ১২৮৮ সালে 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের' জীবনী লেখেন। এই গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে রামমোহনের বৈদান্তিক ভাবনার সারমর্ম লিখেন, "পরমেশ্বর জগতের আত্মা (God is the self of the universe)। পরমেশ্বরের স্বরূপ জানা যায় না। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা, অর্থাৎ মায়াশক্তির কার্য যে জগৎ, তাহা পর্যালোচনা করিয়া তাহার লক্ষণ বা সগুণভাব জানা যায়। পরমেশ্বরই বাস্তবিক পারমার্থিক সত্তা—তাঁহার অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই।.....মায়া ঈশ্বরের শক্তি বা শক্তির কার্য।.... ঈশ্বরাতিরিক্ত বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। ইহাকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানও বলা যায়।..... মায়া মুখ্যরূপে ঈশ্বরের জগৎকারণ শক্তি এবং মায়া গৌণরূপে ঐ শক্তির কার্য, অর্থাৎ জগৎ। এই যে মায়া বা জগৎ ইহা ভ্রমমাত্র।.....যথার্থ সত্তা—পারমার্থিক সত্তা কেবল এক পরমেশ্বরের। ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই। ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তুই অসত্য। জগতের নিজের স্বাধীন নিরবলম্ব সত্তা নাই।.....মুক্তির উপায় জ্ঞান ও শমদমাদি সাধন এবং জনহিতকর কার্যানুষ্ঠান।..... ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে জগতের কর্তা ও নির্বাহক রূপে বিধাতারূপে জানা যায়। রামমোহন রায় এইরূপে বেদান্তদর্শনের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ ভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানুসারে বেদান্তমত সমর্থন করিয়াছেন। রামমোহন রায় শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানুসারে জগতের মিথ্যার স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু সেই শঙ্করোক্ত মিথ্যার নিজে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি শঙ্করমতে মায়া মানিয়াছেন;—মায়া অজ্ঞান। ব্রহ্মকে মায়া স্পর্শ করে না। কিন্তু তিনি সেই অজ্ঞান বা মায়ার এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জীবসকল ঈশ্বর হইতে পৃথক, এইরূপ বোধই মায়া বা অজ্ঞান।..... কিন্তু শঙ্করকে এরূপভাবে বুঝিয়াছিলেন, যাহাতে লৌকিক ব্যবহার, ধর্মাধর্ম ও উপাসনাদি সম্ভব। শঙ্করভাষ্যেও এসকল আছে, তবে নির্গুণ ভাব প্রবল। রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যায় উভয় দিকের সমান প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে।"[৪]

---

১৪. মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ঐ পৃঃ ৩৮।

প্রবীন ব্রাহ্মনেতা ও পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের বিস্তৃত উদ্ধৃতি হতে এটা সুস্পষ্ট যে রামমোহন মূলতঃ শঙ্করানুসারী, রামমোহন অদ্বৈতবাদী। কিন্তু পূর্বের আলোচনাতেই আমরা দেখেছি তিনি শঙ্করানুসারী বেদান্তবাদী হয়েও কয়েকটি তাত্ত্বিক বিষয়ে নিজস্ব চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং তাঁর চিন্তার অবয়বে দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা দিয়েছে অসামঞ্জস্য। যুক্তিপূর্ণ স্বাভাবিক সিদ্ধান্তের স্থান নিয়েছে হৃদয়ের আবেগজাত প্রার্থনার আকুতি। যৌক্তিক সততাকে কোনঠাসা করে প্রাধান্যলাভ করেছে আপোষ প্রবণতা। রামমোহন রায়ের রচনাবলী সরাসরি বিশ্লেষণ করে অজিতনাথ রায় সিদ্ধান্ত করেছেন, রামমোহনের অনাদি অবিদিত অপরিবর্তনীয় জ্ঞানবৃদ্ধির অনতিক্রম্য ও বাক্যাতীত ব্রহ্ম শঙ্করাচার্য-বর্ণিত নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মের সমতুল্য। শঙ্করাচার্যের জীবব্রহ্মৈক্য তত্ত্ব ও মায়া সম্বন্ধে মতবাদ ও জগৎসংসারের অসত্যতা রামমোহন মেনে নিয়েছেন। এবিষয়ে বহু-উদ্ধৃত রামমোহনের উক্তিটি তুলে ধরা যেতে পারে। রামমোহন লিখেছেন, "I reply, that the resemblance of the bubbles with the world is maintained by the Vedanta only in two respects ; 1st, as the bubbles receive from water through the influence of the wind, their birth and existence so the world takes by the power of God, its original existence from the Supreme Being and depends upon him ; and 2ndly, that there is no reality in the existence either of bubble and of the world."[১৪] কিন্তু এই রামমোহনের রচনার মধ্যেই দেখি তিনি শঙ্করাচার্য হতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে জ্ঞানযোগই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় নয়, অথবা মোক্ষলাভের পথে স্তবস্তুতি উপাসনা গৌণমাত্র নয়। বরঞ্চ তিনি যেন রামানুজাচার্যকে অনুসরণ করেই বলেছেন, "মোক্ষ পর্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক। জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার ত্যাগ করিবেক না যেহেতু বেদে মুক্তি পর্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক দেখিতেছি।"[১৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রামমোহন অনাদি ঈশ্বরতত্ত্বকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলে মেনে নিলেও, আত্মাকে ব্রহ্মের সমান ও স্বতন্ত্র মেনে নিয়েও উপাসনাদি কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েছেন। উপাস্য ও উপাসকের, আত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ না স্বীকার করলে উপাসনা স্তবস্তুতির স্থান কোথায়? রামমোহনের বিচারশৈলীর মধ্যে এই বিশাল ত্রুটির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। সম্ভবতঃ রামমোহন ধারণা করেছিলেন যে শঙ্করাচার্য নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটি নিখুঁত দার্শনিকতত্ত্ব রচনা করলেও ধর্মসাধনের উপযোগী জনগ্রাহ্য কোন তত্ত্ব নির্দেশ করতে পারেন নি। এদিকে রামানুজাচার্য দর্শনতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য ও সহজসম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হলেও তাঁর সগুণব্রহ্মের উপাসনা শেষপর্যন্ত পৌত্তলিকতা ও আচার-অনুষ্ঠানাদির আধিক্যদোষে প্রায়ই দুষ্ট দেখা যায়। যুগের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই তিনি শঙ্কর-অনুসৃত সগুণব্রহ্ম বা স্রষ্টা পালনকর্তা ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন নি। তাঁর বিচারবিবেচনা অনুযায়ী তিনি প্রয়োজনের তাগিদায় নির্গুণ নিরুপাধিক নিষ্কল ব্রহ্মের উপর স্রষ্টা নিয়ন্তা ইত্যাদি অধ্যারোপ করেছিলেন, নিরাকার একক পরমেশ্বরকে মানুষের ভক্তিভালবাসার উপাসনা-প্রার্থনার গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। তাত্ত্বিক বিচারের মাপকাঠিতে গরমিল আছে

---

১৪. The English works, Ibid, Part II, p. 145.

১৫. রামমোহন গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, 'বেদান্তগ্রন্থ' পৃঃ ১০১

মেনে নিয়েও তিনি সনাতন ধর্মের তত্ত্ব ও ব্যবহারের মধ্যে সহজ একটি সেতু রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৭]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনীলেখক অজিতকুমার চক্রবর্তী 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের' প্রবক্তা একেশ্বরবাদী অদ্বৈতপন্থী রামমোহন কেমন করে 'লোকশ্রেয়ঃ' সাধনের উপরে অতটা জোর দিলেন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন রামমোহন-কর্তৃক 'সকল শাস্ত্রের সার' বেদান্তের সঙ্গে খৃষ্টীয় নীতিবাদের সার্থক সমন্বয়ের মধ্যে। তিনি লিখেছেন, "বেদান্তের তুরীয় কিমানির ভাবটাকে পশ্চিমের দৌড়ীয় ঝাঁকানির ভাবের দ্বারা ঝাঁকাইয়া তাঁর নাড়ীর রক্তটাকে একটু চন্‌চনে করিবার মতলব তাঁহার ছিল। তাহা না হইলে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক মোক্ষের নিদারুণ বাঁধন ঘোচে কোথায়? ঐ মোক্ষের সাধনা যে পঙ্গুর সাধনা হইয়া দাঁড়ায়; কারণ 'সমাধি' মানেই এক রকমের জীবন্ত কবর।"[১৮] সুপণ্ডিত চক্রবর্তী মশায় শাঙ্কর বেদান্তের সঙ্গে রামমোহনের বেদান্তকে সমার্থক ভেবে লোকশ্রেয়ঃ সাধনের সমাধান দেখতে পেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বৈদান্তিকগণের কাছে এটা কোন সমস্যা বলে মনে হয় নি। 'সমাধি' সম্বন্ধে লেখকের স্পর্ধার কটূক্তি রামমোহনের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে নি, বরঞ্চ লেখকের ঐ বিষয়ে অজ্ঞতাকেই প্রকট করেছে। এই আলোচনায় সূক্ষ্মদর্শী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মন্তব্যও স্মরণযোগ্য। তিনি রামমোহন সম্বন্ধে লিখেছেন, "His emphasis on Isvara made his monism synthetic, concrete and practical."[১৯] রামমোহনের অদ্বৈতবাদের এটাই একটা বৈশিষ্ট্য। এবং এবিষয়ে তাঁর ধ্যানধারণা শঙ্করাচার্যের মননানুসারী নয়।

প্রাগুক্ত পাঁচকড়ি দাশ দাবী করেছেন, রামমোহনের উপনিষদ্ ভিত্তিক একেশ্বরবাদ প্রমাণ করে না যে তিনি একজন হিন্দুমাত্র ছিলেন। রামমোহন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের ঊর্ধ্বে। দাশ মশায়ের সিদ্ধান্ত, "Naturally he (Rammohan) did not distinguish between unitarian thought found in Hindu and that of the Christian scriptures."[২০] এমতানুসারে ব্রাহ্মধর্ম একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্মের একটি বিশিষ্ট প্রকাশমাত্র; কিন্তু তৎসত্ত্বেও দাবী করা হয়েছে রামমোহন ছিলেন 'the founder of a new religion'।

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের সংস্কার বা নূতন ধর্মমতের প্রবর্তক রামমোহনের ধ্যানধারণায় বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। গোষ্ঠীর স্বার্থের মধ্যে কুক্ষিগত বেদান্তদর্শনের নির্মলধারা জনসাধারণের মধ্যে তিনিই প্রথম প্রচার করেন এবং সর্বপ্রথম প্রচার করেন দেশীয় ভাষায়। তাছাড়া এটুকুও সুস্পষ্ট যে শাস্ত্রের ভূমিকা ও শাস্ত্রবিচার সম্বন্ধে রামমোহন শঙ্করের পন্থানুসারী। 'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।' এই বৃহস্পতি-বচন রামমোহন অনেকবার উদ্ধৃত করেছেন এবং এই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে শাস্ত্র ও যুক্তিকে ধারালো ছোরার এধার-ওধার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত বিষয়ে

---

১৭. Ajit Nath Roy : The Religious Ideas of Rammohun Roy, 1970, pp. 60-64.

১৮. অজিতকুমার চক্রবর্তী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা, পৃঃ ১৪১-৪২

১৯. Commemoration Volume of the Rammohun Roy Centenary celebration, Part II, p. 100.

২০. Piyus Kanti Das : Raja Rammohun Roy and Brahmoism, 1970, p. 69.

রামমোহন নিশ্চিতভাবেই শঙ্করানুগ নন। পাঁচটি উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় তিনি শঙ্করাচার্য-পথানুচারী, কিন্তু বেদান্তগ্রন্থে তাঁর মতস্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। মোটের উপর রামমোহনকে শাঙ্কর-অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা মনে করলে ভুল হবে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণণ লিখেছেন, "On the philosophical side he (Rammohan) upheld them as opposed to what is generally called the pantheism of Sankara, according to whom Brahman is all and yet beyond all determination."[২১] রামমোহন ও শঙ্করাচার্যের মধ্যে এই সামগ্রিক মতবিভিন্নতা ছাড়াও উপাসনা ও স্তবস্তুতি শঙ্করদর্শনে গৌণ কিন্তু রামমোহনের ক্ষেত্রে ব্রহ্মোপাসনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো চিন্তাশীল লেখকের মতে ব্রহ্মোপাসনাই রামমোহনের শ্রেষ্ঠ অবদান। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, "রামমোহন রায়ের চিরজীবনের সকল সাধনার অমর ফল তাঁহার বিচারগ্রন্থও নয়, তাঁহার Appeals to Christian Publicও নয়, তাঁহার "তুহফাতুল মওয়াহেদ্দীন"-গ্রন্থও নয়, সে তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা। এই ব্রহ্মোপাসনাটিকেই এদেশে দান করিবার জন্য তিনি অত শাস্ত্র নাড়াচাড়া করিয়াছেন, অত বিচারবিতর্ক করিয়াছেন, অত সামাজিক আন্দোলন করিয়াছেন, শিক্ষার জন্য অমন প্রাণপন শ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। এই হারাটিকে দেশের গলায় দিবার জন্য তিনি যুক্তির কৃপাণ হাতে সেই অন্ধ সংস্কারের জঙ্গলাকীর্ণ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই অভিমত সরল ও আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু রামমোহনের বিশাল প্রতিভা ও জটিল কর্মজীবনকে এই সীমিত মতের গন্ডী সঙ্কীর্ণ করেছে না কি? রামমোহনের সমকালীন প্রতিপক্ষীয়দের মধ্যে অন্যতম প্রধান মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর 'বেদান্তচন্দ্রিকা' গ্রন্থে (১৮ ৭ সাল) রাজার উপাসনাপদ্ধতিকে বলেন, "আধুনিক বনমদমত্ত ব্রাহ্মেরদের স্বাহঙ্কার কুজ্ঞানেতে কৃত যে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ।" বলাবাহুল্য, এই মতে যুক্তির চাইতে আক্রোশই বেশী স্পষ্ট। উপাসনার উপযোগিতা সম্বন্ধে রামমোহন যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা হৃদয়স্পর্শী সন্দেহ নাই। তিনি লিখেছেন, "এই হিন্দোস্তান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন এই হিন্দোস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদু সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তবে কিরূপে কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়?"

●

২১. History of Philosophy, Eastern & Western 1962, Vol. I, p. 527

॥ স্বামী অভেদানন্দ ॥

(জীবন নাট্য)

শ্রীবিমলকৃষ্ণ

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘর]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কালী, কালী! কই রে, রামলেলো কোথায় গেলি?

[রামলালের প্রবেশ]

রামলাল। এই যে আমি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাল যে ছেলেটা এয়েচে, সে কোথায়?

রামলাল। ওই পাশের ঘরেই আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে, আছে। থাক্‌বেই তো। ওইটুকু ছেলে, বলে কি না 'যোগসাধনা ক'রব'। বল্‌তেই হবে। আমিও ওকে সব বললুম। শেষে বললুম, দেবো, দেবো, যোগশিক্ষা দেবো। তবে, আজ রাতটা বিশ্রাম ক'র, কাল সকালে বাকীটুকু হবে'খন। তা'দে, দে ওকে পাঠিয়ে দে।

রামলাল। আচ্ছা। [প্রস্থান]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কালী, কালী! [কালীপ্রসাদের প্রবেশ ও ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ] আয়, আয়, বোস্। তা—নামটা কি?

কালী। আজ্ঞে, শ্রীকালীপ্রসাদ চন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। মা'য়ের প্রসাদী যে তুই। তা—এখানে চিনে এলি কি ক'রে? ঘুর্‌পাক্ খাস্‌নি?

কালী। আজ্ঞে, তা খেয়েছি একটু।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই নাকি? বল্ তো শুনি কি রকম ঘুরপাক খেলি, বল্?

কালী। আপনার নাম প্রথম শুনি আমার বন্ধু বজ্রেশ্বরের মুখে। আমার যোগ-সাধনার আগ্রহ দেখে—সেই আমাকে আপনার কাছে আসবার পরামর্শ দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে, বজ্রেশ্বর শোনালো দক্ষিণেশ্বরের কথা? বাঃ। তারপর?

কালী। নাম তো বল্‌লে। কিন্তু, আপনার সঠিক ঠিকানা কিছুই জানি না। এদিকে আমার আগ্রহও রোজ বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। কাল সকালে বেড়াতে বেরিয়ে আহিরীটোলা থেকে চ'লে গেলুম সোজা বাগবাজারে বজ্রেশ্বরের খোঁজে। কিন্তু, খুঁজে বার করতে পারলুম না তাকে। কারণ, তারও ঠিকানা জানতুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আ হারে, খোঁজবার কি আগ্রহ। তারপর?

কালী। তখন আমার জিদ্ চেপে গেল। ঠিক করলুম—যেভাবেই হোক দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে আপনার চরণ দর্শন ক'রবোই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কালী, কালী। তারপর কি হ'ল?

কালী। তারপর, ঘুরতে ঘুরতে উল্টোপথে চলে গিয়েছিলুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি সর্বোনাশ, সে যে সাঙ্ঘাতিক কথা রে, এ্যাঁ।

কালী। শেষে অবশ্য একজনকে পেলুম, যাকে ধ'রে পথ বুঝোনিয়ে তবে এসে পৌঁছলুম এখানে। কিন্তু—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার 'কিন্তু' কেন রে?

কালী। এত ক'রে এসে পৌঁছেও শুনলুম-আপনি নেই, কলকাতায় গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন কি করলি? চ'টে যাস নি?

কালী। ক্ষিধের জ্বালা, দীর্ঘ পথ হাঁটার ক্লান্তি, নিজের কপর্দকহীন অবস্থা সব কিছু মিলে তখন আমার পাগল ক'রে তুলল! তাই, আপনার ঘরের উত্তর দিকের ওই সিঁড়িতে ব'সে কেঁদে ফেললুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি রে? মাঃ মা! তারপর?

কালী। অমনি সময়ে হঠাৎ একটি ছেলে এসে আমাকেই জিগেস করলে আপনি আছেন কি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কে রে, কি নাম তার?

কালী। শশিভূষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও! তুই কি বল্‌লি তাকে?

কালী। সব কথা বলে শেষে—কলকাতায় কি ক'রে ফিরব তাও যে ভাবছি তাকে বলুলম! সে ব'ল্‌লে—এতদূর এসে আপনার দর্শন না ক'রে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। আমিও যে সে-কথা ভাবিনি তা নয়। কিন্তু, বাড়ীতে যে কিছু ব'লে আসিনি। সে ব'ললে—তারও ওই একই অবস্থা। যাই হোক—শশিই কিন্তু আমায় বুঝিয়ে রাজী করিয়ে—আমার থাকবার-খাবার সব ব্যবস্থা ক'রে দিল রামলালদাদাকে ব'লে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। খুব কষ্ট হয়েছে, নারে?

কালী। আজ্ঞে না। এমন পবিত্রস্থানে থাকবার ভাগ্য ক'জনের হয়! আচ্ছা, আপনি আমায় যোগশিক্ষা দেবেন তো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেশ কথা বলিস তো তুই। কি পড়িস?

কালী। এন্ট্রান্স ক্লাসে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে, সংস্কৃত পড়াশুনো আছে?

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কোন্ কোন্, শাস্ত্র পড়েছিস?

কালী। রঘুবংশ, কুমার সম্ভবাদি কাব্য, ভগবদ্‌গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, শিবসংহিতা এই সব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেশ, বেশ। [উঠে দাঁড়িয়ে] তুই কি বল্‌ছিলি? যোগ শিখবি? আচ্ছা, উঠে আয় তো! [কালীপ্রসাদকে এক কোণে নিয়ে গিয়ে তক্তপোষে বসিয়ে] দেখি জিবটা বার কর্। [ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে কালীর জিবে মন্ত্র লিখে তার বুকে হাত চেপে ধরলেন নিজের] নে, মা কালীর ধ্যান কর্। [কালী তৎক্ষণাৎ সমাধিস্থ] [ঠাকুর কিছুক্ষণ কালীর ভাব নিরীক্ষণ করে তার বুকে ডান হাত বুলিয়ে] কি রে, কি হ'ল?

কালী। [ধীরে স্বাভাবিক হয়ে] আজ্ঞে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি বুঝ্‌লি ?

কালী। অপূর্ব আনন্দ !

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে। ঠিক আছে। এবার উঠে আয়। [এগোতে এগোতে] তুই যোগ শিখতে চাইবিই তো। ঐটুকুই যে বাকী ছিল। এই তোর শেষ জন্ম কিনা। [একটু থেমে] তা, বিয়ে-থা করবার ইচ্ছে আছে ?

কালী। আজ্ঞে না, কিছুতেই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। [হেসে] বেশ, বেশ। বিয়ে থা করিস নি।
শুচি-অশুচিয়ে ল'য়ে দিব্যঘরে কবে শুবি ?
দুই সতীনে পীরিত হ'লে তবে শ্যামা-মাকে পাবি।
[একটু পরে] এবারে যা, মা ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে ধ্যান করগে যা।
[কালীর সম্মোহিতবৎ প্রস্থান।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। [গান]

মা, মা ব'লে আর ডাকিব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
ওমা, ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আরো কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী ?
না হয় দ্বারে দ্বারে যাবো ভিক্ষা মেগে খাবো
মা ব'লে তো আর কোলে যাবো না ॥

[গান শেষে সমাধিস্থ। এরই মধ্যে রামলাল, কালীপ্রসাদ ও কয়েকজন ভক্তের প্রবেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। [সমাধি ভাঙার পর] কালী, কালী ! [একটু পরে] ওরে রামলেলো, ঐ যে ছেলেটা - যার নাম - হ্যাঁ-হ্যাঁ কালী-কালী, সে কি এখনো ধ্যান ক'রছে বুঝি ?

রামলাল। [কালীকে দেখিয়ে] এই তো সে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও, এই তো ! কিরে ধ্যান ক'রলি ?

কালী। হ্যাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক আছে। আয়, মা'র এই প্রসাদটুকু খেয়ে নে।
[প্রসাদ দিলেন, কালী গ্রহণ করল। তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে]
কি ভাব্‌ছিস রে ? ফেরবার কথা ? কোনো ভয় নেই, সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। আর শোন্, যা যা করতে বল্‌ব সব মনে থাকবে তো ?

কালী। আজ্ঞে নিশ্চয়ই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক আছে। শোন্, মাকে ডাকতে সময়ের দিনক্ষণ লাগে না, আয়োজন উপচারেরও দরকার হয় না। রোজ বিছানায় ব'সে মাকে ডাক্‌বি। কাজ শুরু করার আগে, আর, সমস্ত কাজের শেষে। মাকে ডেকে ব'লবি নিজের মনের কথা। আর, আমাকে এসে শোনাবি রোজ ধ্যানের মধ্যে কি দেখ্‌লি আর কি শুনি। [হেসে] আবার আসবি, কেমন ?

কালী। যে আজ্ঞে। কিন্তু—।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার 'কিন্তু' কেন রে ?

কালী। আজ্ঞে, যাতায়াতের ভাড়া যদি জোগাড় করতে না পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। [হেসে] এই কথা। সে এখান থেকে চেয়ে নিবি, লজ্জা করবি না কিন্তু। যাক্ গে। আজ আর নয়। তুই এগিয়ে পড়্। [জনৈক ভক্তের দিকে চেয়ে] হ্যাঁ গা, তুমি তো ক'লকাতায় ফিরবে ? একে একটু পৌঁছে দাও না।

ভক্ত। আজ্ঞে, নিশ্চয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। [কালীর দিকে ফিরে] ব্যস্, আর ভাবনা কি ?

কালী। আজ্ঞে না, ভাবনার আর কি আছে !

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক। এসব আবার ভাব্‌বার একটা বিষয় না কি ? যা ভাব্‌বার—তাই ভাব্। [ভক্তসহ কালীপ্রসাদ প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল। রামলাল ইত্যাদিরও প্রস্থান]

কালী, কালী। এইটুকু বয়েসে ও যোগ শিখতে চাইবেনা তো চাইবে কে ? কত বড় যোগী ছিল পূর্বজন্মে। সিদ্ধিলাভের যেটুকু বাকি ছিল এই জন্মে তা পূর্ণ হবে। [রামলালের প্রবেশ] কি রে রামলেলো, আবার কি হ'ল ?

রামলাল। এক ভদ্দরলোক এসেছেন। কারণ জিজ্ঞেস করতে বল্‌লেন—তাঁর ছেলে নাকি কাউকে কিছু না ব'লে চ'লে এসেছে এখানে। কথা শুনে মনে হ'ল —তিনি ঐ কালীপ্রসাদের বাবা। তিনি দেখা ক'রতে চান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে ! তা নিয়ে এসো। [রামলালের প্রস্থান এবং রসিক চন্দ্রকে পৌঁছে দিয়ে পুনঃ প্রস্থান]

[রসিকচন্দ্রকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ দেখার পর বসতে ইঙ্গিত ক'রে] কি নাম গো আপনার ?

রসিক। শ্রীরসিকলাল চন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাঃ বাঃ বেশ নাম। তা কি করা হয় ?

রসিক। ক'লকাতায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে ইংরিজী পড়াই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাষ্টারী করা হয় ? সে তো খুবই ভালো ! লোকশিক্ষা কি যে সে কথা !

রসিক। তা জানি না। আমি জানি—আমি বড় দুঃখী। সে কারণেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই নাকি ? তা হ'লে কারণটা তো শুনতে হয়।

রসিক। দেখুন, আমার ছেলে কালীপ্রসাদ কিছুদিন থেকে যোগ শিখ্‌বে, যোগ শিখ্‌বে' ক'রে ক্ষেপেছিল। প্রথম প্রথম ছিল একরকম। বাড়ীতেই ঐ-সব বিষয়ে পড়াশুনো নিয়ে মেতেছিল। কিন্তু, কাল ভোর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। শেষে শুনলুম—সে কিছুদিন ধরে এখানে আসবার চেষ্টা ক'রছিল। কাল খবরটা শোনার পর কোনো গাড়ী-টাড়ী জোগাড় করতে পারিনি। তবে, আজ ভোরেই বেরিয়ে প'ড়েছি। আচ্ছা, সে কি এখানে এসেছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁ।

রসিক। এসেছে? একবার ডেকে দেবেন তাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন তো সে এখানে নেই।

রসিক। সে কি? কোথায় গেল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। [হেসে] বাড়ীতেই তো ফিরে গেল।

রসিক। বাড়ী ফিরে গেছে? যাক্, বাঁচলুম। [উঠে] আচ্ছা, চলি। [প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক আছে। কিন্তু, এ ব্যাপারে নিজেকে দুঃখী ভাবার কি হ'ল?

রসিক। [ফিরে এসে] দেখুন, আমার প্রথম স্ত্রী একটি ছেলে রেখে মারা যান। অনেক কষ্টে তাকে মানুষ করলুম! কিন্তু, শেষে সে একদিন বিধর্মী খৃষ্টান হ'য়ে আমায় ছেড়ে চ'লে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ছিঃ ও কি কথা। কোনো ধর্মই নিন্দের নয়। যত মত, তত পথ।

রসিক। তা বটে। সে যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আপনার কাছে আমার নিবেদন—আপনি দয়া ক'রে কালীকে এমন উপদেশ দিন যাতে সে সংসারী হ'য়ে বাপ মার সেবা করে। সন্তানের সেই তো শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসার করা না করার কথা জানি না। তবে মা-বাপ বা গুরুজনের সেবা সে করবে।

রসিক। গুরুজনের সেবা ক'রবে? আপনি ব'লছেন? তা হ'লে আর কিছু চাই না। আচ্ছা, তবে চলি এবার। [সানন্দে প্রস্থান]

শ্রীরামকৃষ্ণ। [হেসে] কালী, কালী!

[গান]

সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥

●

শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ দুইজনে হরিদ্বারের পথে রওনা হইলেন। হরিদ্বার যাওয়ার পথে অযোধ্যা হইয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদের হৃদয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ ও সাহস তাঁহাকে সর্বদা সঠিকপথের নিশানা দিয়াছে, কারণ দৃঢ়-বিশ্বাসের সহিত কালীপ্রসাদ বহু কঠিন আপদ-বিপদ হইতে সকল সময়েই মুক্ত হইয়াছে।

শ্রীগুরুর প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লইয়া কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ পথ চলিতে চলিতে একটি সমৃদ্ধ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে আসিয়া কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া মনে করিলেন সেখানে মাধুকরী করিবেন না, কারণ তখনও অনেক সময় আছে, সুতরাং কিছুটা পথ অগ্রসর হওয়া যায়। সেইজন্য

কালীপ্রসাদ মনের উৎসাহে তুলসী মহারাজকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন এবং বলিলেন : "দেখ, প্রচুর মাধুকরী পাইবার আশায় এই সহরে বসিয়া থাকা উচিত নহে। আজ আমরা অধিক পথও পদব্রজে অতিক্রম করি নাই, সুতরাং অগ্রসর হইয়া চলো, পরের গ্রামে বা সহরে ভিক্ষা করা যাইবে"। তুলসী মহারাজ কিন্তু তাহাতে বিশেষ সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন : "আরও আট ক্রোশ পথ অতিক্রম করলে তবে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া যাবে। মনে হয়, সেখানে মাধুকরী পাওয়া কঠিনও হবে এবং রৌদ্রে অত্যন্ত কষ্টও হবে"। তাহাতে কালীপ্রসাদ তাঁহাকে বলিলেন : "তুলসী, ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে যখন বেরিয়েছি, তখন চিন্তা কি, চলো,—আমাদের মাধুকরী শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে ঠিক ক'রে রেখেছেন। পুত্র জন্মাবার পূর্বেই মাতৃস্তনে দুগ্ধ প্রস্তুত থাকে, সুতরাং আমাদের মাধুকরী ঐ গ্রামে মিলবে।"

এইরূপ মনঃশক্তি দ্বারা কালীপ্রসাদ বহুক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছেন এবং সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ নিবিচারে অনুভব করিয়াছেন। অদম্য উৎসাহে ও বিশ্বাসে কালী-প্রসাদ দৃঢ়তার সহিত পথ চলিতে লাগিলেন এবং একটু ক্ষুণ্ণ মনে পশ্চাতে পশ্চাতে তুলসী-মহারাজ চলিতে লাগিলেন। প্রখর রৌদ্রতাপে পথের ধূলি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে পথ চলাও একান্ত কষ্টসাধ্য। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ নগ্নপদে পথ চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখ-চোখ রক্তিম আভায় পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া একান্ত ক্লান্ত বোধ করিতে লাগিলেন এবং নিকটে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে একটি শিব-মন্দিরে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রায় দ্বিপ্রহরে ঐ ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, প্রায় সকলে দোকান-পাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুলসী মহারাজ একটু বিরক্তির সহিত রুদ্ধস্বরে বলিলেন : "আমি তো বলেছিলাম ভাই, পরবর্তী গ্রাম বহুদূরে এবং সেখানে মাধুকরী মেলা কঠিন"। কালীপ্রসাদ পূর্বের মতোই তুলসী মহারাজকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন : "ভাই, হতাশ হচ্ছ কেন ? আমি যা বলেছি, তাই হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের জন্য মাধুকরী ঠিক করেই রেখেছেন"। ঘটনা ঘটিল তদনুরূপই।

●

রাকু ইয়াকী

শ্রীদিবাকর সেনরায়

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের সারল্য জাপানী জীবনধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। জাপানী বৌদ্ধদের যে-শাখাটি 'জেন্ বৌদ্ধ' নামে পরিচিত—তাঁদের দার্শনিক মতবাদের লিখিত বিবরণ এ বাবত সামানাই পাওয়া গেছে। এটুকু জানা যায় তারা ব্যক্তিগত নির্বাণ লাভে বিশ্বাসী ; তাঁরা মনে করেন, প্রত্যেকেই নিজস্ব প্রচেষ্টায় আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উন্নতিলাভে সক্ষম হতে পারেন। ব্যক্তিবিশেষের কোনো সৃষ্টিকর্মকে জেন্ দার্শনিকেরা জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়পর্বত ইত্যাদির মতো প্রকৃতির স্বাভাবিক অঙ্গ বলেই মনে করেন। একটি সিরামিক্-পাত্রের সৃষ্টি, জেন্ দার্শনিকদের মতে, প্রকৃতিজাত একটি গাছের জন্ম এবং বৃদ্ধির মতোই। অর্থাৎ, একটি সুনির্মিত সিরামিক্-পাত্র দেখে দর্শকের মনে হবে, ওই পাত্রটি

একটি গাছের মতো জন্ম নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠেছে। প্রকৃতিজাত একটি গাছ যেমন কৃত্রিমতা এবং বাহ্যিকতাবর্জিত স্বাভাবিকতার নিদর্শন, সুদক্ষ শিল্পীনির্মিত একটি সিরামিক্‌পাত্রেও প্রতিফলিত হবে ওই গাছটির মতো স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকত্ব এবং সারল্য। জেন্‌ দার্শনিকদের মতে, সিরামিক্‌পাত্র নির্মাণে কোনো শিল্পীর যে প্রয়াস—তা যদি পাত্রটির গড়ন এবং অলংকরণে প্রকট হয়ে না ওঠে, তবেই সিরামিক্‌পাত্রটিকে একটি গাছের মতো স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। জেন্‌ বৌদ্ধ দর্শনের এই সূত্রগুলো প্রাচীনকাল থেকেই জাপানী সিরামিক্‌শিল্পীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। জাপানে চা-পানের উৎসবে ব্যবহৃত চা-পানের পাত্রগুলোতে জেন্‌ জীবনদর্শন সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

চীনের সাংস্কৃতিক ধারা প্রতিবেশী জাপানের সাংস্কৃতিক জীবনকে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রভাবিত করেছে। জাপানের লিপি, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, শিল্পকলা এবং সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে চীনের প্রভাব এখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্যান্য সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের মতো চা-পান উৎসবের অনুষ্ঠানটিও জাপানে এসেছিলো চীন থেকেই। চা-পান উৎসবে যে-চা নির্মন্ত্রিত অতিথিদের পরিবেশন করা হয়ে থাকে—তা বিশেষভাবে আহরিত সবুজ রঙএর গুঁড়ো চা। এই চা মহার্ঘ ও বটে। জাপানী ভাষায় চা-পান অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'চা নোয়ু'। চা নোয়ু অনুষ্ঠান যিনি পরিচালনা করেন, জাপানের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানের পাত্ররূপে তিনি সর্বোচ্চত হয়ে থাকেন। চা-নোয়ু অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত চা-পানের যে-সিরামিক্‌পাত্র জাপানী ভাষায় 'রাকু ইয়াকী' নামে পরিচিত—সেই রাকু ইয়াকীর নির্মাতা সিরামিক্‌শিল্পীরা জাপানে 'রাকু কেই' নামে পরিচিত। এই রাকু কেই-রাও সমগ্র জাপানে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী।

'রাকু' কথাটি অবশ্য জাপানী ভাষায় অন্য কয়েকটি অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'আনন্দদায়ক' এবং 'কৌতুককর' কথা দুটোর জাপানী পরিভাষাও 'রাকু'। এছাড়া জাপানের দুটো বিখ্যাত প্রমোদশালার নামের সঙ্গে 'রাকু'-শব্দটি যুক্ত হয়ে আছে; এদের একটি ষোড়শ শতাব্দীর 'হা রাকু জেই' এবং অপরটি ঊনবিংশ শতাব্দীর 'কাই রাকু এন্‌'।

'রাকু কেই'-রা সমগ্র জাপানে দুটো প্রধান শাখায় বিভক্ত। একটি শাখা জাপানী ভাষায় 'হন্‌ গামা' এবং অপর শাখাটি 'ওরেক্‌ গামা' নামে পরিচিত। রাকু কেই-রা পারিবারিক পদবীরূপে 'তানাকা' নামটি ব্যবহার করে থাকেন। জাপানী শিল্পকলার অন্যান্য শাখার শিল্পীদের মতো তানাকা-রাও বংশানুক্রমিকভাবে রাকু ইয়াকী তৈরী করে আসছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র উপযুক্ত শিল্পীরূপে বিবেচিত হলে পিতার দেহাবসানের পর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কোনো রাকুকেই অপুত্রক হলে অথবা তাঁর পুত্র রাকু ইয়াকী নির্মাণে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জনে সক্ষম না হলে, ওই রাকু কেই-র কোনো ছাত্র রাকু ইয়াকী নির্মাণে উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হলে তবেই তিনি গুরুর অবর্তমানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারতেন। রাকু কেই-দের বংশতালিকায় কখনো কখনো পরম্পরার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এর অন্যতম কারণ, কোনো কোনো রাকু কেই তাঁদের জীবদ্দশাতে এক এক সময়ে এক একটি নাম গ্রহণ করেছেন। এমনও হয়েছে, কোনো 'রাকু কেই' একই সময়ে একাধিক নামে পরিচিত হয়েছেন। দেহসংস্থান অথবা শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী রাকু শিল্পীরা বিশেষ বিশেষ নাম গ্রহণ করেছেন—এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে; যেমন, 'বধির' 'ন্যাটা' কিংবা 'বাঁ হাত ব্যবহারকারী'। জন্মস্থান কোনো গ্রাম অথবা কোনো জেলার নাম ও একাধিক ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে রাকু কেই-দের নামের সঙ্গে।

ঐতিহাসিকদের মতে জাপানে রাকু ইয়াকী শৈলীর পত্তন করেন তানাকা চোজিরো। পণ্ডিতদের অনুমান, কোরিয়া (অন্য মতে চীন) থেকে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে তানাকা জাপানে চলে আসেন এবং কিয়েটো শহরে রাকু পদ্ধতিতে সিরামিক্‌পাত্র তৈরী করতে সুরু করেন। তানাকা অল্পকালের মধ্যেই রাকু পাত্র নির্মাণে সূক্ষ্ম শিল্পবোধ এবং কারুনৈপুণ্যের পরিচয় দেন্‌ এবং তৎকালীন জাপানের চা-পান অনুষ্ঠানের সম্মানিত পরিচালক তথা সিরামিক্‌পাত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সেনো রিকুয়ু-র পৃষ্ঠপোষকতা-লাভে সক্ষম হন্‌। আগেই বলা হয়েছে, জাপানে চা-পান অনুষ্ঠানের পরিচালকরা বিশেষ সম্মানীয় বলে গণ্য হয়ে থাকেন। জাপানী ভাষায় এঁদের বলা হয় চা-জিন্‌। চা জিন্‌-রা কেবলমাত্র চা তৈরী এবং চা-পান অনুষ্ঠানের পরিচালনারই যে বিশেষজ্ঞ তা নয়, এঁরা প্রত্যেকেই রাকু ইয়াকী-র নির্মাণ পদ্ধতি এবং শিল্পবিচার সম্বন্ধে ও বিশেষজ্ঞ। জানা গেছে, কোনো কোনো চা জিন্‌ নিজেরাই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রাকু ইয়াকী নির্মাণ করতে পারতেন।

তানাকানির্মিত রাকু পাত্রগুলো সম্পূর্ণভাবে হাতের সাহায্যে তৈরী হতো। এই রাকু পাত্রগুলোর আকার গেলাসের মতো লম্বা ধরণের হলেও পরিধি নিখুঁত বৃত্তাকার হতোনা। সম্পূর্ণভাবে হাতের সাহায্যে নির্মিত হওয়ায় পাত্রগুলোর দেয়ালের বেধ হতো বেশ চওড়া; মুখের পরিধির মাপের তুলনায় ফুট্‌ রিম্‌-এর (পাত্রের তলাকার অংশ) পরিধির মাপ হতো আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ। লেড্‌ অক্সাইড্‌ মিশ্রিত কালো রঙএর যে-গ্লাজ পাত্রগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে, তা ভাঁটিতে পোড়াবার পর হয়ে উঠেছে পালিশ করা চামড়ার মতো উজ্জ্বল, কিন্তু কাঁচের মতো চক্‌চকে নয়। পোড়াবার পর পাত্রগুলো অল্পমাত্রায় জলশোষক (porous) থাকায় তাতে ফুটন্ত জল ঢাললে ও কখনো অত্যধিক গরম হয়ে ওঠেনা। তানাকা নির্মিত রাকু পাত্রগুলোর ডিজাইনের বিশেষত্ব এই যে, পাত্রগুলো নিখুঁত জ্যামিতিক মাপে তৈরী করা না হলেও আকৃতির কোথাও অসামঞ্জস্য চোখে পড়েনা। যে সাতটি রাকুপাত্র তানাকা-র স্বহস্ত নির্মিত বলে জাপানের বিশেষজ্ঞরা এ পর্যন্ত নিশ্চিত হয়েছেন—সে-পাত্রগুলোর আধারে চা-পান অনুষ্ঠান-বিশেষজ্ঞ সেনো রিকুয়ুর স্বাক্ষরিত যে-লেখা পাওয়া গেছে, তাতে লেখা রয়েছে 'এই পাত্রগুলো তানাকা চোজিরো তৈরী করেছেন।' তানাকা চোজিরো-র স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি মাত্র রাকু সিরামিক্‌স্‌-এর নিদর্শন এ পর্যন্ত জাপানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ওইটি সিংহের নকশাযুক্ত একটি টালি।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তানাকা'র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র (অন্য মতে ভ্রাতা) ফোকেই তাঁর তৈরী চা-পান পাত্রগুলোতে 'রাকু'-সিলটি মুদ্রিত করতে আরম্ভ করেন। অতি অল্পসংখ্যক রাকু পাত্র এ-পর্যন্ত সুনিশ্চিতরূপে ফোকেই-র নির্মিত বলে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। কারণ ফোকেই র নির্মিত পাত্রগুলোর সঙ্গে তানাকা নির্মিত পাত্রগুলোর নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফোকেই নির্মিত রাকু পাত্রগুলোর দেয়াল অপেক্ষাকৃত পুরু এবং পাত্রগুলো ওজনেও অপেক্ষাকৃত ভারী।　　[ক্রমশঃ]

বিংশ শতাব্দীর ধর্ম—স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদ : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীকে বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগ বলা যেতে পারে। যা-কিছু বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিংবা যুক্তিভিত্তিক, এই যুগে শুধুমাত্র সেগুলিই আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে, তাকেই আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি। বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদের ভাবনা ও যুক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং আমাদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান-স্বীকৃত নীতিগুলিদ্বারা আমাদের যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক কার্যের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য-বিধানের প্রবণতা লক্ষ্য করি। আমাদের জীবনের দৈনন্দিন কার্যাবলীর মধ্যেও বৈজ্ঞানিক সত্য প্রয়োগ করবার একটি সাধারণ প্রবণতা আমাদের আছে। বৈজ্ঞানিকগণ আজ প্রকৃতির যে-সকল তথ্য আবিষ্কার করেছেন, আমরা তা' রন্ধনে, আহারে, পানীয়গ্রহণে, পোষাক-পরিধানে, যাতায়াতে—জীবনের সকল কার্যে প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে চেষ্টা করি। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক গবেষকগণদ্বারা অননুমোদিত প্রতিটি জিনিস এখন আমরা বর্জন করতে প্রস্তুত। আমাদের প্রাচীন ধারণাগুলিকে নূতন রূপ দিতে, আমাদের চিরাচরিত অভ্যাসকে পরিবর্তন করতে, আমাদের বাসস্থানগুলিকে পুনর্নির্মাণ করতে ও আমাদের সমাজকে সংস্কার করতে বিজ্ঞান প্রতিদিনই বাধ্য করছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলি আজ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে বিশ্বের অজানা রাজ্যের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকার সাহায্যে আমরা এখন প্রপঞ্চময় এই অদ্ভুত বিশ্বের বিশালত্ব ও মহত্ত্ব দর্শন করতে এবং প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম হতে বৃহত্তম পর্যন্ত প্রতিটি বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশেও অপরিসীম সৌন্দর্য ও পূর্ণতার সন্ধান করতে সক্ষম। বিজ্ঞান আমাদের নিকট প্রকৃতির রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে এবং সত্যান্বেষীকে বিবর্তনের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তির রাজ্যে। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিই অণু-পরমাণু নামে পরিচিত ও তারা অদৃশ্য বস্তুকণিকার উপর ক্রিয়াশীল। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের সৃষ্টিকারী মৌলিক উপকরণগুলিকেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নি, বরং সম্প্রতি তারা আমাদের কাছে এমনও ব্যক্ত করেছে যে, এতদিন যা' পরমাণু নামে পরিচিত ছিল, আসলে তা'-ও অবিভাজ্য একক নয়, বরং বিভাজ্যবস্তু। এগুলি পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মকণিকা। প্রতিটি পরমাণুকে আবার ইলেকট্রন ও প্রোটন-এ বিভক্ত করা যেতে পারে, আর সেগুলিই পরমাণুর অবয়ব গঠন করে। প্রতিটি ইলেকট্রনকে ঋণাত্মক বিদ্যুৎশক্তির অতিসূক্ষ্ম এক একটি কেন্দ্র বলা যেতে পারে। আকর্ষণ-বিকর্ষণের নিয়মানুসারে এ-সকল ইলেকট্রনই অণুপরমাণু, এবং প্রকৃতির মৌলিক পদার্থগুলি সৃষ্টি করে থাকে।

বর্তমানে নূতন জ্ঞানালোক আমাদের মনের দূর-দিগন্ত ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করেছে। এর সাহায্যে আমরা এমন-কিছু দর্শন করি যা' বিগত দিনের চিন্তানায়কদের কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করেছে যে, প্রাকৃতিক শক্তির বিভিন্ন রকমের অভিব্যক্তি, যেমন বিদ্যুৎ, তাপ, আলো, গতি, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি—যেগুলি একটিমাত্র শাশ্বত মহাজাগতিক শক্তির বিভিন্ন রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

সকলেই জানি যে, আধুনিক বিজ্ঞান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ ধরনের সৃষ্টির মতবাদকে ধ্বংস বা নস্যাৎ করেছে, বরং বিজ্ঞান পক্ষান্তরে এটাই প্রমাণ করেছে যে, এই পৃথিবী ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই বিবর্তনের মাধ্যমেই বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁচেছে আর এই

বিবর্তন কর্ম ঘটাতে নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। এই বিবর্তনবাদ দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞান বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছে, কারণ বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব হচ্ছে বিশেষ ধরণের এক সৃষ্টির মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান শতাব্দীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি বাস্তব দৃশ্যমান এই বিশ্বজগতের অত্যাশ্চর্য জিনিসগুলিকে আমাদের চোখের সম্মুখে প্রতিভাত করেছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে, এই পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব মাত্র নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। অধিকাংশ গ্রহই আমাদের নিকট হ'তে দশকোটি মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত। আমাদের এই সৌরজগতের ব্যাস ছয় শ কোটি মাইল। আলোক-রশ্মি প্রতি-সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে, সুতরাং ঐ দূরত্ব অতিক্রম করে আমাদের কাছে আলো আসতে মাত্র ন' মিনিট সময় লাগে। সৌরজগতের বাইরে যে নক্ষত্রটি আমাদের নিকটতম, সেইটিও এত বেশী দূরে রয়েছে যে, তা'র বিচ্ছুরিত আলো আমাদের এই পৃথিবীতে পৌঁছুতে সাড়ে তিন বৎসর লাগে। এ-সকল নক্ষত্রের মধ্যে কোন-কোনটি আবার এতই দূরে রয়েছে যে, আজ আমরা তাঁদের যে আলো দেখ্‌ছি, তা' হয়তো যিশুখৃষ্টের জন্মেরও বহু পূর্বে, যে-সময় ইজিপ্টের পিরামিড নির্মিত হয়েছিল তা'রও পূর্বে।—এমন কি বাইবেলের ওল্ড-টেস্টামেন্টের প্রথম গ্রন্থ জেনেসিস্-এর মতবাদ-অনুসারে এই পৃথিবী-সৃষ্টিরও বহু পূর্বে সেই সকল নক্ষত্র হ'তে নির্গত হয়েছিল। যখন সেই আলো এসে আমাদের এই গ্রহে পৌঁছে, তখন শত শত বৎসর পূর্বেকার যে-নক্ষত্রটি হ'তে এই আলো নির্গত হয়েছিল, সেই নক্ষত্রটি হয়তো ইতিবসরে নির্বাপিত হ'য়ে গিয়েছে। চিন্তা করুন একবার, এই মহাশূন্যের অসীমতা আর এই বিশ্বজগতের বিশালতা-সম্পর্কে! চিন্তা করুন সেই সময়ের কথা, যে-সময় এ-সকল জ্যোতিষ্ক মহাকাশে প্রথম বিকাশ লাভ করেছিল। এবার আপনারা আপনাদের শৈশবে সৃষ্টিতত্ত্বের যে-কাহিনী শুনেছেন, তার সঙ্গে আপনাদের বর্তমান ধারণার তুলনা করুন।

বর্তমান শতাব্দীর ভূবিদ্যা-সম্পর্কিত গবেষণাগুলি প্রমাণ করেছে যে, খৃষ্টানদের বাইবেলে বর্ণিত মাত্র ছ' হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম মানবজাতির অভ্যুদয় হয় নি, বরং আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার কিংবা তা'রও বহু বৎসর পূর্বে টার্শিয়ারি যুগে মানব জাতির প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল।

তুলনামূলক শব-ব্যবচ্ছেদবিদ্যা এবং শরীরবিদ্যা প্রমাণ করেছে যে, মানুষের যান্ত্রিক গঠন "জেনেসিস্-এ বর্ণিত বিশেষ কোন সৃষ্টির ফল নয়, বরং নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর যান্ত্রিক গঠনের সঙ্গে তা' নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী হ'তে উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর বিবর্তনের ক্রমিকপদ্ধতির পরিণতিই মানব। অধিকন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হাতেকলমে পরীক্ষা করা হয়েছে যে, প্রাণ-পদার্থটি নিজেকে কেবলমাত্র প্রাণীর মাধ্যমেই স্পষ্ট করে প্রকাশ করে না, বরং বৃক্ষাদি, এমন কি অজৈব ধাতুর মাধ্যমেও সেটি নিজেকে প্রকাশ করে। বর্তমানে আমরা জেনেছি যে উদ্ভিদেরও চক্ষু এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় আছে। তাদেরও স্নায়ুতন্ত্রের মতো একটি নিয়মতান্ত্রিক নাড়ীর স্পন্দন, হৃৎস্পন্দন, এবং বেদনা প্রভৃতি অনুভব করার ক্ষমতা আছে। যাঁরা স্যার জে. সি. বসুর "রেস্পন্স্ ইন্ দি লিভিং এ্যাণ্ড নন্-লিভিং" (জীব ও জড়ের মধ্যে প্রাণস্পন্দন) নামে বিখ্যাত পুস্তক গ্রন্থটি পাঠ করেছেন, তাঁরা স্মরণ করতে পারবেন যে, লোহা কিংবা টিন প্রভৃতি সাধারণ ধাতুর মধ্যেও প্রাণশক্তির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা

যায়। সজীব প্রাণীর মাংসপেশী কিংবা সজীব মাংস-কলা (tissue) তড়িৎ-আঘাতে ঐ ধাতুগুলিও ঠিক সেরূপ ভাবেই সাড়া দেয়। এই আবিষ্কারটি প্রাণ ও নিষ্প্রাণ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আমূল পরিবর্তন করেছে। অধিকন্তু, এই আবিষ্কারটি বেদোক্ত সেই প্রাচীন সত্যকেই একান্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে,—জীবনী শক্তি অথবা প্রাণ এক এবং বিশ্বজনীন, যদিও তা'র অভিব্যক্তি বহুপ্রকার। [ক্রমশঃ]

●

॥ সংঘ-বার্তা ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চের ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ৪ দিন ব্যাপী ১৪৩ তম জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, আরাত্রিক, হোম, প্রসাদ বিতরণ, গীতি—আলেখ্য প্রভৃতি প্রথমদিনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় দিনের সাধারণসভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ বলেন, মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে অবতার পুরুষ নেমে আসেন ধরাধামে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এসেছিলেন এই যুগো-প্রয়োজনে। কিন্তু আমাদেরকে ভাবতে হবে এই যুগে তিনি নতুন কি দিলেন। তিনি নতুন-পুরাতনের মিলন ঘটালেন। তিনি নতুন অবতার এবং অসাম্প্রদায়িক ভাবধারা দিয়ে বিশ্বকে নতুনভাবে সম্বন্ধ করেছেন। সকলকে সমানভাবে দেখতে বলেছেন তিনি। স্বামীজীর জীবনের আদর্শ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা থেকেই গ্রহণ করেছেন। এই বিভেদময় সংসারে, হতাশার সংসারে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলে আমরা শান্তি পাবো। সমস্ত ভেদাভেদ দূর করে এক মহামিলনের সেতু তৈরীর জন্যে তিনি এসেছিলেন। ভাব-সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক শ্রীশ্রীঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন প্রতিটি মানুষের প্রাণের কথা। অতি সহজ-সরল ভাষায় তিনি সব-সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁকে গ্রহণ করতে পারলে আমরা ধন্য হবো।

শ্রীমৎস্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ বলেন, শুধু মন্দিরে প্রনাম করলে হবে না। যাঁকে প্রনাম করলাম—কেন তিনি প্রণম্য, কি তাঁর ভাবধারা, তা বোঝা আরও বেশী প্রয়োজন। স্বামীজী বলেছেন—ওরে, তাঁর নাম চলে যাক কিন্তু তাঁর বাণী জগতে প্রচারিত হোক। তথ্যদিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। পৃথিবীতে তিনি অবতরণ করলেও এই পৃথিবী তাঁর একটি অংশমাত্র। তাঁর দিব্য স্বরূপ বুঝতে হলে অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হবে। তবুও মানুষ প্রথমাবস্থায় বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চায়। তাঁকে বুঝতে হলে একটি সমগ্র জাতির ইতিহাস জানতে হবে। একজন দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ কিভাবে পূজনীয় হলেন তা জানতে হবে। ভারতবর্ষের সমস্ত ধারাকে আমরা একসাথে তাঁর মধ্যে পাই। সর্বধর্ম সমন্বয় তাঁরই দান। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র বিশ্ব এক মহা-মিলনে ঐক্যবদ্ধ হবে। আমাদের উচিৎ তাঁর ভাবধারাকে গ্রহণ করা এবং বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া।

অধ্যক্ষ অমিয় কুমার মজুমদার বলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন এক বিপ্লবীক শিক্ষক। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের প্রকৃত পন্থার নির্দেশ তিনি দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর আদর্শ গ্রহণ করলে আমরা প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতে পারবো। আজকের নৈরাশ্যও বিদূরিত হবে।

বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র বলেন, এই উৎসবের মূলে তত্ত্ব সমন্বয়ী-দর্শনের তত্ত্ব। আজকের পরিস্থিতিতে আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী বিশেষভাবে মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'যতমত ততপথ'। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বের ঘটনাবলী প্রমাণ করলো যে একই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হলেও শান্তি আসে না। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি না করলে কিছুতেই শান্তি আসবে না। আজকের দিনে এই প্রার্থনা করি—তিনি যেন আশীর্বাদ করেন যে, তাঁর প্রচারিত সত্য যেন আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং অন্যের মধ্যে প্রচার করতে প্রয়াসী হই।

সভায় সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে আনন্দদান করেন ছাত্রদের শিল্পিবৃন্দ। শান্তি পাঠ করেন স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ও ধন্যবাদ জানান স্বামী পরমাত্মানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম দার্জিলিং, কার্সিয়ং এবং শিলগুড়িতে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয় যথাবিহিত মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে।

●

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ত্রাণকার্যের জন্য বিশ্বাণীর গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ,
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
চেক 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' এই নামে হইবে।

উক্ত ত্রাণকার্যে এযাবৎ যাঁহারা সাহায্য পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের আদায়ীকৃত অর্থ ও দ্রব্যাদি বেলুড়, রামকৃষ্ণ মিশনে জমা দেওয়ার তারিখ ও রসিদ যথা :—

৩২।১।৭৯ রসিদ নং ১৭২১—১০৮ টাকা

৭।২।৭৯ রসিদ নং ২৭৫—রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে :—

পুরানো বড় ধুতি—৯টি
,, ,, ডাবু হাতা—১টি
,, ,, ছাতা—১৮টি
পুরানো বড় বেল্চা—২টি

৬।৩।৭৯ রসিদ নং ২৬১৯—৩৬৭ টাকা

●

বিশ্ববাণী

॥ বর্ষসূচী ॥

(ফাল্গুন ১৩৮৪—মাঘ ১৩৮৫)

অগ্নিপুরাণ সাঙ্গীতিক কাব্য, রীতি ও ভাষা—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—৩৪

অন্ধকার চিত্র-দর্শন বিদূর পণ্ডিত জ্ঞাতক শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগী—১২০, ২০২, ২৩৭, ২৯০, ৪৬৩, ৫০৫

আচার্য ভর্তৃহরি শব্দতত্ত্ব—অধ্যাপক বিধুভূষণ ভট্টাচার্য—৪১১

এসো তুমি বরাভয়—নন্দলাল বেরা···১০৬

কিন্নরের দেশে—শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—১২৪, ১৬৭, ২০৫

কর্মজীবনের মর্মকথা—স্বামী পরমাত্মানন্দ—১৯৬

কাজার দুর্গম পথে—শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—৪৬১, ৫০৯, ৫৭৪

গুচ্ছ—শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী—৪১, ৬৪

গ্রন্থসমালোচনা—১৩১, ২০১, ২৫১, ৫৭৮

গান—শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস—৪২৮

জগন্মাতা মা-সারদামণি—শ্রীমণিমোহন রায়—৪৮৮

টাল্টিনের স্মৃতিতে বিবেকানন্দ—স্বামী চেতনানন্দ—৩৫১

তবুও কি—শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী—৪০৪

দাক্ষিণাত্যের দেবদেউলে—শ্রীপ্রাশুতোষ ঘোষ—১০৭, ১৫২, ১৯১, ২৩৩, ২৮১, ৩৩৮, ৫০০, ৫৬২

দেশের মাটি—শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী ঘোষ—১৬১

দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে ধর্মতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গে—ডঃ গোপালচন্দ্র দত্ত—২৪০, ২৯৪

দুর্গাস্তোত্রম্ - অধ্যাপক বিধুভূষণ ভট্টাচার্য—৩৪৪

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা—ডঃ হরেনারায়ন ভট্টাচার্য—৩৪৬

নববর্ষ—১

পঞ্চানন রায়—আঞ্চলিক ইতিহাস ও মন্দির চর্চার আলোকে—শ্রীহারাধন দত্ত—৩৭

পাপ-তাপ—ডঃ রমা চৌধুরী—৭৪

পঙ্কজ মল্লিক স্মরণে—শ্রীমতী সন্ধ্যা সেন ৭৯

পুণ্যাত্মা স্বামী পরমেশ্বরানন্দ স্মরণে—শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ—২৯৯

প্রার্থনার রূপ—শ্রীরনজিৎকুমার সেন—৪৪৭

পরলোক বিশ্বাসী টোডা আদিবাসী—শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—৭৭

বাণী ও কিরণ—২, ৮১, ১৩১, ১৭১, ২১১, ২৫০, ৩০৫, ৪২১, ৪৭১, ৫১৯, ৫৫১

ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণকৃত—স্বামী প্রভানন্দ—১৩, ১০০, ১৩১, ১৭৭, ২৪৪, ২৭৪, ৩১৯

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানুষ—ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী—২১

বক্রেশ্বর মহাতীর্থ—শ্রীশুক্লা ঘোষ—৬৫

বাংলার রূপ—জীবনানন্দ ও নজরুলী—ডঃ রামজীবন আচার্য—১১২

বিবেকানন্দমননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ—২৫৫, ১৮২, ২২৯, ২৭৭, ৪৯৭, ৫৪০

বৌদ্ধ-কর্মনের উদ্ভব—শ্রীঅমল বড়ুয়া—১৫৫

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-চিন্তা—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—৩৬০
বঙ্গবাসী পত্রিকা ও হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য—শ্রীহারাধন নস্ত - ৩৭৪
বালক বিবেকানন্দ —শ্রীপ্রবকুমার দত্ত—৫৯৩
ভারতীয় সঙ্গীতে অন্তরা—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ৩৬৭
ভুলে যে যাই—শ্রীলাবণীল দাস—৪২০
ভূস্বর্গ কাশ্মীর—শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ—৪২৭
মল্লভূমের প্রথম রাসযাত্রাভিনয়—শ্রীমাণিকলাল সিংহ—৫১
মনোসমীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে মনোযোগ —শ্রীপ্রব বসু - ২৮৪
মধুসূদনের সাহিত্যে কৃষ্ণ কথা ও রুক্মপ্রসঙ্গে বীরঙ্গনাকাব্য—ডঃ রামজীবন আচার্য—১৪০
মনোবিজ্ঞানের দার্শনিক পটভূমিকা – ডঃ শ্রীমতী মঞ্জুরী সেনগুপ্ত—৩৮৪
মানসিক সংগতি অপসংগতি—ডঃ মঞ্জুরী সেনগুপ্ত - ১০১
রবীন্দ্রনাট্য সাঙ্কেতিকতা—শ্রী আশুতোষ ঘোষ - ৫৮৬
রহস্যময়ী বৈদ্যুতিন—শ্রীমতী চামেলী বসু - ৪০৫
শ্রীরামকৃষ্ণ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ —শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—৬
শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা—শ্রীসুরেশ চৌধুরী—১২
শিক্ষা প্রসঙ্গে বুদ্ধ, সক্রেটিস ও রবীন্দ্রনাথ—রণজিৎকুমার সেন—৪১
শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ অভেদানন্দ—শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ—১০৩, ১৪৩, ২২৫, ২৬৭, ৩২৩, ৪৮১, ৫০৮, ৫৫৯
শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্প সমালোচনা—১২৩, ১৬১, ২০৭, ৩০১, ৪৬১, ৫১৩, ৫৭৬
শিল্পিত সিরামিকস—শ্রীদিবাকর সেনরায়—১৬৫, ২০০, ২১৭, ৪৫৬
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে—গৌরী পণ্ডিত—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—১৮৬, ২২০, ২৬৮, ৩১৫,
শ্যামাসঙ্গীত—শ্রীসুরেশ চৌধুরী—৩৭৩
শ্রীরামকৃষ্ণ লোকশিক্ষার চাপরাশ দেন—স্বামী প্রভানন্দ —৩৯৩
শাক্তপদ সাহিত্যে ভক্তের আকুতি ও রূপকের রূপ—ডঃ রামজীবন আচার্য—৪৫১
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—৪৯২, ৫৩৩
শ্রীশ্রীমায়ের গীত—শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস—৫৬২
শ্রেষ্ঠতীর্থ গঙ্গাসাগর—শ্রীসত্যেশ্বর অধিকারী—৫৬৮
স্বামীজী শিষ্যা এমা কালভে—শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়—২৭
স্বামী অভেদানন্দের দৃষ্টিতে জন্মান্তরবাদ—স্বামী পরমাত্মানন্দ—৬১
সৃষ্টিতত্ত্ব ও মুক্তি—শ্রীআশুতোষ ঘোষ—৭০
সংবার্তা—৮৫, ১২৯, ২৫২, ৩০৪, ৪৭১, ৫১৫, ৫৬৮, ৬৮২
সুকৃতি—৮৭
স্মৃতিচারণ—শ্রীব্রজগোপাল দত্ত—১৪৯, ১৯০, ১২৭
স্বামী অভেদানন্দ একটি বিস্ময়—শ্রীমিহিরলাল দত্ত—৩২১
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিকত পত্র—৩৪৫
স্বামী অভেদানন্দের দৃষ্টিতে হঠযোগ বনাম রাজযোগ—স্বামী পরমাত্মানন্দ—৪৪০
স্বামী কৈলাসানন্দ স্মরণিকা—শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ—৫৭১
স্তবক—শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী—৪১৫

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set	
Christian Science and Vedanta	
Doctrine of Karma	9·00
Divine Heritage of Man	
Epistles	12·00
Great Saviours of the World	15·00
How To Be A Yogi	10 00
Human Affection and Divine Love	4.00
Ideal of Education	3·00
India and Her People	12 00
Life Beyond Death	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00
My Life Story	12·00
Mystery of Death	18 00
Path of Relization	
Philosophy and Religion	
Reincarnation	8·00
Religion of the Twentieth Century	2·00
Religion, Revelation and God	12·00
Self Knowledge	12 00
Science of Psychic Phenomena	8·00
Spiritual Unfoldment	6 00
Swami Vivekananda and His Works	2·00
The Bases of Indian Culture	75·00
The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
The Steps Towards Perfection	2·00
The Vedanta Philosophy	
Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
True Psychology	16·00
Universal Religion and Vedanta	12·00
Yoga Psychology	16·00
Yoga : Theory & Practice	10 00
Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00
Swami Abhedananda in America	6.50
Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda-The Patriot Saint	20.5

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music	
A History of Indian Music	15.00
Christ the Saviour	2.00
Historical Development of Indian Music	65.00
Music of the Nations	35.00
Philosophy of Progress and Perfection	
Sangitasara-Samgraha	7.50
Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	00.30
Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
19B, Raja Rajkrishna Street
CALCUTTA-700 006

রূপচর্চ্চায়
কে.হোড়ের
প্রসাধনী

কে.হোড় [illegible]

১৯৩০ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানাম-ব্রত ব্রহ্মচারী এম এ., পি. এইচ ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগোপকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। গৌরকথা (১ম - ৩য়) ১ম খণ্ড ৪·০০, ২য় খণ্ড ৪·০০, ৩য় ৭·০০
৩। সপ্তশতী সমন্বিত চণ্ডীচিন্তা ৪·০০
৪। উদ্ধব-সন্দেশ ৫·০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কন্দ (৪ খণ্ড) ১৯·৫০
৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ ৫·০০
৭। উপনিষদ্ ভাবনা ১ম-২য় ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান

১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫১, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা
৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

লব্ধপ্রতিষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া—
কুষ্ঠ-কুটীর

সর্ব্বজনসমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

অসাড় কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসালয়ে অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত রোগের জন্য যাঁহারা সর্ব্বচিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা 'হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর পি, বি, ৭, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৫৯)
শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য-ভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৩ টাকা মাত্র।
শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ৮ টাকা।
সন্তানতী রহস্যের মূল্য ৪ টাকা।
উভয় গ্রন্থ একত্রে ১২ টাকার স্থলে ১০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিষ্টস্ এণ্ড পাবলিশার্স
Wire : Similicure ৭:, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৩৩ এ/৬২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতসাম্রাজ্ঞী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা (মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ)	২০.০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত	
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)	১৮.০০	কায়মে বাঙালী	৪.০০
সটীকস্থ শ্রীগীতা	১২.০০	বীরত্বে বাঙালী	০.৫০
শিক্ষাব্রতীর ধর্মশিক্ষা	৪.০০	বিজ্ঞানে বাঙালী	৮.০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী		বাংলার ঋষি	৭.৫০
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩		বাংলার মনীষী	৩.০০
		বাংলার বিদুষী	৪.০০
		ব্যবহারিক শব্দকোষ (প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)	১৫.০০

Established by
ami Abhedananda
VISVAVANI

R.N. 13733/57
41st Year, April 1979
VOL. II

Regn. No. WB/NC-141
PHONE : 55-1800

- 3 MAY 1979

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

কুক্‌মী

ভারতের সেরা

গুঁড়া মশলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুক্‌মী প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী
ফোন-৩৩-০৯১৫
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

PRICE Rs. 1·50
Sri Ramakrishna Vedanta Math,
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700006.
মূল্য ১·৫০ টাকা

স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

একচল্লিশ বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
বৈশাখ
১৩৮৬

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬'০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে প্রত্রিন 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১'৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১'০০ টাকা ও ৬'০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

  বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।
- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখিবে সব গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২'৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

সদ্য প্রকাশিত হইল !

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তত্ত্বকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সম্বন্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
প্রকাশন বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮৫০)
১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬।

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	১০·০০
মরণের পারে	১৪·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	যন্ত্রস্থ
যোগশিক্ষা	যন্ত্রস্থ	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	৬·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	যন্ত্রস্থ
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	৪·০০	আত্মজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ (৫ম নূতন সংস্করণ)	৬·০০

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ		তীর্থরেণু (বর্ধিত ২য় সংস্করণ)	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	যন্ত্রস্থ	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্ধ	যন্ত্রস্থ
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ (প্রথম ভাগ)	১৬·০০	সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	১২·০০
ঐ (দ্বিতীয় ভাগ)	১৪·০০	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০

আয়ুর্বেদীয় পেটেন্ট ঔষধ

ভাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩৯৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিস্টার্ড নং ১৩৭০৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

বৈশাখ , ১৩৮৬

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

: উপদেষ্টামণ্ডলী :
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিশ্র
ডঃ শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

: সহায়কমণ্ডলী :
স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

: প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

: প্রকাশক ও মুদ্রক :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে
স্বামী পরমাত্মানন্দ
: কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
: সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

: প্রচ্ছদপট শিল্পী :
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ :
শ্রীপার্বতীচরণ রায়
দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯।এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবতগীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'যোগশিক্ষা' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম. এস. সি., এম. বি. (কলিকাতা), ডি. টি. এম. (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/এ.ডব্লু.সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট·কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯। ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

"JECO" BRAND POLYTHENE & P.V.C PIPES

"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC

COMBS & NOVELTIES

P.O. [illegible] CAL-[illegible]

ডি.রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, [illegible] ষ্ট্রীট, কলি-৬

[illegible]

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিধাদি পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service ;—

Please Contact :—

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road. Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

49, Netaji Subhas Road

Calcutta-8

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

রামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম. সি. পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০নং বিধান সরণী হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

Please Contact :—

D. BANERJEE & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fiting, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street, Calcutta-700005, Gram : PLAINED

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005. Post Box No. 12206. Calcutta-700005. Telephone : 55-6172

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৫৫-১৬১৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা তিল তৈল

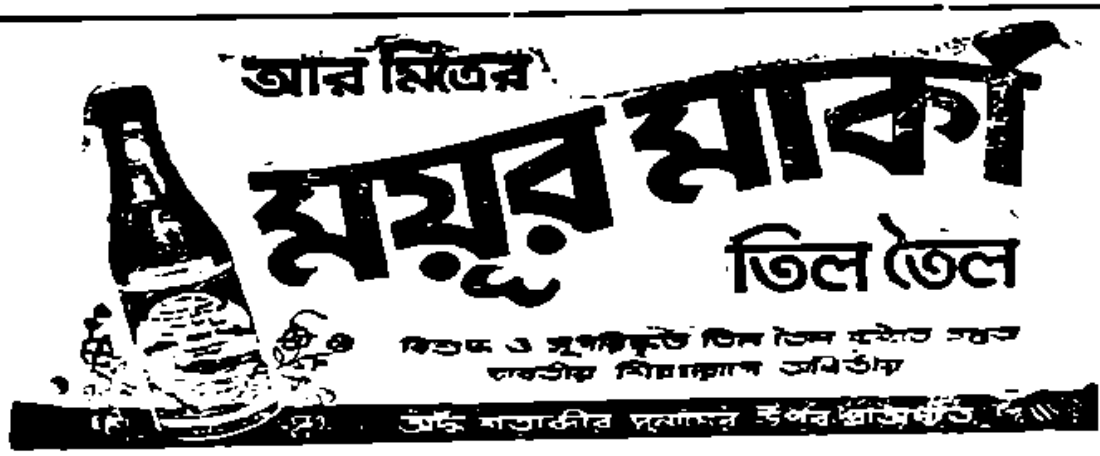

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮
মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী ● পাটনা ● ধানবাদ ● কটক ● শিলিগুড়ি ● গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

বৈশাখ, ১৩৮৬

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	১৫	
২।	ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ	১৮	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	স্বামী অভেদানন্দ (জীবন-নাট্য)	১০১	বিমল ভূষণ
৪।	সঙ্গীতে রস ও সাহিত্যের সার্থকতা	১০৪	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৫।	দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে	১০৮	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
৬।	যুগপ্রবর্তক রামমোহন	১১০	শ্রীতারকনাথ ঘোষ
৭।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	১১৩	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৮।	প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কালবিচার	১১৫	শ্রীঅমিতাভ রায়
৯।	রাকু ইয়াকী	১১৮	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১০।	গ্রন্থ-সমালোচনা	১২১	
১১।	সংঘ-বার্তা	১২৪	

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক
শান্তিরস সালসা
ব্লেণ্ড এণ্ড কোং
ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে
বাত বেদনায় অব্যর্থ
সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য
৪০১/৭ এ, আপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

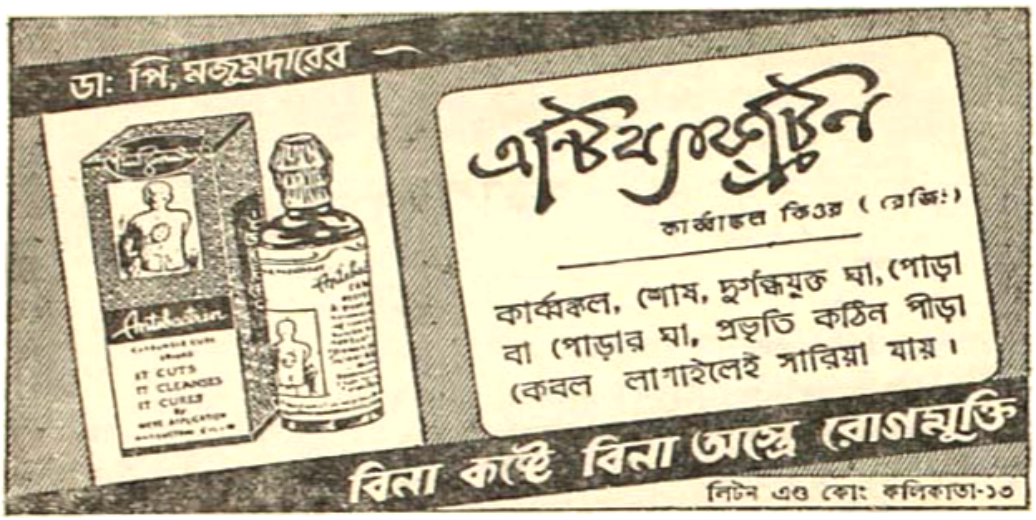

সাহিত্য সংসদের নতুন অবদান !

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত

বাঙলা ভাষার অভিধান

সাহিত্য সংসদ কর্তৃক চল্লিশ বছর পরে অফ্‌সেটে পুনর্মুদ্রিত হয়ে আবার প্রকাশিত হচ্ছে। ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের ভূমিকা সন্নিবিষ্ট। দুই খণ্ডে এক লক্ষ পনের হাজারের বেশী শব্দ ও শব্দাবলী। দুই খণ্ডে প্রায় ২৪০০ পৃষ্ঠা। মজবুত বোর্ড ও কাপড়ে বাঁধাই :

সাধারণ মূল্য : ১০০·০০ টাকা
গ্রাহক মূল্য : ৮০·০০ টাকা

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সীমিত সংখ্যা ছাপা হচ্ছে। নগদে কুড়ি টাকা পাঠিয়ে এখুনি গ্রাহক হোন। প্রথম খণ্ড নেবার সময় ৩৫·০০ টাকা এবং দ্বিতীয় খণ্ড নেবার সময় ২৫·০০ টাকা দেয়। ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র। আগস্ট '৭১ তে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবে।

গ্রাহক হবার ঠিকানা—

সা হি ত্য সং স দ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

এবং

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

২১/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

বিশ্ববাণী

একচল্লিশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা | বৈশাখ ১৩৮৬

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ ষ্টার-থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দর্শন ॥

(দ্বিতীয় অংশ)

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বাগবাজার-এ্যামেচার-থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা ক'রে গিরিশচন্দ্র 'সধবার একাদশী' অভিনয় করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর 'ন্যাশানাল-থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর 'গ্রেট-ন্যাশানল-থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বিনোদ-রঙ্গমঞ্চে ও ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তা বন্ধ হয়ে যায় নানাকারণে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জুলাই 'ষ্টার-থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন গিরিশচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ষ্টার-থিয়েটারেই (বিডন ষ্ট্রীটে) প্রথম পদার্পণ করে 'চৈতন্যলীলা' দর্শন করেন। হাতীবাগানে বর্তমান ষ্টার-থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসেন নি।

২২শে সেপ্টেম্বর (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) ৭ই আশ্বিন (১২৯১ সাল) "একখানি পাল্কীগাড়ী আসিয়া থিয়েটারের (ষ্টার-থিয়েটার) দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। গাড়ীর ভিতরে আছেন স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব, সঙ্গে কয়েকজন শিষ্য, ঠাকুরের যেন ভারী উৎসাহ। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে একজন ভক্ত তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। গিরিশ তখন সেইখানেই পায়চারী করিতেছিলেন। মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী বাগবাজার। গিরিশবাবুর তিনি পূর্বপরিচিত। গিরিশবাবুকে দেখিয়াই বলিলেন—

"এই যে গিরিশবাবু, পরমহংসদেব এসেছেন থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখতে। আমরা কয়জন ভক্তও সঙ্গে আছি। কি বলতে দেন্‌তো ভাল, নচেৎ সবারই টিকিট কিনবো।'[১]

"গিরিশটার উপর গিরিশ মোটেই বিশেষত্ব আরোপ করিলেন না! তিনি বলিলেন: 'পরমহংসদেবের টিকিট লাগ্‌বে না, কিন্তু অপর সকলের টিকিট লাগ্‌বে।

"কিন্তু কেন যেন তৎক্ষণাৎই গিরিশ গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইয়া ঠাকুরকে অভ্যর্থনা

১। দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভক্ত-বৈদ্য গিরিশচন্দ্র' (১৩০৮) পৃ: ১১

করিতে গেলেন। ঠাকুর ইতিপূর্বেই নামিয়া গিরিশের দিকে আসিতেছিলেন। কোথায় গিরিশ নমস্কার করিবেন, ঠাকুর আগেই নমস্কার করিলেন। পরে গিরিশ নমস্কার করিলেন, আবার ঠাকুর নমস্কার করিলেন।"

গিরিশচন্দ্র মনে মনে নমস্কার ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে উপরে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন—সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। চৈতন্যলীলা-অভিনয় দেখার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বারবার সমাধি হ'তে লাগলো। তিনি চিন্তা করলেন—গিরিশ তার পূর্ব-আলাপী। ভক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন: "মনে পড়িল—মাঝে ভাকিবার সময়ে একদিন দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে একটি উলঙ্গ উগ্র বালকমূর্তি নাচিতে নাচিতে আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার মাথায় ঝুটি বাঁধা, কোমরে রূপার পেটি, বাম-কুক্ষিতে সুরাপাত্র, দক্ষিণহস্তে সুধাভাণ্ড। এই না সেই? সেই সময়ে সেই বালককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল —"কে তুমি?" বালক উত্তর দিয়াছিল: "আমি ভৈরব, আপনারই কাজ কর্তে এসেছি"। থিয়েটারে উপস্থিত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিন্‌তে পারলেন—'এই সেই ভৈরব'। ভৈরব গিরিশচন্দ্রের বেশে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম বাঙলার ঘরে ঘরে প্রচার করবেন এবং প্রতিটি অভিনয়মঞ্চকে শ্রীরামকৃষ্ণতীর্থে পরিণত করবেন। ভক্ত অক্ষয়কুমার সেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে এ' ঘটনা সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব চৈতন্যলীলা দর্শন ক'রে আত্মহারা হয়েছিলেন। ভক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন: "অভিনয়ান্তে অমৃতলাল বসু প্রভৃতি সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। যে অভিনেত্রী চৈতন্য সাজিয়াছিল, তাহার নাম বিনোদিনী, সেও সাষ্টাঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিল। বিনোদিনী গঙ্গাস্নান ও হবিষ্য করিয়া তবে চৈতন্যের ভূমিকায় নামিত। ঠাকুর তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—

"মা, তোর চৈতন্য হোক্"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রথমবার 'চৈতন্যলীলা' দেখে ঘোড়ারগাড়ীতে ওঠার সময়ে কত-কি কথা বল্‌লেন ও শেষে গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন—'আর একদিন থিয়েটার দেখাবে হে?'

গিরিশচন্দ্র বল্লেন: 'যে আজ্ঞে, আপনার যেদিন ইচ্ছে হয়—দেখ্‌বেন'।

ঠাকুর—'দেখবো তো, কিছু নিতে হবে'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট কিছু নেওয়ার অর্থ তখন গিরিশচন্দ্র ঠিক বুঝতে পারেন নি। দেওয়া-নেওয়ার কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবই প্রথমে বল্লেন, অথচ শ্রীরামকৃষ্ণদেব টাকাকে মাটি জানই কর্‌তেন। গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে কিছু নেওয়ার কথা শুনে বল্লেন: 'বেশ তো, আপনি আটআনা দেবেন'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বল্লেন: 'মাত্র আটআনা?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বল্লেন: 'না হে; সে বড়ই ব্যাজ্‌লা জায়গা।'

গিরিশচন্দ্র: 'তা কেন?—আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন সেখানেই বসবেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব: 'বস্‌বো তো, তবে একটি টাকা নিও।'

গিরিশ: 'যে আজ্ঞে, আপনি তাই দেবেন।'

গিরিশচন্দ্র তখনও ঠিক 'একটি টাকা নিও' কথার যথার্থ অর্থ বোঝেন নি। গ্যালারির তখন টিকিটের মূল্য ছিল আটআনা।

এখানেই উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা সমাপ্ত হ'ল, কিন্তু সেই 'একটি টাকা নিও' কথার মর্ম তখনও বুঝতে পারেন নি গিরিশচন্দ্র! আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রকে ষোলআনা

কৃপাই করতে চান। ভবিষ্যতে গিরিশচন্দ্র ঐ একটাকা বা ষোলআনার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। কোন এক প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি গিরিশচন্দ্রের ভক্তির কথা উল্লেখ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : 'গিরিশের পাঁচসিকে পাঁচআনা বিশ্বাস'। এখানে গিরিশচন্দ্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের ষোলআনা কৃপার পরিবর্তে ভক্ত ও শরণাগত শিষ্যের বিশ্বাসকে তিনি আরও বেশী ক'রে দেখে বলেছিলেন : 'গিরিশের পাঁচসিকে পাঁচআনা বিশ্বাস ; অর্থাৎ ষোলআনা কৃপার অধিকারী হয়ে ভক্ত গিরিশচন্দ্র তাঁর করুণার সাগর গুরু বা আচার্যদেবকে ভক্তি-বিশ্বাসের বিনিময়ে পাঁচসিকা পাঁচআনা দিয়েছিলেন। ভক্তের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস গুরুর কৃপা-সীমাকেও অতিক্রম করেছিল ! ভক্তের নিকট ভগবান চিরদিন পরাজিত !

এরপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (৮ম পরিচ্ছেদ) শ্রীম বা মাস্টার মহাশয় আলোচনা করেছেন : **'গৌরাঙ্গপ্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুর রামকৃষ্ণ'** (২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৮২)। মাস্টার মহাশয় লিখেছেন : "অভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়িতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন দেখ্‌লেন' ? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'আসল-নকল এক দেখলাম' (একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কলকারখানা হইয়া দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ি অভিমুখে রওনা হইলেন। "গাড়ীতে মহেন্দ্র মুখুজ্যে এবং আরও দু'তিনটি ভক্ত (বাবুরাম মহারাজ, কালীপ্রসাদ ও লাটু মহারাজ—যথাক্রমে স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ছিলেন। মহেন্দ্র খানিকটা এগিয়ে দিবেন। ঠাকুর আনন্দে যাইতেছেন ও গান আরম্ভ করিলেন—

গৌর নিতাই তোমরা দু'ভাই
পরমদয়াল হে প্রভু,
(আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ)।
আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে
আমায় করেছিলেন কাশী-বিশ্বেশ্বরে,
এ যে পরব্রহ্ম শচীর ঘরে, (আমি চিনেছি হে, পরব্রহ্ম)।
• • •
জগাই মাধাই তরে গেছে,
প্রভু, সেই ভরসা আমার আছে।
(ওহে অধমতারণ)।
তোমরা নাকি আচণ্ডালে দাও কোল
কোল দিয়ে বল হরিবোল,
(ওহে পরমকরুণ), (ও' কাঙ্গালের ঠাকুর)।"

মণি বা শ্রীম-ও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন।

• • •

মহেন্দ্র (মুখুজ্যে)—'আজ্ঞা, কৃপা রাখবেন যেন ভক্তি হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—'তুমি খুব উদার সরল। উদার, সরল না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কপটতা থেকে অনেক দূর।'

কপটতা মনের তামসিক ও সঙ্কীর্ণ ভাব। সত্যকার মনের ভাব প্রকাশ না ক'রে নকল ভাব প্রকাশ করাকে কপটতা বলে। বাংলা-অভিধানে কপট-শব্দের অর্থ চাতুরী, প্রতারণা,

শঠতা, ছল, ('কলিতে কপট করি রাখ নিজ দাস')। তাছাড়া কপটাচারী তাকে বলে—যে প্রতারক, ছদ্মবেশী ও প্রবঞ্চক। সুতরাং আসলের নকল বা বিপরীত ভাবের নাম কপটতা। যেমন সত্যকার সরলতা না দেখিয়ে সরলতার ভান করা। ভান করার অর্থ সত্যকে গোপন করা। কাজেই মিথ্যা গোপন ভাব বা বিপরীত ভাব মানুষের অন্তরকে সঙ্কুচিত করে এবং সেই সঙ্কুচিত মনোভাব দিয়ে অসীম উদার সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: 'উদার, সরল না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না,' তাই অন্তরের কপট ভাবকে মন থেকে মুছে ফেলতে হয়। কপটতা অন্ধকার ও সত্যের আবরক। অন্ধকারকে যেমন সরাতে হয় আলোকের স্পর্শ পেতে গেলে, তেমনি আবরণকে না সরালে সত্যবস্তুর প্রকাশ অসম্ভব। ভগবান কারু ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরতা চান না, তিনি চান সরলতা ও স্বভাব-সুন্দর উৎসারিত মন। উৎসারিত মনের নাম ব্যাপক বা বিরাট-মন। বিরাট-মনের নাম Cosmic Mind,—যার নাম প্রকৃতি বা মহাপ্রকৃতি। শুদ্ধসত্ত্ব গুণসম্পন্ন ঈশ্বর। মহাপ্রকৃতিই প্রথমে ঈশ্বরের ও পরে মায়োত্তীর্ণ ব্রহ্মের দিব্যস্পর্শ ও উপলব্ধি দান করে। মনের স্বচ্ছতার নামই উদার ও সরল মন—যে মনের (শুদ্ধমনের) সাহায্যে ঈশ্বর দর্শন হয়।

●

॥ ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

বেদান্তের আলোকে

স্বামী প্রভানন্দ

(তিন)

একথা অনস্বীকার্য যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত আদর্শ তুলে ধরার জন্য রামমোহন প্রধানতঃ শাঙ্কর সিদ্ধান্ত ও শঙ্করের শাস্ত্র-মীমাংসা-পদ্ধতি গ্রহণ করলেও এর মধ্যে তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নি। শঙ্কর-অনুমোদিত সগুণব্রহ্মের উপাসনাপদ্ধতির সঙ্গে "দবিস্তান"-লব্ধ উপাসনা সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের বেদান্তচর্চা ব্রহ্মসূত্রাশ্রিত। অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্ম অরূপ অগম্য এই তত্ত্ব দ্বারা পৌরাণিক ধর্মমতের অযাথার্থ্য প্রমাণ ইত্যাদি রামমোহনের কীর্তিকলাপ শঙ্করবিচার-অনুসারী। কিন্তু উপাসনা সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের ৪/১/৫ সূত্রের শঙ্করভাষ্যের শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত ও যুক্তিবিচার রামমোহন গ্রহণ করতে পারেন নি; সম্ভবতঃ হৃদয়ের প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হয়েই কিঞ্চিৎ বাপছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। যুক্তি দিয়ে বাঁধানো সঙ্ক যে মানুষ সর্বদা হাঁটেন তাঁরও থাকে একটি হৃদয়। যুক্তির সঙ্গে হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতে শুধু যে সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণা কাজকর্মে স্ববৈপরীত্য এনে দেয় তাই নয়, প্রতিভাপ্রদীপ্ত রামমোহনের জীবনেও এর ফলে এসেছিল বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, মতাদর্শেও দেখা দিয়েছিল যুক্তির কাটালে কচি অঙ্কুর—বিশ্বস্রষ্টার প্রতি মানবের চিরকালের আর্তির প্রতীক ব্রহ্মোপাসনা। শুভ সংকল্প ও সাধু প্রতিজ্ঞায় বাঁধানো রামমোহনের মতাদর্শ শেষ পর্যন্ত দেশে বেদান্তের আদর্শের অনুপ্রেরণা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, সেকারণেই দেখতে পাই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই সম্পদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মৈনিতালে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

বেদান্তের উদ্গাতা রামমোহনের বৈদান্তিক মতবাদ সম্বন্ধে আরেকটি দিক ভাববার আছে। অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, "বেদান্ত সকল শাস্ত্রের সার, বেদান্তধর্মকে মানিলেই ভারতবর্ষের উদ্ধার, ইহাই রামমোহন রায়ের মনে ছিল।"[২২] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রামমোহন ভারতীয় ঐতিহ্যধারা অনুসরণ করে 'প্রস্থানত্রয়' অবলম্বনে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হলেন, যার উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম ও বিশ্বধর্ম এক পর্যায়ভুক্ত সত্য—The Universal Religion—একথা প্রমাণ করা।"[২৩] তিনিই অন্যত্র লিখেছেন, "রামমোহনের রচনার মধ্যে বেদবেদান্ত অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় ইত্যাদি মত কোথাও পাওয়া যায় না। ···রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের হাতে পড়ে রামমোহনের 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম' আর সার্বভৌমিক বা বিশ্বজনীন রইল না, কালে তা 'বেদান্তধর্মেই' পরিণত হইল।"[২৪] এখানে চক্রবর্তী মশাই মনে করেন রামমোহন 'বেদান্তধর্ম' অবলম্বন করেই সংস্কারকাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আর মুখোপাধ্যায় মশাই মনে করেন রামমোহনের বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মকে বুঝতে না পেরে তাঁর উত্তরাধিকারী রামচন্দ্র সেই ধর্মকে 'বেদান্তধর্মে' বিকৃত করেছিলেন। রামমোহন ও বেদান্তধর্ম সম্বন্ধে এধরনের বিভ্রান্তির অনেক উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। এ সকলের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বোধ করি স্বয়ং রামমোহনের স্ববৈপরীত্য আচরণ, তাঁর নিজস্ব উদ্ঘোষিত বেদান্ত মতবাদ সম্বন্ধে তাঁর নিজের দ্বিধা ও সন্দেহ। কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক্।

(ক) তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশের ৮ বছর পরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর রামমোহন একটি চিঠিতে লর্ড আমহার্স্টকে লিখেছিলেন, "Neither can much improvement arise from such speculations which are the themes suggested by the Vedanta—in what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which will teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother etc. have no real entity, they consequently deserve no real affection, and the sooner we escape from them and leave the world the better."[২৫] উনিশশতকে বেদান্তের উদ্ধারকর্তা রামমোহনের হস্তাক্ষরে এধরনের অভিমত অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি।

(খ) ষড়দর্শনের সার অদ্বৈতবেদান্তের মধ্যে শঙ্করাচার্য হতে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই নীতিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ও দৃঢ়তম ভিত্তিভূমি দেখতে পেয়েছেন; কিন্তু রামমোহন আবিষ্কার করেন এ বিষয়ে বেদান্তের অযোগ্যতা। তিনি যোগ্যতা খুঁজে পান যীশুখ্রীষ্টের উপদেশের মধ্যে। তিনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি চিঠিতে ডিগবি সাহেবকে লিখেছিলেন—"The consequences of my long and uninterrupted researches into religions truth has been that I have found the doctorine of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than any others which have come to my knowledge."[২৬]

---

২২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ পৃঃ ১৬১

২৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, ১৩৭৯, পৃঃ ১২৭।

২৪ ঐ , পৃঃ ১৩৪

২৫ S. B. Collet: The life & letters of Raja Rammohan Roy, S B S, p. 459

২৬ ঐ, পৃঃ ৭১।

বৈদান্তিক রামমোহনের এধরণের উক্তি বেদান্তমতবাদে তাঁর আস্থার গভীরতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে বৈকি।

বৈদান্তিক রামমোহনের ব্যক্তিজীবনে দেখি ভিন্ন আরেকরূপ। খ্রীষ্টমত অন্যান্য ধর্মমত অপেক্ষা নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে উন্নতির অধিক অনুকূল বলে স্বীকার করলেও তিনি আজীবন ব্রাহ্মণ্যসংস্কার আঁকড়ে ধরেছিলেন। আমরা ধর্মপ্রচারক বা সাধক ভক্ত বলতে যা বুঝি রামমোহন সেরূপ ধার্মিক ছিলেন না। অত্যন্ত সৌখীন ও বিলাসী রামমোহন ছিলেন যুক্তিবাদী সংস্কারক। মিস কোলেটের সঙ্গে 'The root of his life was religion' সিদ্ধান্তে একমত হয়েও আমরা তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে ধ্যানধারণায় যৌক্তিক এক-মুখিতার অভাব, কথায় ও কাজে স্ববৈপরীত্য, মানসলোকের গভীরে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির গভীর প্রভাব সুস্পষ্ট দেখতে পাই। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে গঞ্জাম জেলার সূর্যনারায়ণ রামমোহনের ধর্মমত বুঝতে এসেছিলেন। তিনি ফিরে গিয়ে মাদ্রাজে গভর্ণরকে নিবেদন করেন, "...He (Rammohon) is neither a Christian, a Mohammedan or a Hindu, but a free thinking man, abandoned by all religions'। রামমোহনের ধর্মমতের প্রকৃতরূপ দুর্বোধ্য, কিন্তু এবিষয়ে তদানীন্তন কালের কিশোরীচাঁদ মিত্রের মন্তব্য মননযোগ্য। তিনি বলেছিলেন "Rammohan was a religious Benthamite" এবং "the maximization of human happiness and the minimization of human misery' এই যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করে তিনি ধর্মমতগুলির আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করতেন। এ দৃষ্টিভঙ্গী হতেই তিনি ১৮২৮ খ্রীঃ ডঃ টাকারম্যানকে লিখেছিলেন যে ভারতীয়দের 'political advantage' ও 'social comfort' এর জন্যও অন্ততঃ হিন্দুদের ধর্মের সংস্কারের প্রয়োজন। হিন্দুদের বেদান্ত বা প্রচলিত ধর্মমতের এ সকল যোগ্যতা পুরোপুরি ছিল না বলেই তাঁর ধারণা হয়েছিল। সেকারণে তাঁর ধর্মমত ব্রহ্মসূত্রাশ্রিত হলেও শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ হতে ভিন্ন, সামগ্রিকভাবে প্রচলিত যে কোন ধর্মমত হতেই স্বতন্ত্র। সুশীলকুমার দে বলেছেন, "যে ব্রহ্মের কথা তিনি (রামমোহন) বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষেরই ধর্মগত বিশ্বাসের ব্রহ্ম, নীরস দর্শনশাস্ত্রের ব্রহ্ম নয়।'[২১] রামমোহন প্রচারিত ও আচরিত বেদান্তধর্মে যে ব্রহ্মের পরিচয় পাই তা যতই সরস হোক তার কোন অখণ্ড সুসমঞ্জস অবয়ব পাওয়া যায় না।

ঊনিশশতকে প্রচারিত রামমোহনের অদ্বৈতবেদান্তের পূর্ণভাব, কল্পনা ও বাঞ্ছনা পরিস্ফুট হয় নি সত্য, কিন্তু তদানীন্তন অনড় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ বিদেশাগত যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর যুগপৎ আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পড়লে রামমোহনের বিপুল সংস্কার প্রয়াসেই প্রথম নড়াচড়া দিয়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে রামমোহনের বেদান্তচর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে।

---

২১ সুশীলকুমার দে : বাংলাসাহিত্য, ১৯৫৪, পৃঃ ২০৭

॥ স্বামী অভেদানন্দ ॥

জীবন-নাট্য

তৃতীয় দৃশ্য

বিমলভূষণ

[কাশীপুর বাগানবাড়ী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘর। ঠাকুর শয়ান। কালীপ্রসাদ পাঠরত।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। [মাথা তুলে দেখে] কিরে, কি বই পড়া হচ্ছে ?

কালী। ইংরিজী তর্কশাস্ত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি লেখায় ওতে ?

কালী। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ সম্বন্ধে যুক্তি, তর্ক আর তার বিচার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই তো দেখছি এখানে ছেলেদের মধ্যে বইপড়া ঢোকালি।

কালী। সায়েন্স্ এ্যাসোসিয়েশনে ডঃ মহেন্দ্র সরকারের এই বিষয়ে বক্তৃতা শুনে বেশ লাগল। তাই ঐ সম্বন্ধে পড়ছিলুম। ওঁর বক্তৃতা তো গিরিশবাবুও শুনতে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি বললি, গিরিশ যায় ? তা সে যাক। ব'লেছি না—"ও যা কিছু করুক, ওর ক্ষতি নেই তাতে। ওর যে পাঁচ সিকে পাঁচ-আনা বিশ্বেস।" কি জানিস—বই পড়া বিদ্যে কিছু নয়। অবিদ্যি যারা লোকশিক্ষা দেবে—তাদের ওসবের দরকার আছে। তবে, বই প'ড়ে ঈশ্বরলাভ হয় না। [কালী নিরুত্তর] কিরে, কোনো জবাব নেই যে।

কালী। জবাব দেওয়ার আছে। তবে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। [হেসে] আছে ? আচ্ছা, তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেছিস ? [কালী নিরুত্তর] তুই ঈশ্বর মানিস ? শাস্ত্র মানিস ? লোকাচার মানিস ?

কালী। না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অপর কোনো সাধুর কাছে এরকম ব'ল্লে সে তোর গালে একটি চড় মারতো।

কালী। আপনিও মারুন। যতক্ষণ না—'ঈশ্বর আছেন এবং বেদ সত্য' একথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি, ততক্ষণ অন্ধবিশ্বাস বলে ও সব মান্‌ব কি ক'রে ? আমাকে বুঝিয়ে দিন। আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিন, তখন সব মান্‌ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন জানবি, আর সব মান্‌বি। দেখ্‌না, নরেন আগে কিছুই মান্‌ত না। কিন্তু, এখন ? রাধে-রাধে ব'লে কাঁদে, আর কীর্তনে নৃত্য করে। এরপর তুইও সব মান্‌বি।

কালী। জানতে পারলেই সব মান্‌ব, নয় তো নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বললুম তো—সময়ে সব জানতে পারবি। ছেলেদের মধ্যে তুইও বুদ্ধিমান। নরেনের পরেই তোর বুদ্ধি। ও যেমন একটা মত চালাতে পারে, তুইও সে রকম পারবি। তবে, তুই কখনো একঘেয়ে হোস্ নি। আমি একঘেয়ে ভাব ভালোবাসিনা। [একটু থেমে] আচ্ছা শোন্, কেউ কেউ নরেনকে আমার চেয়ে বড় মনে করে। তুই কি বলিস্ ?

কালী। যারা নরেনকে আপনার চেয়ে বড় মনে করে, তারা কিছুই জানে না। তারা আপনাকে চিন্‌তেই পারে নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন ?

কালী। নরেন আপনারই হাতের তৈরী। আপনার শক্তিতেই সে যা কিছু জেনেছে, শিখেছে। আপনিই তার ইষ্টদেবতা। সে যদি আপনার চেয়ে বড়ই হয়, তবে আপনার পায়ে মাথা রেখে সে জ্ঞান ভিক্ষা করে কেন ? [একটু থেমে] আর একটা কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি কথা রে ?

কালী। সেদিন আমি, নরেন আর নিরঞ্জন মাছ ধরেছিলুম বলে আপনি বারণ করেছিলেন। তবু আমি তর্ক করেছিলুম। তখন আপনি আমায় ধ্যান করতে বলেছিলেন সেই নিষেধের কারণ বোঝবার জন্যে। আমি বুঝতে পেরেছি কেন মাছ ধরা অন্যায়। ও কাজ আর করব না। আমায় ক্ষমা করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। [সস্নেহে কালীর মাথায় হাত রেখে] বুঝতে পেরেছিস ? বাঃ, বাঃ। আমি তো সব ব্যাপারেই কিছু বলি না। বলি কি ? সেই যে নরেন তোকে আর আরো ক'জনকে নিয়ে কুসংস্কার ভাঙাতে হোটেলে গিয়ে কিসের মাংস-টাংস খাইয়ে আনল যেন—আমি তো তা নিয়ে কিছু বলি নি। বরং বলেছি—ভালোই হয়েছে সব কুসংস্কার দূর হয়েছে। কিন্তু, মাছ ধরার ব্যাপারে বললুম কেন ?

কালী। আজ্ঞে— !

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাছ ধরায় বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। খাবারের লোভ দেখিয়ে বঁড়শি লুকিয়ে রাখা, আর, অতিথি বা বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে তার খাবারের মধ্যে বিষ লুকিয়ে রাখা—একই পাপ। তুই বলেছিলি—গীতায় বলেছে—আত্মা মরে না বা অপরকেও মারে না। ঠিক কথা। কিন্তু, এ জ্ঞান সত্যি যার হয়েছে সে আত্মস্বরূপ ! তার, অপরকে হত্যা করার প্রবৃত্তিই হবে না। তাই তো বলি—ঠিক ঠিক জ্ঞান হ'লে আর বেতালে পা পড়ে না। জান্‌বি—আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পারে সাক্ষীস্বরূপ। এই জ্ঞানের নামই আত্মজ্ঞান। জ্ঞান দিয়ে বিচার করলে—দেখা যায়—কিছুই থাকে না, থাকে একমাত্র ব্রহ্ম। সেদিন সেই যে একজন জিজ্ঞেস করলে না—ব্রহ্মজ্ঞান কি রকম। আমি বললুম—বোবার স্বপ্ন দেখার মত। ব্রহ্মজ্ঞান কি—তা মুখে বলা যায় না, তাই ব্রহ্মও কখনো উচ্ছিষ্ট হন না। [কাশি]

কালী। আমার অন্যায় হয়েছে আপনাকে কথা বলানো। থাক, আর কথা বলবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নারে না। ও কিছু না। শোন্, তুই তো প্রথম দিনই যোগ শিখতে চাইলি, তাই না ?

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যোগ মানে কি ? পরমাত্মা হলেন চুম্বক পাথর, আর জীবাত্মা একটা ছুঁচ। তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু, ছুঁচের গায়ে মাটি লেগে থাকলে চুম্বক

টানতে পারে না। মাটি পরিষ্কার করে দিলে তবে টানে। কামিনীকাঞ্চন হ'ল আসক্তিরূপ মাটি। ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে পারলে, সেই বৈরাগ্য সলিলে এই মাটি ধুয়ে যায়। তখন আপনা থেকেই কুম্ভক হয়, দর্শন হয়। তারপর সমাধি। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর বিচার থাকে না।

কালী। তা হ'লে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ না।

কালী। আচ্ছা, জীব ও ব্রহ্মে পার্থক্য কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পার্থক্য? শোন্। নদীর স্রোতে জলের ওপর একটা লাঠি এড়োভাবে ধরলে জলটা দুভাগ হয়েছে দেখায়। কিন্তু নিচে একই জল থাকে, তাই না।

কালী। আজ্ঞে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেইরকম 'অহং'-লাঠি দিয়ে জীব ও ব্রহ্ম পৃথক বোধ হয়। তখন 'আমি' আলাদা, তুমি আলাদা। এই 'আমি'কে ত্যাগ করতে হয়। তবে বিদ্যার 'আমি'তে দোষ নেই। যেমন শঙ্করাচার্য। তিনি লোকশিক্ষার জন্যে বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার। সব মতই সেই সচ্চিদানন্দকে নিয়ে।

নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাতারি
কোকো নিন্দো, কোকো বন্দো-দোনো পাল্লা ভারি।

[থেমে, হেসে] কিরে বুঝতে পারলি যা বললুম?

কালী। আজ্ঞে, আমি সামান্য মানুষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাঃ যাঃ। এইরকম "দাস আমি" হতে আমিও চেয়েছিলুম মা'র কাছে।

কালী। অত তো বুঝি না, শুধু সত্যি কথাটা বললুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বুঝ্‌বি, বুঝ্‌বি, সব বুঝ্‌বি। শোন্ আবার বলছি—'যত মত তত পথ'। বুঝেছিস?

কালী। আজ্ঞে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদ-এ যাঁকে 'ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' বলেছে, তন্ত্রে তাঁকেই 'ওঁ সচ্চিদানন্দ শিব' বলা হয়েছে। আবার তাঁকেই পুরাণে বলা হল 'ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ'। আর, বৈষ্ণবেরাও স্বীকার করেন—শ্রীকৃষ্ণ কালী হয়েছিলেন। কি রে?

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আসলে এক সচ্চিদানন্দেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আর, তাঁকে পাবার জন্যে নানা মত, আর, নানা পথ। কিন্তু লক্ষ্য একটাই। বুঝলি?

কালী। আর কথা বলবেন না। আপনার কষ্ট হচ্ছে। এবার শুয়ে পড়ুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে, এ-অসুখ এই শরীরটাকে ছাড়বে না। সেদিন শশধর তর্কচূড়ামণি বললেন "আপনি যদি শরীরের দিকে একটু মন দেন তাহলে আপনার গলার অসুখ নিশ্চয়ই সেরে যাবে।" আমি বললুম—'যে মন একবার ভগবানকে দিয়েছি তা এই রক্তমাংসের শরীরের দিকে আবার কেমন করে দিতে পারি বলুন।' তা বললেন, "মা'র সঙ্গে যখন কথা কইবেন তখন তাঁকে আপনার অসুখের যাতে উপশম হয় সেটুকু অন্তত বলবেন।

কালী। ঠিকই তো বলেছেন চূড়ামণিমশাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নারে, না। তা হয় না। যখন জগতের মা'র দর্শনলাভ হয় তখন আর সবই ভুল হয়ে যায় যে। তাই, তুচ্ছ এই হাড়মাংসের শরীরের কথাটা মাকে আর কেমন করে বলি বল? [হাসতে হাসতে প্রচণ্ড কাশি]

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য ও রসের সার্থকতা ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(তিন)

কাব্যে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে রসের উপযোগিতা ও সার্থকতা কি সে'সম্বন্ধে সামান্য-ভাবে আলোচনা করেছি। তাহলেও 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্'—এই নির্দেশ অনুযায়ী পুনরায় সে'সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি আচার্য আনন্দবর্দ্ধন ও আচার্য অভিনবগুপ্ত লিখিত 'ধ্বন্যালোক' ও তার বিস্তৃত ভাষ্য 'লোচন' গ্রন্থদুটির অনুবাদক প্রবন্ধের সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম. এ., পি. এইচ. ডি. ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, এম. এ.-লিখিত বাঙলা ভূমিকাকে অবলম্বন ক'রে। কাব্য ও সাহিত্য রসাত্মক বাক্য এবং সঙ্গীতও রস ও ভাবানুবিদ্ধ শিল্প। কাব্যে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে রসবস্তু ও তার অভিব্যক্তি বিশেষভাবে আছে বলেই এদের মধ্যে চারুত্ব ও আনন্দোপলব্ধির বিকাশ আছে।

রস কি? কাব্য ও সাহিত্য কি? ধ্বনি কি এবং তাদের মধ্যে চারুতা ও রমনীয়তা কাকে বলে—এ'সকল বিষয় নিয়ে ধ্বন্যালোকে ও তার ভাষ্য লোচনে আচার্য আনন্দ-বর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন: "কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈঃ সমাম্নাতপূর্বঃ"।[১] পুনরায় তিনি বলেছেন: "শব্দার্থশরীরং তাবৎকাব্যম্। তত্র চ শব্দস্যাস্চারুত্বহেতবোঽনুপ্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব। অর্থগতাস্চোপমাদয়ঃ। বর্ণসংঘটনা-ধর্মাশ্চ যে মাধুর্য্যাদয়স্তেঽপি প্রতীয়ন্তে"; অর্থাৎ কাব্যের আত্মা ধ্বনি একথা পণ্ডিতরা স্বীকার করেন: "কেচিদাচাং স্বিতমবিষয়ে তত্ত্বমুচুস্তদীয়ং, তেন ক্রমঃ সহৃদয়-মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপম্", অর্থাৎ সহৃদয়-ব্যক্তি যে অর্থ গ্রহণ করেন ও যা কাব্যের (এবং সাহিত্য বা পাঠ্যেরও) আত্মা ব'লে স্থির করেন—তার তত্ত্ব অনির্বচনীয়। তাই সহৃদয়ব্যক্তির মনঃপ্রতীতির বা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তার স্বরূপ বলা হচ্ছে। তাছাড়া শব্দার্থময় সহৃদয়-ব্যক্তির মন ও অন্তঃকরণকে আনন্দান্বিত করে যা—তাই কাব্যে লক্ষণ: "প্রকারস্য কাব্যত্বহানেঃ সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্"।

সহৃদয় কাকে বলে? 'লোচন'-ভাষ্যে আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন—কাব্য, সাহিত্য এবং এমন কি সঙ্গীত অনুশীলনের অভ্যাসজন্য হৃদয়মুকুর বা অন্তঃকরণ একান্তভাবে স্বচ্ছ হওয়ায় যাঁরা বিভাবাদি বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা বা তন্ময়তা লাভ করেন তাঁরাই সহৃদয়; তাঁরাই নিজেদের এবং কবিহৃদয়ের সঙ্গে নিজমাধুর্য অনুভব করেন ও তাঁরাই হৃদয়সংবাদী, আর এরূপে যাঁরা এক হৃদয়ের সঙ্গে অপর হৃদয়ের যোগসূত্র বা মিলন-সাধন করেন তাঁদের

১। 'সমাম্নাতপূর্বম্' বলতে আনন্দবর্দ্ধন ধ্বনিবাদের আলোচনা তাঁর পূর্বসূরীদের শৈলীকে অনুসরণ করেই ধ্বন্যালোকে করেছেন, সুতরাং মৌলিক নয়।

ভাব অর্থাৎ ভাবনা বা চর্বনার নামই রসাভিব্যক্তি। তাছাড়া রসধ্বনিই সর্বত্র ও সকল সময়ে আনন্দের বা আনন্দানুভূতির প্রধান কারণ।

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় ধ্বন্যালোকের ভূমিকায় লিখেছেন রস ও কবি বা রসিক সহৃদয়ের ভাবসম্বন্ধে। তিনি বলেছেন, রসে যে ভাবের প্রকাশ হয়—তা স্বগত নয়, পরগতও নয়। রস অলৌকিক বস্তু। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সহযোগে রস নিষ্পন্ন হয় একথা মুনি ভরত রসের উপযোগিতায় বলেছেন।[২] রসের মূল-উপাদান ভাব। আনন্দবর্দ্ধন এবং অভিনবগুপ্ত দু'জনেরই অভিমত যে, কবি বা সহৃদয়ের নিজের চিত্তবৃত্তিতে ভাব থাকে ও সেখানেই তার উপলব্ধি হয়। সঙ্গীতেও তাই, কেননা সুরশিল্পীর ভাব তার নিজের মধ্যে (অন্তরে) থাকে এবং সেখানেই সে উপলব্ধি করে ভাবকে এবং পরে সুর ও কথার সাহায্যে সহৃদয়-শ্রোতার কাছে পরিবেশন করে। ভাব তাই অন্তর বা হৃদয়বাসী।

ডক্টর সেনগুপ্ত বলেছেন, ভাব কবি-সহৃদয়ের নিজস্ব বস্তুমাত্র হলেও তা লৌকিক অনুভবের পর্যায়ই পড়ে। এই ভাব উদ্বোধিত হয় অপরের দ্বারা ও অপরের মধ্যে ভাব যে সকল সঞ্চারী ভাবযুক্ত হয়ে অনুভাবে পর্যবসিত বা রূপায়িত হয় তাকেই কবি-সহৃদয়ের ভাবকে রসরূপতা দান করে। তিনি শুধু কেন, আচার্য আনন্দবর্দ্ধন ও আচার্য অভিনবগুপ্ত দু'জনেই বলেছেন : "কবির শোক রহিল কবির হৃদয়ে, ক্রৌঞ্চের শোক রহিল ক্রৌঞ্চের হৃদয়ে, কিন্তু ক্রৌঞ্চের কাতরতা ও ক্রন্দন প্রভৃতির সংযোগে কবির শোকের যে অংশ হৃদয় হইতে উদ্বেলিত হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল তাহাই করুণরসের সৃষ্টি করিল। এখানে ক্রৌঞ্চ বিভাবমাত্র, অর্থাৎ সেই রস-সঞ্চারের কারণ, ইহার অতিরিক্ত মূল্য তাহার নাই"। ঠিক এভাবে আচার্য আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন—

"কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥

বিবিধবাচ্যবাচকরচনাপ্রপঞ্চচারুণঃ কাব্যস্য এবার্থঃ সমুদ্ভূতঃ। তথা চ আদিকবের্বাল্মীকেঃ নিহতসহচরীবিরহকাতরক্রৌঞ্চাক্রন্দনসমুদ্ভবঃ শোক এব শ্লোকতয়া পরিণতঃ"।

এই প্রসঙ্গক্রমে আচার্য অভিনবগুপ্ত 'লোচন'-ভাষ্যে যে মন্তব্য করেছেন : "স এবেতি প্রতীয়মানমাত্রেইপি প্রক্রান্তে তৃতীয় এব রসধ্বনিরিতি ইতিহাসবলাৎ প্রক্রান্তবৃত্তি-প্রয়োগবলাচ্চ। তেন রস এব বস্তুত আত্মা, বস্তুলঙ্কারধ্বনী তু সর্বথা রসং প্রতি পর্যবস্যতে ইতি বাচ্যানুৎকর্ষো ভাবতাভিপ্রায়েণ ধ্বনিঃ কাব্যস্যাত্মেতি।"[৩] পুনরায় পরে তিনি (অভিনবগুপ্ত) বলেছেন : "নিহতসহচরীতি বিভাব উক্তঃ, আক্রন্দিতশব্দেনানুভাবঃ। ···করুণস্য তচ্চর্বণাযোচরাত্মনঃ স্থায়িভাবঃ। শোকে হি স্থায়িভাবে যে, বিভাবানুভাবাস্তৎসমুচিতা চিত্তবৃত্তির্ব্যভিচারিণস্তাত্মা রস ইতি উচিত্যাৎ স্থায়িনো রসতাপত্তিরিত্যুচ্যতে"। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আচার্য আনন্দবর্দ্ধন করুণরসের স্থায়িভাবকে শোক বলেছেন—"শোকো হি করুণস্থায়িভাবঃ"।

কিন্তু এ' প্রসঙ্গে প্রশ্ন এই যে, কবি-সহৃদয়ও কি ক্রৌঞ্চের সজাতীয়? প্রকৃতপক্ষে শোকভাবের আশ্রয় কবি-সহৃদয়। এটিই হ'ল বিভাব থেকে কবি-সহৃদয়ের পার্থক্য। তাই

২। রসধ্বনি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো।

৩। 'লোচন' টীকায় বা ভাষ্যে আচার্য অভিনবগুপ্ত ভরত-সম্মত 'নৃত্যোপাদি' আটটি রসের উল্লেখ করেছেন।

আস্বাদ্যমানতাই রসের প্রাণ ও এটিই 'রস'-নামের সার্থকতা। এটি কবি বা শিল্পী-সহৃদয়ের প্রতীতির বা উপলব্ধির বিষয় এবং সেজন্যই রস অলৌকিক এবং রসের প্রতীতির ও অভিব্যক্তির জন্য ব্যঞ্জনার আবশ্যকতা আছে। আর সেজন্য স্বীকার করতে হয় যে, রস ব্যঞ্জনার দ্বারাই লভ্য।

তারপর প্রশ্ন আসে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য কি? প্রকৃতপক্ষে লৌকিক ও অলৌকিক কি বস্তু? কাব্য ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক কি এবং কোথায়? কথা এই যে, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে বাচ্যের উপযোগিতা আছে, সেজন্য আচার্য আনন্দবর্দ্ধন বাচ্যকে রসসৃষ্টি থেকে একেবারে বাদ দেন নি, বরং বাচ্য-অর্থকে তিনি ব্যঞ্জনার ভূমি ব'লে বর্ণনা করেছেন, আর বলেছেন যে, পদের সাহায্যে যেমন বাচ্যার্থকে জানা যায়, তেমনি বাচ্যার্থের সাহায্যে ব্যঙ্গকে জানা যায়। বাচ্য ইতিবৃত্তাদি বর্ণনা করে ও সেই ইতিবৃত্ত কাব্যের শরীর। শিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। ব্যঙ্গ্য বলতে শরীরস্থ আত্মা। ব্যঙ্গ্যকে দেহলাবণ্যও বলা যায়।

আসলে হৃদয়স্থিত ভাবই রসের আকারে পরিণত হয় এবং বাইরের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের সংযোগে কবির ও শিল্পীর হৃদয়স্থিত ভাব রসে পরিণত হয়। অশরীরী অনুভব ও তত্ত্ব কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর কাছে সজীবতা লাভ করে এবং এটিই যোগত্রয় শুধু কবিকর্মের লক্ষণ নয়, সাহিত্যিক ও শিল্পীর সাহিত্যসৃষ্টির এবং শিল্পসৃষ্টির লক্ষণ। আচার্য অভিনবগুপ্ত ও আচার্য আনন্দবর্দ্ধন উভয়েই মুনি ভরতের রস-বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তাহলেও তাঁরা নয়টি স্থায়ীভাব ও তাদের অধীনে কতকগুলির সঞ্চারীভাবের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন মনে হয়। ভাব ও ব্যভিচারভাবের আদর্শে তাঁরা ধ্বনি ও তার বিভাগের উপযোগিতাও স্বীকার করেছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকরা ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে কাব্যের প্রাণ:স্বরূপে গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যসমালোচক স্বর্গত ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ও অলঙ্কার-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থে।

ধ্বনির যে তিনটি ভাগ—বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনি সে সম্বন্ধে পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। আনন্দবর্দ্ধন ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিক। তিনি রসধ্বনিকে কাব্যের সার বা প্রাণ বলেছেন। তাছাড়া ধ্বন্যালোকের ভাষ্যকার আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন রস-ধ্বনির সহায়তা ছাড়া বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি নিষ্প্রাণ, কেননা রস ছাড়া প্রাণের অভিব্যক্তি সৃষ্টি করবে কে?[৪] বিভিন্ন উপনিষদে ও বিশেষ ক'রে বৃহদারণ্যক-উপনিষদে রসকে সর্বোত্তম সার (essence or extract) বলা হয়েছে। কাব্যে, সাহিত্যে এবং শিল্পেও তাই। আচার্য ভরত নাটকের প্রয়োজনে শৃঙ্গারাদি আটটি রসের উপযোগিতা স্বীকার করলেও নাটকীয় সঙ্গীত ধ্রুবা: ধ্রুব, সাম, গাথা প্রভৃতি ব্রহ্মগীতি; সাতটি শুদ্ধ ও এগারোটি বিকৃত জাতি রাগএবং জাতিরাগ থেকে বিকশিত গ্রামরাগ প্রভৃতি প্রাণস্পন্দন নিয়ে লীলায়িত হ'ত বিভিন্ন রসের ও ভাবের মিলনে।

আচার্য আনন্দবর্দ্ধন অবশ্য রসধ্বনিকে প্রাণবান ও স্পন্দিত করার জন্য ব্যঞ্জনা স্বীকার করেছেন, আর ব্যঞ্জনাও অভিধা, লক্ষণা, গুণ প্রভৃতি ছাড়া সচল ও কার্যকারী হয় না। তবে আনন্দবর্দ্ধনের অভিমতে রসধ্বনির সার্থকতা সর্বোপরি অধিক—যদিও বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি অভিধা প্রভৃতির সহায়তা কখনও কখনও গ্রহণ করে। তাছাড়া প্রসাদ, ওজস ও মাধুর্যাদি গুণেরও সাহচর্য থাকে শব্দে ও অর্থে, কিংবা শব্দ-অর্থময় কাব্য-শরীরে। কাব্যের আত্মা ধ্বনি—না শব্দার্থ শরীরই কাব্য—এ' প্রসঙ্গে আচার্য আনন্দবর্দ্ধন ধ্বন্যালোকের প্রথম

৪। 'তেন রস এব মুখ্যতঃ আত্মা, বস্তুলঙ্কারধ্বনী তু সর্বথা রসং প্রতি পর্যবস্যতে ইতি বাচ্যাদ্যুৎকৃষ্টো···।'

অধ্যায়ের শ্লোকের ভাষ্যে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "বুধৈঃ কাব্যতত্ত্ববিদ্ভিঃ কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি সংক্ষিপ্তঃ, পরম্পরয়া যঃ সমাম্নাতপূর্বঃ সম্যক্ আসমন্তাদ্ ম্নাতঃ প্রকটিতঃ, তস্য সহৃদয়ঃ হৃদয়মনঃ প্রকাশমাত্মাপ্যভাব···। আচাক্ষীরন্—শব্দার্থশরীরং তাবৎকাব্যম্। তত্র শব্দগতাশ্চারুত্বহেতবোঽনুপ্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব। অর্থগতাশ্চোপমাদয়ঃ। বর্ণসংঘটনা-ধর্মাশ্চ যে মাধুর্য্যাদয়স্তেঽপি প্রতীয়ন্তে। তদতিরিক্ত—মুক্তরোমুক্তরোঽপি যা কৈশ্চিদ্বৃত্তয়ঃ নাগরিকাদ্যাঃ প্রকাশিতাঃ, তা অপি গতা শ্রবণগোচরম্ রীতয়শ্চ বৈদর্ভী প্রভৃতয়ঃ। তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽন্যঃ ধ্বনির্নামেতি।···প্রকারস্তু কাব্যত্বস্থানেঃ সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদিনশব্দার্থময়ত্বেব কাব্যলক্ষণম্"।

পূর্বে বলছি যে, বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনিতে অভিধা প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করলেও প্রসাদ, ওজঃ ও মাধুর্য্যাদি গুণের সাহচর্য থাকে শব্দে ও অর্থে, অথবা শব্দ ও অর্থময় কাব্যে। কিন্তু ভাব ও রসের সমধিকতা ও কার্যকারিতাই প্রধান, কেবলই শব্দ ও অর্থের জন্য কাব্যের সার্থকতা প্রমাণিত হয় না। অনেক পাঞ্চালী, বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতির সহায়তা স্বীকার করেন কাব্যে রসের প্রকাশের জন্য। আচার্য অভিনবগুপ্ত 'লোচন'-ভাষ্যেও এ'সবের আলচেনা করেছেন আনন্দবর্দ্ধনের আলোচনার সূত্র ধরে। তিনি বলেছেন : "অনতিরিক্তত্বাদেব বৃত্তিব্যবহারো ভামহাদিভির্নকৃতঃ। · রীতয়শ্চেতি। ওজঃপ্রভৃত্যো মাধুর্য্যাদয়ো গুণাঃ, তেষাং সমুচিতরসাশ্রিতে···গৌড়ীয়বৈদর্ভপাঞ্চালদেশপ্রবৃত্তিপ্রাচুর্য্যদৃশা তদেব ত্রিবিধং রীতিরিত্যুক্তম্"। আলোচনা দীর্ঘ, তবে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, রীতির উপযোগিতা রসের অপেক্ষা কাব্যে নগণ্য, কিন্তু তাহলেও আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত এবং অন্যান্য আলঙ্কারিকরা বৃত্তি, রীতি, গুণ, অলঙ্কার প্রভৃতি উপাদানকে রসের জন্যই স্বীকার করেছেন,—যদিও কাব্য, সাহিত্য ও এমন কি শিল্পের ক্ষেত্রে তারা 'বিশেষ' পদমর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

আসল কথা এই যে, কাব্য, সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত ও অন্যান্য চারুশিল্পের ক্ষেত্রে শব্দ ও অর্থের সহযোগ ও 'সার্থকতা' থাকলেও রসের প্রাধান্যই সমধিক এবং তা সহৃদয়গণের আনন্দানুভূতির ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে দেখা যায়। সহৃদয়গণের নিকটই রসের কার্যকারিতা ও সার্থকতা অধিক। রসই যে আনন্দসৃষ্টির কারণ সে'কথা সহৃদয়গণ অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন। নাট্যশাস্ত্রে মুনি ভরত এবং সঙ্গীত-রত্নাকরে আচার্য শার্ঙ্গদেব রস-সৃষ্টির জন্য সাঙ্গীতিক পাঠ্য বা সাহিত্য ও কাব্যগুলি রমণীয় ও শ্রুতিযোগ্য হয় সেকথা স্বীকার করেছেন। তা'ছাড়া জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও অন্যান্য ভাষারাগগুলির মধ্যে রস'সঞ্চারিতার উপযোগিতা তাঁরা স্বীকার করেছেন রসিক-শ্রোতাদের হৃদয়ে এবং শিল্পীদেরও হৃদয়ে আনন্দরস সৃষ্টি ও বিতরণ করার জন্য।

●

॥ দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে ॥

কন্যা কুমারী

(বিবেকানন্দরক, ওটাকামণ্ড)

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

(এক)

১৯শে ডিসেম্বর ভোর ৪টা। গাড়ী ছাড়ল মাদুরা হতে। সকাল ৯'১৫ মিনিটে পৌঁছে গেলুম তিরুনেলভ্যালি। কন্যাকুমারীর পথে যাত্রাশুরু এখান হতেই। ৮৫ কিঃ মিঃ (৫৩ মাইল) রাস্তা। পর পর চার খানি ট্যাক্সি—চলতে শুরু করল ঘণ্টাখানেক পরেই। কিছু দূর গিয়েই আরম্ভ হল উঁচু-নীচু পার্বত্য পরিবেশ। মাঝে মাঝে গাছপালার জঙ্গল। পীচ-ঢালা পাথুরে পথ চলেছে তার ভিতর দিয়েই এঁকে বেঁকে। কখনও উচ্চে কখনও নীচে। দুপাশে জনমানবশূন্য। পথের দুধারে শস্যহীন অনুর্বর জমি। চলতে চলতে কখনও দেখা দেয় পাহাড়ের গায়ে লাল মাটি। পাহাড়-চূড়ায় কোথাও বা ছোট ছোট মন্দির। প্রায় ৩০ মাইল অতিক্রম করার পর এসে পড়ি পলিমাটির দেশে। দেখা যায় গ্রাম্য ঘরগুলির লালমাটির দেওয়াল। তার মাঝে মাঝে সবুজ গাছ। আম, কাঁঠালের গাছেরও অভাব নাই। এখানে জমি হয়ে উঠেছে শস্য-শ্যামল। তারপর শুরু হল কন্‌ক্রিটের রাস্তা। এই রাস্তা দক্ষিণ-ভারতের গৌরব। যোগ করেছে ত্রিবেন্দ্রাম্ আর কন্যাকুমারীকে। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন মাইল এর দৈর্ঘ্য। পাশা-পাশি অনায়াসে চলতে পারে চার খানি মোটর। আমাদের ট্যাক্সিগুলি মোড় নিল ডান দিকে কন্যাকুমারীর পথে। পথ চলেছে উঁচু দিয়ে—পাহাড়ের উপর দিয়ে। নীচে দুদিকে দেখা যায় সেই লালমাটির রাজত্ব। মাঝে মাঝে পরিচিত সবুজ গাছ; নয়নাভিরাম সে দৃশ্য। ভুলে যেতে হয় পথের ক্লান্তি। এভাবে চলতে চলতে ২০শে ডিসেম্বর বেলা বারোটায় পৌঁছে যাই ভারতের সর্বশেষ প্রত্যন্ত জেলা কন্যাকুমারী। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও শিল্প-সৌন্দর্যে পূর্ণ স্থান এটি। এখানকার চিরহরিৎ পর্বতমালা, সারা বর্ষব্যাপী জলপূর্ণ নদী-নালা, গভীর অরণ্যানী, পঞ্চাশ মাইলব্যাপী সুদূর তটরেখা এবং মহান অতীত প্রকৃতির ঐতিহাসিক মূল্য ভারতের মানচিত্রে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। পরাশক্তি দেশজুমির প্রত্যন্তে কুমারী কন্যারূপে অধিষ্ঠিতা। জনশ্রুতি পরশুরাম এঁর প্রতিষ্ঠাতা।

তীর্থ যাত্রা পূর্ণ করতে বারাণসী ও কন্যাকুমারী দর্শনের রীতি আছে। কোন্ স্মরণাতীত-কাল হতে উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্য আধ্যাত্মিকতার এক সূক্ষ্ম যোগসূত্রে গ্রথিত। ধীরে ধীরে ট্যাক্সিগুলি এসে প্রবেশ করল লাল কঙ্করময় পথ ধরে ভারত মহাসাগরের সম্মুখস্থ "টুরিষ্ট লজে"। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কামরাটিতে প্রবেশ করেই পশ্চাতের দরজাটি খুলে সমুদ্রের সামনের দরদালানটিতে (lobby) বেতের চেয়ারে বসে বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে দেখি ভারত মহাসাগরের স্থির, গম্ভীর, অতলান্ত দৃশ্য। হঠাৎ একটা অজানা আনন্দে দেহ-মন পূর্ণ হয়ে ওঠে; এ আনন্দের স্বাদ নিজে বুঝি—বোঝাতে পারিনা অপরকে। যখনই দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি—কোন এক অজ্ঞাত মুহূর্তে অনুভব করেছি এমনি এক আনন্দ-চেতনা। আর তখনি মনে হয়েছে জীবনের সার্থকতা অর্থোপার্জনে নয়, খ্যাতি—প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখে সাধুবাদে নয়, তোপে নয়—সে সার্থকতা আছে জীবনকে নানা দিক দিয়ে গভীরভাবে

আনার মধ্যে, অনাদি রহস্যের উপলব্ধি করার আনন্দের মধ্যে—নির্জনে একা বসে এক অসীম সৌন্দর্যকে উপভোগ করার মধ্যে, যা মুহূর্তেই সকল সুখ-দুঃখ ও দ্বন্দ্বকে এক আনন্দময় চেতনার স্তরে উন্নীত করে দিতে পারে। তখন মনে হয় জীবন কত মধুর, কত সুন্দর, এমন কি দুঃখ-কষ্টেরও আছে এক পরমাশ্চর্যময়রূপ। মনে হয়, যাঁরা জীবনকে দুঃখময় বলে থাকেন তাঁরা নাস্তিক। সমস্তকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেখাতেই আনন্দ। তখন দুঃখের আর কোন পৃথক সত্তা থাকে না। কারণ, সকল কিছু সৃষ্টির মূলে আছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি সর্বাণি ভূতানি জায়ন্তে"।

বিচা ও রণজিৎ ভাই এসে প্রবেশ করতেই চমক ভাঙল। স্নান-ভোজনের পর সেরে যেতে হবে 'বিবেকানন্দ শিলা'। এক ঘণ্টা পরে স্নানাহার সেরে কন্যাকুমারীর মন্দির সামনে এসে দাঁড়ালুম যেখানে মিলন ঘটেছে তিনটি সমুদ্রের। বামে চঞ্চল বঙ্গোপসাগর—প্রচণ্ড গর্জনে অবিরাম আছড়ে পড়ছে, দক্ষিণে স্থির আরব সাগর সৌম্য প্রশান্ত, সম্মুখে গম্ভীর ভারত মহাসাগর, বিরাট, অন্তহীন দিগন্তে গেছে মিশে।

মনে হয় বঙ্গোপসাগর যেন উদ্দামগতিতে আরবের সঙ্গে। তারপর উভয়েই আছড়ে পড়ে ভারতের বুকে। হারিয়ে ফেলে তাদের পৃথক সত্তা। ছুটে চলে অনন্তের দিকে, মিশে যায় দিকচক্রবালের সীমারেখায়। হয়ে যায় নীলে নীল। কুমারিকা থেকে হিমালয় দর্শনপর্ব শেষ। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভারতমাতার অপরূপ রূপ। 'তীর্থ গমন মন উচাটন' ভেবে গৃহকোণে বন্দী হয়ে থাকলে দর্শন মিলতো কি আসমুদ্র-হিমাচল ভারতমাতৃকার অখণ্ড এই রূপটির। উন্মোচিত হতো কি দিগন্ত-প্রসারি এক স্বচ্ছ উদার দৃষ্টিভঙ্গি? তাই তো মনের অজান্তেই ভেসে আসে দেশমাতৃকার বন্দনা মন্ত্রটি :

"শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট সাগর-ঊর্মি ঘেরিয়া জংঘা
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পদ্ম-সিন্ধু যমুনা গঙ্গা।"

* * *

জননী তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিত্ত অন্ন, চরণে তোমার বিত্ত মুক্তি।

তাঁর চরণে সেই মুক্তির দ্বারে পৌঁছে গেছি। জানিনা তিনি কোন আধ্যাত্মিক মুক্তি দেবেন কিনা? তবে এটুকু বুঝেছি, এই অপরূপ দৃশ্যে, দেহ, মন, প্রাণ স্নিগ্ধ ও আনন্দে ভরপুর। তাই নির্ভয় কণ্ঠে কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে :

'আবার যদি ইচ্ছা কর, আবার আসি ফিরে,
দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে।"

ইতিমধ্যে সাহা দম্পতিসহ অভয়বাবু ট্যাক্সি নিয়ে এলেন। আর তিনজনেই বলে উঠলেন ম্যানেজার অসিতবাবুর নির্দেশ যাঁরা যে ট্যাক্সিতে ত্রিবেন্দ্রম হতে এসেছেন—সেই ট্যাক্সি নিয়েই কন্যাকুমারীর আশ-পাশের দর্শনীয় যা কিছু দেখে নেবেন। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ট্যাক্সিখানি চলতে শুরু করল "বিবেকানন্দ শিলা" অভিমুখে। গান্ধী স্মারক-ভবনের পাশ দিয়ে সাত মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলুম 'বিবেকানন্দ শিলার' ষ্টীমার ঘাটে। এক টাকা দক্ষিণা দিয়ে টিকেট কেনা হল। টিকেটখানিতে মুদ্রিত বিবেকানন্দ শিলার নব-নির্মিত মন্ডপসহ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক মূর্তি। শুনলুম এসব অর্থ জমা হবে "বিবেকানন্দ শিলা সমিতি" ভাণ্ডারে।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই পবিত্র

শিলাখণ্ডে উপযুক্ত স্মারকস্তম্ভ নির্মাণকল্পে "বিবেকানন্দ শিলা সমিতি" (Vivekananda memorial committee) গঠিত হয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একনাথ রাণাডে ব্যবস্থাপক সম্পাদক নিযুক্ত হন। নানা দেশের, নানা জাতির, নানা ভাষার দর্শনার্থী চলেছেন একই উদ্দেশ্যে একত্রে। আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ১০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলুম বিবেকানন্দ শিলাঘাটটিতে। ঘাট হয়ে পৌঁছিলুম নিম্ন চত্বরে। সেখান হতে দীর্ঘ শৃঙ্খলান্বিত ২৪টি সিঁড়ি অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে পড়লুম একেবারে পাদুকা ভবনের সামনে অর্থাৎ জনগণের পাদুকা জমা রাখার স্থানটিতে। পাঁচটি পয়সার বিনিময়ে সকলেই পাদুকা জমা দিয়ে চলতে শুরু করলাম স্মারক মণ্ডপের দিকে। এই অর্থও জমা হবে সমিতির ভাণ্ডারে। সুন্দর ব্যবস্থা। অবিরাম লোক আসছে-যাচ্ছে। স্মারক মন্দিরের দরজায় দাঁড়াতেই মনের ওপর ভেসে ওঠে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পরিব্রাজকবেশে ভারত পরিক্রমা শেষে কন্যাকুমারী দর্শনে, স্বামী বিবেকানন্দের আগমন পর্বটি। ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তিনি ভারত ভূখণ্ডের সর্বশেষ প্রান্তের পবিত্র তটভূমি হতে প্রায় ১৬০০ ফুট সমুদ্রে সন্তরণ করে শিলাতে পৌঁছে ভারতের দিকে মুখ করে সারারাত্রি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তিনটি সমুদ্রের সঙ্গম-স্থলে তাঁর এই ধ্যানাসন নির্দিষ্ট করার পশ্চাতে একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বৈ কি। উদ্ভাসিত হল তাঁর ধ্যাননেত্রে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল চিত্র। ধ্যানভঙ্গে শিলাটিতে উপবিষ্ট হয়ে উত্তরের উজ্জ্বল বিশাল ভূখণ্ডের দিকে একবার দৃষ্টি পড়ে। সেই মুহূর্তেই তিনি নিজেকে ভারতের জনগণের সেবার জন্য আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং পাশ্চাত্যে বেদান্তের বাণী বহন করে নিয়ে যাবেন স্থির করলেন দেশবাসীর জন্য রুটির ব্যবস্থা করতে।

●

॥ যুগপ্রবর্তক রামমোহন ॥

শ্রীতারকনাথ ঘোষ

(এক)

স্বামী বিবেকানন্দ বেদব্যাখ্যার জন্য যাঁকে সায়ণাচার্যের নবাবতার বলেছিলেন প্রতীচীর মনীষী সেই ম্যাক্সমুলারের কিছু কিছু রচনা নিয়ে জনৈক সংকলক 'ফ্রম রামমোহন টু রামকৃষ্ণ' (রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। উনিশ শতকে রামমোহনকে অবলম্বন করে ধর্মের নবযুগ শুরু হয়েছিল ; শতাব্দীর শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-প্রেরণায় ধর্মজীবনের এক প্রাণবন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ম্যাক্সমুলার যখন রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত ধর্মসাধনার বিবরণ দিয়েছেন তখন তিনি ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা করেছেন বটে কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধুয়ো তুলে একটাকে আর একটার উৎস বা পরিণতি কোনোটাই বলতে চান নি। তিনি ধর্মময় জীবন-সাধনার কয়েকটি ধারার—যথার্থত কয়েকজন ধর্মপ্রাণ সাধকের সাধনার পরিচয় দিয়েছেন।

গত শতাব্দীর ভারতীয় ধর্মসাধনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির নবীন অনুপ্রাদরের গভীর যোগ ছিল। মধ্যযুগে ভক্তিসাধনার বিকাশের পর ইসলামী ধর্মসংস্কৃতির নতুন কোনো ধারাবিবর্তন হয়নি। কিন্তু পশ্চিমের সভ্যতার সঙ্গে সংযোগ আর সংঘাতের ফলে হিন্দু

সংস্কৃতির সর্বোদয় হয়েছিল। সারা ভারতবর্ষেই ধর্মভাবনার নব্য প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশেই ধর্মের পুনরভ্যুদয় সবচেয়ে প্রবল ছিল। এই অভ্যুদয় মোটামুটিভাবে তিনটি ধারাকে আশ্রয় করেছিল।

এই তিনটি ধারার যেটি আদিতম সেটির মূলে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের আদি পুরুষ; তাঁর ব্রহ্মজ্ঞাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দিয়েছিল। রামমোহন ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন জ্ঞানপন্থী কর্মসাধক। মহর্ষির মুখ্য পরিচয়, তিনি ভক্ত। রামমোহন যে বৈদান্তিক ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তাকে তিনি হৃদয়রসে জারিত করে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা শুধুমাত্র ধর্মসাধক ছিলেন না; সমাজ সংস্কারের কর্মসূচী তাঁদের ধর্মসাধনাকে বাস্তব অবলম্বনযোগে সক্রিয় করে তুলেছিল।

দ্বিতীয় ধারার মুখ্য প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একদিকে পশ্চিমের বিচিত্র বিদ্যা, অন্যদিকে ভারতের প্রাচীন ধর্মসাধনার মর্যাদাবোধ, যা স্বাদেশিকতার উত্তাপে সুদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মসমাজের ভাবুকদের মতো তিনিও ইউরোপের জ্ঞানসাধনা দিয়ে ভারত-সংস্কৃতির স্বরূপ আর গরিমা আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর স্বাজাত্যবোধ বা স্বদেশপ্রেম, এত প্রবল ছিল যে ব্রাহ্মসমাজের 'বিজাতীয়' সংস্কার প্রয়াস তিনি প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখেন নি।

তৃতীয় ধারার প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ একটা অসামান্য আবির্ভাব। সমাজ বা সংস্কৃতির জন্য তিনি কী চেয়েছিলেন বলা যায় না—ভগবানলাভই তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। তবে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণায় সারা দেশে ধর্মপ্রেরণা আর কর্মসাধনার এমন একটা আদর্শ প্রসারিত হয়েছে, যার উপর বিদেশের প্রভাব নেই, অথচ যা আদৌ প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক নয়।

(দুই)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মী সাধনার আদর্শ—

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
স্তত্তস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥

মুণ্ডকোপনিষদের এই মন্ত্রাংশটি (৩:১।৮) বিশেষভাবে দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে প্রযোজ্য। কারণ তিনি একদিকে জ্ঞানপ্রসাদ অন্যদিকে ধ্যানরস দুটিই চেয়েছিলেন। রামমোহন প্রচলিত আদর্শে ধ্যাননিষ্ঠ ছিলেন কিনা বলা যায় না; তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে আমরা খুব সামান্যই জানি। কিন্তু তিনি জ্ঞানপরায়ণ ছিলেন। বস্তুত জ্ঞানই তাঁর ধর্মসাধনার মূল ভিত্তি। ব্রহ্ম সভার ভজন কীর্তনাদির কথা বাদ দিলে তিনি জ্ঞানমার্গী ছিলেন বলা যায়—শাস্ত্রবিচারই তাঁর মুখ্য সাধনপন্থা। তাঁর অধ্যয়নের পরিমাণ আর পরিসর দুইই ছিল বিরাট। তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিপুল অংশ অধ্যয়ন তো করেছিলেনই, তা ছাড়া বৌদ্ধ, সিখ, ইসলাম বা খ্রীষ্টান ধর্মের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ আয়ত্ত করেছিলেন। সত্যান্বেষণ তাঁর এই অধ্যয়নের মূল কারণ। এই সত্যান্বেষণের সঙ্গে অবশ্যই ধর্মবোধ জড়িত ছিল। বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা করে তিনি ধর্মের দুটি মূল সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। 'ব্রহ্মোপাসনা' গ্রন্থে সেই মৌলিক সত্য দুটির পরিচয় দিয়েছেন।

'সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা।'
'মনুষ্যের মধ্যে সৌহৃদ্য ও সাধু ব্যবহার।'

রামমোহন নিজেকে ধর্মবিষয়ে 'জিজ্ঞাসু' বলতেন, কিন্তু জ্ঞানপিপাসা তাঁর মূল প্রেরণা ছিল না; ধর্মতত্ত্ব নয়, ধর্মসাধনাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। ঐ সাধনা অবশ্যই আত্মকেন্দ্রিক ছিল না; তিনি হয়তো খ্রীষ্টীয়, ইসলামি বা শিখধর্মের দৃষ্টান্তে সমবেতভাবে ভগবৎ সাধনের আদর্শ প্রবর্তন করেছিলেন।

রামমোহন তাঁর ধর্মজীবনে বেদান্তের পথই বেছে নিয়েছিলেন। ঐ বেদান্ত শংকর বেদান্ত—তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে একমাত্র শংকরের মতই গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছে। নির্গুণ উপাসনা দুরূহ হলেও তাই যে কর্তব্য এ তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ।

'যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কষ্টসাধ্য তাহার উত্তর এই। যে বস্তু বহু যত্নে হয় তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্বদা বহু আবশ্যক হয় তাহার অবহেলা কেহ করে না।'

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মকে আদর্শ বলে মেনে নিলেও রামমোহন বেদান্তের সর্বজনীন চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন না। যখন সরকারী উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হওয়ার প্রস্তাব হয়েছে তখন তিনি তার বিরুদ্ধতা করে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করতে বলেছেন। বেদান্ত শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—

"Neither can much improvement arise from such speculations as the followings which are the themes suggested by the Vedanta ;— in what manner is the soul absorbed in the deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to the better members of society by Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, and the father, brother etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."

লর্ড আমহার্স্টকে লেখা এই পত্রাংশ তাঁর বাস্তব বুদ্ধি আর অসাধারণ বিচারশক্তির নিদর্শন। ধর্মসাধক হলেও তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। স্বদেশকে তিনি ভালোই বাসতেন, কিন্তু স্বদেশপ্রেম তাঁকে বিচারমূঢ় করে তোলে নি। পত্রের আর একটি অংশ—

"the Sanskrit system of education would be the best to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful science, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a College furnished with necessary books, instruments and other appliances

(তিন)

রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের আদিগুরু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ সমাজের ধর্মসাধনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। ঐ ধর্মসাধনার সঙ্গে সঙ্গে যে সমাজ সাধনা সারা দেশে প্রসারিত হয়েছিল তার আদর্শও রামমোহন। বরং পরবর্তীকালের ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের ধর্মভাবনার চেয়ে সমাজ সংস্কারের আদর্শই বেশি করে অনুসরণ করেছিল। তাঁর আগে ভারতবর্ষে যাঁরা ধর্মপ্রচার করে গেছেন তাঁরা অধ্যাত্ম সাধনার গভীরে প্রবেশ করলেও চলমান জীবনের পূর্ণমূল্য দেন নি। রামমোহন যে সমাজের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন এর মূলে সম্ভবত পশ্চিমের সংস্কারযুগের মিশনরীদের প্রেরণা বা আদর্শ ছিল। কিন্তু তিনি মনীষী ছিলেন বলেই সমাজ সংস্কার বলতে দেশের স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে উৎকটভাবে বিজাতীয় হন নি। জাতির নিজস্ব সম্পদ বলেই তিনি বেদান্তের ভিত্তিতে নবযুগের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

সেইজন্যই তাঁর সংস্কার-প্রয়াস ধ্বংসাত্মক গঠনমূলক। সতীদাহ বা অনুরূপ সামাজিক প্রথা বা আচার দূর করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু দেশকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছিলেন। রামমোহনকে আমরা যে যুগপ্রবর্তক বলি এটা তাঁর ধর্মচিন্তা সম্পর্কে কতটা খাটে বলা শক্ত তবে বাংলায় বেদান্তচর্চার প্রবর্তন একটা বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনা সন্দেহ নেই। তিনি যুগপ্রবর্তক, কারণ তিনি আধুনিক যুগের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর জ্ঞানব্রত আর কর্মব্রত নবযুগ সৃষ্টি করেছে। তিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন বলেই ব্রাহ্মসমাজ বা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবানুপ্রেরিত সমাজের জীবন-সাধনা সহজ বিকাশের পথ পেয়েছিল।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দৃঢ়তার সহিত কালীপ্রসাদ শিবমন্দিরের দালানে কম্বল বিছাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, আর তুলসী মহারাজ ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর। তিনিও অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। কালীপ্রসাদ মনে মনে স্থির করিলেন যে, একটু বিশ্রাম করিয়া তবে মাধুকরী করিতে বাহির হইবেন। ঠিক সেই সময়ে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক 'নমো নারায়ণ' বলিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কুছু ভোজন পায়া ?" এই কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ বলিলেন, "নেহি বাবা।" তুলসী মহারাজ সেই সকল কথাবার্তা শুইয়া শুইয়া শুনিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন এবং কালীপ্রসাদকে বলিলেন : "হয়তো মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আমাদের জন্য খাবার আনতে পারেন"। কালীপ্রসাদ উত্তরে বলিলেন— তুলসী, গীতায় ভগবান বলেছেন জানতো—"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। ভক্তের বোঝা ভগবান বয়ে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে যখন বার হয়েছি তখন

তিনিই আমাদের জীবনের সম্বল, তিনি সকল-কিছু অভাবই আমাদের পূরণ করবেন। সুতরাং হতাশ হও কেন? আমাদের তিনিই জোটাবেন"। কালীপ্রসাদের কথা শেষ হইতে না হইতে দেখা গেল যে, মাড়োয়ারী ভদ্রলোক একটি ঝুড়িতে করিয়া পুরী, তরকারী, মেঠাই, লাড্ডু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আনিয়া তাহাদিগের সম্মুখে পাতা কদলের মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ভক্তের বোঝা সত্যই ভগবান বহন করেন। কালীপ্রসাদ তুলসী মহারাজ উভয়েই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তবে সাময়িক, কেননা তাঁহারা অন্তরে জানিতেন যে, তাঁহারা ভগবানের নাম লইয়া নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভগবান দেখিবেন। তুলসী মহারাজকে উদ্দেশ করিয়া কালীপ্রসাদ বলিলেন: "দেখলে ভাই, আমাদের মাধুকরী এখানে-ই পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হইয়া আছে। করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর যে আমাদের সঙ্গে আছেন একথা বিশ্বাস করো তুলসী?" কালীপ্রসাদ তখন শ্রীমদ্ভাবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের সেই শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

আমার ভক্তেরা আমার প্রসাদেই কৃতার্থ হন ইহাই বলিতেছেন। অনন্যকাম হইয়া যে সকল ব্যক্তি আমার চিন্তা করতঃ ভজনা করে, নিত্য আমাতে যুক্ত তাঁহাদিগকে আমি যোগ (ধনাদিলাভ) ও ক্ষেম (ধনরক্ষা বা মোক্ষ) প্রদান করি।

কালীপ্রসাদ শ্লোকটি উচ্চৈস্বরেই পাঠ করিতে লাগিলেন। তুলসী মহারাজ আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন: 'তোমার কথাই ভাই সত্য হ'ল। সত্যই শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা আছেন। অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়, ইষ্টনিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস তাঁহাদিগের জীবনকে ভাস্বরদীপ্ত করিয়াছিল।

তুলসী মহারাজ সাময়িকভাবে অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে ছিল অদম্য সাহস ও প্রত্যয়ের ভাব। কালীপ্রসাদ তো সর্বদাই অচল-অটল ছিলেন এবং তাঁহার সেই সাহস ও স্থৈর্যের ভাব দেখিয়া তুলসী মহারাজ শান্ত, স্থির ও আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন।

অবশেষে তাঁহারা দুইজনে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের আনা পুরী, তরকারী ও মিষ্টান্নাদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করিলেন এবং নিবেদিত খাবারটিকে মহাপ্রসাদ জ্ঞান করিয়া আহার করিলেন। কিন্তু এতই প্রচুর ছিল পুরী, মিষ্টান্নাদি যে, দুই জনে তাহা শেষ করিতে পারিলেন না। সুতরাং অবশিষ্ট খাবারগুলি গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগের সকলকে বিতরণ করিয়াছিলেন। আমন্ত্রিত বালকগণ আনন্দে অধীর হইয়া জয়ধ্বনি দিতে লাগিল এবং তাহা দেখিয়া কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। আনন্দে অধীর হইবার কারণ ছিল এই যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ তাহারা অন্যান্য সকলকে বিতরণ করিতে পারিয়াছেন। বালকদিগের জীবনেও সৌভাগ্যের কথা, কেননা তাহারা অপরিচিত ও একদিক হইতে অনাহূত, সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ তাহাদিগের জীবনকে পবিত্র করিবে।

কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ অযোধ্যার সেই রাত্রে একটি শিবমন্দিরে অতিবাহিত করিলেন।

॥ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কালবিচার ॥

শ্রীজয়জিৎ রায়

(দুই)

ঋগ্বেদ, যা আর্যদের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের স্মারকবাহী, কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত নয়। ঋগ্বেদের মধ্যে প্রচীনকালের বিভিন্ন পর্যায় পাশাপাশি অবস্থান করছে। তাই ঋগ্বেদের মধ্যে (১।১৬৪।১১) ৩৬০টি অহোরাত্র সমন্বিত বৎসরের উল্লেখ দেখেই মনে করা ঠিক হবে না যে, আর্যেরা চিরকাল নাতিশীতোষ্ণ বা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেই বসবাস করতেন। কেননা, তার পাশেই চোখে পড়ে এমন সব সূক্ত, যা মেরু-সন্নিহিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক। এবং তা' থেকে মনে হয়, আর্যেরা উক্ত অঞ্চলেরই বসবাসকারী। এ রকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে বলা হয়েছে :

'অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দৃশ্রে কুহ চিদ্দিবেয়ুঃ।' (১।২৪।১০) অর্থাৎ ঐ যে ঋক্ষ বা সপ্তর্ষি, তা উচ্চে স্থাপিত। রাত্রে দৃষ্ট হয়ে দিবাভাগে কোথায় চলে যায়! এখানে সপ্তর্ষিমণ্ডল (ursa Major) উচ্চে স্থাপিত বলে বর্ণিত হয়েছে। মেরু-অঞ্চল থেকে আকাশে তাকালেই সপ্তর্ষিকে উচ্চে বা মাথার ওপর দেখা সম্ভব। অন্যত্র তা সম্ভব নয়। ঋগ্বেদের যে ঋষি সপ্তর্ষিকে 'উচ্চে' প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি মেরু-সন্নিহিত অঞ্চল থেকেই তা করে থাকবেন।

(২) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে :

'একং বা এতদ্দেবানামহঃ যৎ সংবৎসরঃ।' (৩।১২।১)

অর্থাৎ সংবৎসর হচ্ছে দেবতাদের একদিন মাত্র। পার্সীদের প্রাচীনতম গ্রন্থ আবেস্তার মধ্যেও এ-জাতীয় উল্লেখ আছে। অহুর মজদা এক জায়গায় বলেছেন, চন্দ্র-সূর্য একবারই উদিত ও অস্তমিত হয় এবং একটি বৎসর একটি দিনরূপেই প্রতিভাত হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বা আবেস্তার মধ্যে এ-জাতীয় উল্লেখ মেরু-অঞ্চলের বৎসরেরই বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক। কেননা, মেরু-অঞ্চলে কয়েক মাসের একটি দীর্ঘ দিন ও অনুরূপ দীর্ঘ রাত্রির সমন্বয়েই বৎসর গঠিত হয়। ৩৬০টি দিনরজনীর বৎসর সেখানে থাকা সম্ভব নয়। মনে হয়, প্রাচীনতম বৈদিক বৎসর দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল : দেবযান ও পিতৃযান। দীর্ঘ দিনই সম্ভবত 'দেবযান' বলে আখ্যাত হত, যখন যাগযজ্ঞ করা সম্ভব হত এবং সম্ভব হত মৃতদেহের সৎকার। কিন্তু পিতৃযান বা দীর্ঘ রাত্রিতে ধর্মকার্য বা মৃতদেহের সৎকার সহজসাধ্য ছিল না। তাই দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে মৃত্যু অশুভ বলে গণ্য হত। তাই পিতৃযানকে বলা হয়েছে মৃত্যুর পথ। দেবযান প্রকাশিত হত দীর্ঘ রাত্রির তমসার অবসানে, যখন দৃশ্যমান হতেন অগ্নি, উষা, সূর্য প্রভৃতি দেবতারা।

৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যেরা যে মেরু-অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীকালের সূর্যসিদ্ধান্ত বা মহাভারত থেকে। মহাভারতের বনপর্বে অর্জুনের মেরু-অঞ্চলে গমনের কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(৪) ঋগ্বেদের সপ্তমমণ্ডলের ৭৬ সংখ্যক সূক্তে দিগন্ত উষার প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হওয়া ও সূর্যোদয়ের মধ্যে অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে (তানি ইদ

অহানি বহলানি আসন্)। কয়েক মাসব্যাপী দীর্ঘ রাত্রির শেষে কয়েক দিনের দীর্ঘ উষা কেবল মেরু-কেন্দ্রিক অঞ্চলেই সম্ভব। ঋগ্বেদে উষা শব্দের বহুবচনাত্মক প্রয়োগ এ-ধারণাকে সমর্থন করে। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের একটি সূক্তে (৩.৬১।৩) বলা হয়েছে, উষা একপথে বিচরণ করতে ইচ্ছা করে চক্রবৎ পুনরাবৃত্ত হয়। এটাও মেরু অঞ্চলের উষারই একটি বৈশিষ্ট্য। মেরু-অঞ্চলের উষার রক্তাভাকে অনেকদিন ধরে দিগন্ত বরাবর চারদিকে চক্রের মত আবর্তিত হতে দেখা যায়। তখন দিগন্তরেখার নীচে থাকে বলে সূর্যকে দেখা যায় না। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (৬।৫৯।৬) বলা হয়েছে, উষা ত্রিশ পদ অতিক্রম করেছেন (ত্রিংশৎ-পদানি অক্রমীৎ)। অন্যত্র (১।১২৩।৮) বলা হয়েছে, উষাদেবীগণ ত্রিশ যোজন আবর্তন করেন (ত্রিংশতং যোজনান্যেকৈকা ক্রতুং পরিয়ন্তি)। বেদের ভাষ্যকার সায়ণ ত্রিশ যোজন অর্থে অর্ধ দণ্ডকাল বুঝিয়েছেন। কিন্তু সায়ণের এ ব্যাখ্যা বিভিন্ন জ্যোতি-বৈজ্ঞানিক কারণে গ্রাহ্য নয়। যোজন অর্থে আহ্নিক গতি বুঝে নিলে উল্লিখিত উভয় সূক্তেই ত্রিশ দিবসব্যাপী উষার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাচীনকালে আর্যেরা যেখানে বসবাস করতেন, সেখানে উষা ত্রিশ দিন ধরে চক্রের মত (বা কুমারের চাকার মত) আবর্তিত হত (পরিয়ন্তি)। অর্থাৎ এসব সূক্ত মেরু-কেন্দ্রিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যবাচক।

এ সব এবং এ-রকম আরো অসংখ্য বিক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে মনে হয়, আর্যেরা অতি প্রাচীনকালে মেরু-সন্নিহিত বা মেরু-কেন্দ্রিক অঞ্চলে বসবাস করতেন। পৃথিবীতে কম করেও দু'টি তুষারযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে অতিক্রান্ত হয়েছে। দু'টি তুষারযুগের মধ্যবর্তী একটি যুগ বা Inter glacial period। অধিকাংশ ভূতাত্ত্বিকের মতে, প্রায় ১০,০০০ বছর আগেই শেষ তুষারযুগ অবসিত হয়েছে। এই সময়েই আর্যেরা তুষারপাত সুরু হওয়ায় এবং মেরু-অঞ্চল ক্রমে বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠায় প্রাচীন আবাসভূমি ছেড়ে উত্তর ইউরোপ এবং পরে মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েন। তুষারযুগের বিধ্বংসী স্মৃতি প্রলয়-পয়োধিজলে বেদ লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কাহিনী কিংবা মহাপ্লাবনের কাহিনীর মধ্যে রক্ষিত। মহাপ্লাবনের কাহিনী শতপথব্রাহ্মণ, মৎস্যপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতে রয়েছে। আদি বাসভূমি ছেড়ে আসার দীর্ঘকাল পরে স্মৃতির সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধারের কাজ আরম্ভ হয়। উদ্ধার করা হয় বেদ। আবেস্তার মধ্যেও পার্সীদের প্রাচীন বাসভূমি ছেড়ে আসার উল্লেখ আছে। আবেস্তা ও বেদের মধ্যে সাদৃশ্য প্রকট। কেননা, ভারতীয় আর্য ও ইরানীয় আর্য মূলে একই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর দু'টি ধারা।

মেরু-কেন্দ্রিক অঞ্চলে প্রাচীনকালে, দু'টি তুষার যুগের মধ্যবর্তী সময়ে মহাদেশের অস্তিত্বের কথাও অনেকে বলেছেন। বেদে 'পঞ্চ জনাঃ' শব্দের বহুল ব্যবহার থেকে মনে হয়, একদা সেখানে ইন্দো-ইউরোপীয়রা ছাড়া অন্য চারটি জাতির বাসভূমি ছিল। তাই পৃথিবীর প্রাচীন জাতিদের পুরা-কাহিনীর মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। বিগত তুষারযুগ আরম্ভ হওয়ার আগে ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। তখন সেখানে ছিল আরামপ্রদ, ঠাণ্ডা গ্রীষ্মকাল ও কয়েক শীতকাল। আবহাওয়ার সমতার জন্য তখনকার ঐ অঞ্চলকে চিরবসন্তের দেশ বললে অত্যুক্তি হয় না। সম্ভবত এর থেকেই পরে স্বর্গের ধারণা এসে থাকবে, যেখানে চিরবসন্ত বিরাজিত। সুদূর অতীতে চিরবসন্তময় মেরু কেন্দ্রিক অঞ্চলের স্বর্গ-রহস্যকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে তুষারযুগের তত্ত্বকে। আর তুষারযুগকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে পৃথিবীর অয়ন-গতির তত্ত্বকে।

পৃথিবীর দু'টি গতির সঙ্গেই আমরা বেশী পরিচিত। একটি হচ্ছে নিজের মেরুদণ্ড বা অক্ষরেখার চারদিকে পৃথিবীর আবর্তন, যা আহ্নিক গতি বলে পরিচিত এবং দিবারাত্রির কারণ। অপরটি হচ্ছে সূর্যের চার দিকে পৃথিবীর আবর্তন, যা ঋতুপরিবর্তনের কারণ। এছাড়াও পৃথিবীর আরেকটি গতি আছে। পৃথিবী তার নিজের চারদিকে অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে লাট্টিমের মতই ঊর্ধ্বাকাশে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি বৃত্ত রচনা করে। এই বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে পৃথিবীর ২৫।২৬ হাজার বছর দরকার হয়। এটাই হচ্ছে অয়ন-গতি বা মেরু-দোলন (Precession of the Equinoxes)।

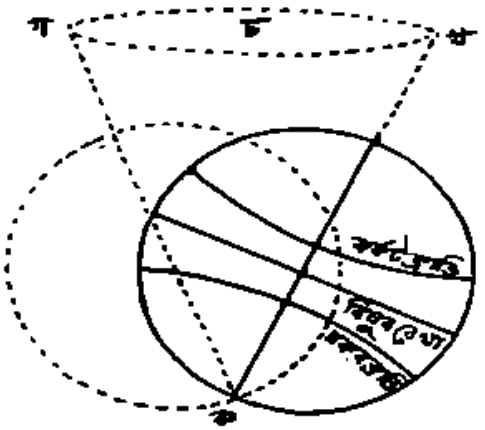

(এই চিত্রে চ হচ্ছে মেরু-দোলনের ফলে ঊর্ধ্বাকাশে রচিত কল্পিত বৃত্ত। পৃথিবীর কখ অক্ষরেখা ঘুরতে ঘুরতে কগ অবস্থানে যাবে প্রায় ১২,৫০০ বছর পর এবং পুনরায় কখ অবস্থানে ফিরে আসতে সময় লাগবে ২৫।২৬ হাজার বছর।)

পৃথিবী যে পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তার নাম রবিমার্গ বা ক্রান্তিবৃত্ত। পৃথিবীর বিষুবরেখাকে ক্রান্তিবৃত্তের মত বড় আকারে আকাশে বাড়িয়ে দিলে তাকে বলা হয় আকাশ-বিষুব। ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে আকাশ-বিষুবের যে দু'টি বিন্দুতে ছেদ হয়, তাদেরকে বলা হয় যথাক্রমে মহাবিষুব বা বাসন্তবিষুব এবং অপবিষুব বা শারদবিষুব। সূর্য এই দু'টি বিন্দুতে অবস্থানকালে পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। কিন্তু পৃথিবীর অয়ন-গতি বা মেরু-দোলনের ফলে এই দুই বিন্দু ক্রমশ পেছনদিকে সরে সরে আসছে। আমরা রাশিচক্র মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদিক্রমে গণনা করে থাকি। কিন্তু অয়ন-গতির প্রভাবে বিষুব-বিন্দু মিথুন, বৃষ, মেষ ইত্যাদিক্রমে ভ্রমণ করে। রাশিচক্র হচ্ছে ৩৬০° ডিগ্রী এবং প্রতিটি রাশি হচ্ছে ৩০° ডিগ্রী। বিষুব-বিন্দুর ১° ডিগ্রী পেছনে সরে আসতে প্রায় ৭২ বছর সময় লাগে। মহাবিষুব ক্রান্তিপাত বর্তমানে মীন রাশির ৮° ডিগ্রীতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ চৈত্র মাসের ৮ তারিখে দিনরাত্রি সমান হয়। মূলত ৭২ পর পর দিনরাত্রি সমান হওয়ার তারিখটি একদিন করে পিছিয়ে আসতে থাকবে। উত্তর গোলার্ধে বৎসরের যে দুটি দিন দিবা ও রাত্রি সব চাইতে দীর্ঘ হয়ে থাকে, অয়ন-গতির ফলে সেই দু'দিনও ৭২ বছরে এক দিন করে পেছনে সরে আসবে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে বা অথর্ববেদ গ্রৌতসূত্রে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি থেকে বর্ষারম্ভের কথা আছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির (winter Soltice) অন্য নাম মকর সংক্রান্তি, যেদিন থেকে দিন ক্রমশ বড় হতে সুরু করে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে। তিলকের মতে, বৈদিক যুগে বাসন্ত বিষুব

থেকেই বর্ষ আরম্ভ হত। বাসন্ত বিষুব থেকে শারদ বিষুব পর্যন্ত সময়কে বলা হত দেবযান এবং পরবর্তী ছয় মাসকে বলা হত পিতৃযান। বেদের যুগে বত্সর, সংবৎসর, প্রজাপতি প্রভৃতি শব্দ ছিল সমার্থ দ্যোতক। বৎসরের অন্য নিমকে বলা হত 'বিষুবন'। অর্থাৎ বিষুবন অর্থে শারদ বিষুবদিন। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা দেবতাদের ঋতু এবং শরৎ, হেমন্ত ও শীত পিতৃদেব। বসন্ত ঋতু থেকেই বৎসর আরম্ভ হয়, একথা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।২।৬) বলা হয়েছে। সুতরাং বাসন্ত বিষুব থেকে বসন্ত ঋতু তথা বৎসর সুরু হত।

●

॥ রাকু ইয়াকী ॥

শ্রীদিবাকর সেনরায়

(দুই)

জাপানে রাকু শৈলীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে যিনি আখ্যাত—তাঁর নাম ডোন্‌ইয়ু। ইনি নোন্‌কো নামেও পরিচিত। রাকু শৈলীর তৃতীয় ওস্তাদ শিল্পী (master) রূপে জাপানে এঁর খ্যাতি বিস্তৃত। ডোন্‌ইয়ুনির্মিত রাকু পাত্রগুলোর গঠনাকৃতিতে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। চা-পানের পাত্র ছাড়া ডোন্‌ইয়ু বিভিন্ন আকারের ফুলদানী এবং ধূপদানীও তৈরী করেছিলেন। তিনিই প্রথম জাপানী শিল্পী যিনি রাকু পাত্রে প্রথম লাল রঙ-এর গ্লেজ ব্যবহার করেন। ডোন্‌ইয়ুনির্মিত কোনো কোনো রাকু পাত্রের গায়ে চিকনীর আঁচড়ের দাগের মতো অলংকরণ দেখা যায়। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ডোন্‌ইয়ু পরলোকগমন করেন।

রাকু শৈলীর চতুর্থ ওস্তাদ শিল্পীরূপে জাপানে যিনি আখ্যাত হয়ে থাকেন—সেই ইচিনিয়ু-র কাজে কিন্তু বিশেষ বৈচিত্র্য চোখে পড়ে না। ইচিনিয়ু প্রধানতঃ তাঁর পূর্বসূরী রাকু শিল্পীদের কাজের ধারা অনুসরণ করে গেছেন। অবশ্য তিনি নিজে একধরণের লালচে গ্লেজ তৈরী করেছিলেন। ওই গ্লেজ তিনি স্বনির্মিত রাকু পাত্রে ব্যবহার করতেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইচিনিয়ু-র দেহান্তর ঘটে।

জাপানের রাকু শৈলীর শিল্পীদের মধ্যে ডোরাকু (সপ্তদশ শতাব্দী), হোনামি কোয়েৎসু (ষোড়শ শতাব্দী) এবং তাঁর পুত্র হোনামি কুচু-র (ষোড়শ শতাব্দী) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাপানে রাকু ইয়াকী নির্মাণপদ্ধতির সূত্রগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হতো। রাকু কেই-রা ওই সূত্রগুলো উপযুক্ত পুত্র অথবা শিষ্য ছাড়া অপর কারুর কাছেই প্রকাশ করতে চাইতেন না। গোপনতা রক্ষার জন্য এই সূত্রগুলো লিখিত হতো না, শিষ্য-পরম্পরায় মৌখিকভাবে প্রচারিত হতো। শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্র উপযুক্ত বিবেচিত হলে গুরু ছাত্রকে নিদর্শনপত্র দিতেন। এই নিদর্শনপত্র জাপানী ভাষায় 'কু ডেন্' নামে পরিচিত। একমাত্র 'কু ডেন্' প্রাপকরাই রাকু শৈলীর প্রধান শিল্পীরূপে গণ্য হতেন।

রাকু ইয়াকী অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুমোরের চাকে তৈরী করা হয়ে থাকলেও কখনো কখনো কেবলমাত্র হাতের সাহায্যেও রাকু ইয়াকী তৈরী করা হয়েছে। রাকু ইয়াকী নির্মাণে জাপানে এক বিশেষ ধরণের ছুরি ব্যবহার করা হয়। এই ছুরির জাপানী নাম

'হেরা'। বাঁশ কাটবার জন্যও জাপানীরা 'হেরা' ব্যবহার করে থাকেন। হেরার সাহায্যে রাকু পাত্রের উপরিভাগে নানান্ ধরণের অলংকরণও করা হয়ে থাকে। এই ধরণের অলংকরণে জাপানী রাকু শিল্পীদের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

রাকু ইয়াকী সাধারণতঃ উচ্চতাপসহ মিশ্রিত মাটির মণ্ডে তৈরী করা হলেও ৮০০° সেন্টিগ্রেড থেকে ৯৫০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপের মধ্যে ভাঁটিতে পোড়ানো হয়, ফলে পোড়াবার পর ওই মাটির মণ্ড কখনই ঘনীভূত কাঁচীর মতো পরিণত হয় না। এই মিশ্রিত মাটির মণ্ড ষ্টোন্ অয়্যার শ্রেণীর, তবে উত্তাপের অভিঘাত প্রতিরোধশক্তি বাড়াবার জন্য ২০ থেকে ৩০ ভাগ বিশুদ্ধ বালি, কায়ার ক্লে জাতীয় মাটি অথবা গ্রগ্ চূর্ণ মেশানো হয়ে থাকে। রাকু সিরামিকপাত্র তৈরী করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ ভালো করে পাত্রগুলো শুকোবার আগেই জলন্ত ভাঁটিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কয়েক ঘণ্টা পোড়বার পর পাত্রগুলো বিস্কুটের মতো বাদামী রঙ ধারণ করলে পাত্রগুলো লম্বা হাতলযুক্ত সাঁড়াশীর সাহায্যে বের করে আনা হয়। এরপর নিম্নতাপসহ লেড আম্লাইড কিংবা সোরাম্লমিশ্রিত রঙীন গ্লেজ লাগিয়ে পাত্রগুলো ভালো করে শুকোবার পর লম্বা হাতলযুক্ত সাঁড়াশীর সাহায্যে জলন্ত ভাঁটিতে ঢুকিয়ে ভাঁটির দরজা উচ্চ তাপসহ ইট সাজিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়ে থাকে। ভাঁটির দরজার ওপর দিকে যে ছোটো ছিদ্র থাকে—সেই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে দেখে নেওয়া হয়, পাত্রে লাগানো গ্লেজ পুরোপুরি গলেছে কিনা। যখন দেখা যায় গ্লেজ গলে গেছে, তখন ভাঁটির দরজা খুলে লম্বা হাতলযুক্ত সাঁড়াশীর সাহায্যে পাত্রগুলো একটি একটি করে বের করে এনে একটি বড়ো পাত্রে রাখা ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। গ্লেজ-এর বিশেষ ধরণের রঙ পাবার জন্য গ্লেজে ঘোঁয়া লাগাবার প্রয়োজনে জলন্ত ভাঁটি থেকে বের করবার পরই পাত্রগুলো প্রথমে একটি বড়ো লোহার অথবা মাটির ট্রে-তে রাখা কাঠের গুড়ো কিংবা শুকনো পাতার মধ্যে কিছুক্ষণ রেখে তারপর ঠাণ্ডা জলে ডোবানো হয়ে থাকে।

রাকু ইয়াকী-র দুটো মুখ্য নির্মাণপদ্ধতি জাপানে প্রচলিত রয়েছে। একটি পদ্ধতিতে মাটির মণ্ড ভালো করে মেখে নিয়ে সেই মাটি দু'হাতে পাকিয়ে একটি সেন্সিল্-এর পরিধির মাপে দড়ির আকার দেওয়া হয়। ওই দড়ির সাহায্যে বিড়ে তৈরী করবার পদ্ধতিতে রাকু পাত্র তৈরী করা হয়ে থাকে। অপর পদ্ধতিতে একতাল মাটিকে বাঁশের তৈরী একটি চ্যাপটা ছুরি দিয়ে চেঁছে এবং আঙুলের সাহায্যে মাটিকে চেপে চেপে পাত্রের আকার দেওয়া হয়। এ ধরণের পাত্রগুলোর তলার দিকের দেয়ালের বেধ বেশ পুরু হয়ে থাকে। দু'ধরণের পদ্ধতিতে তৈরী রাকু পাত্রের তলার গোলাকৃতি অংশ ফুটরিম (footrim) আলাদাভাবে তৈরী করে নিয়ে পাত্রের তলায় জুড়ে দেওয়া হয়। ফুটরিম্-এর মাপ সাধারণতঃ পাত্রের মুখের মাপের এক-তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে। জাপানী ভাষায় ফুটরিম্কে বলা হয় 'কোডাই'।

চিত্রিত করবার প্রয়োজন হলে তুলির সাহায্যে পাত্রগুলোকে চিত্রিত করে তারপর পাত্রগুলোর ওপর গ্লেজ-এর একাধিক আস্তরণ লাগিয়ে দেওয়া হয়। গ্লেজ বেশ পুরু করে লাগানো হলেও রাকু ইয়াকী ভাঁটিতে পোড়াবার পর ওই গ্লেজ হয়ে ওঠে মসৃণ। গ্লেজএর রঙ হয়ে থাকে কালো, হাল্কা ও গাঢ় খয়েরি, লাল এবং হাল্কা হলুদ। তাছাড়া কোরিয়ার প্রচলিত সিলাডন্ (celadon) গ্লেজএর রঙ-এর অনুসরণে ছাই এবং সাদাটে হলুদ রঙের গ্লেজও রাকু ইয়াকীতে লাগানো হয়ে থাকে। বেশির ভাগ রাকু পাত্রে নকশা আঁকা

হয় না। পাত্রগুলোতে বিভিন্ন রঙের গ্লেজএর মিশ্রণে যেসব নকশার সৃষ্টি করা হয়ে থাকে—তার মধ্যে রয়েছে জাপানের ফুজিয়ামা পর্বত, পাইন গাছ এবং সারস পাখি। পূর্বেই বলা হয়েছে, চা-পান অনুষ্ঠানে যে চা পরিবেশিত হয়—সে চা-র রঙ সবুজ। ওই সবুজ রঙএর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাকু ইয়াকীর গ্লেজএর রঙ নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

জাপানের সিরামিক্ শিল্পীদের অতুলনীয় সূক্ষ্ম শিল্পবোধ এবং কারুনৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটেছে রাকু ইয়াকীতে। রাকু চা-পানের পাত্রগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে গোলাকৃতি করে তৈরী করা হয়নি; গেলাসের আকারে ওই পাত্রগুলো তৈরী করা হয়েছে—যাতে দুটো হাতের মধ্যে সুবিধাজনকভাবে ধরা যেতে পারে। পাত্রগুলোর কিনারা ভেতর দিকে সামান্য চাপা—যাতে কিনারায় ঠোঁট লাগিয়ে সহজে চা পান করা যায়। বেশির ভাগ রাকু পাত্রের বাইরের দিকের পুরোটাই রঙীন গ্লেজ দিয়ে না ঢেকে কিছু কিছু অংশ গ্লেজহীন রাখা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো—যে ধরণের মাটির মণ্ডে পাত্রটি তৈরী হয়েছে, সে-মাটির স্বাভাবিক রঙ যাতে দৃষ্টিগোচর হতে পারে। রাকু ইয়াকী বিভিন্ন আকারে তৈরী করা হয়েছে; এ-বিষয়েও জাপানী শিল্পীদের কল্পনা এবং উদ্ভাবনীশক্তির বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে। গ্রীষ্মকালে চা-পানের জন্য যে-রাকু পাত্রগুলো নির্মিত হয়েছে—তার আকার ছোটো থালার মতো; যাতে ওই পাত্রে চা ঢাললে অল্প সময়ের মধ্যেই তা ঠাণ্ডা হতে পারে। আবার শীতকালে চা-পানের জন্য যে রাকু ইয়াকী তৈরী করা হয়েছে—সেগুলোর আকার অনেকটা গেলাসের মতো লম্বা—যাতে ওই পাত্রে রাখা চা সহজে ঠাণ্ডা হয়ে না যায়।

অন্যান্য দেশের মতো জাপানেও উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুপ্রাচীনকাল থেকেই সিরামিক্স্ নির্মিত হয়ে আসছে। কালের আবর্তনে বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের রাজনীতি যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনই পরিবর্তিত হয়েছে ওই উপলক্ষে নির্মিত সিরামিকএর গঠন এবং অলংকরণ। জাপানের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রায় সর্বস্তরে পরিবর্তন তথা আধুনিকতা গৃহীত হলেও জাতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন ধারাটিকে কিন্তু তাঁরা বাতিল করে দেননি। তাই আধুনিক জাপানীদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দেশজ সংস্কৃতির প্রাচীন যোগসূত্রটি। সেই কারণেই কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে ও অন্যতম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানরূপে 'চা-নোয়্' যুক্ত হয়ে রয়েছে আধুনিক জাপানী জীবনধারার সঙ্গে। 'চা-নোয়্'-র অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে রাকু ইয়াকী-র সমাদর এবং সম্মান যে বর্তমানে কেবলমাত্র জাপানেই সীমাবদ্ধ, তা নয়; শিল্পিতে সিরামিক্সএর অনন্য শৈলীরূপে রাকু ইয়াকী এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্পরসিকমহলেও বিশেষভাবে সমাদৃত এবং সম্মানিত।

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

ধর্ম : আধুনিক অন্বেষা—স্বামী পবিত্রানন্দ। অনুবাদ : শ্রীসৈকত রুদ্র।
প্রকাশক—ডি. সি. বোস এণ্ড কোম্পানী, ৮০/৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৬।
পরিবেশক—উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩।
মূল্য—৪·০০ টাকা।

স্বামী পবিত্রানন্দ 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদক ছিলেন (১৯৩১-৩৫), মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯৩৭-৪৮) এবং সবশেষে ন্যুইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, সুলেখক। 'Modern Man in Search of Religion'-গ্রন্থটি তাঁর মনীষার পরিচয় বহন করে। শ্রীমান সৈকত রুদ্র তাঁর অনুমতি নিয়েই এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। সমালোচ্য গ্রন্থটি এই অনুবাদ। নাম—ধর্ম: আধুনিক অন্বেষা।

গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত: নাস্তিক্য ও আধুনিক যুগ, বিজ্ঞান ও ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্ম, মনের গভীরে ধর্মের স্বরূপ এবং ধর্মের ভবিষ্যৎ। অনেকেই মনে করেন, আধুনিক যুগে নাস্তিক্য বুদ্ধির প্রাধান্য। স্বামীজী এই মত বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্তে বলেছেন, মানুষ সুদূরের যাত্রী, তারমধ্যেই রয়েছে অসীম ও অনন্ত এবং তার অন্বেষাই মানুষের সাধন। এই সাধন না থাকলে মানুষ যথার্থ মানুষ হয় না। সুতরাং মানুষ নাস্তিক হলেও তার অন্তর্নিহিত অশেষকে অবিশ্বাস করলে সে মনুষ্যত্ব হারায়।

বিজ্ঞান ও ধর্মের তথাকথিত বিরোধ স্বামীজী স্বীকার করেন না। তাঁর মতে 'উভয়ে সমান্তরাল পথচারী। বিজ্ঞানের কারবার বহিঃপ্রাকৃতিক বিষয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নিয়ে। ধর্ম নিযুক্ত মানুষের অন্তঃপ্রাকৃতিক রহস্য পাঠে।' অন্তর ও বাহির দুই মিলেই পরিপূর্ণ সত্য। এইদিক থেকে ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের কথা—'Science without religion is lame and religion without science is blind.'

রাজনীতি ও ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামীজী প্রশ্ন তুলেছেন—'কেমন করে ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয়সাধন সম্ভব? উভয়েই মানবজীবনের মৌলিক প্রয়োজনপ্রসূত, কিন্তু বাহ্যত যেন তারা বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছে।' তিনি আরও বলেন, 'যে কোন-সরকার নিয়েই প্রথম ও প্রধান সমস্যা: কারা প্রকৃত ক্ষমতার দক্ষ ব্যবহার করতে পারে এবং তারা কোন্ ধরনের মানুষ এবং ধর্মই প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতে পারে।' এইখানেই ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সেতুবন্ধন। আরও কথা, ধর্ম বলে, যেমন নিজেকে ভালবাসো, তেমনই ভালবাসো আর সবাইকে। সবাইকে ভালোবাসার ইচ্ছা নিয়ে রাজনীতি করলেই দেশ ও জনের উপকার করা যায়। শান্ত মনে ঠাণ্ডা মাথায় কথাগুলো ভেবে দেখা দরকার।

'মনের গভীরে' অধ্যায়ে স্বামী পবিত্রানন্দজী মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড, অ্যাডলার এবং য়াঙ্গ-এর মত বিচার ও বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন, 'মনঃসমীক্ষণবাদীরা অর্থাৎ আধুনিক মনোবিদরা মনের অংশবিশেষকে দেখেন। মনের সমগ্র রূপটি তাঁরা ধরতে পারেন না। তাই তাঁদের সিদ্ধান্তও অংশত সত্য, সম্পূর্ণত নয়। নিজেরাই খণ্ডিত মনের অধিকারী হওয়ায় মনকে পুরোপুরি তাঁরা দেখতে পান না; মনের গবেষণা করেন নিজেদের মন দিয়েই, তাই তাঁদের সিদ্ধান্ত কখনোই চূড়ান্ত হতে পারে না।'

প্রাচীন ভারতের মনোবিজ্ঞানী পতঞ্জলি দেখেছিলেন, জেনেছিলেন মনের অতল রহস্য। তিনি জানতেন, অধিকাংশ মানুষই লোভ, লালসা ইত্যাদি আবেগের অধীন। কিন্তু, তিনি কখনই বলেন নি যে এই সব আবেগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের নিরাশ সুযোগ দিতে হবে। তাঁর অভিমত, এদের জয় করার একমাত্র পথ এদের বিরোধী ভাবনা। 'বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম' (যোগসূত্র ২/৩৩)। স্বামী পবিত্রানন্দ এই প্রসঙ্গ বিস্তারিত করে বলেছেন, 'ক্রোধের হাত থেকে মুক্তি পেতে হ'লে আবাহন জানাতে হ'বে অক্রোধকে, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রেম। প্রেমে প্রতিষ্ঠিত যে তার শত্রু থাকে না, তার কোন বৈরিতা থাকে না।

ধর্মের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামী পবিত্রানন্দজী স্বীকার করেছেন, 'ধর্ম বিষয়টি বহু-বিতর্কিত' এবং এর 'যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারণ দুসাধ্য।' St, Augustine ধর্ম কি, এই প্রশ্নের উত্তরে সঙ্গতভাবেই বলেছিলেন, 'If you ask me, I know not, But you do not ask, I know.' পবিত্রানন্দজী বলেছেন, ধর্ম মানুষের অন্তরবেদনার, মুক্তিকামনার সঙ্গে যুক্ত। ধর্ম অসীমের প্রতি মানুষের তীব্র ব্যাকুলতার বহিঃপ্রকাশ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করে।' মননশীল আধুনিক মনকে জয় করার জন্য এর চেয়ে ভালো কোন লক্ষণ ধর্মের দেওয়া যায় কি-না, তা সন্দেহের বিষয়।

ধর্মের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, ধর্ম অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে হয়ত ধর্মের ওপর আক্রমণ আসবে, সন্দিগ্ধ মন নানা প্রশ্ন তুলবে, কিন্তু 'পৃথিবীতে সব কালে, সব যুগেই থাকবেন উচ্চ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত মানুষ, তাঁরা আলো দেখাবেন, পথ দেখাবেন।—ঈশ্বরকে মানুষ কখনও হারাবে না, হারাতে পারে না।'

আমার মতে আলোচ্য গ্রন্থটি স্বামী পবিত্রানন্দজীর পাণ্ডিত্য, বিশ্লেষণ শক্তি এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির ত্রিবেণী ধারায় স্নিগ্ধ ও সমৃদ্ধ। ধর্মের বিরুদ্ধে যাঁরা যুক্তিজাল বিস্তার করেন স্বামীজী তাঁদের যুক্তির ফাঁক দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের জবাব দিয়েছেন বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তিনি ধর্মের স্বরূপ ও ভবিষৎ নির্ণয় করেছেন বুদ্ধি ও যোগির প্রদীপ জ্বালিয়ে। শ্রীযুক্ত সৈকত রুদ্রের অনুবাদ স্বচ্ছ, নুলাদুপ এবং অর্থবহ। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

অনুধ্যান ও নানাচিন্তা—শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশক—শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণী, কলিকাতা—১৩। মূল্য—পাঁচ টাকা মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারায় আলোকিত কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্কলন মূলতঃ পুস্তকখানির কলেবর পরিপুষ্ট করেছে। সময়োপযোগী এবং আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় এই প্রবন্ধগুলি পাঠে আমরা আনন্দলাভ করবো। লেখক সারাজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারায় নিয়োজিত। সেই অর্থে এই সংকলন গ্রন্থটি অত্যন্ত অর্থবহ হয়েছে। সু-সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের "রবীন্দ্রনাথের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ"-প্রবন্ধটি গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

অথাতঃ অর্থ জিজ্ঞাসা—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী।

সম্পাদনা—শ্যামাদাস দে। প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স। কলি-১২। মূল্য—দশ টাকা।

'প্রবর্তক' পত্রিকার ২১টি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ নিয়ে রচিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থটি। শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ছিলেন সু-সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের গহনে প্রবেশাধিকার ছিল তাঁরপক্ষে অনায়াসলভ্য। তাঁর সুচিন্তাপ্রসূত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ আমাদের কাছে অজ্ঞাত-ই থেকে যেত যদি না তাঁরই সুযোগ্য গুণগ্রাহী শ্রীশ্যামাদাস যে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা নিয়ে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করতেন। জীবন এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এক সুগভীর যোগসূত্রের অতি সূক্ষ্ম এবং বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি পাঠে আমাদের আনন্দ লাগবে।

—রমণীরঞ্জন পোদ্দার

শ্রীশ্রীনগেন্দ্র উপাদেশামৃত (১ম পর্ব)।

সংকলক—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ। ৺বি, রামমোহন রায় রোড। কলিকাতা—৭০০০০৯। মূল্য—১৬ টাকা, পৃষ্ঠা-৩২০।

—শ্রীরামকৃষ্ণোত্তর যুগে যে ক'জন সাধক স্বীয় মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিলেন—তাঁদের মধ্যে মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ অন্যতম। আত্মপ্রচার-বিমুখ এই পরম সাধকের জীবনী ও বাণী অধ্যাত্ম পিপাসু ব্যক্তিবর্গের নিকট যে এক মহার্ঘ পাথেয় তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। অনেক বিলম্বে হলেও তাঁর এই অমৃতোপম বাণীগুলির সংকলন প্রকাশ করায় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী সকলের নিকট থেকেই সাধুবাদ পাবেন। কিছুটা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ধরণের এই গ্রন্থে মহর্ষির সঙ্গে ভক্তদের কথোপকথন-সংকলিত হয়েছে। অতি সুললিত ভাষায়, সাবলীল ভঙ্গিতে আলোচিত হয়েছে ধর্মাচরণের বিবিধ প্রসঙ্গ যথা, ভক্তিলাভের উপায়, শরণাগতি কি, চিত্তশুদ্ধির অর্থ, প্রার্থনার গুরুত্ব, ত্যাগ বৈরাগ্যের মহিমা, ইত্যাদি। যাঁরা ইতিমধ্যে সাধনজগতে প্রবেশ করেছেন এবং যাঁরা প্রবেশ করতে যাচ্ছেন—তাঁদের বইটি যথেষ্ট সাহায্য করবে। বইটির মুদ্রন ইত্যাদি কাজ সুন্দর।

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ

১। **কণ্ঠ-সংগীত**—দ্বিতীয় ভাগ, অমর লাইব্রেরী, ৫৯।৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ও এন্, চন্দ্র এণ্ড কোং ৪ রফি আহমেদ্ কিদ্ওয়াই রোড, কলিকাতা। মূল্য ৯.০০ টাকা। সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীতাপস আদিত্য রচিত 'কণ্ঠসংগীত'-গ্রন্থে সংগীত-শিক্ষাকালে কি কি অসুবিধায় পড়তে হয় তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আলোচনা করেছেন। নিজের রচনাগুলির সুরে-আরোপিত স্বরলিপি, তালশিক্ষা, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন, রেকর্ড সঙ্গীত, ছায়াছবির গানের স্বরলিপি প্রভৃতি সংযোজন করে তিনি গ্রন্থখানি পাঠকপাঠিকাদের সহযে গান শিক্ষার উপযোগী করেছেন। লেখকের পরিশ্রম সার্থক হোক।

২। **পরমার্থ-সঙ্গীতাবলী**—শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ, হরিমোহন রায় রোড, কলিকাতা। মূল্য ১০.০০ টাকা। শ্রীশ্রীনগেন্দ্র নাথ গ্রন্থখানিতে ভাবের সৌন্দর্যে ও ভাষায় ভক্ত-হৃদয়ের গানগুলি ভগবানের চরণে নিবেদন করেছেন। ইহার সাফল্য কামনা করি।

৩। **গীত-মঞ্জরী**—২য় খণ্ড, ডাঃ তারক চন্দ্র ঘোষ। পরিবেশক বিশ্বজ্ঞান, ১৮৩ চৈতার লেন। কলিন প্রকাশক ষ্টেশন রোড, চুঁচড়া, হুগলী। ডাক্তার শ্রী তারক চন্দ্র ঘোষ স্বরচিত 'গীত মঞ্জরী' দেবতার চরণে নিবেদন করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন। গানগুলি গভীর ভক্তি ও প্রেমরসে ভরপুর। সুর-সংযোগে গীত হলে শুধু ভাবুক হৃদয়েই নয়, সাধারণের চিত্তেও পুলকের সঞ্চার করবে।

—ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ

॥ সংঘ-বার্তা ॥

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবার নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় নানান দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল্'-এর উপরে (দ্বিতলে) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারেও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রসারতাকে জয়যুক্ত করবে। ইতি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সম্পাদক
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

স্বীকৃতি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে গৃহ নির্মাণকার্যে যাঁহারা এ পর্যন্ত দান করিয়াছেন—
(পূর্ব প্রকাশিতের পরে)

	নাম		টাকা
৭১১।	শ্রীপাচকড়ি সাধুখাঁ ১০৯সি, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬	...	৫০০১·০০
৭২০।	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ "অনুকূল ভবন" ১৬১।২।১, রাসবিহারী এভিন্যু, কলি.—৭০০০১৯		১০০০·০০
৭২১।	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ ও শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী ঘোষ ১৬১।২।১ রাসবিহারী এভিন্যু, কলি-৭০০০১৯		১০০০·০০
৭২২।	শ্রীমতী লীনা রক্ষিত, ব্লক ডি./সি. ২৫ এফ্. বি. সি. পোঃ কারাক্কা ব্যারেজ, জেলা—মুর্শিদাবাদ	... (মেরামতি কাজের জন্য)	২০০·০০
৭২৩।	শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, ৪২৩ সোনারী, ওয়েষ্ট লে আউট সোনারী, জামসেদপুর-৮৩১০১১	... (মেরামতি কাজের জন্য)	২০০·০০
৭২৪।	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ১২নং পাতালবাবু রোড, ভাগলপুর-৮১২০০১, বিহার	...	১০৩·০০
৭২৫।	শ্রীপার্বতীচরণ ভা পীরপুকুর কালনা রোড, পোঃ+জেলা—বর্দ্ধমান	... (মেরামতি কাজের জন্য)	১০০·০০
৭২৬।	শ্রীমতী নীলিমা সিংহ ১৭ বোটানিকাল গার্ডেন লেন, পোঃ—বোটানিকাল গার্ডেন, হাওড়া	...	৬৭·০০

Phone : 36-1207

THE ARTISAN

107/A, B. B. Ganguli Street
Cacutta-700012

DESIGNERS,
BLOCK-MAKERS
&
COLOUR PRINTERS

মনস্তাত্ত্বিকভিত্তিতে অধ্যাত্মসাধনার অপূর্বগ্রন্থ
"পরামার্থসাধন ও সাধুসংগ"
গ্রন্থকার :
শ্রীঅজিতকুমার সেন
মূল্য—৬·০০ টাকা

মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা
'রঘুনাথবিল্ডিংস্'
৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৩৫, ৫৬
অন্যান্য শাখা : বারাণসী, কটক

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য-ভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—৩·০০ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—৩·০০ টাকা

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিষ্টস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা (মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ)	২০·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত	
		ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)	১৮·০০	বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০
		বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০
সটীকশ্রীগীতা	১২·০০	বাংলার কবি	৭·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৩·০০
		বাংলার বিদুষী	৪·০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩		ব্যবহারিক শব্দকোষ (প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)	১৫·০০

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi	10·00	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
India and Her People	12·00	True Psychology	16·00
Life Beyond Death	16·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Yoga Psychology	16·00
My Life Story	12·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Mystery of Death	18·00	Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25
Path of Relization			
Philosophy and Religion			

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	20·5

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	00.30
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples. Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Litarature)

Estabiished by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733/57
41st Year, May 1979
VOL. III

Regn. No. WB/NC-141
PHONE : 55-1800

2 2 JUN 1979

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

কুক্‌মী

ভারতের সেরা

গুঁড়া মশলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুক্‌মী প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী
ফোন-৩৩-০৯৯৫
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

PRICE Rs. 1·50
Ramakrishna Vedanta Math.
19-B. Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006.
মূল্য ১.৫০ টাকা।

স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

একচল্লিশ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ
১৩৮৬

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র দ্বারাই পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

দুলালের তেলমিছরী

প্রস্তুতকারক
শ্রীসুভাষ চন্দ্র দত্ত
১, বেনারা লেন, কলিকাতা-৩
ফোন : ৩৩-৫৩৩৩

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশন বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬।

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	১০·০০
মরণের পারে	১৪·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	যন্ত্রস্থ
যোগশিক্ষা	যন্ত্রস্থ	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	৬·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	যন্ত্রস্থ
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	৪·০০	আত্মজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ (৫ম নূতন সংস্করণ)	৬·০০

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মনুষ		তীর্থরেণু (বর্ধিত ২য় সংস্করণ)	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	যন্ত্রস্থ	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্ধ	যন্ত্রস্থ
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ (প্রথম ভাগ)	১৬·০০	সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	১২·০০
ঐ (দ্বিতীয় ভাগ)	১৪·০০	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০

মনস্তাত্ত্বিকভিত্তিতে অধ্যাত্মসাধনার অপূর্বগ্রন্থ

"পরমার্থসাধন ও সাধুসংগ"

গ্রন্থকার :

শ্রীঅজিতকুমার সেন

মূল্য—৬·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

মহেশ লাইব্রেরী

২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

'রঘুনাথবিল্ডিংস্'

৩২-বি, রাসবেহারী রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫, ৫৬

অন্যান্য শাখা : বারাণসী, কটক

আয়ুর্বেদীয় পেটেন্ট ঔষধ

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্‌স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩৯৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম. সি. পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০নং বিধান সরণী হাতীবাগান,
কলিকাতা-৭০০০০৬

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ । ৫৫-৬৫৬৫

GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4832

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO. 10813. CAL-9

ডি রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কণ্ওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি. ৬

ফোন: ৩৪- ৮৭১৬

কেশগুচ্ছে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিত্যানন্দ পারফিউমস প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিস্টার্ড নং ১৩৭০৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

জ্যৈষ্ঠ , ১৩৮৬

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ.

: উপদেষ্টামণ্ডলী :
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

: সহায়কমণ্ডলী :
স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

: প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১১বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

: প্রকাশক ও মুদ্রক :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে
স্বামী পরমাত্মানন্দ

: কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

: সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

: প্রচ্ছদপট শিল্পী :
শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়

মুদ্রণ :
শ্রীপার্বতীচরণ রায়
দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯।এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভাগবতগীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'যোগশিক্ষা' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গোর ঘোষাল, এম. এস. সি., এম. বি. (কলিকাতা), ডি. টি. এম. (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্‌ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. BANERJEE & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fiting, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street, Calcutta-700005.
Gram : PLAINED

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Telephone : 55-6172

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ

প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড,

কলিকাতা-৭০০০৬৭

ফোন : ৫৫-১৬১০

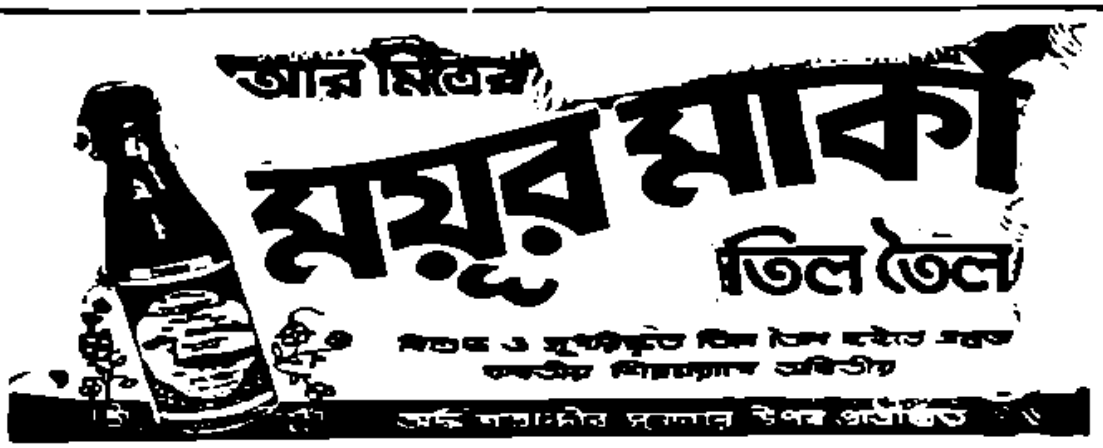

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী ● পাটনা ● ধানবাদ ● কটক ● শিলিগুড়ি ● মোহাটী।

বিশ্ববাণী

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	১২৯	
২।	ব্রাহ্ম আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ	১৩২	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	স্বামী অভেদানন্দ (জীবন নাট্য)	১৩৬	বিমল কৃষ্ণ
৪।	সঙ্গীত সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	১৩৭	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৫।	দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে	১৪০	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
৬।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ : পরিত্রাজক পর্যালোচন	১৪৪	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৭।	প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্ব : পৈশাচী	১৪৮	ডক্টর রামজীবন আচার্য
৮।	প্রাচীন ভারতীয় সভ্যাচার কালবিচার	১৫০	শ্রীঅমিয় রায়
৯।	বিংশ শতাব্দীর ধর্ম—স্বামী অভেদানন্দ	১৫৪	শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
১০।	শিল্পিত সিরামিক্স্	১৫৬	শ্রীদিবাকর সেনগুপ্ত
১১।	শ্রীরামকৃষ্ণশতক—অভেদানন্দ	১৫৮	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
১২।	সংঘ-বার্তা	১৫৯	

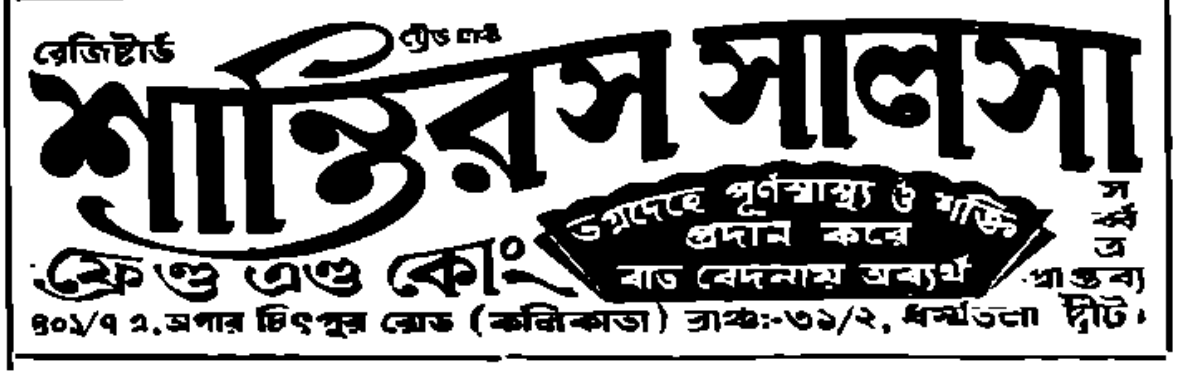

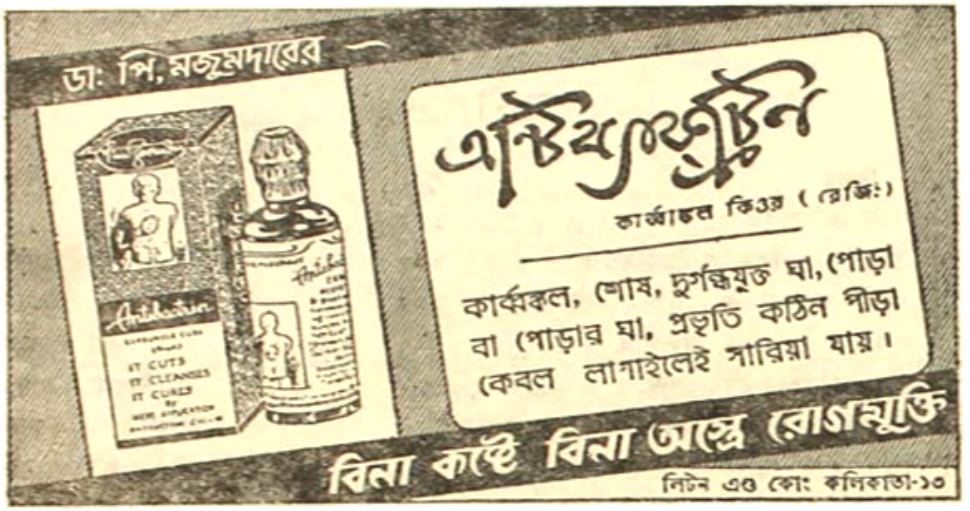

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service ;—

Please Contact :—

ARI & SONS

Manufacturers of : —

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road. Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

87, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

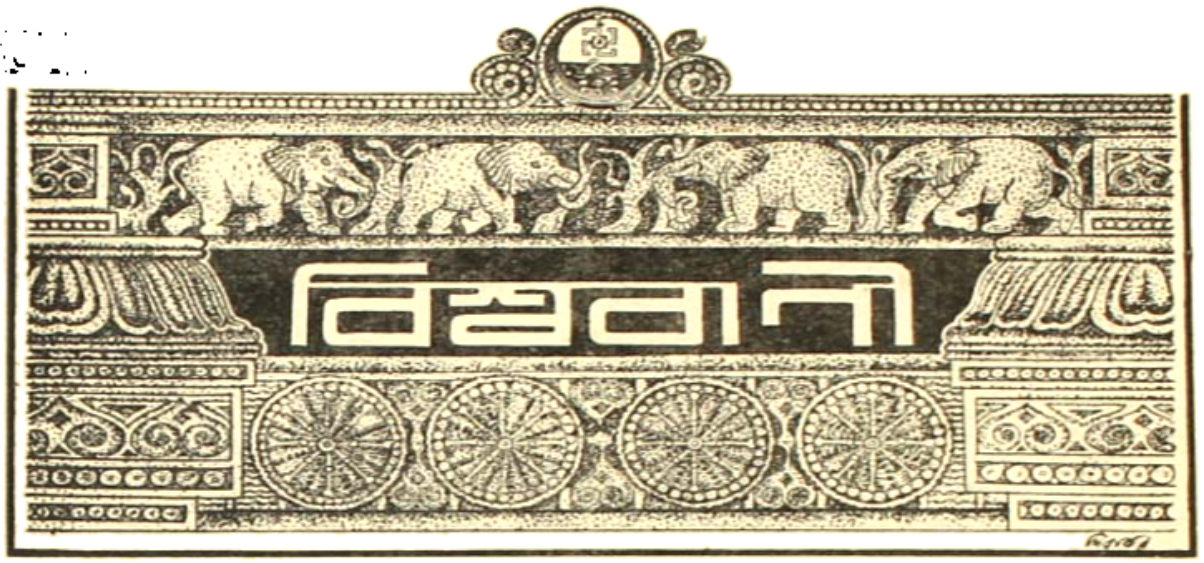

একচল্লিশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ সকলেই তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডাকছে ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকছে। ঘেঁষাঘেঁষীর দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি—যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল। 'আমার ধর্ম ঠিক, আর ওদের ধর্ম ঠিক—কি ভুল, সত্য—কি মিথ্যা—এ' আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—এ' ভাব ভাল নয়'। কেননা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর বলতো—সাকার 'আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দোনো 'পাল্লা ভারী'।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১৮৫

পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে। সঙ্গে মাষ্টার, হাজরা, বিজয়, শিবনাথ, কেদার প্রভৃতি। শ্রীম লিখেছেন: "আজ শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়াছেন, সপ্তমী পূজা, শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুরের অনেকগুলি কাজ। শারদীয়-মহোৎসব। রাজধানীর (কলিকাতার) মধ্যে হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে আজ মায়ের সপ্তমীপূজা আরম্ভ। ঠাকুর অধরের বাড়ি প্রতিমা দর্শন করিবেন ও আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন। আর একটি সাধ—শ্রীযুক্ত শিবনাথকে দর্শন করিবেন।

"বেলা আন্দাজ দুই প্রহর হইতে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের ফুটপাথের উপর একটি ছাতি হাতে কারয়া মাষ্টার পাদচারণ করিতেছেন। একটা বাজিল, দুইটা বাজিল, ঠাকুর আসিলেন

না। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর ডিস্‌পেনসারির ধারে মাঝে মাঝে বসিতেছেন। দুর্গাপূজা-উপলক্ষে ছেলেদের আনন্দ ও আবালবৃদ্ধ সকলের ব্যস্ততাব দেখিতেছেন। বেলা তিনটা বাজিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সমাজ-মন্দির দৃষ্টে (দেখিয়া) ঠাকুর করযোড়ে প্রণাম করিলেন।.....ঠাকুর বলিলেন—'আমি' শিবনাথের বাড়ি যাইব' (কেননা নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাথের বাড়িতে যেও')। তাই ঠাকুর গাড়ি থেকে নেমেই বল্লেন: 'আমি শিবনাথের বাড়ি যাইব'।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কলকাতায় আসবেন—এ' সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল, সুতরাং কিছু লোকের ও ভক্তের ক্রমে ক্রমে সমাগম হতে লাগলো। ঠাকুর শিবনাথের (শিবনাথ শাস্ত্রী) বাড়ি যাবেন, কিন্তু শিবনাথ তো বাড়িতে নাই। "কি হইবে? দেখিতে দেখিতে শ্রীযুক্ত বিজয় (গোস্বামী), শ্রীযুক্ত মহালানবিশ ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষেরা উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাজমন্দির-মধ্যে লইয়া গেলেন।" তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বসার জন্য অনুরোধ করলেন।

শ্রীম লিখেছেন; "ঠাকুর আনন্দময়। তিনি সহাস্যবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। বেদীর নীচে যেখানে সংকীর্তন হয়, সেইস্থানে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল। বিজয়াদি অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত সম্মুখে বসিলেন"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহাস্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন: 'শুনলাম—এখানে নাকি সাইনবোর্ড আছে? অন্যমতের লোক নাকি এখানে আসিবার যো নাই। নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) বল্‌লে—'সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাথের বাড়ীতে যেও'।

সাকার ও নিরাকার দুটি মতের মধ্যে ভেদ বা দ্বন্দ্ব-ভাব চিরদিনই প্রায় সকল সমাজে আছে। ব্রাহ্মসমাজে নিরাকারের উপাসনা। কিন্তু তাই নিয়েও মতভেদ ও দলাদলির অন্ত নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু ঐ সকল দ্বন্দ্ব-কোলাহলের সম্পূর্ণ বাইরে। তিনি সকল সময়েই চাইতেন সমন্বয়। সমন্বয় বলতে সকল অমিলের মধ্যে মিলন বা মহামিলন। ব্রাহ্মসমাজে ও সমাজের বাইরেও তখন সাকার ও নিরাকার নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অন্ত নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে'কথা ভালভাবেই জানতেন। তাই ব্রাহ্ম-সমাজমন্দিরে বেদীর নীচে আসন গ্রহণ করেই তিনি বল্লেন: শুনলাম—এখানে (মন্দিরের মধ্যে) নাকি সাইনবোর্ড আছে, আর তাতে লেখা আছে—অন্যমতের লোকদের সেখানে প্রবেশ-নিষেধ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তেরা সম্মুখে বসে আছেন। সাইনবোর্ডের লেখা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু অস্বস্তিবোধ করলেন। তিনি সহাস্যে বললেন: "আমি বলি সকলেই তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডাকছে। যেখাযেখীর দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। তবে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি[১] ভাল নয়"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন স্পষ্টবক্তা ও সত্যের পূজারী। এতটুকু গোঁড়ামী ও অসহিষ্ণুতার ভাব দেখলেই কিছু-না-কিছু বলতেন। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) সে'কথা জানতেন, সেজন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে যেতে একরকম নিষেধই করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের সেই নিষেধের কথা উল্লেখ ক'রে বলেও ফেল্লেন: 'নরেন্দ্র বল্‌লে—

১। শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় এখানে বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজী প্রতিশব্দ দিয়েছেন (Dogmatism)। Dogmatic-শব্দের অর্থ একগুয়েমী অথবা কোন এক মতে বিশ্বাসী, কিন্তু অন্যমত অসহিষ্ণুতাকে গোঁড়ামীই বলা যায়।

সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাথের বাড়িতে যেও'। মনের কথা চেপে রাখা শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বভাব ছিল না। তিনি মনের কথা স্পষ্ট ক'রে বলেই ফেলতেন সকল সময়ে। মনে এক ভাব, আর মুখে অন্য কথা—এতো লোকঠকানো ও দুই দুই দ্বৈতভাব। একেই গীতায় 'মিথ্যাচার' বলা হয়েছে। মনে এক রকম ও মুখে আর এক রকম—এর নাম মিথ্যাচার। মিথ্যাচারের অন্য নাম কপটাচার। বাইরে কাজ করবো না ও কাজে ফাঁকি দেব, কিন্তু মনে কাজ করে বলতে মনে কাজের চিন্তা করে—তারই নাম মিথ্যাচার। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন সত্যাশ্রয়ী। মন ও মুখ তাঁর এক রকমের ছিল, অর্থাৎ মন ও মুখ তাঁর সমান্তরাল রেখার মতো ছিল। সুতরাং যখন শুনলেন যে, ব্রাহ্মসমাজে অন্যমতের লোকের প্রবেশাধিকার নাই, তখনই তিনি অন্তরে ব্যাথা পেলেন। সেজন্য মন্তব্যের বুদ্ধি বলেই সে'কথার যেন ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেই বলেন: "অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল; 'আমার ধর্ম ঠিক, আর ওদের ধর্ম ঠিক-কি ভুল, সত্য—কি মিথ্যা—এ' আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—এ'ভাব ভাল নয়'। কেননা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বোঝা যায় না। কবীর বলতো—সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী'।

'আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের (ধর্ম) ভুল'—এ' বুদ্ধি একদেশী, অর্থাৎ একটিকে প্রশংসা ও গ্রহণ ক'রে অপর সকলকে নিন্দা ও বর্জন করা বোঝায়। ধর্মের আচরণও ভিন্ন হতে পারে, বা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু 'ধর্ম' অর্থে যিনি সকলের ঈশ্বর ও প্রতিষ্ঠা, যাঁর সত্তায়ই বিশ্বচরাচরের সকল-কিছুই সত্তাবান, সেই ঈশ্বরের মধ্যে ভাগাভাগীর বা ছোট-বড়র ভাব থাকবে কেন? ধর্মমত বা ধর্মপথ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ধর্মমতের বা ধর্মপথের লক্ষ্য ঈশ্বর। আত্মাচৈতন্য বা ব্রহ্মচৈতন্য—তিনি পৃথক পৃথক হবেন কেন? মতের অনুযায়ী পথকে সাধনপথ বলে ও সেই সাধনপথ ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে সাধকের দৃষ্টি ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্য। বিশ্বসংসারে অসংখ্য ও অগণিত মানুষ। সকল মানুষ মনুষ্য-পদবাচ্য হলেও তাদের দৃষ্টি ও রুচি-অনুযায়ী মনের নির্বাচনভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া মানুষের মন বা অন্তঃকরণ এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যরূপ আধারের মধ্যে থেকে তা ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। যেমন একই পুকুরের জল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে থাকলেও সাধারণ বুদ্ধিতে (ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে অবস্থিত) জল ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু একথা ঠিক যে, ঐ জল একই পুকুরের জল। তেমনি ঈশ্বর মহাপ্রাণ ও মহাচৈতন্যরূপে সর্বত্র ও সর্বক্ষণই এক—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্ যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—অর্থাৎ এক ও' অখণ্ড ঈশ্বর বা ব্রহ্মের দ্বারাই সমগ্র জগৎ (জগতের সকল প্রাণী ও পদার্থ) পরিব্যাপ্ত। পরিব্যাপ্ত ('বাস্যম্') বলতে সকল-কিছুর মধ্যে ঐ একই অসীম ও অনন্ত ব্রহ্ম বা ব্যাপকচৈতন্য বিদ্যমান, কোন কিছুই চৈতন্য থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন নয়। তেমনি আত্মা বা পরমাত্মারূপী ধর্ম (ধৃ—মন্) এক ও অভিন্ন এবং সেই ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে প্রকাশ পায়—যেমন হিন্দুধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতি। আবার ধর্ম অর্থে যখন প্রকৃতি বা স্বভাব বোঝায় তখন তা 'গুণ'-রূপে ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করে—যেমন মানবধর্ম, পশুধর্ম, দ্রব্যধর্ম প্রভৃতি। বাঙলা-অভিধানে 'ধর্ম'-শব্দের অর্থ সাধারণত বিশেষ্য ও বিশেষণ দু'রকম অর্থ প্রকাশ করে। যেমন বিশেষ্য-অর্থে 'ধর্ম'-শব্দের বা ধর্মকথার অর্থ ঈশ্বরোপাসনাপদ্ধতি, আচার-আচরণ, পরকাল প্রভৃতি বিষয়ের নির্দেশ করে। তাছাড়া পুণ্যকর্ম, সৎকর্ম, কর্তব্যকর্ম (কর্মা শ্রেষ্ঠ ধর্ম), শাস্ত্রবিধান, সুনীতি, সাধনার পথ, স্বভাব, শক্তি, প্রভাব বা গুণ (মানবধর্ম, কালের

ধর্ম, আশুতের ধর্ম ন্যায়বিচার, নৈতিকতা প্রভৃতি। ধর্মের আধার লক্ষণ আছে—ধৃতি, ক্ষমা আত্মসংযম, করুণা বা দয়া, ইন্দ্রিয়সংযম, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি।

কিন্তু ধর্মের তত্ত্ব ও অধ্যাত্মদৃষ্টিগত অর্থ হোল—যা ধারণ করে বিশ্বসৃষ্টিকে, বা যার সত্তায় সত্তাবান বিশ্বের সকল-কিছুই—তাই ধর্ম। সুতরাং ধর্ম-শব্দের অর্থ ঈশ্বর বা সর্বব্যাপকচৈতন্য —ব্রহ্ম, কেননা ঈশ্বর বা ব্রহ্মই বিশ্বচরাচরের (সৃষ্টির) প্রতিষ্ঠা বা অধিষ্ঠান এবং সেই পরমসত্তা ও পরম চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর আছেন বলেই তাঁর সৃষ্টি ও তাঁর বিকাশও সার্থক ও সচকল। এই পরমসত্তারূপ ঈশ্বর সকলের মধ্যেই ব্যষ্টিরূপে আছেন ও সমগ্র বিশ্বে বা মহাপ্রকৃতিতে (অব্যাকৃতিতে) সমষ্টিরূপে আছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্র-সরস্বতী-রচিত 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে ব্যষ্টি ও সমষ্টির আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্যষ্টি ও সমষ্টির আধার বা আধষ্ঠান যে এক ও অদ্বিতীয় একথাই বলা হয়েছে—

(১) 'যথা বনস্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ বৃক্ষা ইতি অনেকত্ব ব্যপদেশঃ, যথা বা জলাশয়স্য ব্যষ্ট্যভি-প্রায়েণ জলানি ইতি.....।'

(২) 'অত্র সমস্তব্যস্তব্যাপিত্বেন সমষ্টিব্যষ্টিতা-ব্যপদেশঃ।'

(৩) 'অত্র অপি অখিলস্থূলশরীরম্ একবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবৎ জলাশয়বৎ বা সমষ্টিঃ। অনেকবুদ্ধি বিষয়তয়া বৃক্ষবৎ জলবৎ বা ব্যষ্টিঃ অপি ভবতি'।

এখানে এক একটি ধর্মমত, এক একটি ধর্মসম্প্রদায়, নিজ নিজ ধর্মসাধন সৃষ্টি করে, কিন্তু ধর্মরূপী আত্মা, ঈশ্বর বা পরমাত্মা সকলেরই এক ও অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অন্যভাবে বলেছেন—'চাঁদা-মামা সকলেরই মামা'। সুতরাং ঈশ্বর ও ধর্মের তত্ত্ব এক নয়—ভিন্ন ভিন্ন বলে যারা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ, কিন্তু তত্ত্বদর্শী যাঁরা ও যাঁরা ঔপনিষদিক তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁরা 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'—ঈশোপনিষদের সর্বাশ্রয়ী সর্বব্যাপক এক ও অখণ্ড ভাবই গ্রহণ করেন এবং সেই ভাবানুযায়ী ধর্মে অর্থাৎ এক ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের যে দৃষ্টিভেদ ও দৃষ্টিভেদের জন্য মতভেদ—তার ঊর্ধ্বে থাকেন এবং উদারদৃষ্টি নিয়ে সকল ধর্মকে ও ধর্মসেবীকে এক ও অখণ্ড ঈশ্বরের সাধক ও উপাসকরূপে চিন্তা করেন। সেজন্য সেক্ষেত্রে দ্বেষাদ্বেষীর বা অন্যের মনোভাব কিছু থাকে না। তাছাড়া দ্বেষভাব ও অন্যভাব থেকে আসে ভয়, আর অভয় এ'সকলের পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না"। ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ বিশ্বের সকল চেতন ও অচেতন প্রাণী ও বস্তুতে এক ও অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যসত্তার উপলব্ধি না হ'লে অনুদার ও সীমিত মনোভাবের বিলুপ্তি ঘটে না। আপন-পর-ভাবই তখন অনুদার ও সীমিত মনোভাব সৃষ্টির কারণ হয়। ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে যখন উপলব্ধি হয় যে, বিশ্বের সকল-কিছুতে ও সকল ধর্মমতে এক ও অখণ্ড আত্মা বা ব্রহ্মেরই প্রকাশ, তখন ঘটের জল যে নদীর বা সাগরের জল থেকে ভিন্ন নয়, একই জল, সবই একাকার—এই জ্ঞান হয়। এই অখণ্ড একাকার ব্রহ্মবুদ্ধির উদাহরণ দিতে গিয়ে অদ্বৈতবেদান্তের প্রাথমিক 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে সদানন্দ-যোগীন্দ্র বলেছেন—

(১) 'এবম্ (জ্ঞানবিধৌ) আচার্যেণ অধ্যারোপাপবাদপূরঃসরং তত্ত্বম্-পদার্থৌ[২] শোধয়িত্বা বাক্যেন অখণ্ডার্থে অববোধিতে অধিকারিণঃ 'অহং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাব-পরমানন্দাত্মাস্বয়ং ব্রহ্ম অস্মি' ইতি অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তিঃ উদেতি"।

২। 'তত্ত্বম্'-পদার্থ—তৎ (ব্রহ্মই) ত্বম্ (জীব) এই পরিশুদ্ধি ও নির্ণয়। ভ্রমে বা অজ্ঞানে ব্রহ্ম থেকে জীব পৃথক বলে জ্ঞান হয় (=অজ্ঞান), কিন্তু জ্ঞানবিচারে (পরিশুদ্ধিতে) জীবই ব্রহ্ম এই নিশ্চিত জ্ঞান হয়।

(২) 'তত্র সবিকল্পকঃ নাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি-বিকল্পলয়াপেক্ষয়া অদ্বিতীয় বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অবস্থানম্'।

(৩) 'তদা মৃন্ময়ঘটাদিভানে অপি মৃদ্ভাববৎ দ্বৈতভানে অপি অদ্বৈতং বস্তু ভাসতে'।

(৪) 'নির্বিকল্পকঃ তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়াপেক্ষয়া অদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াং চিত্তবৃত্তেঃ অতিস্থিরম্ একীভাবেন অবস্থানম্।

(৫) 'তদাতু তদাকারাকারিত-লবণানবভাসেন জলমাত্রাবভাসবৎ অদ্বিতীয়বস্ত্বাকার'-কারিত চিত্তবৃত্তানবভাসেন অদ্বিতীয় বস্তুমাত্রং (এব) অবভাসতে'।

এখানে 'তদাকারাকারিত'-শব্দটি মনে রাখা উচিত—যদিও ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির আগোচর, তবুও শুদ্ধমন বা শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একথাই বলেছেন। কেননা চিংচে যেমন শাকের মধ্যে গণ্য নয়, তেমনি শুদ্ধমন বা শুদ্ধবুদ্ধি মন বা বুদ্ধির মধ্যে গণ্য নয়। 'তদাকারাকারিত' বলতে মন বা বুদ্ধি তখন ব্রহ্মচৈতন্যের আকারে আকারিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যরূপেই প্রতীত হয় বা উপলব্ধির বিষয় হয়। এটি বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৬।১।৪) 'যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'-বাক্যের মতো ; অর্থাৎ মাটি থেকে তৈরী সকল মাটির দ্রব্য নামে ও রূপে (আকৃতিতে) পৃথক বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা গেলেও মাটিরই তারা পরিণতি বা মাটিই সকলের উপাদান, সুতরাং উপাদান মাটিই (মৃত্তিকা) সত্য, আর ঘট, গ্লাস, সরা, প্রভৃতি রূপ (আকৃতি) ও নাম সত্য নয় এজন্য যে সেগুলিকে ভেঙে একাকার করলে মাটিই মাত্র অবশেষ থাকে। সেজন্য 'সর্বদা কার্যকারণাত্মক-সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তত্বেন সততং একরূপম্' আর 'ভেদরহিতেন দ্বিতীয়রহিতং'—এক ও দুই এই ভেদের অতীত হওয়ায় আর দ্বৈতজ্ঞান থাকলো না, অদ্বৈত-জ্ঞানে পর্যবসিত হল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই কবীরের দোঁহার নিদর্শন দিয়ে বলেছেন—

'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ।
কাকো নিন্দো কাকো বন্দো,
দোনো পাল্লা ভারী॥'

সাকার ও নিরাকার দুইই এক ; একই টাকার এ'পীঠ ও' পীঠ। দাঁড়ি-পাল্লার ওজনে দুইই সমান। সুতরাং কাকে অনাদর ও কাকে ত্যাগ করবে ; আর কাকেই বা আদর ও গ্রহণ করবে ?—'দোনো পাল্লা ভারী'—দুইয়ের ওজনই সমান। ব্রহ্মানুভূতি বা ঈশ্বরদর্শন হ'লে জীবে ও শিবে, জীব জগতে ও ব্রহ্মে, অথবা মায়ায় ও ব্রহ্মে কোন ভেদেরই প্রতীতি হয় না। তখন নাম ও রূপের জন্যই ব্রহ্ম থেকে জীব-জগৎ পৃথক ব'লে অনুভব হয়। তাই বিবেকরূপ বিচারের সাহায্যে নাম-রূপে গঠিত মায়ার বা অবিদ্যার অতীত, কিংবা নাম-রূপের জন্য স্বরূপ থেকে বিকৃত বলে মনে হওয়ার ভাব দূর হয় ও অভেদ এবং অদ্বৈতজ্ঞানের আলোকে ভেদভাবের অন্ধকার সরে যায়। অদ্বৈতবেদান্তে তাই অজ্ঞান-আবরণভঙ্গের বা আবরণ-অপসারণের নামই ব্রহ্মজ্ঞান—এ'কথা পূর্বে বলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অভেদ ও অদ্বৈতজ্ঞানের সর্বত্র ও সর্বপ্রসারিত ('দিব্যং চক্ষুরাততম্') দৃষ্টি নিয়েই বলেছেন : "আমি বলি—সকলেই তাঁকে (এক ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে) ডাকছে, সুতরাং ধর্মাধর্মীর দরকার নেই"। ধর্মাধর্মী বলতে এই ধর্মাবলম্বী লোক বড় ও ঐ অন্য ধর্মাবলম্বী লোক ছোট—এই ছোট-বড়র দরাদরীর কোন প্রয়োজন নাই। অজ্ঞানের দরাদরীতে ছোট-বড়র অভিমান বা অহংকার যায় না। এই জন্য দরকার সমজ্ঞান, উদার-দৃষ্টি ও অভেদবুদ্ধি—যে জ্ঞানে, দৃষ্টিতে, বুদ্ধিতে দুই দুই

জ্ঞান থাকে না। তখন হয় সম-জ্ঞান—যে জ্ঞানে সকল ভেদবুদ্ধি ও সীমিত-জ্ঞানের বিলোপসাধন ঘটে। এই তত্ত্বই গীতার ২।৬৪।৬৫ শ্লোক-দুটিতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

(১) 'আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি'।

(২) 'প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে'।

'প্রসাদ' (মনের প্রসন্নতা) বলতে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন: "প্রসাদং প্রসন্নতাং চিত্তস্য শুদ্ধতাং পরমাত্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতাং অধিগচ্ছতি"। তিনি বলেছেন তখন 'ব্রহ্মাত্মৈক্যাকারা পর্যবস্থিতিশ্চিত্তে পরি সমন্তাদবস্থিতে···।" চিত্ত প্রসন্ন হওয়ার নাম চিত্তের বা মনের পরমাত্মতত্ত্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভের যোগ্যতা। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে একথাই বলা হয়েছে—

'তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমীশম্।'

'অক্রতু' বলতে জাগতিক বিষয়ভোগের সংকল্পরহিত আত্মাকে সাধক তখন সাক্ষাৎকার ক'রে বীতশোক অর্থাৎ সকল শোকের অতীত হন। 'ধাতু' বলতে ইন্দ্রিয়সকল বা মন। এই মন প্রসন্ন, স্থির ও লক্ষ্যমুখী হয়ে মুক্তিসংকল্প ছাড়া অন্য সকল সংকল্পকে অতিক্রম বা ত্যাগ ক'রে। সুতরাং সংকল্প বলতে স্বার্থযুক্ত ভোগের ইচ্ছা বা বাসনা। এই স্বার্থকেন্দ্রিক বাসনা-কামনা দূর হয়ে সকল বাসনা থেকে নির্মুক্ত হলেই মন পরিশুদ্ধ ও প্রসন্ন হয়। একেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'শুদ্ধমন বা শুদ্ধবুদ্ধির গোচর' এই শুদ্ধবুদ্ধির বিকাশ হলে ঈশ্বর সাকার (আকারযুক্ত মূর্তিমান) বা নিরাকার (আকারহীন অমূর্ত)—এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির বিচার শুদ্ধ হয়, বুদ্ধির সীমা তখন অসীম ও উদার হয়। সেই একাকার বুদ্ধিতে সাকার ও নিরাকার একজ্ঞান হয় বলতে সমদৃষ্টি ও সমজ্ঞান আসে।

সাধক কমলাকান্ত গানে বলেছেন—

জাননা রে মন পরমকারণ, শ্যামা-মা শুধু মেয়ে নয়।
মেয়ের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
* * *
যে রূপে যে জন করয়ে সাধন, সেইরূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে কমলে কামিনী উদয় হয়॥

শ্যামা-মা সর্বশক্তিময়ী মহাপ্রকৃতি বলে সকল-কিছুর তিনি কারণ, কিন্তু সাধক কমলাকান্ত বলেছেন—পরমকারণ। পরমকারণ ও মহাকারণ একই। পরমকারণ বা মহাকারণ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য-কিছু নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—কারণের পর মহাকারণ। বিচারের দৃষ্টিতে অখণ্ডকালরূপিণী মহাকালী বা মহাশক্তি (প্রকৃতি) শুদ্ধ অর্থাৎ সগুণ-নির্গুণের অতীত ব্রহ্মচৈতন্য থেকে কিছুটা ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপদৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভিন্ন। এই ব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তি কখনও পুরুষরূপে, আবার কখনও স্ত্রীরূপে, কখনও শূন্য (সগুণ-নির্গুণের অতীত)-রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীদূতসংবাদে (৮০ শ্লোকে) মহাশক্তি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচণ্ডীকে বলা হয়েছে: 'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ',—যিনি চিতিশক্তি (চৈতন্য)-রূপে সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত ক'রে অবস্থিতা'। এই শ্লোক ও ঈশোপনিষদের 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' একই অর্থের প্রকাশক, চিতিরূপা ও ঈশ্বরচৈতন্য একই। শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশাধ্যায়ে পুনরায় দেবীকে বলা হয়েছে: 'ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া'। সুতরাং ঈশ্বর বা মহাশক্তি কখনও

রূপে, কখনও অরূপে, আবার রূপ ও অরূপের পারে অখণ্ড একাকার চৈতন্যসমুদ্রবিশেষ তিনি —যার কূল-কিনারা নাই। অগণিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—সৃষ্টি-পালন-ধ্বংসকর্তা সেই অকূল অনন্ত সমুদ্রে ওঠে ও ভাসে, আবার অখণ্ডে বিলীন হয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাচৈতন্যসমুদ্রের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েই তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বাশ্রয়ী গানটি রচনা করেছিলেন—

'এক রূপ, অরূপ নাম-বরণ,
অতীত-আগামী-কালহীন,
দেশহীন সর্বহীন,
নেতি নেতি বিরাম যথায়।'

সেই এক ও অদ্বিতীয় নেতিস্বরূপ চৈতন্যসমুদ্র থেকেই সৃষ্টির কারণধারার বিকাশ হয়, আবার তাতেই লয় হয়। বিকাশ ও বিলয় লীলারই খেলা। আবার তিনি নিত্য সর্বলীলাহীন একাকার নাম-রূপহীন অখণ্ড চৈতন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সর্বত্র'প্রসারিত সর্বগ্রাসী একাকার চৈতন্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই সকল সমবেত ব্রাহ্ম প্রভৃতি ভক্তদের লক্ষ্য ক'রে বলেছেন : "হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা —সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার পেটে যা সয়—মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়িতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও-কালিয়া ক'রে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। কারু জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ পৃঃ ১৮৫-১৮৬)।

এখানে পাঁচটি ছেলে বিশ্বচরাচরে অসংখ্য জীব বা প্রাণী। তাদের মন বা অন্তরকরণ কিন্তু স্বরূপে এক ও অখণ্ড হলেও বাস্তব জগতে ভিন্ন ভিন্ন আধার (দেহ)-অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে (প্রতীত) হয় ও সেজন্য তাদের এক রকম রুচি বা মনের চাহিদা না হ'য়ে ভিন্ন ভিন্ন বা বিচিত্র হয়। আর বৈচিত্র্যের জগতে সকল-কিছু বিচিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু 'চাঁদা-মামা সকলেরই মামা'। বীজময়ী মহাপ্রকৃতি বিশ্বজননী কিন্তু সকলেরই মা—পোষণকারিণী ও রক্ষাকারিণী বিশ্বজননী। সেজন্য কালীকল্পতরুমূলে যে যা চায়, সে তাই পায়। বৈচিত্র্যময় জগতে বিচিত্র রকমের রুচি-অনুযায়ী বিচিত্র প্রাপ্তি ও ভোগ হয়, কিন্তু যদি কেউ বিচারদৃষ্টি নিয়ে আত্মানুসন্ধান করে তবে সেই বিচারী মানুষ একই ঈশ্বরের সন্ধান পায় একই উৎস ও কারণরূপে। তখনই তার বৈচিত্র্যমুখী মন একের সন্ধানে আত্মতুষ্টি লাভ করে এবং সকল দ্বন্দ্বসত্তার অতীত হয়। এই অতীত হওয়ার নামই মুক্তি বা এক ও অখণ্ড ব্রহ্মের উপলব্ধি।

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দু'টি কথা মনে রাখার জিনিস : (১) 'ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা', (২) 'কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন'। (১) শ্রীশ্রীঠাকুর রসিকচূড়ামণি। তাই রসিকতাচ্ছলে বলেছেন : ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং কালের ব্রহ্মজ্ঞানী বলতে ব্রাহ্মভক্ত—এক নয়, পার্থক্য দুয়ের মধ্যে অনেক। কেননা ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানীদের পরিচয় পাই উপনিষৎ থেকে। উপনিষদের কথা প্রত্যক্ষ-উপলব্ধিবান ঋষিদের—যাঁরা বোধে বোধ-রূপে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন জ্ঞানদৃষ্টি দিয়ে। সেজন্য তাঁদের কথা-কাহিনী বা তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে কোন বাহুল্যের ও রূপকের স্পর্শ নাই, আছে আভরণহীন নিছক সত্য। কিন্তু ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ ও বাইরের মাধুর্যই অধিক। তাই সর্বস্বহীন নিঃসঙ্গ-সত্যের মধ্যে ঐক্যহীনতাও লক্ষ্য

করা যায় এঁদের মধ্যে। পূর্বেই বলেছি যে, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মভক্তদের দৃষ্টি ও অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য অনেক। আর (২) 'যা সকলকেই সমান ভালবাসেন' বলতে সূর্য যেমন নির্বিচারে পুণ্যবান ও পাপীর উপর সমানভাবে আলোক বর্ষণ করেন, কার্পণ্য ও বৈষম্য কোন দিক দিয়েই সূর্যের মধ্যে থাকে না, তেমনি ঈশ্বরের নিকট সকল প্রাণীর ও পদার্থের মূল্য ও সমাদর একই রকমের; কেননা সকল প্রাণী ও পদার্থের মধ্যে এক তিনিই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে বর্তমান এবং তাঁর অপার্থিব সত্তাতেই সকলে সত্তাবানও। তাছাড়া ঈশোপনিষদের অন্তরঙ্গী সর্বকালের শাশ্বতীবাণী প্রমাণ করে যে বিশ্বকৃত, আবার বিশ্বোত্তীর্ণ রূপে এক ঈশ্বরই (ব্রহ্মচৈতন্যই) সর্বকালের অবিনশ্বর সত্য ও সত্তা।

●

॥ ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

(বেদান্তের আলোকে)

স্বামী প্রভানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

সেকালে রাজা রামমোহনই অদ্বৈতবেদান্তের প্রধান বোদ্ধা ও প্রবক্তা রূপে খ্যাত। কিন্তু আমরা দেখেছি বেদান্তত্ত্ব তাঁর ধ্যান-ধারণায় সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ স্বীয় কোন রূপ নিতে পারে নি। তাঁর মতবাদ ও অবদান সম্বন্ধে সমকালীন কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, "His works on Hindu Theology do not prove that he was a believer in the revelation of the Vedas, but that he aimed at engrafting a kind of universal unitarinism on it ·····His was a sort of Catholic unitarianism.·····He was, according to our humble opinion, essentially a theo-philanthropist. To promote love to god, and love to man, agreeably to his own view of both, constituted the practical and the most important part of his creed."[১৮] মিত্রমশাই যথার্থই বলেছেন যে রামমোহন ছিলেন ধর্মকেন্দ্রিক সমাজসেবী। ঈশ্বরপ্রীতি ও মানবপ্রেম তাঁর চরিত্রের প্রধান দুটি ভূষণ, কিন্তু এবিষয়েও তাঁর ধ্যানধারণার স্বকীয়তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

রামমোহনের চরিত্র-অনুধ্যানে, পাঠকমাত্রেরই নজরে পড়বে তাঁর মন ও মুখের ঐক্যাভাব। বৈষয়িক অভ্যুদয়ের-চৌহদ্দির মধ্যে নিঃশ্রেয়স মুক্তির জন্য সাধনভজনের গৌণ-ভূমিকা তাঁর সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত। শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে গার্হস্থ্যাশ্রমেই নিঃশ্রেয়স মুক্তি যে নিশ্চিতলভ্য এবিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। 'ভারতপথিক' রামমোহনের যুক্তিবিচারের তীক্ষ্ণতা তাঁর প্রায় সকল প্রতিপক্ষকে অভিভূত করেছিল; তৎসত্ত্বেও একথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে যে তাঁর বেদান্তত্ত্ব তাঁর জীবনচর্যায় শিকড়-সন্নিবি লাভ করতে পারেনি। ফলে আমরা

১৮ Aloke Roy (Editor): Nineteenth Century Studies, 1973, Vol-I, pp. 84-5.

●

লক্ষ্য করেছি তাঁর ধ্যানধারণা ও আচার-আচরণে স্ববৈপরীত্য, আমরা তাঁর কণ্ঠে শুনেছি অদ্বৈতবেদান্তের উপযোগিতার বিরুদ্ধে কঠোর উক্তি।

শুধু রামমোহনই নন, উনিশশতকের অধিকাংশ মনীষীর মনন-আশ্রমে আবির্ভূত হয়েছিল স্ববিরোধিতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রহ্ম-আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতায় দীর্ঘকাল আবদ্ধ ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কারণ সংক্ষেপে উদ্ধৃতি করা যেতে পারে ১৭৯২ শকাব্দ আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হতে। "শিক্ষিতদের মধ্যে আর একপ্রকার লোক আছেন তাঁহারা ভাবেন, ধর্মসংস্কারে হস্তক্ষেপ না করিয়া বিদ্যালয়স্থাপন, কৃষিবাণিজ্যের উন্নতি ও এতদ্রূপ অন্যান্য হিতকর কার্য অনুষ্ঠান করিলে বড় উপকার হইবে, ধর্মসংস্কারে সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইঁহাদিগের সিদ্ধান্ত অতীব অকিঞ্চিৎকর।" এঁদের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র 'অতীব অকিঞ্চিৎকর নয়' ভারতপথিক রামমোহনের মতানুগ নয়। কিন্তু ভারতীয় বেদান্তবিষয়ে রামমোহনের ন্যায় এঁদের ধ্যানধারণার মধ্যে দেখা দিয়েছিল স্ববৈপরীত্য ও অপূর্ণতা।

অপরাজেয় পৌরুষের অধিকারী মহাবিদ্বান বিদ্যাসাগরের জীবন-শিকড় স্বভূমিতে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি বলেই বোধ করি তিনি বলতে পেরেছিলেন যে প্রাচীন ষড়দর্শনে 'আধুনিককালের পক্ষে শিক্ষণীয় কিছু নেই।' অবশ্য অন্যপ্রসঙ্গে তাঁর বেদান্তের স্বীকৃতি দেখতে পাই 'বোধদয়ে'। উপরোধের চাপে তিনি সেখানে লিখেছেন, 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।' উনিশশতকের ধর্মসংঘাতের বিবর্তনের ধারা তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন; তিনিই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ ব্যালানটাইনকে লিখেছিলেন, "that the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute." বিদ্যার সাগর বেদান্ত-সম্বন্ধে এরূপ মারাত্মক মন্তব্য করলেও তাঁকে কিন্তু বেশ কিছুকাল বেদান্ত ও সাংখ্য-বিষয়ে অধ্যাপনা করে রুজিরোজগার করতে হয়েছিল।

শুধু বিদ্যাসাগরই নয়, তাঁর সহকর্মী ও তত্ত্ববোধিনীর 'brain-box' (মস্তিষ্ক) অক্ষয়কুমার দত্ত প্রতিভাবান যুক্তিনিষ্ঠ ও বিদ্বান। তিনি ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্র, শঙ্করাচার্যের শারীরিকভাষ্য, মধুসূদনের বেদান্তসিদ্ধান্তবিন্দু প্রভৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন, "উল্লেখিত দার্শনিক গ্রন্থকারেরা অনেকেই সতেজ বুদ্ধির সুস্পষ্ট বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।.....তাঁহারা বিশ্বের যথার্থপ্রকৃতি সেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মাবলী নির্ধারণপূর্বক কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণের নিশ্চিত উপায় কেবল আপনাদের অনুধ্যানবলে দুই-একটি প্রকৃতমতের সহিত অনেকগুলি মনঃকল্পিত মত উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের একটি পথপ্রদর্শকের অভাব ছিল। একটি বেকন, একটি বেকন, একটি বেকন তাঁহাদের আবশ্যক ছিল।"[২১] ব্রাহ্মনেতৃগণের বেদান্তচর্চার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার নিজেই "বেকনের" ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ (১৮৫০ খ্রীঃ) ঘোষণা করেন, 'বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত।' যুক্তিবাদী নীতিবাদী অক্ষয়কুমার কিছুকালের জন্য ব্রাহ্মপ্রচারিত বেদান্তের ক্ষেত্রে জ্ঞানপ্রহরীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

রামমোহন বিদেশে গেলে তাঁর প্রবর্তিত ব্রহ্মসভার দীপশিখাকে সযত্নে আগলিয়ে রেখেছিলেন নিষ্ঠাবান রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি সে-সভার বেদী হতে প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে উপদেশ দিয়েছিলেন: (১) বেদ নিত্য সত্য ও অভ্রান্ত। এবং (২) জীবাত্মা ও

২১ অক্ষয়কুমার দত্ত: ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪১-৪২

পরমাত্মার অভেদচিন্তনই মুখ্য উপাসনা। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সংস্পর্শে প্রথম আসেন। তিনি লক্ষ্য করেন, "সেই প্রকার নিভৃতভাবেই বেদপাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালী মত ব্যাখ্যান করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণনা করিতেছেন।"[৩০]

ব্রাহ্ম-আন্দোলনের পরবর্তী শীর্ষ নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ব্রাহ্মধর্মের উদ্গাতা ও প্রথম প্রবল প্রবক্তা। রামমোহন প্রকাশিত ঈশোপনিষদের একটি ছেঁড়া পাতা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনে নবজিজ্ঞাসার সূচনা করে। ঐ পাতার মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ করে দেন, শুনে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্রের নিকট ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ পাঠ করেন। অন্যান্য পণ্ডিতের কাছে আরও ছয়টি উপনিষদ পাঠ করেন। উপনিষদের ভাবালোকে অনুপ্রাণিত দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্বরঞ্জিনী' সভা স্থাপন করেন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে আচার্য রামচন্দ্র সভার নাম পরিবর্তন করেন। নূতন নাম হয় "তত্ত্ববোধিনী"। সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।"[৩১] তত্ত্ববোধিনী-সভার নিয়ম অনুসারে দেখা যায়, সভার উদ্দেশ্য ছিল "এদেশে কাল্পনিক ধর্ম নিবারণপূর্বক বিস্তাররূপে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা।"[৩২] এই সভাতে ক্রমে ক্রমে এসে যোগদান করেন অনেকেই যারা বেদান্তধর্ম, এমন কি ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন বা বিরোধী। এ সভার সভ্যরূপে দেখতে পাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, ডিরোজিও শিষ্য রামগোপাল ঘোষকে, তারতীয় 'বেকন' অক্ষয়কুমার দত্তকে। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হল—উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক তৈরার করা। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর (৭ই পৌষ) দেবেন্দ্রনাথ বিশজন সহকর্মীকে নিয়ে আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মধর্মকে বেদান্তধর্ম ও বেদকে অপৌরুষেয় অভ্রান্তশাস্ত্র বলে প্রচার করতে থাকে। ইতিমধ্যে 'জগবন্ধু' পত্রিকার পৌষ-ফাল্গুন (১৮৪৬ খৃঃ) সংখ্যায় 'বেদ ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্র নহে' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তীব্র প্রতিবাদ করেন দেবেন্দ্রনাথ। রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে মিলেমিশে দেবেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ লেখেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৬৮ শকের মাঘ-চৈত্র সংখ্যায়। এর পূর্বেই ডফ্ সাহেব তাঁর India and India's Missons গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে বিশেষতঃ বেদান্তকে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে ১৭৬৬ শকের ১লা ফাল্গুন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় "Vaidantic doctrines vindicated"। কোন কোন মতে এলেখা চন্দ্রশেখর দেবের অপর মতে রাজনারায়ণ বসুর, আবার অন্যের মতে দেবেন্দ্রনাথের নিজের। এই নিবন্ধ যার কলম হতেই নিঃসৃত হোক না কেন, এর মধ্যে সুস্পষ্ট বিধৃত রয়েছে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের তদানীন্তনকালের মানসচিত্র। বেদান্তকে বলা হয়েছে "final dispensation of Hinduism"। নিবন্ধের শেষ পর্যায়ে রয়েছে সুদৃপ্ত ঘোষণা—"we consider the Vaids and the Vaids alone, as the authorised rule of Hindu theology. They are the sole foundations of all our belief, and the truths of all other Shastras must be judged of, according to their agreement

৩০ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, কলিকাতা, পৃঃ ১৩

৩১ শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, ৩য় সং : পৃঃ ৩৭

৩২ ১৭৬৮ শকের ১লা পৌষ সংখ্যার "তত্ত্বরাধিনী"-পত্রিকাতে 'তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম' শীর্ষক নিবন্ধ।

with them." অবিশ্বাস্য মনে হলেও বৈদান্তিক দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহধর্মীদের কিছুকালের মধ্যে বেদান্ত সম্বন্ধে মত ও বিশ্বাস পাল্টে যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অদ্বৈততত্ত্ব বর্জন করলেন। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও অভ্রান্তত্ব অস্বীকার করলেন। প্রতিভাধর অক্ষয়কুমার দত্তের মতে বিশ্বগ্রন্থই ব্রাহ্মদের ধর্মপুস্তক, বিজ্ঞানগ্রন্থ সে-ধর্মের ব্যাখ্যা পুস্তক। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'Defence of Brahmoism and Brahmo Samaj' এ লিখলেন, "As soon as they perceived their mistake after a a wider study of the Vedas, they shook it off at once" সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (বৈশাখ ১৮৩৯ শকাব্দ, ৮৮ সংখ্যা) ঘোষণা করে, "শতসহস্র যুগযুগান্তরের অজিত মানসিক শৃঙ্খল নির্বিবাদে ও সহজে খসিয়া গেল; বিনা রক্তপাতে একটি মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংসাধিত হইল।" দেবেন্দ্রনাথ বেদান্ত বর্জন করলেন, কিন্তু ক্রমেই অধিকতর হিন্দুঘেষা হবার জন্য ব্যগ্র হলেন। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ইতিহাস-লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী নেতা দেবেন্দ্রনাথের নূতন পথ সম্বন্ধে বলেন, "he also became conscious to keep the movement as much as possible on the old lines of reverence for the ancient Hindu scriptures."[৩৩] দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রামমোহন-প্রবর্তিত 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' পরিণত হ'ল ব্রাহ্মধর্মে। সময় ছিল ১৮৪৭ খ্রীঃ, ১৭৬৯ শকাব্দ। তিনি শঙ্করের শারীরিক ভাষ্য পড়ে চমকে উঠেছেন। তিনি লিখেছেন, "শঙ্করাচার্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।····যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে?" তিনি আরও লিখেছেন, "আবার যখন উপনিষদে দেখিলাম, ব্রহ্মোপাসনার ফল নির্বাণমুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল।····· কোথায় ব্রাহ্মধর্মে আত্মার অনন্ত উন্নতি আর কোথায় এই নির্বাণমুক্তি। উপনিষদের এই নির্বাণমুক্তি আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না।"[৩৪] ফলতঃ শঙ্কর অদ্বৈতবাদকে বর্জন করে তিনি দ্বৈতমতকে গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' গ্রন্থে বললেন "আবার জড় হইতে জীবাত্মা যত ভিন্ন, তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে জীবাত্মা পরমাত্মা হতে ভিন্ন। তাঁহার সমান আর কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়।"[৩৫] নেতা দেবেন্দ্রনাথের এই ধ্যান-ধারণার পটভূমিতে উদ্ভূত হল 'ব্রাহ্মধর্ম'। মূল উপনিষদের মন্ত্রের স্থলে তিনি ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি করলেন, "আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়"। ধর্মসাধনের নূতন পত্তনভূমি স্থাপনের যুক্তিস্বরূপ উপস্থাপিত করলেন নিজস্ব একটি অভিমত। তিনি বললেন, "হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের আলোচনা দ্বারা, ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হন।'

পাশ্চাত্যের intution-বাদ আত্মপ্রত্যয় নয়। আত্মপ্রত্যয় ধ্যানজ প্রজ্ঞা। দেবেন্দ্রনাথের জীবনীকার অবশ্য স্বীকার করেছেন, "ইহার পরে তিনি (দেবেন্দ্রনাথ) আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে 'সহজজ্ঞান' কথাটা আনিয়া ফেলিয়া আত্মপ্রত্যয়ের অর্থের কিছু গোলযোগ করিয়াছেন।"[৩৬] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর progressive revelation অনুযায়ী উপনিষদের অসার অংশ ত্যাগ করলেন, সারাংশ গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর বিশুদ্ধ হৃদয় পেতে দিলেন ঈশ্বরের প্রতি। ঈশ্বরকৃপায় তাঁর আলোকিত হৃদয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন অধ্যাত্ম-পরশমণি—ব্রাহ্মধর্মের বীজ।

---

৩৩ Sivanath sastri : History of the Brahmo Samaj, 2nd Edn, 1974, P. 69

৩৪ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৭২।

৩৫ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মতত্ত্ববিদ্যা ২য় সং ১৮৬২ খ্রীঃ পৃঃ ১৪।

৩৬ অজিতকুমার চক্রবর্তী : মহর্ষী দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৬০।

প্রেরণার আলোকে তিনি অনুলেখক অক্ষয়কুমারের সাহায্যে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচনা করলেন। সৃষ্টি হল ব্রাহ্মধর্মের মূলগ্রন্থ 'ব্রাহ্মী উপনিষদ্'। তাঁর জীবনীকার দাবী করেছেন, "ব্রহ্মতত্ত্ব কিছু দেবেন্দ্রনাথ নিজের কল্পনা হইতে গড়ান নাই—তাহা উপনিষদ হইতেই পাইয়াছেন উপনিষদের সেই ব্রহ্মতত্ত্বের 'যৌগম্' অংশ লইয়া যে ধর্ম গড়িয়া উঠিল, তাহারই নাম ব্রাহ্মধর্ম।"[৩৭] দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাশক্তি ও যুক্তিবিচারের নিজস্ব আহৃত পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েই উপনিষদের নিকট আলোকপ্রার্থী হয়েছিলেন। উপনিষদের অসার অংশ বর্জন ও সারাংশ নির্বাচন স্বচরিতা দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র মননের প্রতিফলন বৈ ত নয়। উপনিষদকে তিনি তাঁর তদানীন্তন ধ্যান-ধারণার উপযোগী করে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। এভাবে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম সৃষ্টি করেন, ক্রমে সুসংগঠিত করেন এবং সম্ভাব্য বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করেন। বিপদ-আপদ সম্বন্ধে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন, "ব্রহ্মধর্মকে তিনটি বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতে হইবে। প্রথম বিঘ্ন পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয় বিঘ্ন খ্রীষ্টধর্ম, তৃতীয় বিঘ্ন বৈদান্তিক মত। পৌত্তলিকেরা যেমন ব্রহ্মেতে মনুষ্যত্ব আরোপ করে, বৈদান্তিকেরা তেমনি ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে।"[৩৮]

●

॥ স্বামী অভেদানন্দ ॥

(জীবননাট্য)

বিমলভূষণ

চতুর্থ দৃশ্য

[বরাহনগর মঠ, অভেদানন্দ পাঠরত]

[কালীপ্রসাদ একটি ঘরে একাগ্রচিত্তে পাঠে নিমগ্ন। তিনি স্নেহের ভাই নরেনের জন্য উদ্বিগ্ন, মিলতে চান তিনি পর্যটনরত নরেনের সঙ্গে। কিন্তু তিনি কিছুই জানেন না তখন নরেন্দ্রনাথ কোথায় কোনখানে। তাই বরাহনগর মঠ ছেড়ে যেতে চান কালী নরেনের উদ্দেশ্যে পুনরায়। এবং ঠিক করলেন মনে—কালই ভোরে তিনি বরাহনগর মঠ ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে পুনরায় যাত্রা করবেন]

[রামকৃষ্ণানন্দের প্রবেশ]

রামকৃষ্ণানন্দ। কালী (কালী একাগ্রচিত্তে পাঠরত, সুতরাং একটু জোরে)—কালী ?

অভেদানন্দ। (চমকে উঠে) কে ? ও শশি, আয়।

রামকৃষ্ণানন্দ। শুনছি নাকি তুই আবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করবি ?

অভেদানন্দ। হ্যাঁ ভাই : নরেনের অভাবের জন্য সব যেন শূন্য দেখছি। ভাবছি—আবার বেরিয়ে পড়বো পরিব্রাজক হ'য়ে। দেখি—পাওয়া যায় কিনা নরেনকে।

[এমন সময়ে লাটুর প্রবেশ]

লাটু। কালী ভাই, তুমি নাকি যাচ্ছ নরেনের খোঁজে কালই ভোরে ?

---

৩৭ অজিতকুমার চক্রবর্তী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৩৭

৩৮ প্রিয়নাথ ঠাকুর সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত পরিশিষ্ট পৃঃ ১৭৮

অভেদানন্দ। ঠ্যাঁ ভাই, নরেন আমাদের অন্তরের ধন, তাকে না দেখে মন কিন্তু আমার আর এখানে থাকতে চাচ্ছে না।

লাটু। সেটা কেমন কোরে হোয়। হামরা তো আছি। হামরাই বা তোমাকে ছেড়ে দেব কেমন ক'রে?

অভেদানন্দ। তাতে কি ভাই, সন্ন্যাসী আমরা, আমাদের ঘর ও বাহির দুইই সমান।

রামকৃষ্ণানন্দ। তাতো জানি ভাই, কিন্তু আমরাই বা তোমাকে ছাড়ি কেমন ক'রে। নরেন এখন নাই, তাই সকলে মিলে একসঙ্গে থাকলে সান্ত্বনা কিছুটা পাই।

অভেদানন্দ। না ভাই, আশীর্বাদ করো তোমরা। আমি নরেনকে খুঁজে নিশ্চয়ই বার করবো। তারপর দু'জনে আবার ফিরে আসবো এই বরানগর-মঠে।

লাটু। বেশ, তাই হবে ভাই—ঠাকুর যা করেন।

(কালী তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিল। রাত্রি অতীত হ'ল ও ভোর হয়ে এলো। অন্ধকার তখনও কাটেনি। সামান্য দুইও তখন আরম্ভ হয়েছে। কালী নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে বালী-ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হ'ল।)

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(চার)

যমক, অনুপ্রাস, রূপক, উপমা, দীপক প্রভৃতি বহু অলঙ্কার আছে কাব্য ও সাহিত্যকে অপরূপভাবে সাজানোর জন্য, কিন্তু আচার্য দণ্ডী কাব্যের গুণ ও অলঙ্করণরূপে শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সৌকুমার্য, অর্থব্যক্তি, উদারতা, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি এই দশটি কাব্যগুণ নির্ণয় করেছেন ও বলেছেন—এ' দশটি গুণের সমন্বয় যে কাব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাকেই ঠিক প্রাণবন্ত কাব্য ব'লে গণ্য করা যায়, আর এ' গুণগুলিই কাব্যদেহকে যথার্থভাবে সুষমান্বিত করে। গুণই কাব্যের অন্তরঙ্গ সজ্জা ও কাব্যের আত্মা, আর অলঙ্কাররূপ অলংকরণ কাব্যের বহিরঙ্গ-উপকরণ। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'কাব্য-কৌতুক'-গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে এ' সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করেছেন।

দণ্ডীর পর অভ্যুদয় হ'ল আলঙ্কারিক বামনের। অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, আচার্য বামন গুণ ও অলঙ্কারের মধ্যে যে পার্থক্য—তাকে আরও সবিশেষভাবে বর্ণনা করলেন। বামন আচার্য দণ্ডীর শ্লেষ, প্রসাদাদি দশটি কাব্যগুণ স্বীকার করলেন। কিন্তু কাব্যগুণকে কাব্যের বা সাহিত্যের আত্মা বা প্রাণকেন্দ্ররূপে মেনে নিলেন না। তিনি বলেন: 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য', অর্থাৎ রীতি বা বিশিষ্ট পদরচনাই কাব্যের ও সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র। রীতি অর্থে বিশিষ্ট পদরচনা—'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ'। রীতির ইংরাজী ষ্টাইল (Style)। এই রীতি বা ষ্টাইল বৈদর্ভী, গৌড়ীয় ও পাঞ্চালী-ভেদে তিনরকম। পরে আচার্য আনন্দবর্দ্ধন ধ্বন্যালোকেও আচার্য অভিনবগুপ্ত 'লোচন'-টীকায় এই বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের আলোচনা করেছেন সামান্যভাবে একথা আমরা পূর্বে বলেছি। আচার্য ভরত নাট্য-

শাস্ত্রে বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতির আলোচনা করেছেন নাটকের পাঠ্য বা কথা-কাহিনীর উপযোগিতায়। অবশ্য বিদর্ভদেশজাত বৈদর্ভীরীতিই শ্রেষ্ঠ, কেননা সকল গুণের সমাবেশ ও প্রকাশ বৈদর্ভী-রীতির মধ্যে পাওয়া যায়।

আচার্য বামনের সূত্র ধরে আচার্য আনন্দবর্দ্ধনের যখন অভ্যুদয় হ'ল তখন কাব্য ও সাহিত্যক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল। কবি ও সাহিত্যিক সর্বদাই তাঁদের রচনায় চারুত্বকে বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং এই চারুত্ব প্রাণবান হয়ে ওঠে ধ্বনির সহায়তায়, কেননা ধ্বনিই কাব্য ও সাহিত্যের যে রস—তাকে অপরূপভাবে সৃষ্টি ও প্রকাশ করে। আচার্য ভরত নাট্যশাস্ত্রে ধ্বনির উল্লেখ না করলেও রসকেই বলেছেন নাটকের, সাহিত্যের ও সঙ্গীতের প্রাণ। তিনি আটটি রসের সঙ্গে সঙ্গে আটটি ভাবেরও পরিচয় দিয়েছেন।[১] অবশ্য ভরতোত্তর যুগে শান্তরসকে নিয়ে নবরসের সৃষ্টি হয়েছিল এবং বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে বাৎসল্যরূপ দশম রসের উল্লেখও করেছেন বৈষ্ণবরসশাস্ত্রীরা।

আচার্য ভরতের মতো আচার্য আনন্দবর্দ্ধনও রসকেই কাব্যের প্রাণ বা আত্মা বলেছেন,—যদিও ধ্বনিবাদ বা ধ্বনিতত্ত্বেরই তিনি বিশেষভাবে প্রচারক তাঁর পূর্ব-পূর্ব ধ্বনিবাদী আচার্যদের অনুসরণ ক'রে। আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন যে, যেখানে রসের সম্পর্ক ও স্পর্শ নাই সেখানে কাব্য ও সাহিত্য নিষ্প্রাণ ও অনড়। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'কাব্যকৌতুক'-গ্রন্থে আনন্দবর্দ্ধনের এ' কথার উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "রমণীর" অন্তর্গূঢ় লাবণ্য যেমন দর্শকের চিত্ত চমৎকৃত ক'রে তোলে, সেই রকম সাহিত্যে অন্তর্গূঢ় রসও লাবণ্যস্থানীয়। 'রস' হচ্ছে কবিচিত্তের বিচিত্র অনুভূতিজনিত একটি স্পন্দন—যা তাঁকে (কবি ও সাহিত্যিককে) শব্দময় কাব্য রচনা করবার জন্যে প্রেরণা দিয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষের চিত্তের মধ্যে কত বাসনা সুপ্তভাবে বিরাজ করছে, সেই বাসনা যখন জাগ্রত হয়ে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম ক'রে দেশ-কালাতীত শাশ্বত ও সার্বজনীনভাবে প্রকাশিত হয়ে ওঠে, তখনই তাকে 'রস' বলে অভিহিত করা হয়।"[২] এই রস নাটক এবং সঙ্গীতেরও প্রাণ বা আত্মা।[৩] আচার্য ভরত যখন রাগের বীজস্বরূপ জাতি বা ষাড়্জী প্রভৃতি জাতিরাগ ও পরে গ্রামরাগের আলোচনা করেছেন, তখন প্রতিটি জাতিরাগে ও গ্রামরাগে আটটি রসের কোন্ কোন্ রস তাদের মধ্যে প্রধানভাবে লীলায়িত হ'ত—সে' সবের কথা নাট্যশাস্ত্রে আলোচনা করেছেন।

তাছাড়া কবির ও সাহিত্যিকদের রসানুভূতিই কবিকে ও সাহিত্যিককে কাব্য ও সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে প্রেরণা দান করে। তাছাড়া সহৃদয়ের সহানুভূতিই তার লক্ষ্য। অবশ্য শব্দ, অর্থ, গুণ, অলঙ্কার কবির ও সাহিত্যিকের রসসৃষ্টিকে সাহায্য করে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আচার্য আনন্দবর্দ্ধন ধ্বনিতত্ত্বের প্রচার ক'রে কাব্য ও ও সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রকে সুষমান্বিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। তবে একথা ঠিক যে, আনন্দ-বর্দ্ধন ব্যাকরণাচার্যদের ধ্বনিবাদ ও স্ফোটতত্ত্বের অনুসরণ করেই 'ধ্বনি' নামটি গ্রহণ করেছিলেন 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে। ডক্টর বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

১। অনেকে বলেন যে, আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত আচার্য ভরতের নবরসকে অনুসরণ করেই নবরসের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়, কেননা এক কাশ্মীরী সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্র ছাড়া কাশী, বরোদা প্রভৃতি সংস্করণে ভরতোক্ত আটটি রসেরই উল্লেখ আছে।

২। 'কাব্য-কৌতুক' (প্রত্নেরিত-পাবলিশার্স) পৃঃ ১২৩

৩। আমরা সঙ্গীতে রস-সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে এ' সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করবো।

"গ্রন্থে 'ধ্বনি' নামটি গ্রহণ করিবার কারণ-প্রসঙ্গে ধ্বনিকার (আনন্দবর্ধন) বলিয়াছেন— 'পরিনিশ্চিতনিরপত্রংশশব্দব্রহ্মণাং বিপশ্চিতাং মতমাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোঽয়ং ধ্বনিব্যবহারঃ' (৩।৩৩ বৃত্তি) ; অর্থাৎ শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণগণের অভিমত অবলম্বন করিয়া এই ধ্বনি-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কারণ 'প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্। তে চ শ্রূয়মাণেষু বর্ণেষু ধ্বনিরিতি ব্যবহরন্তি। তথৈবান্যৈস্তন্মতানুসারিভিঃ হরিভিঃ কাব্যতত্ত্বার্থ-দর্শিভিঃ বাচ্যবাচকসংমিশ্রঃ শব্দাত্মা কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যো ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ্ ধ্বনিরিত্যুক্তঃ" (১।১৩ বৃত্তি) ; অর্থাৎ ব্যাকরণ সর্ববিদ্যার মূল বলিয়া অগ্রগণ্য বিদ্বান হইতেছেন বৈয়াকরণগণ ; তাঁহারা শ্রূয়মান বর্ণে 'ধ্বনি'-শব্দের প্রয়োগ করেন। তাঁহাদের মতানুসারে কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণ ধ্বনিকে ব্যঞ্জকত্বের সহিত সমানধর্মী বলেন এবং সে' অর্থেরই ধ্বনিশব্দের ব্যবহার আসিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আনন্দবর্ধনাচার্য স্বকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি বৈয়াকরণ-মতানুসারে অলঙ্কারশাস্ত্রে ধ্বনি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।"[৪]

ব্যাকরণাচার্যরা বলেন যে, শব্দ নিত্য ও স্বপ্রকাশ। শব্দের সঙ্গে অর্থের অবিনাভাব সম্বন্ধ—যেমন শিবের সঙ্গে শক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মহাকবি কালিদাস এই তত্ত্বটি তাঁর 'রঘুবংশ'-কাব্যে প্রকাশ ক'রে বলেছেন—

'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।'

শব্দের সঙ্গে অর্থের নিত্যসম্বন্ধ। কিন্তু 'শব্দগুণমাকাশম্'—আকাশের গুণ (বা কার্য) শব্দ হলেও অদ্বৈতবেদান্তমতে আকাশ অনিত্য, কেননা একমাত্র অবিনশ্বর ব্রহ্মই (ব্রহ্ম-চৈতন্যই) নিত্য ও সত্য, সুতরাং ব্রহ্মভিন্ন শব্দ অনিত্য। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে এবং আচার্য ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়'-গ্রন্থের ব্রহ্মকাণ্ডে শব্দব্রহ্মরূপ স্ফোটকে নিত্য বলেছেন। স্ফোট নিত্যশব্দ—ব্যঞ্জক, দ্যোতক ও প্রকাশক। অর্থ স্ফোটকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ব্যঙ্গ অর্থ কাব্য ও সাহিত্যের চমৎকারিত্বের কারণ। ব্যঙ্গ্য (অভিপ্রায়) অর্থের প্রকাশে বাচকশব্দ ও বাচ্য অভিধেয় অর্থের দ্বারা। ...'ধ্বনতি প্রকাশয়তি' এই অর্থে ধ্বনি-শব্দ কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন, পরে ব্যঞ্জনা-ব্যাপার (প্রকাশ ক্রিয়া)। এবং ধ্বনির কর্ম যে আভিপ্রায়িক অর্থ তাকেও বোঝায়। বৈয়াকরণের প্রয়োগে ধ্বনি-শব্দ ধ্বনন-ক্রিয়ার কর্তা অর্থে প্রয়োগ হয়েছে।[৫]

কাশ্মীরতন্ত্রের মধ্যে আচার্য উৎপলদেব-রচিত 'শিবদৃষ্টি'-গ্রন্থে যেখানে পরা, পশ্যন্তী প্রভৃতি বাক্ বা শব্দের আলোচনা আছে সেখানে তিনি কারণ-বাক্‌কে স্ফোট বলেছেন। স্ফোট শব্দ, তবে কারণশব্দ। উৎপলদেব বলেছেন : "অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্" (২য় আহ্নিক ১ম শ্লোক)। পুনরায় তিনি বলেছেন : "শব্দব্রহ্মনি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি"। অবশ্য পশ্যন্তী-বাকের প্রসঙ্গেই এ'কথা তিনি বলেছেন। টীকায় এজন্য তিনি পুনরায় বলেছেন : "তথৈবংভূতে পশ্যন্তীরূপে শব্দাখ্যে ব্রহ্মণি যো নিষ্ণাতস্তেন পরং ব্রহ্মাধিগতং ভবীতি"। কথা এই যে, অবিচ্ছুরিত কুণ্ডলিনীশক্তি থেকে প্রথমে পরা বাকের সৃষ্টি। তা থেকে পশ্যন্তী ও পরে মধ্যমা-বাকের সৃষ্টি। পরিশেষে বৈখরী-বাক্। 'বাক্যপদীয়', গ্রন্থে (ব্রহ্মকাণ্ড) আচার্য ভর্তৃহরির শব্দব্রহ্মতত্ত্ব অনেকটা উৎপলদেবের মতের অনুযায়ী। তবে উভয়ের মধ্যেও মতভেদ আছে, কেননা ভর্তৃহরি অদ্বৈতব্রহ্মবাদেরই অতি নিকটবর্তী সিদ্ধান্তবাদী। আর উৎপলদেব

৪। 'ধ্বন্যালোক'—৮টীর শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনূদিত, পৃঃ ৪৯-৫০
৫। ঐ, পৃষ্ঠা ৫০

শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদী। কিন্তু তাহলেও আমরা উল্লেখ করেছি যে, ভর্তৃহরির শব্দব্রহ্মবাদ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে আচার্য শঙ্কর-কর্তৃক খণ্ডিত হয়েছে।

এই আলোচনাটি আরও পরিস্ফুট করার জন্য অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য-প্রণীত 'কাব্য-কৌতুক' থেকে উদ্ধৃত ক'রে বলি: "ভর্তৃহরি-প্রমুখ বৈয়াকরণ-আচার্যগণ ক্রমমান ক্ষণবিধ্বংসী বর্ণসমূহের অর্থবোধকত্ব স্বীকার করেন না। সেই সকল ক্ষণিক ক্রমোচ্চারিত বর্ণসমূহের যে অখণ্ড, নিত্য এবং ক্রমশূন্য অভিব্যক্তি ঘটে, তাহাই 'স্ফোট'-রূপ শব্দতত্ত্বের সম্বন্ধ বাচ্যবাচকভাব স্ফোটের অভিব্যক্তির অনুকূল ব্যাপারের সংজ্ঞা 'ধ্বনি'। ভর্তৃহরি স্ফোটশব্দ, ব্যঞ্জক ক্ষণবিধ্বংসী বর্ণরাশি এবং ব্যঞ্জনাব্যাপার এই তিনটিকে আবার 'ধ্বনি' সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং স্ফোটবাদিগণের মতে শ্রূয়মান বর্ণসমূহ স্বতঃ নিরর্থক, তাহাদের সার্থকতা কেবলমাত্র অখণ্ড এবং নিত্য স্ফোটরূপ শব্দতত্ত্বের অভিব্যঞ্জনে। সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে আচার্য আনন্দবর্দ্ধন স্ফোটবাদিগণের সিদ্ধান্তের এই সারমর্মটুকু গ্রহণ করিয়াছেন।.....আনন্দবর্দ্ধনপ্রমুখ ধ্বনিবাদিগণ বৈয়াকরণ-প্রয়োগ অনুসরণ করিয়া 'ধ্বনি' এই সংজ্ঞার দ্বারা ব্যঙ্গ্য, ব্যঞ্জক এবং ব্যঞ্জনা এই ত্রিবিধ বস্তুকেই নির্দেশ করিয়া থাকেন। এমন কি সমুদায়াত্মক কাব্যকেও তাঁহারা 'ধ্বনিকাব্য'-রূপে অভিহিত করিয়া থাকেন।"[৩] আনন্দবর্দ্ধনও একথাই বলেছেন—

'যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃত স্বার্থৌ।
ব্যঙ্ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ।'

(এ' সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করবো।)

●

॥ দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে ॥

কন্যাকুমারী

(বিবেকানন্দ-রক, শুচীন্দ্রম)

(দুই)

কোন এক প্রচলিত প্রাচীন উক্তি অনুসারে বলা হয় আসল কন্যাকুমারী মন্দির "শ্রীপদ পরই" নামে শিলায় অবস্থিত ছিল যেটি অধুনা "বিবেকানন্দ শিলা" নামে পরিচিত। তিন একর ভূখণ্ডবিশিষ্ট এই শিলা এখন সমুদ্র দ্বারা দুভাগে বিচ্ছিন্ন। সমুদ্রতল হতে এর উচ্চতা হ'ল ৫৫ ফুট। বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডটি দেখা যায় অদূরেই।

এই ভূখণ্ডটিতে গ্রানাইট প্রস্তর-নির্মিত মন্দিরটির আয়তন হ'ল ৮৫' × ৪০' ফুট। পরিকল্পনা করেন দেবকোট্টাইর বিশিষ্ট স্থপতি শ্রীএস্ .ক. আচারি। স্মৃতি মণ্ডপটি দুটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত। একটি 'শ্রীপদমণ্ডল', অপরটি 'বিবেকানন্দ স্মৃতিমণ্ডপ'। এই মণ্ডপটি দুটি হল-ঘর-সমন্বিত। একটি 'সভামণ্ডপ', অপরটি 'ধ্যানমণ্ডপ'। প্রথমেই আমরা প্রবেশ করলুম, সভামণ্ডপে—উজ্জ্বল গ্রানাইট প্রস্তরে অজন্তার সাদৃশ্য স্তোতক কারুকার্যমণ্ডিত ৬৫' ফুট উচ্চ বিমান, বেলুড় মঠের অনুকরণ। বিমানের নীচেই দণ্ড কমণ্ডলুবিহীন পরিব্রাজক-

৩। 'কাব্য-কৌতুক', পৃ: ১৪০-১৪১

আজও জাগ্রত—নচেৎ তাঁর নামে এই নতুন তীর্থ আবির্ভূত হল কি করে—যা সরকারের রাজনৈতিক শক্তির দাক্ষিণ্যে নয়, রচিত হয়েছে জনগণের সমবেত ইচ্ছার শক্তিতে।" মন্দিরের কাজ অল্প-বিস্তর এখনও চলেছে। বেশ-কিছুক্ষণ মন্দিরে থেকে উপস্থিত হলুম ধ্যান-মণ্ডপে। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ : "যাহারা ধ্যান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারাই কেবল মণ্ডপ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন।" বিনা দ্বিধায় চিত্তে নীরবে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ ধ্যান করে বাইরের চত্বরে এসে তার সমগ্র বেষ্টনীটি চক্রাকারে ঘুরে দেখতে লাগলুম যেদিকে দৃষ্টি যায় অসীম সমুদ্র। তবে পুরীর মত বিক্ষুব্ধ সমুদ্র নয়। অন্তহীন, বিরাট অসীম জলরাশি। ইচ্ছা জাগে পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যেতে। চত্বরটির পূর্বে এসে দেখি অ্যামিডিক রেখার অঙ্কিত কোন্ মাসে, কোন্ সময় কোন্ স্থানে আকাশের সূর্যের অবস্থান তার নক্সা। তীরের মত একটি কাঁটা দিয়ে তার নির্দেশনা। তাই এখানে সূর্যোদয় দেখতে আসেন দলে দলে দর্শনার্থীরা। পশ্চাতেই মন্দির-দেওয়ালগাত্রে উল্লিখিত এই স্মৃতিমণ্ডপ নির্মাণকল্পে কোন্ প্রদেশ কত টাকা অনুদান দিয়েছেন তার তালিকা। একের পর এক নাম পাঠ করতে করতে পশ্চিমবঙ্গের দানের অঙ্কে দৃষ্টি পড়তেই লজ্জায় মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে, যে প্রদেশে এই বিশ্ব-বরেণ্য মানুষটির জন্ম সেখানকার দানই কিনা সর্বনিম্নে। "হেরিকেনের নীচেই অন্ধকার" বলতেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব। সেখান হতে রণজিৎ ভাইসহ তিনজনে "শ্রীপদমণ্ডপে" গিয়ে মন্দিরাভ্যন্তরে মাতৃপদ-চিহ্ন-যুগল দেখে পশ্চাতের দীর্ঘায়ত পৈঠাগুলির উপর বসে পড়লুম—সমুদ্রের দিকে মুখ করে। দেখতে লাগলুম অগণিত মানুষের অবিরাম যাতায়াতের দৃশ্য। তারপর যাত্রী-বোঝাই ষ্টীমারখানি গেটে লাগতেই সকলে ধাপ বেয়ে নেমে এসে ষ্টীমারে করে চলে এলুম এপারে। সেখানে অপেক্ষমান ট্যাক্সিটি আমাদের নিয়ে একেবারে উপস্থিত হ'ল গান্ধী-স্মারক স্তম্ভের পাদদেশে সূর্যাস্ত দেখতে আরব সাগরে। এই স্মারকস্তম্ভটিও নির্মিত হয়েছে তিনটি সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে কন্যাকুমারীর সোনালী বালুকারাশির মধ্যে উড়িষ্যার ভাস্কর্যের অনুকরণে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে। ১২৫৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজীর চিতাভস্ম বিসর্জিত হয় এই সমুদ্র-সঙ্গমেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কষ্টপাথর নির্মিত স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ ধ্যানমূর্তি। দ্রুত উঠে গেলুম তার উচ্চতম তলে। এসে দেখি দর্শনার্থীদের ভিড়ে চত্বরটি পূর্ণ, কারো হাতে দূরবীণ, কারো হাতে ক্যামেরা, কেউ বা গজ্‌গজ্‌ করছেন তাঁর সামনে লোক দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আড়াল করার জন্য। তারই মধ্যে একটু স্থান করে সামনেই দাঁড়িয়ে পড়লুম। সকলেই চঞ্চল, সকলেই উদ্‌গ্রীব। সামনেই আকাশের গায়ে সূর্যদেব। ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল তাঁর তেজ। ছড়িয়ে পড়ল মাথার ওপর আকাশের গায়ে নানা বর্ণের ছটা। ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে সেই রশ্মি। রক্তিমাভ হয়ে পড়ে সারা আকাশ, সমুদ্রের বুক। সে আলোক দ্যুতিও ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। সূর্যদেব ধারণ করতে থাকেন রক্তবর্ণ একটি থালার আকার। সাগরের জলের সঙ্গেও করতে থাকে দ্বন্দ্ব। ধীরে ধীরে তিনি যেন নিস্তব্ধ আরবসাগরের বুকে বসে পড়েন। সমুদ্রাসনে আসীন বরুণদেব। তারপর প্রবেশ করতে থাকেন আরবসাগরের জলে—বাকী থাকে না একটুও। কিছু-সময়ের জন্য রক্তিমাভ হয়ে ওঠে দিগন্ত। মিশে যায় লাল সাগরের জল আর লাল আকাশ। শেষে উভয়েই হারিয়ে ফেলে তাদের নিজস্বরূপ। সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে দেখি অপরূপ এই সূর্যাস্তের দৃশ্য। সেই সঙ্গে অপর প্রান্তে বিবেকানন্দ শিলায় নেমে পড়ে উড্ডীয়মান পতাকা। এখানকার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল পূর্ণিমার দিন এই স্থানে দাঁড়িয়েই দেখা যায় একই সময়ে চন্দ্রোদয় ও সূর্যাস্ত।

শীতের সন্ধ্যা—ঘড়িতে ৬টা বাজে। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ট্যাক্সিখানি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি শুচীন্দ্রম্ দর্শনে। ছুটে চলে হু-হু শব্দে ট্যাক্সিটি দক্ষিণ-ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজপথ বেয়ে। পথের দুধারে নারিকেলকুঞ্জ ও কদলীগাছের ঝাড়। ৯ মাইল পথ অতিক্রম করে গাড়ী পৌঁছে যায় শুচীন্দ্রম্ মন্দিরের সামনে। গাড়ী থেকে নেমেই দেখি ১৪০ ফুট উঁচু এক গোপুরম দ্রাবিড় শিল্পের ঐশ্বর্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। পুরোহিতের নির্দেশে সমস্ত গাত্রাবরণ উন্মোচন করে একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে উপস্থিত হই মন্দিরদ্বারে। বিমানের অঙ্গের অপরূপ কারুকার্য। শীর্ষদেশ একটি গম্বুজের আকার। শৃঙ্গে শোভা পায় তিনটি কলস, একটির পর একটি। তার উপর শোভিত ত্রিশূল।

শৈব মন্দির। কিন্তু এটিকে বলা হয় "স্থানুমলয়"। নামটি ত্রিমূর্তির পরিচায়ক—"স্থানু" শিবের নাম। "মল" বিষ্ণু এবং 'অয়ন' ব্রহ্মার নামের রূপান্তর। শুচীন্দ্রম্ নামের পশ্চাতেও রয়েছে একটি আখ্যায়িকা: শুচি অর্থে পবিত্রতা। অহল্যার সতীত্ব নাশের পর ইন্দ্র অভিশাপমুক্ত হবার জন্য জ্ঞানারণ্যে ভয়ঙ্কর তপস্যা শুরু করেন। শিব আবির্ভূত হয়ে প্রতি রজনীতে এই স্থানটিতে তাঁর পূজা করার সর্তে তাঁকে স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। তখন হতে স্থানটির নাম হল শুচি+ইন্দ্রম্=শুচীন্দ্রম্। অর্থাৎ এখানে অভিশাপমুক্ত হয়ে ইন্দ্র পবিত্র হন। মন্দিরের মধ্যে দর্শন করি ত্রিমূর্তি। দক্ষিণে হংসারূঢ় ব্রহ্মা, বামে গরুড় বাহনে বিষ্ণু, মধ্যস্থলে নন্দী (বৃষভ)-বাহনে হর-পার্বতী। সেখান হতে চলে আসি নন্দী মণ্ডপে। দেবতার দিকে মুখ করে বসে আছেন চিরঅনুগত বাহনটি। আকৃতির সাদৃশ্য মেলে তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরের নন্দীর সঙ্গে। সেখান হতে চলে আসি হনুমান-মন্দিরে। সেখানেও করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভক্তশ্রেষ্ঠ অভিকায় হনুমান—অঙ্গে তাঁর কত ভূষণের বাহার। সংক্ষেপে এ সব দর্শন শেষ করে রাত্রি ৭-৩০টায় ফিরে আসি কন্যা-কুমারী মন্দিরদ্বারে তাঁর অধিবাস-মুহূর্ত দেখতে। কঠোর তপস্যান্তে বাণাসুর বর পেলেন তাকে কোন পুরুষ হত্যা করতে পারবে না। ত্রিভুবন জয় করে ইন্দ্রকে করলেন অমরাবতী হতে বিতাড়িত। বিষ্ণুর পরামর্শে ইন্দ্র যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সেই যজ্ঞাগ্নি হতে আবির্ভূত হলেন এক পরমাসুন্দরী কন্যা। এই দেবী-কন্যার সৌন্দর্যের কথা জ্ঞাত হয়ে অসুর তাঁকে দেখে তাঁর মনোমুগ্ধকর রূপে আকৃষ্ট হয়ে বলপূর্বক লাভ করার চেষ্টা করেন। এলে দেবীর সহিত যুদ্ধে বাণাসুর নিহত হন। তখন শিবকে পতিরূপে লাভের জন্য এই কুমারী কন্যা কঠোর তপস্যা শুরু করেন। আকাঙ্ক্ষিত দেবতাও সন্তুষ্ট হয়ে এই বিবাহে সম্মতি দেন, কিন্তু লগ্ন উত্তীর্ণ হলে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে না এই সর্তে। শিব আসছেন নন্দীবাহনে বিবাহে, শুচীন্দ্রমের কাছেই দুর্বাসার সঙ্গে সাক্ষাৎ। দুজনে শুরু হয়ে গেল শাস্ত্রালোচনা—ছাড়া পেয়ে শিব কিছুদূর অগ্রসর হতেই শুনলেন কাকপক্ষিগণের কলরব। মনে হল ভোর হয়ে গেল। কিন্তু তা হয়নি তখনও। এসব নারদের কারসাজি। ভালোমানুষ শিব ভাবলেন লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই তিনি শুচীন্দ্রমেই রয়ে গেলেন। ঋষিদের আগমন প্রতীক্ষায় তপস্যারত কন্যা চিরকাল কুমারীই রয়ে গেলেন। তাই স্থানটির নাম হল কন্যা-কুমারী। আরও একটি কুমারীর স্মৃতির উদ্দেশে সমাধি আছে এই কন্যাকুমারীতেই তিনি হলেন যীশুখ্রীষ্টের কুমারী মাতা মেরী। কন্যা-কুমারী মূর্তিকে প্রতিদিন সজ্জিত করা হয় তিন বার। প্রাতে অরুন্ধনীয় বেশে ও সন্ধ্যায় অধিবাসবেশে ঋষিদের সঙ্গে মিলনলগ্নের প্রতীক্ষায়। দুপুরে রাজবেশে হন ক্ষুব্ধিতা। আজ সন্ধ্যায় আমরা উপস্থিত মন্দিরদ্বারে সেই পরম অধিবাস লগ্নের সন্ধ্যা দেখতে। পুরোহিতের নির্দেশে গাত্রাবরণ উন্মোচন করে প্রবেশ করতে হল এখানেও

সকল পুরুষ দর্শনার্থীদের। নিবিষ্ট চিত্তে দাঁড়িয়ে দেখলুম—বাসন্তী শাড়ি পরিহিতা, চন্দনচর্চিতা, পুষ্পাভরণসজ্জিতা, সদাহাস্যময়ী, সরলতা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যমণ্ডিতা এক মহিমান্বিতরূপ—যা সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিচিত্তে আত্মদীনতার ভাব সৃষ্টি করে।

মনে হল, বিশ্বের সকল কুমারীই কি তার প্রেমাস্পদের জন্য একই তপস্যায় ব্রতী হন? এ যে প্রকৃতির পুরুষকে লাভ করার তপস্যা। এ তপস্যার শুরু আদিতে, চলবেও যুগ হতে যুগান্তরে। এটিই সৃষ্টির আদি রহস্য। আর এজন্যই কি স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণে এসেছিল প্রাচ্যের সঙ্গে প্রাশ্চাত্যের মিলনপ্রেরণা সাগরত্রয়ীর মিলনক্ষেত্রে মিলনাকাঙ্ক্ষী কন্যাকুমারীর তপস্যারত এই রূপ দর্শনে?

দর্শন শেষে পূজারীর হাতে ভোগ-পূজার জন্য ১৯টি টাকা দেওয়া হল। সেইসঙ্গে তিনি ভোর ৪-৩০ টায় কুমারী মূর্তিকে অরক্ষণীয়া বেশে সজ্জিত করার পূর্বে মন্দিরে উপস্থিত থাকার জন্য বললেন। সময়মত আমরা সাতজনে মূল দরজায় দাঁড়াতেই পরিচিত পুরোহিতদের একজন সঙ্গে নিয়ে গিয়ে মূর্তির সামনেই আমাদের বসিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার মত তখন মন্দিরে লোকের ভীড় নাই। গর্ভমন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোক নাই—প্রদীপালোকে আলোকিত কুমারী দেহ হতে একে একে গাত্রাবরণ সব উন্মোচন করা হল। শ্বেতচন্দন বিলেপিত মুখমণ্ডল ধৌত করা হল। বিস্মিত নেত্রে দেখলুম কৃষ্ণবর্ণ কষ্টি পাথরের নিরাবরণা এক কুমারী মূর্তি। আর ক্ষণিকের জন্য মনে হল প্রাণস্পন্দী মানুষের গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করলে দেহের যেমন উর্ধ্বাঙ্গ স্ফীত হয়ে ওঠে প্রস্তর নির্মিত দেবীর দেহের উর্ধ্বাংশও যেন তেমনি স্ফীত হয়ে উঠলো। দেহ-মন আনন্দের আতিশয্যে ভরে গেল। দেখলুম যেন এক দিগম্বরী জীবন্ত কুমারীকে।

এখন অরক্ষণীয়া বেশে কুমারীদেহ সজ্জিত করার কাজ শুরু হল। আমরাও বঙ্গোপসাগরে সূর্যোদয় দেখতে দ্রুত বেরিয়ে এলাম বিবেকানন্দ শিলার দিকে। কিন্তু বিরাট একখণ্ড মেঘ বঙ্গোপসাগরের উপর হতে পূর্বের সমস্ত আকাশটিকে ঢেকে ফেলায় সূর্যোদয় দেখা হল না। তারপর ১৬টি স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ-সম্মুখস্থ কন্যাকুমারী ঘাটে একে একে সকলে স্নানপর্ব সেরে পুনরায় কুমারীর 'অরক্ষণীয়া' বেশ দেখার জন্য চলে এলুম মন্দিরদ্বারে।

সুবিস্তৃত চতুর্ভুজাকৃতি এক ভূখণ্ড, সৈকতাগ্রভাগস্থিত চতুষ্পার্শ্ব প্রাকারবেষ্টিত, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরবসাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের মিলন-কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে ভারতের সর্বশেষ এক মন্দির। অভ্যন্তরে দেবী কন্যাকুমারী। সমুদ্রত্রয়ীর জলরাশি ধৌত করছে তাঁর পদযুগল। মন্দিরের পূজারী গর্ভমন্দিরের অতি সন্নিকটে আমাদের বসিয়ে দিলেন। এখন তাঁকে দেখি সম্পূর্ণ ভিন্ন সাজে। পরিধানে আসমানি শাড়ি, পুষ্পাভূষণের পরিবর্তে সারা অঙ্গে উঠেছে জহরতের অলঙ্কার। চন্দনচর্চিত মুখমণ্ডল। কপালে হীরার টিপ। গলায় মুক্তামালা। হাত দুটি সোনার পাতমোড়া। যেন রাজেন্দ্রনন্দিনী। মনোমোহিনী মূর্তি। নির্নিমেষে চেয়ে চেয়েও দেখা যেন ফুরায় না। এমন সময় পুরোহিত এসে হাতে দিয়ে গেলেন বিচুরী প্রসাদ। পুরাণে বর্ণিত এখানেই এই তিনটি সমুদ্রের সঙ্গমে শিবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য গৌরী তপস্যারত ছিলেন। তাই গৌরী এখানে কন্যারূপেই পূজিতা। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে এসে কুমারীকে পূজা করে ভাবাবেশে অভিভূত হন। স্বামী বিবেকানন্দও প্রাচীনকালে যেখানে কন্যাকুমারীর মন্দির ছিল সেখানেই ধ্যানে বসে লাভ করেন বিশ্বমৈত্রীর প্রেরণা। আমরাও দেখে গেলাম এক অনিন্দ্য জীবন্ত মূর্তি। তাই যাত্রা শেষে প্রণাম জানিয়ে বলি বিদায় দেবী। বিদায়। আবার যদি কোনদিন আহ্বান আসে

বন্দনা করে যাব সমুদ্রত্রয়ীর জলরাশি-বিধৌত তোমার ঐ পদযুগল। দেহেমনে আনন্দের এক অনুভূতি নিয়ে ফিরে আসি হোটেলে বেলা দশটায়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব শেষ করে বিশ্রাম নিতেই আমাদের ট্যাক্সিচালক তাগিদ দেয় তিরুনেলভ্যালি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে। বেলা ১টায় আবার চারখানি গাড়ী চলতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে একখানি গাড়ীর সিলেণ্ডার ভাঙল—চালক ছুটল—কন্যাকুমারীর "টুরিষ্ট লজে।" ইতিমধ্যে বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। সকলে আশ্রয় নিলুম একটি বাড়ীর বারান্দায়। প্রায় ১ ঘন্টার মাথায় ফিরে এল চালকটি অন্য একখানি গাড়ী নিয়ে। গাড়ীগুলি চলতে শুরু করল অতি দ্রুত। মাদুরাগামী ট্রেণ ছাড়ার মাত্র ২০ মিনিট পূর্বে পৌঁছে গেলুম তেরুনেলভ্যালি ৩-৪০ মিনিটে। রণজিৎ ভাই আমাদের ট্যাক্সির মীটার দেখে বললেন প্রতি জনের লাগবে ৮০ পঃ মীটার হিসাবে মোট ৫১ টাকা।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে ঃ পণ্ডিত পদ্মলোচন ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

॥ এক ॥

পূর্বভাষ :

'বর্ধমান অধিপের সভার পণ্ডিত।
নানা শাস্ত্র তত্ত্ব-বেত্তা খ্যাতি সমন্বিত॥
নাম পদ্মলোচন ধীরেন্দ্র একজনা।
প্রভু-দরশনে যাঁর সফল বাসনা॥—পুঁথি, ৫৫২

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে পণ্ডিত পদ্মলোচন একটি বিশেষ খ্যাতনামা চরিত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে যে সমস্ত মহাভাগ্যবান ও প্রথিতযশা সাধক-পণ্ডিতের মিলন ঘটেছিল এবং যাঁরা তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে হৃদয়ের অপার শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করেছিলেন, ইনি তাঁদেরই অন্যতম।

'লীলাপ্রসঙ্গ,' 'কথামৃত,' 'পুঁথি' প্রভৃতি আকর-গ্রন্থে এই পুণ্যাত্মা সাধক-পণ্ডিত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিবরণী ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ঐ বিবরণী-গুলির প্রায় সমস্তই স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত। যা হোক, বর্তমান নিবন্ধটি সেই সব মূল্যবান তথ্যেরই সযত্ন সংগ্রহে রচিত।

জীবন কথা : [জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা]

'দিগ্বিজয়ী বিচারেতে দেশ জুড়ে নাম।
নাহিক পণ্ডিত কেহ তাঁহার সমান॥
ন্যায়েতে পণ্ডিত তেঁহ বেদান্তে তেমন।
তদুপরি সাধনায় সিদ্ধ একজন॥—পুঁথি ১২২

পণ্ডিতপ্রবর পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয় ছিলেন বর্ধমান মহারাজের প্রধান সভাপণ্ডিত। ইনি বর্ধমান অথবা তার সন্নিহিত কোনও স্থানের অধিবাসী ছিলেন। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীভুক্ত এক অতি নিষ্ঠাবান সাধক-পণ্ডিতকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

পদ্মলোচন অত্যন্ত মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বাল্যকাল হতেই নানা শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলনে এঁর প্রবল অনুরাগ দেখা যায়। তার ফলে অল্প বয়সেই

ইনি ক্রমশঃ ন্যায়-শাস্ত্রের উভয় শাখারই পাঠ সাঙ্গ করেন। তারপর ইনি বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়নের জন্য ব্যাকুলিত হন। কিন্তু সে-সময়ে বাংলাদেশে প্রকৃষ্টভাবে ঐ শাস্ত্র-চর্চার সুযোগ বিরল ছিল। এ জন্য ইনি নিজ অন্তরের ঐ অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে ৺কাশীধামে গমন করেন এবং সেখানে এক প্রসিদ্ধ গুরুকুলে বাস ক'রে ঐ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তার সূক্ষ্ম মীমাংসাগুলির অনুশীলনে একনিষ্ঠভাবে ব্রতী হন।

উদ্যমী ও ধীমান পদ্মলোচন কঠোর পরিশ্রম ও একান্ত যত্নে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ঐ শাস্ত্রের খুটিনাটি প্রায় সমস্ত বিষয়েই আয়ত্ত করে ফেলেন। তার ফলে, ঐ গুরুকুলের বিদগ্ধ বৈদান্তিকগণ এঁর অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিমুগ্ধ হন এবং এঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। যা হোক, তার পরেও ইনি আরও কয়েক বছর ৺কাশীধামে থাকেন এবং সেই অবসরে ঐ শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার ও অধ্যাপনাদি করেন। এইরূপে ইনি বেদান্তদর্শনে বিশেষ কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন এবং সেখানে ঐ শাস্ত্রের একজন গণ্যমান্য অধ্যাপকরূপেই বিখ্যাত হন।

[প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি]

পণ্ডিত পদ্মলোচন ৺কাশীধাম হতে মহোপাধ্যায় বেদান্তবাগীশ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে, বর্ধমানাধিপতি এঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় আকৃষ্ট হ'য়ে এঁকে নিজ সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। তারপর ইনি নিজ অসাধারণ মনীষা ও চরিত্রবলে, কালক্রমে ঐ রাজ-দরবারে প্রধান সভাপণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং সেখানে ঐ পদে আজীবন অধিষ্ঠিত থাকেন।

●

'পণ্ডিত শুনিয়া আনা বর্ধমানে বাসা।
যবে বেধা উঠে কোন দুর্বোধ্য সমস্যা।
যথার্থ সিদ্ধান্ত কিবা মীমাংসার আশে।
দিগ্ দিগন্তরবাসী কত লোক আসে।—পুঁথি ১২৩

কৃতবিদ্য নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পদ্মলোচনের অদ্ভুত বিচারদক্ষতা ও শাস্ত্রপারদর্শিতার সুখ্যাতি বঙ্গের সর্বত্র, এমনকি বঙ্গের বাহিরেও বহুস্থানে ব্যাপ্ত ছিল। শাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য তত্ত্বের সুমীমাংসার জন্য ইনি কেবল স্বদেশেই নয়, বিদেশেও বিভিন্ন স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচারসভায় সসম্মানে আহূত হতেন। ঐ উদ্দেশ্যে, এঁর নিকট নানা স্থান হতে জিজ্ঞাসু পণ্ডিতেরাও দলে দলে আসতেন। আবার দূরান্তরের অনেকের সঙ্গে ইনি পত্রে নিবন্ধ লিখেও বিচার-মীমাংসাদি করতেন। সেকালের খ্যাতনামা পণ্ডিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে এঁর বিচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। [কথামৃত ১৷৩৷১৷১১২ দ্রষ্টব্য]

[উদারতা ও সরলতা]

তর্কালঙ্কার মহাশয় অত্যন্ত উদার ও মহানুভব ছিলেন। ইনি কখন কোন একদেশী বা সংকীর্ণ বিষয়বস্তুর বিচার-বিতর্কে লিপ্ত হতেন না এবং ঐরূপ কোনও বিষয়ের আন্দোলনকে কখন উৎসাহ দিতেন না। পণ্ডিতেরা কখন ওরূপ কোনও বিষয়ের মীমাংসার জন্য এঁর শরণাপন্ন হলে, ইনি সরস ও সংক্ষিপ্ত কথাবার্তায় তার উদার সমাধান করে দিতেন। তার ফলে, উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হতেন।

এ সম্বন্ধে কৌতুকপ্রদ একটি ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। শিব বড়, না বিষ্ণু [ব্রহ্ম ?] বড়'—এ বিষয়ে* একবার বর্ধমানে পণ্ডিতদের সভায় তুমুল বাদ-বিতণ্ডা শুরু হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় সে-সময় বর্ধমানে ছিলেন না। যা হোক, ঐ সভায় পণ্ডিতেরা নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিরুচি অনুসারে, কেহ কেহ শিবকে, আবার কেহ কেহ বা বিষ্ণুকে বড় বলে নির্দেশ করেন এবং উভয় পক্ষই তুমুল বাদ-বিতর্কে লিপ্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঐ বিষয়টির সুমীমাংসায় পৌঁছতে পারেন না। তখন উভয় পক্ষই তার সমাধানের জন্য পণ্ডিত পদ্মলোচনের মুখাপেক্ষী হন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বর্ধমানে ফিরে এলে ঐ পণ্ডিতেরা আবার মিলিত হন এবং সেই বিষয়টির মীমাংসার জন্য এঁকে আহ্বান করেন। তাঁদের প্রস্তাব শুনে, ইনি সরলভাবে সহাস্যে বলেন,—'আমার চৌদ্দপুরুষে কেহ শিবকে কখন দেখে নি, বিষ্ণুকেও কখন দেখে নি। অতএব তাঁদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট—কেমন ক'রে বলব ?'

পণ্ডিত পদ্মলোচনের ঐ সহজ সরল কথায় সেই সভায় হাস্যরোল পড়ে যায়। ঐ প্রসঙ্গে ইনি তাঁদের আরও বলেন,—'তবে, তোমরা যদি শাস্ত্রের কথা শুনতে চাও তো এই বলতে হয় যে, শৈবশাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে, আর বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বড় ক'রেছে। যার যিনি ইষ্ট, তার কাছে তিনিই বড়। নিজ নিজ ইষ্টে নিষ্ঠা-ভক্তি থাকা খুবই ভাল, কিন্তু গোঁড়ামি কখনই ভাল নয়। অন্যের ইষ্টকে হেয় জ্ঞান করা নিতান্তই হীনবুদ্ধির কাজ।'

অবশেষে, ইনি শৈব ও বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি থেকে শিব ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্যসূচক নানা শ্লোক উদ্ধৃত করেন এবং উভয়কেই অনন্ত মহিমময় বলে বর্ণনা করেন। এঁর ওরূপ উদার ও যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হন এবং সবাই এক বাক্যে এঁকে ধন্য ধন্য করেন।

এ-বিষয়ে লীলাপ্রসঙ্গ-কার লিখেছেন,—'পণ্ডিতজীর ঐরূপ আড়ম্বরশূন্য সরল শাস্ত্রজ্ঞান ও স্পষ্টবাদিত্বেই তাঁহার এত প্রতিভার পরিচয় আমরা বিলক্ষণ পাইয়া থাকি এবং তাঁহার এত সুনাম ও প্রসিদ্ধি যে কেন হইয়াছিল, তাহার কারণ বুঝিতে পারি।' লী, প্র ৪র্থ, পৃঃ ৯১।

এ প্রসঙ্গে কথামৃতে লিপিবদ্ধ শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি,—"একটা সভায় বিচার হয়েছিল—শিব বড়, না ব্রহ্ম বড়। শেষে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা ক'রলে। পদ্মলোচন এমন সরল, সে ব'ললে—'আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, বিষ্ণুও দেখে নাই।"—ক-১ম।৬।১।১১২

"বিদ্বেষভাব ভাল নয়। শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক—এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়। পদ্মলোচন বর্ধমানের সভাপণ্ডিত ছিল। সভায় বিচার হচ্ছিল,—শিব বড়, না ব্রহ্ম বড়। পদ্মলোচন বেশ বলেছিল,—আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নেই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই।...ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে [ঈশ্বরকে] পাওয়া যায়। তবে নিষ্ঠা থাকা ভাল।"—ক-৪র্থ।৫।৩।৫৭

[সাধনা ও সিদ্ধাই-শক্তি]

পণ্ডিত পদ্মলোচন ছিলেন একজন অতি ভক্তিমান ও নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক সাধক। ইনি অদ্বৈতবাদী—বিচারশীল জ্ঞানী হয়েও গভীর প্রেম ও অনুরাগ-সহকারে, তন্ত্রোক্ত প্রণালীতে নিয়মিত সাধন-ভজন করতেন। জগন্মাতা কালী ছিলেন এঁর ইষ্টদেবী। তাঁর প্রসাদে ইনি বিশেষ শক্তি-বিভূতি এবং সিদ্ধি-ঋদ্ধি লাভ করেন।

---

* এই বিষয়টি 'লীলা-প্রসঙ্গ' (৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৯৯) অনুসরণে পরিবেশিত হল। 'কথামৃত' (১ম ও ৩য় ভাগ) গ্রন্থেও এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ-মতে ঐ পণ্ডিতসভায় বিচার্য বিষয় ছিল—'শিব বড়, না ব্রহ্ম বড় ?' যা হোক, উল্লিখিত উভয় লেখক গ্রন্থেই বর্ণিত ঐ প্রসঙ্গটির মর্মকথা, যারা-বিষয়ী ও পণ্ডিত পদ্মলোচনের উদার সমাধান প্রণালী অভিন্ন। সুতরাং এক্ষেত্রে এইটাই মূখ্য বিষয়, অন্যটি গৌণ।—লেখক

এ-বিষয়ে লীলাপ্রসঙ্গ-কার লিখেছেন,—'পণ্ডিত পদ্মলোচন বেদান্তোক্ত জ্ঞান-বিচারের সহিত তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীর বহুকাল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছিলেন এবং ঐরূপ অনুষ্ঠানের ফলও কিছু কিছু জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।"—লী, প্র, ৪র্থ, ১০২

ইনি ঐ 'সিদ্ধাই'-শক্তির প্রভাবে শাস্ত্রীয় তত্ত্বের বিচার-মীমাংসায় 'দিগ্বিজয়ী' হন। বিচার-সভায় বসার পূর্বে ইনি সুকৌশলে ঐ সিদ্ধাই-শক্তি প্রয়োগ ক'রতেন। ইনি ঐ দেবী-শক্তি যেমন একান্তই নিভৃতে লাভ করেছিলেন, তেমনি সেটি সর্বদাই নিজ অন্তরে বিশেষ সংগোপনে রক্ষা ক'রতেন। এমন কি, নিজের সহধর্মিনী বা পুত্রের নিকটেও ইনি ঐ রহস্যবিদ্যাটি কখন প্রকাশ করেন নি। বস্তুতঃ ইষ্টদেবীর আদেশেই তিনি ঐ বিষয়ের গোপনীয়তা একান্তভাবে রক্ষা ক'রে চলতেন এবং সকলের অজ্ঞাতেই তার সুফল উপভোগ করে চরিতার্থ হতেন।

'মীমাংসায় বসিবার পূর্বে বীরবর।
আছিল তাঁহার এক রীতি স্বতন্তর।
জলপূর্ণ ঝারি এক গামছা সহিত।
সর্বদা তাঁহার পাশে থাকিত স্থাপিত।
তাই লয়ে হাতে ইতস্ততঃ বিচরণ।
পশ্চাতে তাহার হয় মুখ প্রক্ষালন।
বদন মোক্ষণ পরে গামছা ধারায়।
তবে তিনি বসিতেন প্রশ্ন মীমাংসায়।
এ হেন প্রক্রিয়া করি বসিলে বিচারে।
কেহ নাহি দুনিয়ায় হারায় তাঁহারে।
ইষ্ট-নিষ্ঠাবান-হেতু পণ্ডিত প্রবর।
ইষ্টদেবী সুপ্রসন্না হেন এই বর।'—লুঁথি, ১২৩-১২৪

পদ্মলোচন বিচার-সভায় যাবার সময় সঙ্গে জলপূর্ণ একটি গাড়ু ও একখানি কাচা গামছা রাখতেন। ঐ গাড়ুর জলে মন্ত্রপড়া থাকত, আর গামছাখানি পাট করা অবস্থায় গাড়ুর উপরে শোভা পেত। যা হোক, ইনি সেখানে উপস্থিত হয়ে, হাতে ঐ গাড়ু ও গামছা নিয়ে কয়েক পা হাঁটতেন এবং যেখান থেকে ওরূপ হাঁটা শুরু করতেন, সেইখানে ফিরে এসে গাড়ুর জলে মুখ ধুতেন ও গামছা দিয়ে মুখ মুছতেন। তারপর ইনি ঐ সভায় বসতেন এবং সভা চলাকালেও মাঝে মাঝে ঐ জলে আচমন করতেন ও গামছা দিয়ে মুছতেন। ঐ গাড়ু ও গামছাটি ইনি সযত্নে নিজের পাশে রাখতেন এবং মাঝে মাঝে ওরূপ ক'রতেন।

এঁর ওরূপ আচরণকে সকলে এঁর একটা বিশেষ অভ্যাস বা আচার বলে মনে ক'রত। সুতরাং এঁর ঐ বিষয়ে কখনও কারও মনে কোনরূপ জিজ্ঞাসা বা কৌতূহলের উদ্রেক হ'ত না এবং তার মূলে যে কোনও গূঢ় রহস্য নিহিত র'য়েছে তা কখন কেউ কল্পনাও করতে পারত না।

যা হোক, পদ্মলোচন ওরূপ ক্রিয়া-কলাপের প্রভাবে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতেন। তার ফলে, এঁর মেধা, প্রজ্ঞা, উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির আশ্চর্য জাগরণ হ'ত এবং বিপক্ষরা হীনবল, বুদ্ধিভ্রংশ ও অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ত। এইভাবে ইনি ঐ সিদ্ধাই-শক্তি-বলে, বিচার সভায় সর্বত্রই বিজয়ীর সম্মান ও গৌরব লাভ করতেন। (ক্রমশঃ)

॥ প্রাচীন ভারতীয় ভাষা : পৈশাচী ॥

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ইত্যাদির মতো পৈশাচী এক সাহিত্যিক প্রাকৃত। পিশাচগণের ভাষা পৈশাচী। চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দের আলঙ্কারিক কবিরাজ বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্য-দর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলিলেন 'পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্।' এখন প্রশ্ন আসে পিশাচ কাহারা? অনেকে মনে করেন পিশাচগণ হইলেন উত্তরপশ্চিম ভারতবর্ষের গিরি-বনচারী অধিবাসী। সম্ভবতঃ ইহারা আর্যোত্তর জাতি। আর্য্যবৃন্দের দ্বারা বর্জিত অনার্য বা সেই শ্রেণীর লোকেরা পিশাচজাতির অন্তর্ভুক্ত এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। পিশাচগণের ভাষা ভূতভাষা, ভূতভাষিত, ভূতবচন ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত হয়। ভূত কথাটি পিশাচ কথার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়া পিশাচ-প্রকৃতির দ্যোতনার সহায়কতা করিয়াছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর ভাষাকোবিদ কবি বররুচি তাঁহার প্রাকৃতপ্রকাশে দশম পরিচ্ছেদ ব্যয়িত করিয়াছেন পৈশাচীপ্রাকৃতের লক্ষণ নির্দেশে। ষষ্ঠশতাব্দীর আলঙ্কারিক আচার্য দণ্ডী তাঁহার বিখ্যাত কাব্যাদর্শে লিখিলেন, 'ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাম্।' পণ্ডিতসম্প্রদায় অদ্ভুত অর্থবিশিষ্ট ভূতভাষা অর্থাৎ পৈশাচীভাষায় নিবদ্ধ গুণাঢ্য-রচিত বৃহৎকথার অতুলনীয়তার কথা বলেন। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ এই অংশের টীকায় পৈশাচীকে অপভ্রংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন—'ভূতভাষা পৈশাচীভাষা, অদ্ভুতার্থাম্ অদ্ভুতরসবাহিকাম্। পৈশাচ্যাশ্চাপভ্রংশ রূপত্বাদপভ্রংশকাব্যং বৃহৎকথেতি জ্ঞেয়ম্।' জীবানন্দ বিদ্যাসাগরও এই একই অভিমত দিলেন তাঁহার টীকায়—'ভূতভাষা পৈশাচীভাষা তন্ময়ীং তদ্রচিতাম্, অদ্ভুতার্থাং বিস্ময়রসপূর্ণাং প্রায়ঃ বিদ্যাংস ইতি শেষঃ, পৈশাচ্যা ভাষয়া নিবদ্ধত্ব বৃহৎকথাখ্যমপভ্রংশকাব্য-বিত্যবধেয়ম্।' খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বহুগ্রন্থরচয়িতা মনীষী কবি আচার্য হেমচন্দ্র এই পৈশাচী প্রাকৃতে কুমারপালচরিত নামে এক অভিনব কাব্য রচনা করেন। অতএব পৈশাচী এক সাহিত্যিক ভাষা।

পৈশাচীভাষাবাহিত যে বৃহৎকথা মহাকবি বাণভট্টের প্রশংসাধন্য (সমুদ্দীপিতকন্দর্পা কৃতগৌরী প্রসাধনা। হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা॥) সেই বৃহৎকথার সময় কি? অর্থাৎ পৈশাচী কখন সাহিত্যের বাহন হইয়া উঠে?

Bubler বৃহৎকথার রচয়িতা গুণাঢ্যকে প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে, Smith প্রথম শতাব্দীতে, Levy দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীতে, Weber ষষ্ঠ শতাব্দীতে, Speyer এবং Twaney চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে গুণাঢ্যকে স্থাপন করেন। Keith বলেন 'We Can fairly claim that Gunadhya is not later than A. D. 500 but to place him in first century A. D. is quite conjectural nor in reality is any other later date more assured,' বররুচির আবির্ভাবসময় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী ধরিয়া গুণাঢ্যকে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পঞ্চম শতাব্দীতে আমরা স্থাপিত করিতে পারি।

বৃহৎকথা পৈশাচীভাষায় লিখিত গ্রন্থ। কিন্তু গুণাঢ্য পৈশাচীভাষাকে তাঁহার গ্রন্থটির বাহন করিলেন কেন? কবি ক্ষেমেন্দ্রের মতে গুণাঢ্যের জন্মস্থান সরিৎসা পবিত্র। গোদাবরীর তীরবর্তী প্রতিষ্ঠানপুর। প্রতিষ্ঠানপতি -অন্ধ্রবংশীয় রাজা সাতবাহনের একান্ত প্রীতিভাজন কবি গুণাঢ্য। একদা রাজা যখন আপন মহিষীগণের সঙ্গে জলকেলিতে রত তখন জলসিঞ্চনরত

রাজাকে জল-সিঞ্চনে নিষেধ করিয়া বলিয়া উঠেন, মোদকৈঃ (মা+উদকৈঃ) অর্থাৎ জল 'সকল ক'রোনা। রাজা সংস্কৃতভাষা জানিতেন না। তিনি ভাবিলেন তাঁহার প্রিয়া মোদক বা মিষ্টান্নের কথা বলিতেছেন। তাই মোদকের ব্যবস্থা করিলেন রাজা। তখন মহিষীগণ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ রাজাকে উপহাস করিলেন। এইরূপে অপমানিত রাজা সংস্কৃতশিক্ষায় আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। গুণাঢ্য ছয় বৎসরে রাজাকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিতে পারিবেন বলিয়াছিলেন। অথচ বৈয়াকরণ শরবর্মা ছয়মাসে রাজাকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন করিলে পূর্বপ্রতিজ্ঞামতো গুণাঢ্য নীরবে বিন্ধ্যাচলে গমন করেন। সঙ্গে ছিল মাত্র দুই শিষ্য গুণদেব ও নন্দিদেব। বিন্ধ্যগিরিতে গুণাঢ্য ভূতভাষিত নামক পিশাচের নিকট কাহিনী শুনিয়া অপভ্রংশ ভাষায় বৃহৎকথা রচনা করেন। পরবর্তীকালে বুধস্বামী, ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব প্রভৃতি এই গ্রন্থাবলম্বনে গ্রন্থরচনা করেন।

প্রাকৃতপ্রকাশের বিখ্যাত টীকারচয়িতা ভামহ তাঁহার মনোরমা টীকায় লিখিলেন 'পিশাচানাং ভাষা পৈশাচী।' বররুচি শৌরসেনী প্রাকৃতকে পৈশাচীর উৎস নির্ধারণ করিলেন 'প্রকৃতিঃ শৌরসেনী।'

এই পৈশাচী সম্পর্কে বররুচি যে সূত্রগুলি দিলেন তাহা এইরূপ—

(১) বর্গাণাং তৃতীয় চতুর্থয়োরনুযোরনাভোরাদ্যৌ

পৈশাচীতে পদমধ্যবর্তী অযুক্ত বর্গীয় তৃতীয় ও চতুর্থবর্ণ স্থানে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ হয়। গ, জ, ড, দ, ব, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ স্থানে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ ও ফ হয়। গগনং>গকনং ; মেঘঃ>মেখঃ ; রাজা>রাচা

(২) ইবস্য পিবঃ। ইবশব্দস্থানে পিব আদেশ হয়। কমলঃ ইব মুখং>কমলঃ পিব মুখম্।

(৩) ণো নঃ। 'ণ'-কারের স্থানে 'ন' হয়। যথা তরুণী>তরুনী।

(৪) ষ্টস্য সটঃ। 'ষ্ট' স্থানে 'সট' আদেশ হয়। যথা কষ্টং মম বর্ততে>কসটং মম বট্টই।

(৫) স্নস্য সনঃ। 'স্ন' স্থানে 'সন' আদেশ হয়। যথা স্নানং>সনানং ; স্নেহঃ>সনেহো।

(৬) র্যস্য রিঞ্ঞঃ। 'র্য' স্থানে 'রিঞ্ঞ' এইপ্রকার আদেশ হয়। ভার্যা>ভারিঞ্ঞা।

(৭) জ্ঞস্য ঞ্ঞঃ। 'জ্ঞ' স্থানে 'ঞ্ঞ' হয়। যথা বিজ্ঞাতঃ>বিঞ্ঞাতো

(৮) ক্তস্যাংনন্ত। এই সূত্র পূর্বসূত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। 'ক্ত' স্থানে 'ন্ত' হয়। কৃত>কন্ত।

(৯) জ্ঞ চ্চ। শৌরসেনী-নিয়মে সাধিত 'জ্ঞ' স্থানে 'চ্চ' হয়। কার্যম্>কজ্জং>কচ্চং।

(১০) রাজ্ঞো রাচি টাভিসিঙস্তিষু বা। রাজন্ শব্দের তৃতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমীতে রাচিনা>রঞ্ঞা ; রাচিনো>রঞ্ঞো ; রাচিনি>রঞ্ঞি।

(১১) কত্বাতুনং। 'কত্বা' স্থানে 'তুনং' আদেশ হয়। কৃত্বা>কাতুনং, দত্বা>দাতুনং।

(১২) হৃদয়স্য হিতমকং>'হৃদয়' শব্দে 'হিতমক' নিপাতনে সিদ্ধ হয়। হৃদয়ং হরসি মে তরুনি>হিতমকং হরসি মে তরুনি।

পৈশাচীতে কোমল উচ্চারণের প্রতি আগ্রহ দৃষ্ট হয়। দৃষ্ট হয় স্বরভক্তির প্রতি আগ্রহ। আধুনিক ভারতীয় ভাষা পৈশাচীর মতো আপভ্রংশ প্রাকৃত অপভ্রংশ ইত্যাদির মধ্য দিয়া নব-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'পৈশাচী' শব্দটি বড়ই কৌতূকোদ্দীপক। প্রাচীনভারতীয় ভাষা মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; আভীরী, শাবরী, চাণ্ডালী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির নামের সঙ্গে সংযুক্ত। পৈশাচী সেযোক্ত শ্রেণীর—পিশাচ শ্রেণীর জনসাধারণের ভাষা; কালে সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়।

●

॥ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কালবিচার ॥

শ্রীজয়জিৎ রায়

(তিন)

বরাহমিহিরের কালে রেবতী নক্ষত্রে হ'ত বাসন্ত বিষুব ক্রান্তিপাত এবং দক্ষিণায়ন সুরু হ'ত পুনর্বসু নক্ষত্র থেকে। কিন্তু বরাহমিহিরই আবার উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর কালের প্রাচীন গ্রন্থ-অনুসারে দক্ষিণায়ন অশ্লেষা নক্ষত্রের মধ্যভাগে ধরা হ'ত। অন্যান্য অনেক গ্রন্থেও এ কথার সমর্থন পাওয়াতে মনে হয়, একদা মাঘ মাসে বৎসর সুরু হত। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে দেখা যায়, শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম দেহত্যাগের জন্য উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। মাঘ মাসের প্রথমার্ধেই তখন সুরু হয়েছিল উত্তরায়ণ। আর সেকালে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে, মাঘ মাসে হ'ত উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, সেকালে অবশ্যই বাসন্ত বিষুব ক্রান্তিপাত হত ভরণীনক্ষত্রের শেষ পাদে কিংবা কৃত্তিকা নক্ষত্রের আদিতে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুসরণে বলা যায়, সেকালে বাসন্ত বিষুব ক্রান্তিপাত হ'ত ভরণী নক্ষত্রের ১০° ডিগ্রীতে। তাহলে জ্যোতির্গণনায় বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল দাঁড়ায় ১২৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১১৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে বসন্তকে ঋতুদের মুখস্বরূপ এবং কৃত্তিকাকে নক্ষত্রদের মুখস্বরূপ বলা হয়েছে। ভরণীর পরবর্তী নক্ষত্রই কৃত্তিকা। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ভরণীতে বাসন্ত বিষুব হ'ত বলা হয়েছে। সুতরাং তারও পূর্বে কৃত্তিকাতে বাসন্ত বিষুব ছিল। তাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কৃত্তিকাকে নক্ষত্রের প্রথম বলে ধরা হয়েছে। বেদের যুগে কৃত্তিকা নক্ষত্র বলতে বিশেষ নক্ষত্রকেই বুঝাত, আকাশের কাল্পনিক বিভাগ বুঝাত না। এটা মেনে নিলে কৃত্তিকা নক্ষত্রে যখন বাসন্ত বিষুব ক্রান্তিপাত হ'ত, সেই তৈত্তিরীয় সংহিতার কাল হবে ২৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমি ঋতুর মধ্যে বসন্ত, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ।' মৃগশিরা নক্ষত্র থেকে মার্গশীর্ষ শব্দ, যার অর্থ অগ্রহায়ণ। সুদূর অতীতে মৃগশিরা নক্ষত্রে সম্ভবত বাসন্ত বিষুব হ'ত এবং অগ্রহায়ণ মাসেই সুরু হত বসন্তকাল। গীতার উক্তি সেই সুদূর স্মৃতি বহন করছে। আরো পূর্বে পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুব ক্রান্তিপাত হওয়ার কালে বৎসর আরম্ভ হ'ত। পুনর্বসুর অধিদেবতা অদিতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুযায়ী অদিতি থেকেই সকল যজ্ঞ সুরু ও শেষ হ'ত। যজ্ঞ ও

সংবৎসর সমার্থক শব্দ। অদিতি থেকেই তখন দেবযান সূচিত হ'ত। তাই ঋগ্বেদে (১০।৭২।৫) অদিতি হচ্ছেন দেবতাদের মাতা। অদিতি থেকেই আদিত্যরা জন্মাল (ঋগ্বেদ ১০।৭২।৮)। অর্থাৎ সূর্যের দ্বাদশ রাশিতে ভ্রমণ সুরু হল। জ্যোতির্গণনার দ্বারা তিলক প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কালকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করেছেন।

১. অদিতি যুগ—খ্রীঃ পূঃ ৬০০০—খ্রীঃ পূঃ ৪০০০। পুনর্বসু নক্ষত্রে তখন বাসন্ত বিষুবপাত হত। বেদের ঋষিরা তখনই প্রথম বিধিবদ্ধভাবে যজ্ঞকর্ম সুরু করেন।

২. মৃগশিরা যুগ—খ্রীঃ পূঃ ৪০০০—খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ। আর্দ্রা বা মৃগশিরাতেই তখন ছিল বাসন্ত বিষুব। এটা বৈদিক সূক্ত রচনার কাল। এ সময়েই ইরানের আর্য ও ভারতীয় আর্যগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন।

৩. কৃত্তিকা যুগ—খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ। এটা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। বিভিন্ন সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগ হচ্ছে এটা। বেদের সূক্তগুলি তখন প্রাচীন ও দুর্বোধ্য।

৪. প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ বা বুদ্ধ-পূর্ব যুগ—খ্রীঃ পূঃ ১৪০০—খ্রীঃ পূর্ব ৫০০ অব্দ। এটাকেই ষড়দর্শনের যুগ বলা চলে।

ভাষাতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে

ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদের ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের অন্যান্য ভাষার প্রাচীনতার তুলনা ক'রে এবং অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক বিচার থেকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কাল-নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। ম্যাক্সমুলারও একদিন ভাষাতত্ত্বের বিচারের ওপর নির্ভর করেই বৈদিক সভ্যতার ঊর্ধ্বতম সময়-সীমা নির্ধারণ করেছিলেন ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। তাঁর মত গ্রাহ্য হয় নি। বর্তমানে ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষাতত্ত্বের বিচারের সঙ্গে নৃতত্ত্ব-প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে উদ্ঘাটিত তথ্য ও সত্যের সাহায্যও গ্রহণ করেছেন। ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান আলোচনা করে গেছেন। এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিমতটি প্রতিধান করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

সভ্যতার আলোকস্পর্শ লাভ করার আগে নরাকৃতি বানরকে অতিবাহিত করতে হয়েছে কত অসংখ্য শতাব্দী আর সহস্রাব্দী। তারপর কৃষিকর্ম, পশুপালন প্রভৃতির সাহায্যে অন্নের সংস্থান করতে শিখে সমাজবদ্ধ হয়ে গ্রাম অথবা নগরে মানুষ বসবাস করতে আরম্ভ করেছে অনধিক ৫০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে। ধীরে ধীরে মিশরের নীলনদ, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী এবং ভারতের সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতার। তখন আর্যদের পূর্বপুরুষ ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেরা এবং তাদেরও পূর্বপুরুষ ইন্দো-হিত্তীরা অর্ধ-বানাবর অবস্থায় কৃষ্ণসেনের উত্তাল পর্বতের দক্ষিণে ইউরেশিয়ার সমতল ভূমিতে বসবাস করত। আনুমানিক ৩৫০০।৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তারা মেসোপটেমিয়ার মানুষদের কাছ থেকে গো-পালন, মেষ-পালন, তাম্রের অস্ত্র-নির্মাণ প্রভৃতি শিখলেও নিজেদের সভ্যতার জন্ম দিতে পারে নি। ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে তারা ককেসাস পর্বত পেরিয়ে উত্তর ইরাকে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে 'আর্য' নাম গ্রহণ করল। ইরানের মধ্য দিয়ে প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তারা ভারতের পঞ্চনদ প্রদেশে এসে প্রবেশ

করে আর্যদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয়রা। ভারতে উপনিবিষ্ট আর্যদের মধ্যে প্রচলিত বৈদিক ভাষা হচ্ছে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারই একটি শাখা। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাই পরে হিত্তী, বৈদিক, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসিক, প্রাচীন গ্রীক, লাতিন, গথিক, প্রাচীন তুখারীয়, প্রাচীন কেল্ট, বাল্ট, স্লাভ প্রভৃতি ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

বৈদিক সভ্যতার জনয়িতা আর্যেরা ভারতে বহিরাগত এবং তাদের ভারতে আগমন খ্রীষ্ট জন্মের ১৫০০ বছরের পূর্বে নয় বলে বৈদিক সভ্যতার বয়সও খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের অনূর্ধ্বে।

মহাভারতের কাহিনী ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর আশ্রিত। আধুনিক কালের অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এটা সমর্থিত। মহাভারতের আদি রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। তিনি প্রাচীন আর্যদের মধ্যে প্রচলিত বীর গাথা, ইতিহাস, দেবতা রাজা-ঋষিদের কাহিনী প্রভৃতি সংকলিত করেন 'পুরাণ' নাম দিয়ে। তাছাড়া ঋষিদের মধ্যে প্রচলিত ও ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত স্তব-স্তোত্র-গান প্রভৃতিও তিনি সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহকে 'বেদ' নামে আখ্যাত করে তিনি চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। ফলে তিনি পরিচিত হলেন বেদব্যাস নামে। তিনি একদিকে মহাভারতের রচয়িতা, অন্যদিকে বেদের সংকলয়িতা। মহাভারতের যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন বেদব্যাস। সুতরাং মহাভারতের কালনির্ণয় করতে পারলে বেদ-সংকলনেরও কাল নিরূপণ করা হবে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মহাভারতের ঘটনার কাল ৩১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কিন্তু ইন্দো-ইউরোপীয় ইতিহাস আলোচনা করলে তাদেরই উত্তরপুরুষ আর্যদের পক্ষে এত প্রাচীন তারিখ গ্রাহ্য হতে পারে না। তাই মহাভারতের ঘটনাকাল নিরূপণে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ব্রাহ্মণগ্রন্থের রাজবংশলতিকা বা ঋষি পরম্পরাকে ঐতিহাসিক বলে মেনে নিয়ে তার ভিত্তিতে খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল বলে মনে করেছেন। অন্যদিকে ভারততত্ত্ববিদ পার্জিটার সাহেব পুরাণ-বর্ণিত রাজবংশানুক্রম অনুসরণ করে মহাভারতের ঘটনাকাল ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলে স্থির করেছেন। দু'টি ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করেও শেষ পর্যন্ত দু'জনই যখন প্রায় একই সময়ে পৌঁছেছেন, তখন মনে করা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম শতকেই মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এই সময়েই বেদ সংকলন করেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। বেদের সূক্তগুলি এর আগে কয়েক শ' বছর ধরে রচিত হয়ে আসছিল বলে অনুমান করা যায়।

এল, ডি, বার্নেটের অনুসরণে অধ্যাপক সুনীতিকুমার বলেছেন, তীর্থঙ্কর মহাবীর জৈন ইতিকথা অনুযায়ী ২৪তম তীর্থঙ্কর। ২৩তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের ২০০ বছর পরবর্তী হচ্ছেন মহাবীর। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলে মহাবীরের কাল হচ্ছে খ্রীষ্ট পূর্ব ৫ম শতক। সুতরাং পার্শ্বনাথের কাল হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০। পার্শ্বনাথের প্রায় ২০০/২৫০ বৎসর পূর্ববর্তী হচ্ছেন ২২তম তীর্থঙ্কর নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি। জৈন শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণ মতে, অরিষ্টনেমি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জেঠতুতো ভাই। ভাগবতপুরাণেও অরিষ্টনেমির উল্লেখ আছে। পার্শ্বনাথের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ হলে অরিষ্টনেমি ৯০০/৯৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন। অতএব একথা বলা যেতে পারে যে, অরিষ্টনেমির কালই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের কাল, বেদব্যাসের কাল ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, বাক্‌তত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব ঋগ্বেদের এই কালনির্ণয়কে সমর্থন করে। বৈদিক ভাষার সহোদরা হচ্ছে প্রাচীন ইরানের আবেস্তার ভাষা ও প্রাচীন পারসিক ভাষা।

ঋষি জরথুশ্‌ত্র বা জরদুষ্ট্রের রচিত গাথা হচ্ছে আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ। এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে রচিত। উৎকীর্ণ লিপিমালায় ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে প্রাচীন পারসিকের নিদর্শন পাওয়া যায়। বেদের ভাষার সঙ্গে আবেস্তার ভাষা ও প্রাচীন পারসিকের ব্যবধান ৩০০/৪০০ বছরের হতে পারে। আবেস্তায় জরথুশ্‌ত্রের রচিত প্রাচীন গাথা অংশের কাল ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হলে বেদের শেষপর্ব বা বেদ-সংকলনের কাল হবে ১০০/১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। এর আগে কয়েক পুরুষ ধরে বৈদিক সূক্তগুলি রচিত হচ্ছিল বলে বেদের রচনাকালের উর্ধ্বসীমা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলে মনে করাই-যুক্তিযুক্ত।

ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে বৈদিক ভাষাই হচ্ছে প্রাচীনতম বলে ভাষাতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু মেসোপটেমিয়াতে মিতান্নি ভাষা ও এশিয়া মাইনরে হিত্তী ভাষা আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই দুটি ভাষাই প্রাবৈদিক যুগের বলে স্থির হয়। মিতান্নি ভাষার আর্য নামগুলি প্রাবৈদিক। মিতান্নি ভাষার কাল ১৬০০/১৭০০খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। বৈদিক ভাষা তার পরবর্তিকালের।

ইরাকের অসুর ও বাবিল-জাতীয় অনুশাসন প্রভৃতিতে আনুমানিক ২০০০ থেকে ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব কালপর্বের আর্যভাষার শব্দ ও নাম পাওয়া যায়। এ সকল শব্দ বৈদিক, আবেস্তীয় ও প্রাচীন পারসিক ভাষার পূর্ববর্তি স্তর নির্দেশ করে। এ সকল অনুশাসনে প্রাপ্ত কয়েকটি শব্দ এবং তার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হচ্ছে এ রকম :

তপসস্ — তপঃ
হরিয়স্ — সূর্যঃ
মরুত্তস্ — মারুত
দক্স্ — দক্ষঃ
ইন্দর — ইন্দ্র
অর্তহুমর — ঋতম্বর

আসিরীয় ও বাবিলনীয় প্রত্নলেখের এসব শব্দ থেকে মনে হয়, বৈদিক ভাষা পরবর্তি-কালের। প্রাচীন লিপিমালা থেকে অনুমিত হয়, ইন্দো-ইউরোপীয়দের একটি দল তাদের আদি বাসভূমি থেকে আনুমানিক ২২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ককেসাস পর্বতের দক্ষিণে, মেসোপটে-মিয়ায়, উত্তর-পশ্চিম ইরানে এসে প্রবেশ করেছিল। এদের কয়েকটি জাতি বা উপদল ইউরোপে উপনিবিষ্ট হয়। দুটি দল আসে এশিয়া মাইনরের দিকে, যাদের একটি হচ্ছে হিত্তী। এরা ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যদের পূর্বপুরুষ। প্রাচীন সভ্যজগতের কাছে আর্যদের বিশিষ্ট অবদান হচ্ছে ঘোড়া।

●

॥ বিংশ শতাব্দীর ধর্ম—স্বামী অভেদানন্দ ॥

অনুবাদক—শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

(দুই)

সজীব প্রাণীতে রূপান্তরিত করার পূর্বে প্রথম মানবের নাসারন্ধ্রে ঈশ্বর তাঁর শ্বাসক্রিয়া দ্বারা প্রাণসঞ্চার করেছিলেন,—নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের জীবনরক্ষার জন্য মোটেই কোন শ্বাসকার্য নেই,—প্রাণীবিজ্ঞান এই প্রাচীন মতবাদও নস্যাৎ করে দিয়াছে ; পক্ষান্তরে তা' প্রমাণ করেছে যে, ক্ষুদ্রতম প্রোটোপ্লাজম্ কিংবা বায়োপ্লাজম্ কিংবা অ্যামিবারও প্রাণ আছে ; কেবল তা'-ই নয়, সমগ্র বিশ্বজগৎ শাশ্বত প্রাণ-উপাদান বা জীবনরক্ষক শক্তিতে পরিপূর্ণ,—যেন প্রাণহীন মৃত পদার্থ বলে কিছু নেই এবং মানুষের জীবন কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপের ফল নয়, কিন্তু এটি বৃক্ষলতা ও নিম্নশ্রেণীর জীবের প্রাণের মতই স্বাভাবিক।

তুলনামূলক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখি যে, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরও আমাদের মতো ইন্দ্রিয়বোধ, অনুভূতি, বিচারবুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি ও অন্যান্য মানসিক কর্মক্ষমতাসমূহ আছে। প্রকৃতির সংগঠনে আমাদের মতো তাদেরও প্রয়োজন আছে। আমরা আরও জানি যে, এই স্থূল-ভৌতিক দেহ যতখানি—মনও ঠিক ততখানি বিবর্তন ও বিবর্ধনসাপেক্ষ। মনের সংগঠন-সম্পর্কে বর্তমান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানীবৃত্তি প্রমাণ করেছে যে মানসিক বৃত্তিগুলি আকাশ মণ্ডলের সূক্ষ্মতম কণিকাপুঞ্জের কম্পনজাত এবং মানসশক্তির সঙ্গে দৈহিক-শক্তি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভৌতবিজ্ঞান আরও প্রমাণ করেছে যে, প্রাণবস্তুটি অখণ্ড ও সার্বজনীন। বিবর্তনবাদ, শক্তিনিরবিচ্ছিন্নতা এবং শক্তিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা ঐ বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করেছে যে, প্রকৃতির নানাপ্রকার শক্তি একটিমাত্র শাশ্বত শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ বা অভিব্যক্তিমাত্র। মনোবিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে ঐরূপ মনোজগতের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে।

চিন্তার স্থানান্তরীকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ছাড়া অপরাপরের সঙ্গে চিন্তার যোগসূত্র প্রমাণ করেছে যে, ব্যষ্টি বা ব্যক্তিমন পরস্পরসংযুক্ত, তারা যেন শাশ্বত এক সর্বত্রবিস্তৃত মহাজাগতিক মনেরই অসংখ্য ঘূর্ণিস্রোত। আমাদের দ্বারা চিন্তিত অন্যান্য চিন্তাও অন্যান্য ব্যক্তির মনকে স্পর্শ করে ও প্রভাবিত করে। তা'রা আমাদের কাছেই থাকুক, বা দূরেই থাকুক, পার্থিব জগতের দূরত্ব কিন্তু আমাদের মানসিক অবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

বিশ্বে বেতার-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেশের সীমাকে অতিক্রম করতে পেরেছি এবং আমাদের কাছে ঐ বিজ্ঞান এই রহস্যও প্রকাশ করেছে যে, বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎপ্রবাহ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বিদ্যুৎতরঙ্গ অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তিশালী। চিন্তার স্থানান্তরীকরণ ও আভ্যন্তরিক যোগাযোগ বা সংযোগ মানুষকেও ঠিক তেমনি দেশের গণ্ডীর বা দেশসীমার ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছে। তা'রা ঐ তত্ত্বও প্রমাণ করেছে যে বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে চিন্তাতরঙ্গ ব্যষ্টি বা ব্যক্তিমনে সৃষ্ট চিন্তাতরঙ্গ অপেক্ষা সহস্রগুণে শক্তিশালী। এখন জানি যে, আমরা যদি আমাদের মানসিক অবস্থার মধ্যে সমতা বা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি, বা সর্ববিস্তারী মনের কম্পনের সঙ্গে আমাদের নিজ নিজ মনের চিন্তাতরঙ্গকে একসূত্রে বন্ধন করতে পারি, তাহলে আমরাও আমাদেরকে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন অনন্ত-সম্ভাবনার ভাণ্ডারে পরিণত করতে পারব।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞান অনুশীলন করে মানুষের জীবন ও মন সম্পর্কে আমাদের ধারণা এতদূর সম্প্রসারিত হয়েছে যে, আমরা এখন দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, যেখানেই জীবনের বিকাশ ও অভিব্যক্তি দেখা যায়, সেখানেই—যা'কে আমরা মন বলি—তার কিছু কিছু ধর্ম প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির জটিল নিয়মগুলি এবং অতিসূক্ষ্ম শক্তিগুলির সম্পর্কে বিভিন্ন আবিষ্কার এবং বর্তমান শতাব্দীতে উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি এই তথ্যকেই যথার্থভাবে প্রমাণ করেছে যে, মানুষের বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি বিধাতাপুরুষের সমষ্টি-বুদ্ধি ও সর্বশক্তিশালী ইচ্ছাশক্তিরই অভিব্যক্তি।

আবার, মন ও বস্তু দুইটি পৃথক সত্তা, পূর্বেকার এই দ্বৈতবাদকে বর্তমান শতাব্দীর অদ্বৈতবাদ এক মারাত্মক আঘাত হেনেছে। আজ আমরা জানি যে, বস্তু ও মন একই পদার্থের বা সত্তার বিষয়মুখী ও অন্তর্মুখী অভিব্যক্তি। আধুনিক বিজ্ঞানে এ-কেই অজ্ঞাত ও ও অজ্ঞেয় শক্তি বলেছে। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন: "বস্তু, গতি ও শক্তি আসল সত্তা নয় তা'রা যথার্থ সত্তার প্রতীক মাত্র।" তিনি তাঁর মনোবিজ্ঞানে আরও বলেছেন: "একই সত্তা নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিক দু'রকমভাবে আবির্ভূত। ঐ শক্তি নিজেকে বাস্তবজগতে 'বস্তু' ও আত্মিকজগতে 'মন'-রূপে প্রকাশ করে। বাস্তব-জগতে এটির নাম মাধ্যাকর্ষণ, তড়িৎ, তাপ ও গতি প্রভৃতি, আর আত্মিক-জগতে এ'টি বোধ, আবেগ, ইচ্ছা প্রভৃতি নামে অভিব্যক্ত। উভয়ের সত্তা একটি, কিন্তু প্রকাশ তার ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত হ'ল বহুত্বের মধ্যে একত্ব। এই অদ্বৈত-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এখন প্রত্যক্ষভাবে বলতে পারি যে, মহাবিশ্বের বাস্তব ও কর্মমুখ কারণগুলি এমনই একটি বিশেষ সত্তায় বিধৃত রয়েছে—যাকে যাবতীয় মানসিক ও দৈহিক শক্তিগুলির সাধারণ উৎস বা কারণ বলা যায়।

যে স্রষ্টা বিশ্বপ্রকৃতির বহির্ভাগে অবস্থান করেন এবং যিনি তাঁর স্বর্গলোকের বাসস্থান হ'তে আদেশ করেন এবং যিনি কোন-কিছুর সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের পথযাত্রীরা তেমন স্রষ্টায় আর বিশ্বাসী নয়। অপর কোন বস্তুর সাহায্য ছাড়াই কোন কিছুর সৃষ্টি সম্ভব—প্রাচীন এই অসম্ভব ধারণাকে আধুনিক বিজ্ঞান পরিত্যাগ করেছে। এই তত্ত্ব ও তথ্য আরও এমন একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপন করেছে যা'র দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বস্তু বা পদার্থের মতো প্রাণবীজকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, আর এ' সকল প্রাণবীজও কার্য-কারণ নিয়মসূত্রের অধীন। এটিও একটি অপরিমিত অব্যক্ত অপরিসীম সম্ভাবনাময়ী শক্তি। এ-সকল প্রাণবীজ, বা যা'কে আমরা ব্যষ্টি-আত্মা বা জীবাত্মা বলি, তা কোন জনক-জননী সৃষ্টি করেন না, অথচ তাঁদেরই বলি আমরা প্রধান-নিমিত্ত। চক্রের মাধ্যমে প্রাণবীজগুলি সূক্ষ্ম-ভৌতিক শরীর গঠন করে ও যে-সকল শক্তি সেই সকলের মধ্যে প্রথম থেকেই সুপ্তাবস্থায় থাকে, তাকেই সেগুলি বিকশিত করে। কোন মহিমময় অলৌকিক পুরুষের দ্বারা শিশুর জন্মলগ্নে প্রাণবীজ বা ব্যষ্টি-আত্মাগুলির সদ্যঃ সৃষ্টি হয়েছে,—এই প্রাচীন বিশ্বাসের ভিত্তি উক্ত বৈজ্ঞানিক সত্য দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। অধিকন্তু প্রাণবীজ ও প্রাণশক্তির অবিনাশীত্বের প্রমাণ দ্বারা জন্মমৃত্যুর রহস্যকে আজ জীবনের পূর্বসত্তা ও মরণোত্তর সত্তার নিরবিচ্ছিন্নতার সত্যসকাশে এনে দিয়েছে।

আজ আমরা জানি যে আমরা কখনও মরতে পারিনা, অথবা কখনও ধ্বংস কিংবা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'তে পারি না; পরন্তু প্রাণবীজ যতদিন নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলবে, ততদিন আমাদের বারংবার আবির্ভাব ঘটবে। এই ঘটনাই আমাদেরকে পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ তত্ত্বের দিকে ঠেলে দেয়।

শিল্পিত সিরামিক্‌স্

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীদিবাকর সেনরায়

মানবসভ্যতার আদিপর্বে সাধারণ মাটির সাহায্যে যে-পাত্রগুলো তৈরী হয়েছিলো—সেগুলো সম্ভবতঃ বাস্তবস্তু রাখবার জন্যে গাছের বড়ো পাতা কিংবা বড়ো আকারের ঝিনুকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আগুনের ব্যবহার জানবার পর প্রাগৈতিহাসিক মানুষ কাঁচা মাংসের বদলে আগুনে সেঁকা মাংস খেতে সুরু করে। রোদে শুকানো মাটির পাত্রে কাঁচা মাংস রেখে আগুনের আঁচে ওই মাংস সেঁকে নিতে গিয়ে সে-যুগের মানুষ যে-ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলো—তা হলো, আগুনের আঁচে মাটির পাত্র বেশ শক্ত হয়ে ওঠে; তাছাড়া সেটি হয়ে ওঠে জলরোধকও। এর ফলে আগুনে পোড়ানো মাটির পাত্রে জল কিংবা তরল পদার্থ ধরে রাখাও সম্ভব হয়ে উঠলো।

ইতিহাসের কোন্ পর্বে লতাপাতা দিয়ে বুনে ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরী করা সুরু হয়েছিলো—তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব হয়নি। তবে ঐতিহাসিকদের মতে সুপ্রাচীন কাল থেকেই লতাপাতায় বোনা ঝুড়ি ইত্যাদির ফাঁক ফোঁকর বন্ধ করবার জন্যে ওগুলোর ভেতর দিকে পুরু করে মাটির প্রলেপ লাগিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হতো। ঐতিহাসিকদের অনুমান, অরণ্যবাসী আদিম মানুষদের তৈরী লতাপাতায় বোনা ওই রকম কিছু ঝুড়ি অরণ্যের দাবানলে পুড়ে যাবার পর দেখা গেলো, ঝুড়িগুলি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ওই ঝুড়ির ভেতরে লাগানো মাটির পুরু প্রলেপটি আগুনের আঁচে কঠিন হয়ে ধারণ করেছে পোড়ামাটির পাত্রের আকার। এভাবেই পোড়ামাটির পাত্রনির্মাণে লতাপাতায় বোনা নানান্ আকারের ঝুড়ি অথবা চুব্‌ড়িকে ছাঁচ (mould) হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা আদিম মানুষের মাথায় এসেছিলো বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন।

মৃৎপাত্র তৈরীর অপর একটি সুপ্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে 'বিড়ে পাকানো পদ্ধতি (coiling method)। একতাল মাটির সঙ্গে অল্প পরিমাণ জল মিশিয়ে ঘন কাদা করে নিয়ে সেই কাদায় ছোটো ছোটো ডাল দু'হাতে পাকিয়ে মোটা দড়ি তৈরী করে ওই মাটির দড়ি দিয়ে বিড়ে বানাবার কায়দায় যেভাবে মৃৎপাত্রের আকার দেওয়া হয়—তাকেই বলে বিড়ে পাকানোর পদ্ধতিতে মৃৎপাত্র নির্মাণ (Pottery making by coiling method)। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিড়ে পাকানো পদ্ধতিতে যে-মৃৎপাত্রগুলো তৈরী হতো—সেগুলোর ভেতর ও বাইরের দিকের দেয়ালের অসমান জমি ঝিনুক অথবা ধারালো পাথর দিয়ে চেঁছে সমান করা হতো। মৃৎপাত্রগুলোর বাইরের দিকটি ঘষে ঘষে পালিশ করা হতো এক টুকরো মসৃণ পাথর অথবা হাড়ের সাহায্যে। বিড়ে পাকিয়ে মৃৎপাত্র তৈরী করবার পদ্ধতিটি এখনও পর্যন্ত আদিম মানবগোষ্ঠির কোনো কোনো শাখায় প্রচলিত রয়েছে। আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান এবং আফ্রিকার কয়েকটি উপজাতির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (শ্রাবণ, ১৩৮৪) যে-কুমোরের চাকএর কথা বলা হয়েছে, পুরাতাত্ত্বিকদের অনুমান, সেই কুমোরের চাকএর উদ্ভব হয়েছে বিড়ে পাকিয়ে মৃৎপাত্র তৈরীর কায়দা থেকে। পুরাতাত্ত্বিকদের ধারণা, প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোনো সমতল প্রস্তরখণ্ডের

ওপর এক তাল মাটি রেখে ওই মাটি দিয়ে দড়ি পাকানো হতো। ওই মাটির দড়ির সাহায্যে বিড়ে পাকানো পদ্ধতিতে এক একটি মৃৎপাত্র গড়ে উঠতো সেই সমতল প্রস্তরখণ্ডটির ওপরেই। আর্দ্র গোলাকৃতি মাটির বিড়েগুলো প্রস্তরখণ্ডের ওপর একের পর এক চাপিয়ে বেভাবে ক্রমশঃ প্রয়োজনমতো উঁচু করে তোলা হতো—তাকে তুলনা করা যেতে পারে ইঁটের ওপর ইঁট সাজিয়ে দেয়াল তৈরী করবার পদ্ধতির সঙ্গে। পুরাতাত্ত্বিকরা মনে করেন, এভাবে কোনো সমতল প্রস্তরখণ্ডের ওপর বিড়ে পাকিয়ে মৃৎপাত্র তৈরী করতে গিয়ে সেই আদিম যুগের মানুষ এটাই অনুভব করেছিলো যে, ওই সমতল প্রস্তরখণ্ডটিকেই যদি কোনো উপায়ে ধীরে ধীরে ঘোরানো যায়, তবে বিড়ে পাকানো পদ্ধতিতে মৃৎপাত্র তৈরীর কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। মনে হয়, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের এরকম ধারণা থেকেই একটি সমতল প্রস্তরখণ্ডের ওপর আর একটি সমতল প্রস্তরখণ্ড বসিয়ে ওপরের প্রস্তরখণ্ডটিকে কোনো সহকারীর সাহায্যে ঘোরাবার ব্যবস্থার সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু এভাবে প্রস্তরখণ্ডটিকে ঘোরানো সুবিবেচনাপ্রসূত মনে না হওয়ায় হয়তো পরবর্তীকালে যে পদ্ধতির উদ্ভব হলো, তাকেই বর্তমান কুমোরের চাক-এর পূর্বসূরী বলা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের ধারণায়, কোনো সমান আকারের পাথরের খণ্ডের মাঝখানে ফুটো করে (অথবা ছিদ্রযুক্ত কোনো সমতল প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করে) সেই পাথরটি বসিয়ে দেওয়া হতো মাটিতে খাড়াভাবে প্রোথিত শক্ত গাছের ডাল অথবা দণ্ডাকৃতি পাথরের টুকরোর ওপর। দণ্ডের ওপর বসানো ওই পাথরের খণ্ডটি সহকারীর সাহায্যে ঘোরাবার ব্যবস্থা করা হতো। এতে সুবিধে হলো এই যে, পাথরের টুকরোটি দণ্ডে বসানো থাকায় ঘূর্ণায়মান অবস্থায় সেটি আর কোনো দিকে সরে যাবার সম্ভাবনা রইলোনা। ভারতের গ্রামাঞ্চলে গম প্রভৃতি শস্য পেষাই করবার জন্যে এখনও যে-ধরণের পাথরের জাঁতা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়—সেই জাঁতার সঙ্গে আদিম কুমোরের চাক-এর তুলনা করা যেতে পারে।

একথা আগেই বলা হয়েছে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কুমোরের চাক প্রথম আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়েছিলো বর্তমান ইরাকের ভূখণ্ডে। প্রাচীন ভারতীয় ভূখণ্ড মহেন্‌জোদারো-হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে প্রাপ্ত কিছু কিছু মৃৎপাত্রের গঠন দেখে মনে হয় ওগুলো চাক-এর সাহায্যে তৈরী। তবে মহেন্‌জোদারো-হরপ্পায় কুমোরের চাক ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সেই চাক তৎকালীন সিন্ধু উপত্যকার উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফলশ্রুতি অথবা সুদূর মেসোপটেমিয়া থেকে আনীত, সেবিষয়ে সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে যে-ধরণের কুমোরের চাক সাধারণতঃ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়—সেগুলোকে দুটো শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর চাক-এর গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করলে যা দেখা যায়, তা হলো এই : একখণ্ড সমতল কাঠের পাটাতনের মাঝখানে লম্বভাবে বসানো একটি লোহার তৈরী দণ্ড (spindle)। দণ্ডটির মাথায় কাঠ অথবা লোহার তৈরী ছোটো আকারের (আনুমানিক এক ফুট ব্যাসযুক্ত) একটি নিরেট চাকা সমান্তরালভাবে বসানো। এই চাকাটিকে বলা হয় wheel's head। উল্লিখিত spindleটির তলার দিকে কাঠের পাটাতনের ওপরে প্রায় দু'ফুট ব্যাসযুক্ত বেশ ভারি ওজনের আরও একটি নিরেট লোহার তৈরী চাকা সমান্তরালভাবে লাগানো। এই চাকাটিকে বলা হয় Fly wheel। Wheel's headএর ঠিক নীচে কাঠের তৈরী চতুষ্কোণ যে পাটাতনটি থাকে—সেটি দাঁড়িয়ে থাকে চারটি কাঠের পায়ার সাহায্যে ; দেখতে অনেকটা সাধারণ টেবিলের মতো—উচ্চতাও সাধারণ টেবিলের অনুরূপ। গোড়ার তলার দিকে অপর যে কাঠের পাটাতনের কথা বলা হয়েছে, সেটিও চারটি পায়ার সঙ্গে চারকোণায় যুক্ত থাকে। টেবিলের

প্রায় সমউচ্চতাযুক্ত একটি টুলে বসে শিল্পী কাজ করে থাকেন। টুল-এ বসে শিল্পী পায়ের সাহায্যে পূর্বোক্ত Fly wheelটিকে ঘুরিয়ে দিলে spindleএর সঙ্গে যুক্ত wheel's headটিও ঘুরতে থাকে। wheel's headএর ওপর মাটির মণ্ড রেখে শিল্পী দু'হাতের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের সিরামিকপাত্রের রূপ দিয়ে থাকেন। Fly wheelটি বেশ ভারি ওজনের হওয়ায় একবার পায়ের সাহায্যে সেটি ঘোরালে চট্ করে থেমে যাবার সম্ভাবনা থাকেনা। তাছাড়া পায়ের চাকার গতি প্রয়োজনমতো বাড়ানো এবং কমানো যেতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকগুলো অনেকটা চরকার অনুরূপ। এ-ধরণের চাকএর spindleটির সঙ্গে তলার দিকে যুক্ত একটি যন্ত্রাংশের সঙ্গে আনুমানিক দু' থেকে আট ইঞ্চি মাপের লোহার তৈরী চাকা লম্বভাবে লাগানো থাকে। এই চাকাটিতে একটি হাতল যুক্ত থাকে এবং হাতলটি ধরে হাতলসংযুক্ত চাকাটি ঘোরালে Fly wheel এবং wheel's headও একই সঙ্গে ঘুরতে থাকে। এ ধরণের চাক-এ কাজ করতে গেলে একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়। কারণ চাক-এ কাজ করবার সময়ে শিল্পীর দুটো হাতই যুক্ত থাকা প্রয়োজন। এ ধরণের চাক সীমিতসংখ্যক সিরামিক-শিল্পীই ব্যবহার করে থাকেন। কারণ এই শ্রেণীর চাক-এর গতি শিল্পীর প্রয়োজনমতো বাড়াতে ও কমাতে গেলে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়।

প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর চাক প্রয়োজনবোধে ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যেও চালানো যেতে পারে।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ক্রমে কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ অযোধ্যা সহরে উপস্থিত হইলেন। অযোধ্যা সহরের কাহিনী অতিপ্রাচীন ও ঐতিহাসিক। অযোধ্যায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-কাহিনী রামায়ণ-গ্রন্থে সকলেই পড়িয়াছি এবং তাহা হইতে রামরাজ্যের ও শ্রীরামচন্দ্রের শাসননীতির বহুকথাই জানিতে পারি। তবে একথা ঠিক যে সেই রামও নাই, আর অযোধ্যা নাই। তবে আজিও শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া আছে। কালীপ্রসাদ ও তুলসীমহারাজ অযোধ্যায় তিন রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অযোধ্যার রামচন্দ্রের স্মৃতিজড়িত স্থানগুলি ও রামইৎ বৈষ্ণবদিগের আখাড়াগুলি দেখিয়া এবং সরযূনায় স্নান করিয়া অতীতদিনের সেই অযোধ্যার স্বর্ণস্মৃতি তাঁহাদিগের অন্তরকে ব্যাকুল করিয়াছিল। অপূর্ব সেই রামচরিত যাহা আজিও মানুষের শ্রদ্ধার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সাধক তুলসীদাস তাঁহার 'রামচরিতমানস'-গ্রন্থে সুললিত ভাষায় শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য-লীলাকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে মুনি বাল্মিকী 'রামায়ণ' রচনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনীকে অমর করিয়া গিয়াছেন। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ তিন দিন তিন রাত্রি অযোধ্যায় বাস করিয়াছিলেন এবং এক ভিক্ষাদি করা ছাড়া সকল সময়েই শ্রীরাম-চন্দ্রের জীবনকাহিনী ও জীবনাদর্শ আলোচনা করিয়া কাটাইয়াছিলেন। ইহার পর লক্ষ্ণৌয়ের পথে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। লক্ষ্ণৌও একটি ঐতিহাসিক কাহিনীপূর্ণ সহর। কারণ বহু মুসলমান নৃপতিদের কীর্তিকাহিনীর স্মৃতি লক্ষ্ণৌ সহরে রক্ষিত আছে।

কালীপ্রসাদ ও তুলসীমহারাজ লক্ষ্ণৌ সহরের সর্বত্র পরিভ্রমন করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ভ্রমনকালে একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক তাঁহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় তাঁহারা যাইবেন। তাহাতে কালীপ্রসাদ বলিয়াছিলেন তাঁহারা হরিদ্বারে যাইবেন পদব্রজে। তাহা শুনিয়া ভদ্রলোক বলিলেন : 'হরিদ্বার ? হরিদ্বার তো এখান (লক্ষ্ণৌ) হইতে বহুদূর, কি করিয়া এতটা পথ পায়ে হাঁটিয়া আপনারা যাইবেন, তাহা শুনিয়া কালীপ্রসাদ বলিলেন ; 'বাবা, প্রায় অর্ধেক পথ তো আমরা আসিয়াই পড়িয়াছি, আর বাকী পথ অবশ্যই যাইতে পারিব'। এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোক কিছুক্ষণ পরে বলিলেন : মহাত্মাজী, আমি আপনাদের ট্রেনভাড়া দিব, আপনারা গ্রহন করুন'। কালীপ্রসাদ শুনিয়া বলিলেন : বাবা আমরা শপথ গ্রহণ করিয়াছি যে, পথে কোন অর্থ স্পর্শ করিব না। সুতরাং যদি ট্রেনের টিকিট কাটিয়া দেন, তবে তাহা গ্রহণ করিবেন। সেই কথা শুনিয়া হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আনন্দে আত্মহারা হইয়া তৎক্ষণাৎ দুইটি হরিদ্বারের ট্রেনের টিকিট কাটিয়া আনিলেন এবং রাস্তায় খাবার জন্য কিছু লাড়ু-মিঠাই কিনিয়া দিয়া কালীপ্রসাদ ও তুলসীমহারাজকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ হিন্দুস্থানী ভক্তটির অকপট শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার ও অত্যধিক ভালবাসা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও ভদ্রলোকটির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন কালীপ্রসাদ তুলসী মহারাজকে বলিলেন : "ভাই তুলসী, এমন করেই অপরকে দিয়ে ভগবান ভক্তের অভাব পূরণ করেন। দেখলে তো, হিন্দুস্থানীটি আমাদের পরিচিত বা আপনজনও নয়, অথচ কত ভক্তি ও কত ভালবাসা নিয়ে আমাদের সেবা করলো। সবই শ্রীশ্রীঠাকুরে খেলা। আমরা তাঁর নাম নিয়ে বার হয়েছি এবং বিশ্বাস করি, সর্বদা তিনিই আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।"

কালীপ্রসাদের সেই কথা শুনিয়া তুলসী মহারাজও বিশেষ আনন্দিত হইলেন। পরিশেষে তাঁহারা দুইজনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ট্রেনে হরিদ্বারের দিকে রওনা হইলেন।

॥ সংঘ-বার্তা ॥

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবার নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় নানান দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল্'-এর উপরে (দ্বিতলে) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারেও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। যেহেতু আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রসারতাকে অন্বয়ুক্ত করবে। ইতি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সম্পাদক
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

স্বীকৃতি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে গৃহনির্মাণকার্যে যাঁহারা এ পর্যন্ত দান করিয়াছেন—

(পূর্ব প্রকাশিতের পরে)

	নাম		টাকা
৭২৭।	শ্রীমতি বনলতা মিশ্র ৪১সি, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলি-৭০০০০৬	...	৫১·০০
৭২৮।	শ্রীগঙ্গাদাস ব্যানার্জি সি. আর. রোড-৩১, কে২ ৩৫, টেল্‌কো কলোনী, জামসেদপুর-৮৩১০০৪	... ...	৫০·০০
৭২৯।	শ্রীমতি অরুণা রায় ১৪সি, গড়িয়াহাট রোড, কলি ৭০০০৩১	... ...	৫০·০০
৭৩০।	শ্রীমতি কুন্তরাণী রায়চৌধুরী C/o শ্রী এ. সি. রায়চৌধুরী ৩১এ, বকুলবাগান রো, ভবানীপুর, কলি-৭০০০২৫	... (মেরামতি কাজের জন্য)	২০·০০
৭৩১।	শ্রীপীযূষকান্তি দাস C/o শ্রীহরিপদ পোদ্দার সাহেববাগান, চন্দননগর, হুগলী	... (মেরামতি কাজের জন্য)	১৩·০০
৭৩২।	শ্রীবিকুপদ মুখার্জী ২২।১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, হাওড়া, পিন ৭১১১০১	... (মেরামতি কাজের জন্য)	১৮·০০
৭৩৩।	শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ ৮, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২	... ...	১০·০০

With best compliments from :—

The Peerless General Finance & Investment Company Ltd.

ESTD : 1932

Registered Office : "PEERLESS BHAVAN"

3, Esplanade East, Calcutta-700069

MORE THAN 100% OF THE COMPANY'S LIABILITY TO ITS CERTIFICATE-HOLDERS ARE KEPT INVESTED IN GOVERNMENT SECURITIES & IN FIXED DEPOSITS WITH NATIONALISED BANKS.

বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ

(বাংলা সাপ্তাহিক)
প্রচার-সংখ্যা : ৭০,০০০
প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা ০ বার্ষিক সডাক —১০ টাকা

০

পশ্চিম বংগাল

(হিন্দী পাক্ষিক)
প্রচার-সংখ্যা : ৫৫,০০০
প্রতি সংখ্যা-১০ পয়সা ০ বার্ষিক সডাক-২·৫০ পয়সা

০

ওয়েষ্ট বেঙ্গল

(ইংরেজী পাক্ষিক)
প্রচার-সংখ্যা : ১০,০০০
প্রতি সংখ্যা-২০ পয়সা ০ বার্ষিক সডাক-৫ টাকা

০

এ ছাড়া, সাওতালী পাক্ষিক 'পছিম্ বাংলা'
এবং উর্দু পাক্ষিক 'মগরেবী বংগাল'
পত্রিকা দুটিতেও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়।

০

বিজ্ঞাপনের হার ও অন্যান্য শর্তাদির জন্য
নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—
তথ্য অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-৭০০০০১
আই. সি. এ.—৫০২২ / ৭৯

আমাদের অভিযান এগিয়ে চলেছে

কৃষি প্রগতির প্রতীক

কৃষির উন্নতির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।
এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের অভিযান এগিয়ে চলেছে।

দেশে সারের ঘাটতি থাকায় একদিকে যেমন নতুন নতুন সার কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে অপর দিকে তেমনি বিদেশ থেকে সার আমদানি করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে কৃষি উৎপাদন কোনমতেই ব্যাহত না হয়।

HAPPY CHILD-NATION'S PRIDE

হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড বিপণন বিভাগ
৪৮ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

, মুটিলাড়া, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ • পি, ডি, চালিহা রোড, পঞ্চবটী, নিলপুকুরি, গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম)
৫/এ, সত্যানন্দর, ভুবনেশ্বর-৭৫১০০৭ (উড়িষ্যা) • ডাঃ ঠি, এন, ব্যানার্জি রোড, পাটনা-৮০০ ০০১, (বিহার)
৫ হাউজিং সোসাইটি, রায়পুর-৪৯২০০১, (মধ্যপ্রদেশ)

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ., পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগোপকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। গৌরকথা (১ম—৩য়) ১ম খণ্ড ৬·০০, ২য় খণ্ড ৪·০০, ৩য় ৫·০০
৩। চণ্ডীচিন্তা ৪·০০
৪। উদ্ধব সন্দেশ ৫·০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কন্ধ (২য়-৩য়) ৫২·৫০
৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ ৫·০০
৭। উপনিষদ্-ভাবনা (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান

১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৬
২। মহেশ লাইব্রেরী
২১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা
৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

লব্ধ প্রতিষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া— কুষ্ঠ-কুটীর

সর্ব্বজনসম্মাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

অসাড় কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসালয়ে অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত রোগের জন্য যাঁহারা সর্বচিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর পি, বি, ৭, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৫৯)
শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়)

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য-ভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।
শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।
শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—৩·০০ টাকা
শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—৩·০০ টাকা

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিষ্টস্ এণ্ড পাবলিশার্স
Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা (মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ)	২০·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত	
		ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	১৮·০০	বীরত্বে বাঙালী	০·৫০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১২·০০	বাংলার ঋষি	৭·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৩·০০
		বাংলার বিদুষী	৪·০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩		ব্যবহারিক শব্দকোষ (প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)	১৫·০০

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6.00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi	10·00	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization		Why a Hindu Accepts Christ and	
Philosophy and Religion		Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda :		Swami Abhedananda-The Patriot	
A Spiritual Biography	16.00	Saint	20.5

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical	
Christ the Saviour	2·00	Thought	45·00
Historical Development of		The Philosophical Ideas of Swami	
Indian Music	65.00	Abhedananda	00.30
Music of the Nations	35.00	Thoughts on Yoga, Upanishad	
Philosophy of Progress and Perfection		and Gita	12·00

The Forthcomming Outstanding Books on Music
by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733/57
41st Year June 1979
VOL. IV

Regn. No. WB/NC-14
PHONE . 55-1800

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

কুক্‌মী

ভারতের সেরা

গুঁড়া মশলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুক্‌মী প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী
ফোন-৩৩-৭৯৯১
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

PRICE Rs. 1·50
Ramakrishna Vedanta Math.
19-B. Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006.
মূল্য ১·৫০ টাকা

স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

একচল্লিশ বর্ষ
পঞ্চম সংখ্যা
আষাঢ়
১৩৮৬

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে যত্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।

- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখিবে সব গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র দ্বারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·০০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-

সদ্য প্রকাশিত হইল !

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সমৃদ্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স

৮১, বিপ্রদাস সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

(হাতীবাগান বাজার)

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	১০·০০
মরণের পারে	১৪·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা		হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	৬·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	৪.০০	আত্মজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ (৫ম নূতন সংস্করণ)	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ		কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ		তীর্থরেণু (বর্ধিত ২য় সং)	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্দ্ধ যন্ত্রস্থ	
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ	১৬·০০	সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	১২·০০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ		নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা	১০·০০	পত্রে উপদেশ	
আচার্য্য অভেদানন্দ	২·৫০	অর্চনা (নূতন সং)	·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	১০·০০
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

আষাঢ়, ১৩৮৬

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ

শ্রীদেবাশীষ হোড়

শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :

ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ

শ্রীরঞ্জনীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ :

শ্রীকুবের দত্ত

দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস

৬ নং ভাক্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার যোগশিক্ষা' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন- ৫৫-২৫৪৯ । ৫৫- ৬৫৬৫

GRAM : PURNIBANSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4532

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফাটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

কেশগুচ্ছে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

PHONE : 55-452

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR JATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMOEO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Rd. Office :

69, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

ফোন : ২২-৮৪২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

১০১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০ নং বিধান সরণী, হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

Please Contact :–

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.

(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fitings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED

Sales Office ;—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ

প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৮, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৪-১৬১৩

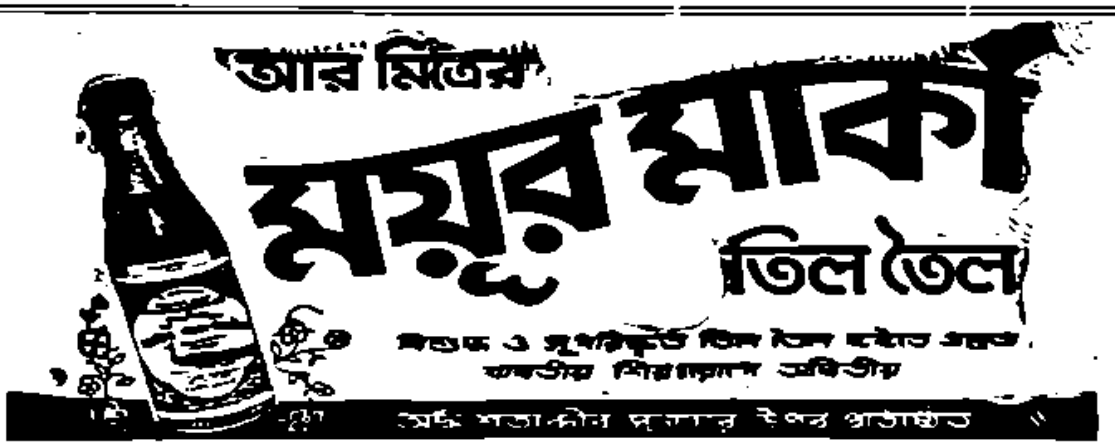

ফোন নং ৪৮-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, ডাঃ জগন্নাথ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

আষাঢ়, ১৩৮৬

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। বাণী ও বিচার	১৬১	
২। ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ	১৭০	স্বামী প্রভানন্দ
৩। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাঙ্গনে : পণ্ডিত পদ্মলোচন	১৭৬	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৪। সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	১৮১	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৫। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	১৮৪	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৬। দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে	১৮৬	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
৭। স্বামী অভেদানন্দ (জীবন-নাট্য)	১৯০	শ্রীবিমলকৃষ্ণ
৮। প্রাচীন ভারতীয়-সভ্যতার কালবিচার	১৯৪	শ্রীজসজিৎ রায়
৯। শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	১৯৮	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১০। সংঘবার্তা	২০২	

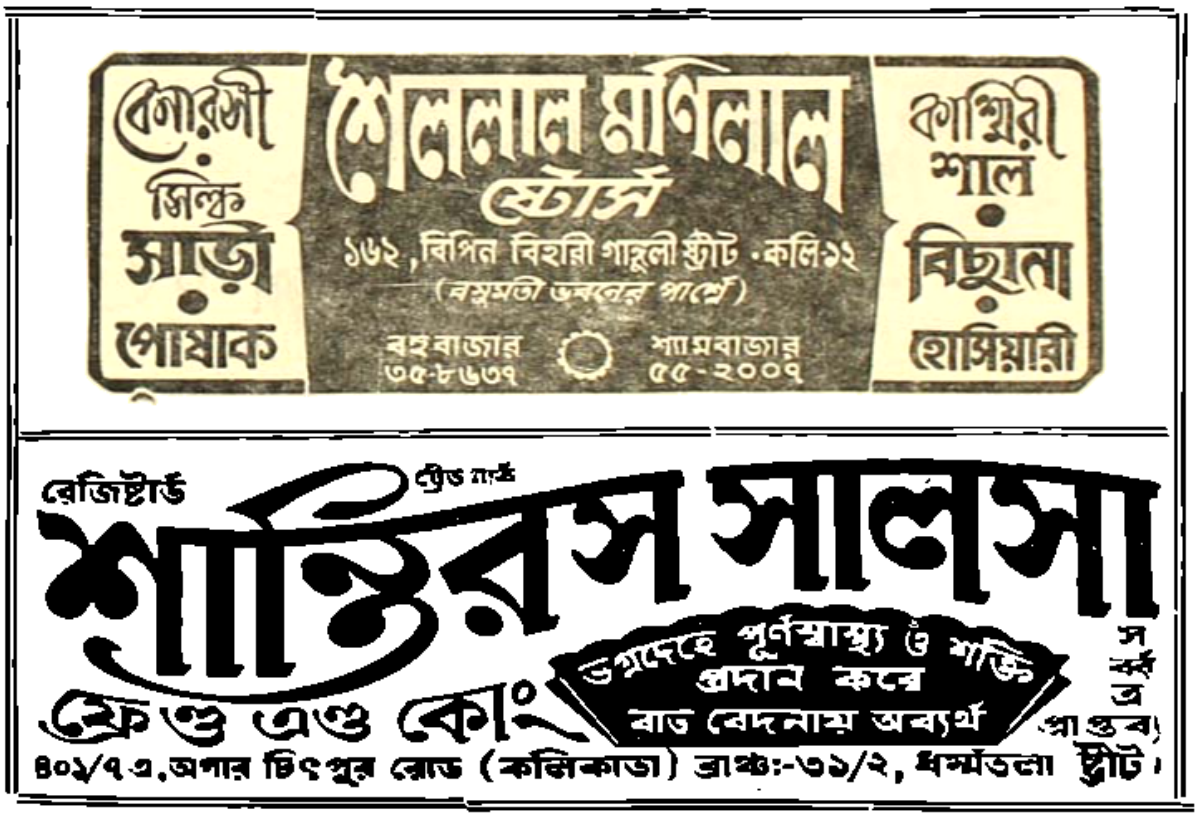

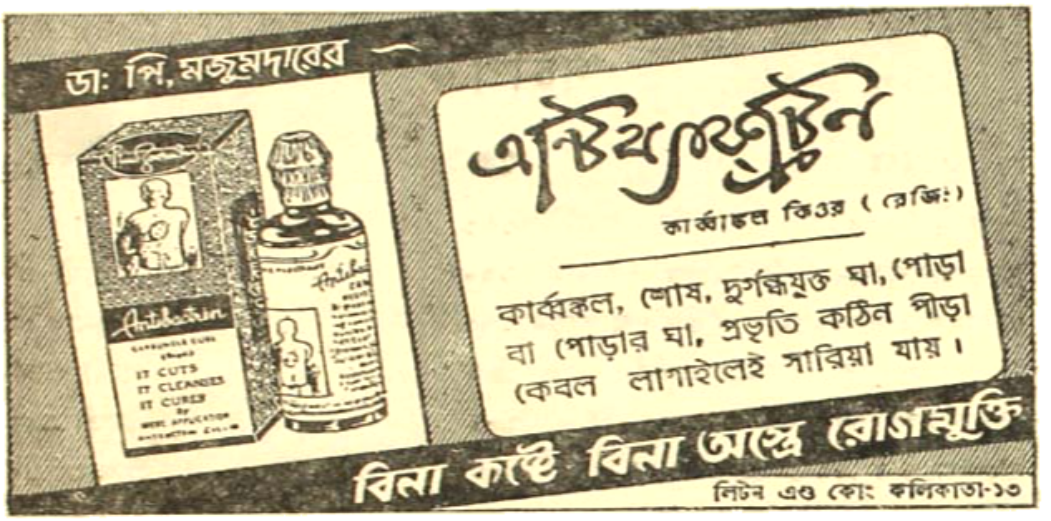

যাবতীয় পেটের পীড়ায়

ভাঃ সেনস্

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্‌স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

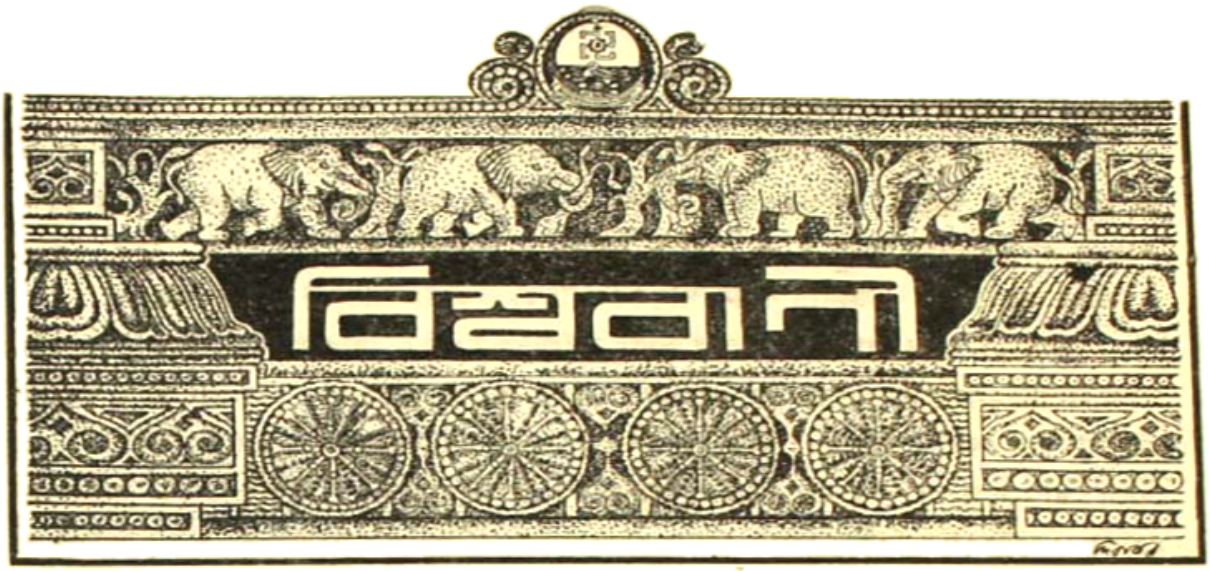

একচল্লিশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা | আষাঢ় ১৩৮৬

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ॥

(দুই)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন : "আমার ভাব কি জানো? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব।[১] (সকলের হাস্য) আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি-চচ্চড়ি—এ'সবতাতেই আছি। আবার মুড়িঘণ্টোতেও আছি, কালিয়া-পলোয়াতেও আছি (সকলের হাস্য)।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১৮৬

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—'আমি শুক্‌নো ভক্ত নই, রসে-বসে আছি'। একটানা বা একঘেয়ে ভাব নিয়ে যাঁরা থাকেন তাঁদের শুক্‌নো-ভক্ত বলতে পারি। তাঁরা বলেন 'আমার সব-কিছুই ভাল, আর সকলের মন্দ'। সাধনার ক্ষেত্রেও তাই—যার যেমন ভাব। কেউ ভক্তিপথে থেকে ঈশ্বরের পূজা-অর্চনা করতে চান, কেউ জ্ঞানপথে বিচার করতে চান। তিনি অন্তরে—না বাহিরে, তিনি সগুণ—কি নির্গুণ, তিনি সাকার—কি নিরাকার—এ'সব বিচার নিয়ে থাকেন জ্ঞানীরা। জ্ঞানপথ বিচারের পথ, আর ভক্তিপথ বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও প্রেম-ভালবাসার পথ। ঈশ্বর প্রেম ও ভালবাসার স্বরূপ। প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে তিনি (ঈশ্বর) সংসারের সকল মানুষকে ধরে রেখেছেন। প্রেমস্বরূপ ভগবান, সুতরাং অনুরাগ—ভক্তি দিয়েই ভগবানকে ভজনা করতে হয়। ভগবানকে প্রেমঘন, আনন্দঘন, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—এ'কথা জ্ঞানীরা বলেন ও ভাবেন, কিন্তু তিনি (ঈশ্বর) শুদ্ধজ্ঞান ও বিজ্ঞানস্বরূপও। তিনি অন্তরে-বাহিরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুতে সর্বত্রই

১। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'কথা বক্রোক্তি-ছলে বলেছেন। একথা বলার উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বভাব ছিল অত্যন্ত কোমল ও সরলবৎ, স্বভাবতই তিনি পরের দুঃখে-কষ্টে সহজে কাতর হয়ে পড়তেন।

চৈতন্যরূপে, প্রাণরূপে ও আত্মার আত্মারূপে বিরাজিত। জ্ঞানী তাই ঈশ্বরের স্বরূপকে জানার ও উপলব্ধি করার জন্য নেতি নেতি বিচার করেন, ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করেন তাঁকে রূপের অতীত অরূপে, আবার রূপ ও অরূপের পারে তত্ত্বচৈতন্যরূপে উপলব্ধি করার জন্য। আসলে একটি প্রেমের উপলব্ধি ও অপরটি জ্ঞানের বা বিশ্বতত্ত্ববিজ্ঞানের উপলব্ধি, কিন্তু চরম-উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভক্ত ও জ্ঞানীর সমান আসন নির্বাচিত, উভয়ের আনন্দই পরমানন্দস্বরূপ।

তাছাড়া আছে যোগের ও কর্মের অর্থাৎ কর্মযোগের পথ। রাজযোগের আলোচনা ঋষি পতঞ্জলি পাতঞ্জলদর্শনে বিশেষভাবে করেছেন। আর আছে আলোচনা শিবসংহিতা ও অন্যান্য বহু যোগগ্রন্থে যোগের প্রসঙ্গে। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ যোগের আলোচনা করেছেন বিচিত্রভাবে—যে যোগে রাজযোগ ও কর্মযোগ—দুটির অন্তর্নিবেশ হ'তে পারে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪ থেকে ২৯ শ্লোকে বিভিন্ন যজ্ঞের প্রসঙ্গে রাজযোগ ও কর্মযোগের আলোচনা একটু ভিন্নভাবে আছে। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বলেছেন—

'এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মনো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥—গীতা ৪। ৩২

এখানে আছে যে, বেদমুখে বহু যজ্ঞ বা কর্মানুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তাহলেও জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। দ্রব্যত্যাগকে যজ্ঞ বলে। দ্রব্য অর্থে হবিঃ বা ঘৃত। বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে ঘৃতের বা আজ্যের উল্লেখ না থাকলেও জীবাত্মার সত্তাকে পরমাত্মার সত্তায় সমর্পণ করার সার্থকতার কথা বলা আছে। সুতরাং গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪-২৯ শ্লোকগুলিতে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বলে আপাতত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা রাজযোগ ও কর্মযোগেরই সমন্বিত রূপ। এই সিদ্ধান্ত অনুসৃত করেছেন আচার্য মধুসূদন সরস্বতী গীতার 'গূঢ়ার্থদীপিকা'-ভাষ্যে। তাছাড়া জ্ঞান বা জ্ঞানযোগকে সেখানে বিশেষভাবে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে—'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' (৪। ৩৩)। জ্ঞান অর্থে ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকার, অর্থাৎ জীবরূপী আত্মা বা জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপী ব্রহ্ম যে এক ও অভেদ এই পরতত্ত্ব জ্ঞানে বা জ্ঞানবিচারে উপলব্ধি হয়, সেজন্য জ্ঞান দ্রব্যযজ্ঞ ও অন্যান্য সকলযজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কথা এই যে, সকল কর্ম বা কর্মযজ্ঞ ব্রহ্মবুদ্ধি ক'রে অনুষ্ঠান করলে তা মুক্তি ও ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ক হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্ ·· ব্রহ্মকর্মসমাধিনা' (২৪) প্রভৃতি শ্লোকে সে'কথাই বলেছেন। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এই শ্লোকের ভাষ্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রে বলেছেন—"ব্রহ্মদৃষ্টেরেব চ সর্বযজ্ঞাত্মিকেতি স্তুয়তে', অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিই সমস্ত যজ্ঞের বা কর্মযজ্ঞের স্বরূপ।

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, গীতায় কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতির প্রসঙ্গে 'যজ্ঞ'-শব্দের উল্লেখ করার সার্থকতা কি? আচার্য মধুসূদন সরস্বতী 'যজ্ঞ'-শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন : 'যজ্ঞঃ' প্রত্যাগাত্মানাং যদ্-পদার্থং 'যজ্ঞেনৈব' যজনস্য আত্মনামত্বং যাস্কেন পঠিতং, ইষ্টস্বরূপলক্ষণে তৃতীয়া, এবকারো ভেদাভেদব্যাবৃত্ত্যর্থঃ", অর্থাৎ যজ্ঞ আত্মার নাম। প্রকৃত অর্থে, যজ্ঞ বা যজ্ঞকর্ম যেমন সকলের অবশ্য-কর্তব্য, তেমনি ব্রহ্ম ও আত্মার

(পরমাত্মা ও জীবাত্মার) অভেদদর্শন করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। এ'জন্য যজ্ঞের প্রকৃত অর্থ আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞান। তাছাড়া ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শনের অর্থ জ্ঞানীরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে জীবাত্মাকে (জীবভাবকে) আহুতি দান করেন এবং আহুতি দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞাহুতির সমতুল্য।

এ'তথ্যটি শ্রীরুক্ষ গীতার ৪।২৬ শ্লোকে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। সে'শ্লোকটি হ'ল—

'শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥'

'অন্যান্য কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন, অপরে কেহ কেহ ইন্দ্রিয়াগ্নিতে শব্দাদিবিষয়কে আহুতি দান করেন ও অনাসক্তভাবে বিষয়সকল ভোগও করেন'। বিষয়টি কঠিন না হলেও সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য নয়। বলা যায় যে, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-ত্বক্-জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে সমাধি-রূপ অগ্নিতে আহুতি দান করেন বলতে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সার্থকতার জন্য চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলকে স্ব-স্ব-বিষয় বলতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি থেকে ফিরিয়ে এনে সাধক আত্মায় কেন্দ্রিভূত করেন, কেননা মনের বা চিত্তের বৃত্তিগুলিকে কেন্দ্রগত ও অন্তর্মুখী না করলে ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত বস্তুতে স্থির বা সমাধিযুক্ত হয় না, ফলে চিত্তের বিক্ষেপ হয় এবং শান্তি ও আনন্দ লাভ থেকে সাধক বঞ্চিত হন।[২] এজন্য যোগোক্ত প্রত্যাহার সাধন করতে হয়—"স্বস্বিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকরণে ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ"। কিন্তু এই প্রত্যাহারকে সার্থক করতে হলে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাস করা প্রয়োজন। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-সম্পর্কে বলেছেন :

(১) 'তত্র হৃৎপুণ্ডরীকাদৌ-মনসশ্চিরকাল স্থাপনং ধারণা'।

(২) 'এবমেকরূপতত্র ভগবদাকারবৃত্তি প্রবাহোঽন্তরাঽন্তরাঽন্যকারপ্রত্যয়ব্যবহিতোঽধ্যানম্'।

(৩) 'সর্বথা বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সমাধিঃ'।

অর্থাৎ—

(ক) হৃদয়পদ্মে (হৃদয়পুণ্ডরিকে সমাসীন আত্মায়) মনকে ধারণার বহুক্ষণ ধরে রেখে অচঞ্চলভাবে রাখা বা স্থির করার নাম ধারণা ;

(খ) চিত্ত বা মনকে কোন একটি স্থানে (কেন্দ্রে) স্থাপন ক'রে তার মধ্যে বিজাতীয় বা ভিন্ন প্রত্যয়ের (জ্ঞানের) ধারা প্রবাহিত হলেও তাতে অবিচ্ছিন্নভাবে যে আত্মাকার বা ভগবদাকার বৃত্তিপ্রবাহ (জ্ঞানধারা) সৃষ্টি হয়—সেই প্রত্যয় বা তৈলধারাবৎ জ্ঞানধারাকে ধ্যান বলে ;

২। উপনিষদে আছে : 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ, তস্মাৎ পশ্যতি নান্তরাত্মন্', সুতরাং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত অর্থে আত্মাভিমুখী করা উচিত। তবে গীতার ৬।২১ শ্লোকে 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে' প্রভৃতি কথা থেকে বোঝা যায়, কেবল ইন্দ্রিয়সংযম করলেই হবে না, সকল বাসনা-কামনাও ত্যাগ করতে হবে, তবেই শান্তি—'স শান্তিমধিগচ্ছতি'।

(গ) আর বিজাতীয় (ভিন্ন জ্ঞানের বা প্রত্যয়ের) ধারায় অব্যবহিত যে সজাতীয় জ্ঞানধারা তার নাম সমাধি। সমাধির অপর নাম চিত্ত বা মনে কেবলমাত্র ব্যবধানরহিত অবিচ্ছেদ্য একজাতীয় প্রত্যয় বা জ্ঞানের প্রবাহ।

এ'গুলি রাজযোগের সাধন, কিন্তু ভক্তিযোগে, কর্মযোগে ও জ্ঞানযোগেও ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সার্থকতা আছে। "স তু চিত্তভূমিভেদেন দ্বিবিধঃ সম্প্রজ্ঞাতোঽসম্প্রজ্ঞাতশ্চ",—সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ ও অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজভেদে সমাধি দু'রকম। এ'দুটির মধ্যে অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ-সমাধি শ্রেষ্ঠ, কেননা এ' সমাধিতেই যথার্থভাবে আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়—'সর্ববৃত্তিনিরোধাত্তির্বীজঃ সমাধিঃ' (পাতঞ্জলদর্শন ১।৫১)।[৩] ঋষি পতঞ্জলি পুনরায় লয়-সমাধি ও বাধ-সমাধি দু'রকম সমাধির কথা উল্লেখ করেছেন: 'দ্বিবিধোহি সমাধির্ভবতি লয়পূর্বকো বাধপূর্বকশ্চ'।[৪] লয়-সমাধিতে ব্যুত্থান অর্থে সমাধি থেকে যোগীসাধক পুনরায় ইন্দ্রিয়ের জগতে নেমে আসেন, সুতরাং তাঁর মধ্যে একটু অজ্ঞান (অজ্ঞানলেশ) থাকে, কিন্তু বাধ-সমাধিতে সাধকের অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয় ও তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। এ'সম্বন্ধে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন: "এতাদৃশো য আত্মসংযমরূপো যোগঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানদীপিতে জ্ঞানং বেদান্ত-বাক্যজন্যো ব্রহ্মাত্মৈক্য-সাক্ষাৎকারস্তেনাবিদ্যাতৎকার্যনাশদ্বারা দীপ্যতে অত্যন্তোজ্জ্বলিতে বাধ-পূর্বকে সমাধৌ সমষ্টিলিঙ্গশরীরমপরে মুহূর্তি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ",—অর্থাৎ আত্মসংযম বা ইন্দ্রিয়সংযম যোগবিশেষ। তাকে অগ্নিরূপেও কল্পনা করা যায়, কেননা ইন্দ্রিয়সংযমরূপ-অগ্নিতে ইন্দ্রিয়সকল ভস্মিভূত হয় বলতে ইন্দ্রিয়গণের শক্তি আত্মায় কেন্দ্রাভিত ও সমাহিত হয়, ফলে পরিপূর্ণ চৈতন্যের তখন প্রকাশ হয় ও সাধক শাশ্বত শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হন। এরই নাম মুক্তি।

কর্মযোগের কথাও তাই। কর্ম যদি নিরাসক্ত বা নিষ্কামভাবে অথবা ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হয় তবে কর্ম অনুষ্ঠান ক'রে কর্মের বন্ধনে মানুষ আর আবদ্ধ হয় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম-কর্মযোগের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। আসলে কর্মও যজ্ঞ এবং কোন বস্তু অর্পণ করাও যজ্ঞ। এই কর্ম বা অর্পণরূপ যজ্ঞ যদি মানুষের নিজের জন্য অনুষ্ঠিত হয় তবে যজ্ঞের উদ্দেশ্য সার্থক হয় না, বরং বিফল হয়। সেজন্য কর্মযজ্ঞ ভগবদ্-আরাধনারূপে অনুষ্ঠিত হ'লে ঐ কর্মযজ্ঞের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ ও নির্মল হয় এবং ঐ শুদ্ধচিত্তের সাহায্যে মানুষ ব্রহ্মোপলব্ধি (বা ঈশ্বর দর্শন) করে জীবনের লক্ষ্যকে সার্থক করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাছকে ভিন্ন ভিন্ন রকমে খাওয়ার উদাহরণ দিয়ে বিচিত্র সাধনকর্মের ও বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন নিজের উদার ধর্মমত ঈশ্বরবিশ্বাসের উল্লেখ ক'রে। "আমার ভাব কি জানো" ?—এ'কথা ব'লে তিনি তাঁর উদার ও সর্বসমন্বয়ী ধর্মদৃষ্টির কথাই উল্লেখ করেছেন। জীবনে তিনি বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠান সাধন করেছেন, উপলব্ধি করেছেন

৩। 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে সদানন্দ-যতি উভয় সমাধির কথা বর্ণনা করেছেন এবং নির্বিকল্পসমাধির যে লয়-বিক্ষেপ-কষায় রসাস্বাদ—এ' চারটি বিঘ্নের (কষায়) কথা আলোচনা করেছেন।

৪। লয়-সমাধি যোগের ও বাধ-সমাধি বেদান্তের, সুতরাং দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে।

সকল ধর্মের ও ধর্মসাধনার ভিতর এক ও অখণ্ড সত্যের রূপ ও প্রচার করেছেন "যত মত, তত পথ", কিন্তু লক্ষ্য এক। তিনি ছিলেন অদ্বৈতের সাধক, কিন্তু তাই ব'লে দ্বৈতপথের তিনি নিন্দা করেন নি; বিশিষ্টাদ্বৈত, শাক্তাদ্বৈত, শিবাদ্বৈত, প্রভৃতিরও তিনি সমালোচনা করেন নি কোনদিন। সুতরাং অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইঙ্গিত সহজে অনুধাবন করা কঠিন হলেও সরল তাঁর ভাষা, সাধারণ ও সুন্দর তাঁর উপমা, অথচ গভীর ও অন্তরস্পর্শী তাঁর ভাষার ও উপমার রহস্য এবং মর্মকথা।

তিনি বলেছেন: "কি জানো? দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিন্তু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর (ঈশ্বরের) কাছে পৌঁছানো যায়। যদি কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হ'লে তিনি সে' ভুল শুধরিয়ে দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথদর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণদিকে না গিয়ে উত্তরদিকে যায়, তা'হলে অবশ্য পথে কেউ ব'লে দেয়—'ওহে, ওদিকে যেওনা, দক্ষিণদিকে যাও'। সে' ব্যক্তি কখনও-না-কখনও জগন্নাথ দর্শন করবে"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের মতো যুক্তিনিষ্ঠ ও অন্তর্ভেদী। তিনি বলেছেন: "দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিন্তু ঈশ্বর নয়"। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে শুধু ধর্মমত ও ধর্মসাধনা কেন, সামাজিক আচার-বিচার, অনুষ্ঠান, মানুষের বিশ্বাস ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে এবং ভিন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। একজনে বা একদেশে, বা এককালে যে মতবাদ, সামাজিক আচার-বিচার ও অনুষ্ঠানের প্রচলন থাকে, ভিন্ন জনের মধ্যে, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন সময়ে তাদের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। পরিবর্তনের জগতে অপরিবর্তন কিছুই বা কোনটাই নয়। তবে পরিবর্তনের মধ্যে বা অতীতে অপরিবর্তন একটি বস্তু আছে—যার নাম ঈশ্বর বা পরমাত্মা। ঈশ্বর বা পরমাত্মা দেশ-কাল-পাত্রের বাইরে বা ঊর্ধে বিধৃত, কেননা দেশ-কাল-পাত্রই সীমা ও ভেদ সৃষ্টি করে, তাই দেশ-কাল-পাত্রও -মায়া বা অবিদ্যা। মায়া বা অবিদ্যার স্বভাব সকল-কিছুকে সীমিত ও দূষিত করা। দেশ-কাল-পাত্রও তাই।[৫]

তারপর ঈশ্বর নিজে কোন-কিছু না করলেও ঈশ্বরের অব্যক্তস্থায়ী মায়া[৬] সকল-কিছু সৃষ্টি করেন, পরিপালন করেন, আবার ধ্বংস করেন। সুতরাং কিছু করা বা না-করা মায়ার কাজ। মায়ারই কর্তৃত্ব সেখানে, মায়াধীশ ঈশ্বরের নয়, তিনি 'স্বাক্ষী-চেতা নির্গুণঃ'। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলেছেন 'ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন'—এ'বলার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকেই একমাত্র কেন্দ্র, কর্তা ও সকল-কিছুর আধার ও কারণ ব'লে চিন্তা করা, ঈশ্বর-ব্যতীত বিশ্বসংসারে কোন-কিছুই হ'তে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: 'তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না'। ঈশ্বর যে সকল-কিছুর কারণ, কর্তা ও অধিষ্ঠান—এ'

৫। তবে 'সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর'। সীমার মাঝে অসীমের রূপ দর্শন করেন জ্ঞানীরা।

৬। বিশ্ববীজরূপিণী মায়া। সকল-কিছুর বীজ সংস্কাররূপে অব্যক্তস্থায়ী মায়ার মধ্যে নিহিত (সুপ্ত) থাকে।

তত্ত্ব বোঝা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের এ'কথা থেকে। তাই কথা এই যে, ঈশ্বরকে জানার, বোঝার বা পাওয়ার একমাত্র উপায় বা পথই ধর্ম। ধর্ম সাধারণত আচার ও অনুষ্ঠানমূলক, কিন্তু ধর্ম আবার সকল আচার ও অনুষ্ঠানের ঊর্ধে, আর তখনই ধর্মের অর্থ আত্মা বা পরমাত্মসত্তা—যা সকল-কিছুকে ধারণ ক'রে বা ধরে রাখে। তবে সাধারণত ধর্ম বলতে আচারিক অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসমূলক সাধনপথ—যে পথ ধরে অগ্রসর হ'লে লক্ষ্যরূপ ঈশ্বরসান্নিধ্যে উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং ধর্ম মত বা বিশ্বাস, আবার ধর্ম পথ বা উপায়। সেজন্য ধর্মমত ঈশ্বর নয়, তবে ঈশ্বরে উপনীত হবার পথ, পদ্ধতি বা উপায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "মত কিন্তু ঈশ্বর নয়"। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি প্রধান বা সার কথা বলেছেন: "তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত (ধর্মমত) আশ্রয় করলে"। আন্তরিক কথার অর্থ মন-মুখ (মনের চিন্তা ও মুখের কথা) এক (সমান্তরাল বা দুই দুই না) হওয়া। তবে ভক্তি, একান্ত অনুরাগ বা অনুরক্তির ও শ্রদ্ধার সঙ্গে "একটা মত আশ্রয় করলে, তাঁর (ঈশ্বরের) কাছে পৌঁছানো যায়"। সুতরাং ধর্মমত, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসাধনার মধ্যে প্রধান হ'ল কোন কাজ করার উপায় ও কৌশল জানার জন্য আন্তরিক হওয়া। সত্যবস্তু ও তত্ত্ববস্তু জান্‌বো—এজন্য মনের ও ভাবের ঘরে চুরি না ক'রে মন-মুখ এক ক'রে আন্তরিক হতে হয়। তবেই মনের দৃঢ়তা, একনিষ্ঠ চেষ্টা ও সকল-কিছুতে সমান দৃষ্টি হয়ে অগ্রসর করিয়ে দেয় সাধককে ঈশ্বরলাভের পথে, অন্যথা গতানুগতিক ও অন্তঃসারশূন্য হয় সাধনার প্রচেষ্টা এবং লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি ও গতিতেও আসে মন্থরতা বা ব্যর্থতা।

তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর একটি বিশেষ কথা বলেছেন: "যদি কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হ'লে তিনি (ঈশ্বর) সে ভুল শুধরিয়ে দেন"। ধর্মজীবনে ও সাধনজীবনে এজন্য প্রবল বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং মনের নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন। যদি ঈশ্বরের প্রতি এই একান্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকে যে, তিনি আমার চালক, তিনি সম্পদে ও বিপদে আমার পথনির্দেশক; পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু-স্বজন-পরিজন একমাত্র তিনিই, তিনি সকলের, আমার ও সকল-কিছুর পালক ও পরিত্রাতা, তবেই ঈশ্বরনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের অন্তরে সৃষ্টি হয় শরণাগতির ভাব এবং তখনই তিনি (ঈশ্বর) শরণাগত সাধকের সকল ভার গ্রহণ করেন, সকল-কিছু দোষ-ত্রুটীর সংশোধন করেন ও পরিচালনা করেন সাধককে মুক্তি ও শাশ্বত আনন্দ-প্রাপ্তির পথে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে'কথাই বলেছেন ঈশ্বরলাভ বা আত্মোপলব্ধি-পথের সন্ধান দিয়ে। ঠিক এ'ধরনের সন্ধান দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরণাগত সখা অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রে-যুদ্ধের সময়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥'

'ভক্তিসহকারে যিনি আমায় জানেন (অভিজানাতি) তিনি পরে পরমানন্দস্বরূপ হন'। তারপর অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতির তত্ত্ব-সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়েছিলেন—

(১) 'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'।

(২)　'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।'

(৩)　'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।'

(৪)　'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।'

—গীতা ১৮।৫৫-৬৬

এ' কথাই পরমতত্ত্বকথা—যা জীবনরহস্যের সমাধান করে সৃষ্টি ক'রে আশার আলোক ও জীবনে চিরসান্ত্বনা। শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন: 'ম ইদং পরমং গুহ্যম্' (১৮।৬৮) এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন: "যদি কোন মত (ধর্মমত বা সাধনপথ) আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হ'লে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে দেন"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ-দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণদিকে না গিয়ে উত্তরদিকে যায়, তাহলে অবশ্য পথে কেউ বলে দেয়—ওহে, ওদিকে যেও না—দক্ষিণদিকে যাও। সে ব্যক্তি কখনও না কখনও জগন্নাথ দর্শন করবে"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "অবশ্য পথে কেউ বলে দেয়" (জগন্নাথ-দর্শনের যথার্থ ও সঠিক পথ কি)। জীবনের পরমরহস্যকথাই তাই যে, ঈশ্বর অন্তর্যামীরূপে সাধকের অন্তরে থেকেই তার লক্ষ্যপথের সন্ধান দেন। এ'সন্ধানের ইঙ্গিত আসে বিবেক থেকে।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাবধান ও সতর্ক-বাণী প্রতিটি মানুষের স্মরণে থাকা উচিত। তিনি বলেছেন: "তবে অন্যের মত ভুল হয়েছে—এ'কথা আমাদের দরকার নাই। যাঁর জগৎ, তিনি ভাবছেন। আমাদের কর্তব্য—কিসে যো সো ক'রে জগন্নাথ দর্শন হয়"। সকল রকম ধর্মমত ও সাধনার পদ্ধতি, আচার-বিচার ও নির্দেশ ভিন্ন ভিন্ন হলেও লক্ষ্য যে ঈশ্বরদর্শন—তা সকলের জীবনেরই এককথা। তাই পথে ও মতেই যা বিভিন্নতা, লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। সেজন্য কোন ধর্মের বা ধর্মমতের সমালোচনা করা কারুরই উচিত নয়, আর একথা বলা ঠিক নয় যে, আমার ধর্ম ও আমার সাধনাই ঠিক ও শ্রেষ্ঠ, আর তোমার ধর্ম বা অন্য ধর্ম ও অন্যের সাধনা ভুল। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যাঁর জগৎ, তিনি ভাবছেন"। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্রে বাদরায়ণ-ব্যাস ও ভাষ্যকার শঙ্কর ঈশ্বরকেই (সগুণ-ব্রহ্মকেই) বিশ্ব-সৃষ্টির কারণ বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ঈশ্বরকেই জগৎকারণ ও জগন্নিয়ন্তা বলে মনে করেন। সুতরাং বিশ্বসৃষ্টির কর্তা ও নিয়ন্তা যিনি—তাঁরই কর্তব্য ও চিন্তা যে, কিভাবে বিশ্বকর্ম ও বিশ্বশৃঙ্খলা নিয়মিতভাবে রক্ষিত ও পরিচালিত হয়, আমরা তাঁর সৃষ্টি ও প্রজামাত্র। তাই সকল মানুষের কর্তব্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও লক্ষ্য রাখা এবং মনে করা (শুধু মনে করা নয়—বিশ্বাস করা) যে, তাঁর কার্য তিনিই করবেন, আমরা শরণাগত মাত্র।[৭]

৭। একটি গানেও সাধক বলেছেন: 'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি'।

এতে ক'রে ক্ষুদ্র-অহংভাব ও অভিমান মানুষের মধ্যে থেকে অন্তর্হিত হয়। ফলে প্রসারিত হয় সকলের চিন্তাক্ষেত্র ও জীবন, উৎসারিত হয় সকলের অন্তর বিশ্বপ্রাণ ঈশ্বরের পুণ্যস্পর্শ লাভ করার জন্য।

পূর্বেই বলেছি যে, কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন উপস্থিত। তাঁকে পরিবৃত ক'রে আছেন শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হাজরা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। শিবনাথ, কেদার এবং আরও অনেক ব্রাহ্মভক্তেরা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁদের সকলের উদ্দেশে বললেন: "তা তোমাদের মতটি (ব্রাহ্মমতটি) বেশ। মিছরীর রুটি সিদে ক'রে খাও, আড় ক'রে খাও, মিষ্টি লাগবে"।

সাকার ও নিরাকার। সাকার ঈশ্বর বিচিত্র গুণবিশিষ্ট ও শক্তিবিশিষ্ট। ঈশ্বরের সত্যকারের নির্দিষ্ট কোন রূপ নাই, তবুও ভক্তের ও সাধকের কাছে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেন। কোন গুণ নাই, তবুও ভক্তসাধকগণ বিচিত্র গুণের অধিকারী করেন ঈশ্বরকে। ঈশ্বর ভক্তদের দেখা দেন দুর্গা, কালী, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং আরও কত কি দেবদেবীরূপে। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে আছে: চৈতন্যঘন ব্রহ্ম রূপে রূপে (সৃষ্টিতে) আবির্ভূত হন—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। আবার অমূর্ত অরূপ হয়ে কেবলই থাকেন সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত শুদ্ধ চৈতন্যরূপে। এই শুদ্ধচৈতন্য ব্যাপক ও সর্বত্রবিস্তারী হলেও রূপায়িত বলে মনে হয়, কিন্তু কোন রূপই তাঁর সত্যকারের নাই, অথচ শত-সহস্র রূপ সেই অরূপসাগর থেকে নিত্যই ওঠে, ভাসে, আবার বিলীন হয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত গানই তার একটি সাক্ষ্য। গানটির বর্ণনার সৃষ্টিতত্ত্বের গভীর রহস্য নিহিত। গানটির কিছুটা অংশ পূর্বে উল্লিখিত হলেও এখানে সম্পূর্ণভাবে বলি—

এক, রূপ অরূপ নাম-বরণ
অতীত-আগামী-কালহীন,
দেশহীন সর্বহীন, নেতি নেতি বিরাম যথায়।
সেথা হ'তে বহে করুণধারা,
ধরিয়ে বাসনা বেশ-উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি
অহমহমিতি সর্বক্ষণ।
সে অপার ইচ্ছাসাগর মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি কে করে গণন॥
কোটি চন্দ্র, কোটি তপন, লভিয়ে সেই সাগরে জনম
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক—জ্যোতি-মগন।

তাহে বাসে কত জড়-জীব-প্রাণী,
সুখ-দুঃখ-জরা জনম-মরণ,
সেই সূর্য তারি কিরণ
যেই সূর্য সেই কিরণ।

সৃষ্টিতত্ত্বের সকল-কিছু বর্ণনা ক'রে পরিশেষে স্বামীজী অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত দুটি তত্ত্বেরই আভাস দিয়েছেন 'যেই সূর্য তারি কিরণ' ও 'যেই সূর্য সেই কিরণ'—এই দুটি কথায়।

তার পরের গানটি প্রলয়ের বা আকারের নিরাকারে পরিণতি—

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর।—প্রভৃতি

একটি সাকারে ও অপরটি নিরাকারে; একটি রূপে ও অপরটি অরূপে। এই অরূপ কিন্তু সত্তাহীন শূন্য নয়, তাও সত্তা বা সৎ, কিন্তু পরম ও চরম-সৎ বা সত্তা। সাকারে সত্তা—যা স্থূল ও বাস্তব সত্তা, আর নিরাকারেও সত্তা—যা পরমকারণসত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেজন্য বলেছেন, "মিছরীর রুটি সিদ্ধে ক'রে খাও। আর আড় ক'রে খাও, মিষ্টি লাগবে"। 'সিদ্ধে ক'রে' ও 'আড়ক'রে'—এই সাকারের ও নিরাকারের উপলব্ধি প্রায় একই রকমের, কেননা সাকারে সেই চিদ্‌ঘন-আনন্দের উপলব্ধি ও নিরাকারেও সেই চিদ্‌ঘন-আনন্দের অনুভূতি। সিদ্ধে ক'রে ও আড় ক'রে—এই দুটিভঙ্গীর শুধু পার্থক্য, বস্তু কিন্তু এক ও অভিন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "মকুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়" অর্থাৎ অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন একদর্শী মানুষের বুদ্ধি ভাল নয়, কেননা এ'সকল মানুষ সাকারকে গ্রহণ ক'রে নিরাকারের করে প্রশংসা, আবার নিরাকারকে গ্রহণ ক'রে সাকারকে করে নিন্দা ও বর্জন। জ্ঞানদৃষ্টি-মানুষের কথা স্বতন্ত্র, তাঁরা এক অখিণ্ডীয় চৈতন্যসত্তার দৃষ্টি নিয়ে সাকার ও নিরাকার উভয়কেই করে গ্রহণ ও উভয়েরই করে সমাদর ও প্রশংসা।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুরূপী প্রাণীর গল্প বলেছেন। বলেছেন যে, জানোয়ারটি এক, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার রূপের পরিবর্তনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছে বিভিন্ন সময়ে। ঈশ্বরও তেমনি এক ও অখিণ্ডীয়, হয়তো নামে ও রূপে তাঁর পরিবর্তন দেখা যেতে পারে, হয়তো তাঁকে কেউ বলে সাকার, আবার কেউ বলে নিরাকার, কিন্তু তাতে ঈশ্বরের কিছু যায় আসে না, তিনি স্বরূপে একই রকম চিরদিন থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরিশেষে তাঁর কথার যাথার্থ্য বা সত্যতার প্রমাণ দিয়ে বলেছেন: "বেদে তাঁকে (ঈশ্বরকে) সগুণ নির্গুণ দুই বলা হয়েছে। তোমরা (ব্রাহ্মভক্তগণ) নিরাকার বলছো। একঘেয়ে? তা হোক। একটা ঠিক জান্‌লে অন্যটাও জানা যায়। তিনিই জানিয়ে দেন। তোমাদের এখানে (সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে) যে আসে, সে এঁকেও জানে, ওঁকেও জানে (দুই একজন ব্রাহ্মভক্তের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ)।

ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে যাঁরা শুধু নিরাকার বলেন, তাঁরা একঘেয়ে, কেননা সাকার-রূপকে তাঁরা বাদ দেন নিরাকারকেই মাত্র সত্য ব'লে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন একটাকে মাত্র

সত্তা বলে অন্যটা মিথ্যাতেই পরিণত হয়। সুতরাং এইদৃষ্টি একদেশী ও একঘেয়ে। তাই যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টি ও বোধশক্তি নিয়ে তিনি বলেছেন যে, এ'দৃষ্টি ভাল নয়, কেননা নিরাকারকে জান্‌লে সাকারকেও জানা হয় ;—যেমন ভালকে জান্‌লে মন্দকেও জানা হয়, আলোককে জান্‌লে অন্ধকারকেও জানা হয়। ভালো ও মন্দ—আলোক ও অন্ধকার পরস্পরে আপেক্ষিক। যেমন দুই বল্লে একের ধারণা আসে। সে'জন্য আচার্য শঙ্কর দ্বৈতদৃষ্টিকে খণ্ডন ক'রে যখন অদ্বৈতদৃষ্টির কথা বলেছেন, তখন দ্বৈত ও অদ্বৈত দুটি সত্তার কথাই স্বতই মনে ভাসে। সেজন্য তিনি ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকৃত আভাস বা ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—'দ্বৈতাদ্বৈতবিনির্মুক্তম্', অর্থাৎ ব্রহ্ম এক নয়, দুইও নয়, এক ও দুইয়ের অতীত—সর্বোপরম পরম ও তুরীয় বস্তু। তবে তিনি (ব্রহ্ম) একেরও যেমন অধিষ্ঠান বা আধার, দুইয়ের বা বহুরও তেমনি অধিষ্ঠান বা আধার। আবার সত্তাকারের আধার ও কারণ তিনি কোন-কিছুরই নন।

●

॥ ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

(বেদান্তের আলোকে)

স্বামী প্রতানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ব্রাহ্মসমাজের কট্টোর পন্থীদের কাহারও কাহারও মতে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনকে অনুসরণ করেই চলেছিলেন। একজন লিখেছেন, "In his conception of God and in his opposition to Advaita Vedanta, he did not go beyoud Rammohan Roy".[৩৯] কিন্তু অধিকাংশ মননশীল ব্যক্তিই রামমোহন হতে দেবেন্দ্রনাথের মতান্তর লক্ষ্য করেছেন। এমন কি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে মতের ক্রমপরিবর্তন তথা তাঁর ধর্মতত্ত্বের ক্রমপরিণতি বিচার করে দেখেছেন। সর্বপ্রথম, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্বের ক্রমপরিণতির রূপরেখাটি অজিতকুমার চক্রবর্তীর ভাব ও ভাষাতে আমরা অনুসরণ করব। ধর্মতত্ত্ববিৎ দেবেন্দ্রনাথের আপনার ভিতরকার আধ্যাত্মিক জীবনের তাড়নায় 'এ দেশের এবং বিদেশের সমস্ত দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র' আত্মসাৎ করে তাঁর জীবনদর্শনের সত্যোপলব্ধিগুলিকে একটি বড়ো পরিণামের সূত্রে গেঁথেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ স্থির করলেন "ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি···তিনটি জিনিষ একযোগে। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞান বা নিঃসংশয় বা নির্মল জ্ঞান, বিশুদ্ধসত্ত্ব বা বিশুদ্ধহৃদয়, এবং মনের আলোচনা বা ধ্যানধারণা।" [৪০] তিনি শঙ্করাচার্যের জীবব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক তত্ত্ব বা ঐ অভেদপ্রতিপাদক উপনিষদ্ বাক্য গ্রহণ করতে পারলেন না। দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' রচনা করলেন

৩৯। Pijus Kanti Das : Raja Rammohan Roy and Brahmonism, 1970, p. 111

৪০। অজিতকুমার চক্রবর্তী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা, পৃঃ ৫৫২

১৮৫০-৫১ সালে। "শাঙ্কর বেদান্তদর্শনের মতকে এই আত্মতত্ত্ববিদ্যায় তিনি খণ্ডন করিতে গিয়া একদিকে পাশ্চাত্ত্য কার্তিজীয় দর্শনের (Cartesian philosophy) বিষয়-বিষয়ীর দ্বৈত মতকে গ্রহণ করিলেন, অন্যদিকে বেদান্তের পরমাত্মার শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব অদ্বিতীয় ও নির্গুণ স্বরূপের মতকেও গ্রহণ করিলেন। কেবল পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা ও জড়ের একান্ত ভিন্নতা আছে, এই মতই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করিবার জন্য শাঙ্কর মতকে তিনি স্বীকার করিলেন না।"[৪১] পরবর্তী গ্রন্থ "ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস" (১৮৫১-৬০) গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অজিতকুমার লিখেছেন, "তিনি (দেবেন্দ্রনাথ) উপনিষদ্-বেদান্তের মূল সত্যগুলিকে মত ও বিশ্বাসের আকার দান করিতে গিয়া পশ্চিমের প্রাচারল থিয়োলজি ; বাটলার, কেলি, চামার্স, প্রভৃতির রচনা ; রীড্, হ্যামিলটন, ডিউগ্যাল্ড ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি স্কচ্ দর্শনকারদের লেখা ; বেন্থাম, মিল প্রভৃতি ইউটিলেটারিয়ন-বাদ, কান্টের নীতিশাস্ত্র—এ সমস্ত বিচিত্র মালমসলা, হাপড়, হাতুড়ি আনিয়া ফেলিয়াছেন।.....ইহাদের সাহায্যে বেদান্ত-উপনিষদের মতগুলিকে গড়িয়া-পিটিয়া ঘসিয়া-মাজিয়া একালের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া দিয়া গিয়াছেন এইখানেই তাঁহার মস্ত কৃতিত্ব।"[৪২] সংক্ষেপে যে ঘোর দ্বৈতমত আত্মতত্ত্ববিদ্যার প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে পুরাপুরি না খণ্ডিত হইলেও, তাহার বিচ্ছেদগুলি যে ক্রমশঃ মিলিত হইবার দিকে চলিয়াছে, ইহা বেশ লক্ষ্য করা যায়।" তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬০-৬১)। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে বলা হইল যে, আত্মাতে তাঁহার রূপ, জগতে প্রতিরূপ। আত্মাতে তাঁহার সাক্ষাৎ-রূপ বিরাজ করিতেছে। "আত্মা তাঁহার শরীর।" "জীবাত্মা পরমাত্মা এত নিকট যে তাঁহাদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই।" অজিতকুমারের মন্তব্য : "দেবেন্দ্রনাথের সাবেক দ্বৈতমত গিয়া ব্যাখ্যানে পুরা শাঙ্কর অদ্বৈত মত না দাঁড়াইলেও অদ্বৈতঘ্যাঁষা মত দাঁড়াইয়াছে বলা যায়। পুরা অদ্বৈত মত হইলে মুক্তি একেবারে কৈবল্যমুক্তি হইয়া বসে, তাহাতে ব্যক্তির স্বাধীন কর্তৃত্বের ও ক্রমিক উন্নতির স্থান থাকে না।"[৪৩] "এখানে দেখা গেল আত্মার স্বাধীনতার সার্থকতা, স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের অধীন হওয়া। তাঁর সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ পুরুষে-পুরুষে স্বাধীন সম্বন্ধের মতো। সে-সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই আত্মার ক্রমিক উন্নতি। বোধ হয় এই কথাটাই ব্যাখ্যানের একমাত্র সারকথা।" দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমভক্তির সাধনায় হাফেজকে সঙ্গী করেছিলেন, বাংলার বৈষ্ণবকবিদের তিনি ঠাঁই দেন নি। আর খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বা সলোমোনের গান তাঁর কাছে ছিল একেবারে নিষিদ্ধ বস্তু।

যোদ্ধাকথায় দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ নির্মল অংশই ব্রাহ্মধর্ম। তত্ত্ববোধিনীতে লেখা হয় "একেশ্বরবাদই হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্ট অংশ, তাহা হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ মত। হিন্দুধর্মের সেই একেশ্বরবাদই ব্রাহ্মধর্ম। জনৈক সমালোচকের অনুমান এটির লেখক স্বয়ং

৪১। অজিতকুমার চক্রবর্তী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা, পৃঃ ১৪০

৪২। ঐ পৃঃ ১৪১-২

৪৩। ঐ পৃঃ ১৬২-৩

দেবেন্দ্রনাথ।" [৪৪] সহকর্মী রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার মাত্র। দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখদের অবদান সম্বন্ধে 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত' (পৃঃ ৯৯) লিখেছে, রামমোহন রায়ের কৌশল অনুসারে হিন্দুভাব রক্ষা করত পৃথিবীর আর আর প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র হইতে সত্যগ্রহণ না করিয়া হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে এই বিশ্বজনীন ধর্মকে বদ্ধ রাখা হইল।" এই ধর্মের উপাস্য হলেন, "পরমবন্ধু এবং তাহা হইতেও অধিক, তিনি পরমপুরুষ।" "তিনি পূর্ণ পুরুষ, আমরাও প্রকৃতি হইতে উচ্চপদে, আমরাও পুরুষ।" "তিনি আমাদের পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা, সখা সকলি।" "জীবাত্মা পরমাত্মা এত নিকট যে তাহাদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই।···আত্মা পরমাত্মা উভয়েই একত্র রহিয়াছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা।" দেবেন্দ্রনাথের "আত্মতত্ত্ববিদ্যার" জগৎ, আত্মা ও পরমাত্মা এ তিনের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ দেখা গিয়েছিল, 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে' ব্যবধান সঙ্কীর্ণ হয়। রামমোহন ও রামচন্দ্রের অদ্বৈতবেদান্ত দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে ঘোর দ্বৈতবাদ এবং ক্রমে তা হতে বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব আশ্রয় করে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদের ধ্যান-ধারণায় মৌলিক পরিবর্তন উপস্থিত হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "রামমোহনের কঠোর যুক্তিবাদী ধর্মের আসন সরিয়ে, সেখানে সরল ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হল, যা ছিল 'সমাজ', সর্বধর্মের ঈশ্বরবিশ্বাসীর ব্রহ্মোপাসনার কেন্দ্র, The Universal Religion-এর পীঠস্থান তা হ'ল মন্দির।" [৪৫] এই পরিবর্তনই আপেক্ষিক-ভাবে স্থায়ী হয়। ব্রাহ্মধর্মের সুনির্দিষ্ট চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে।

রামমোহন হতে দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত ব্রাহ্ম-আন্দোলনের উত্তরণে চিন্তাশীল বিপিনচন্দ্র পাল লক্ষ্য করেছিলেন, "কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ রাজার চরিত্রের প্রভাবেই ফুটিয়া ওঠেন, রাজার বিশিষ্ট সাধনপন্থার কিম্বা তত্ত্বসিদ্ধান্তের অনুশীলন করেন নাই। ফলতঃ দেবেন্দ্রনাথ রাজার সিদ্ধান্ত ও সাধন দুই-ই বর্জন করেন। তত্ত্বসিদ্ধান্তে রাজা অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন।···মহর্ষি ভক্তিবাদী ছিলেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদের নামগন্ধমাত্র তিনি সহিতে পারিতেন না। রাজা তান্ত্রিক সাধক ছিলেন···মহর্ষির সাধন অন্যপথ ধরিয়া চলিয়াছিল;···ভক্তিসাধনায় মহর্ষি ইসলামীয় ভক্তির সখ্যরসের বিশেষ অনুবর্তন করিতেন। রাজার ভক্তি রসের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল কিনা সন্দেহ।" [৪৬]

এই ধর্মমতের উত্তরণকালে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় রামমোহনের অদ্বৈতবাদভিত্তিক নির্গুণ একেশ্বরবাদের স্থান অধিকার করেছে উপনিষদের সগুণ নিরাকার ঈশ্বরবাদ। শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত রামমোহনের বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্মকে স্থানচ্যুত করেছে 'আত্মপ্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম। এ-প্রক্রিয়াতে যে দার্শনিক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল সেসম্বন্ধে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর অদ্বৈতকে

৪৪। 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তত্ত্ববোধিনী সভা', দিলীপকুমার বিশ্বাস : ইতিহাস, ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। পৃঃ ৪৮

৪৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, পৃঃ ২০১

৪৬। বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের বাংলা, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৬৮-৯

খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়া, সগুণ-ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিলেও তদ্দ্বীয় পরিণামবাদ অস্বীকার করিয়াছেন। অথচ বিবর্তবাদ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে বিবর্ত উপাদানকারণ বলা অনর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র। এ অতি অদ্ভুত মীমাংসা; পরিণামবাদও নয়, বিবর্তবাদও নয়, অথচ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশে ও গতিতে কোন একটি মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত যদি দেবেন্দ্রনাথ না দিতে পারিলেন, তবে কি করিয়া অন্ততঃ তিনি শাঙ্কর মায়াবাদের প্রতিবাদ করিলেন তাহা বুঝা কঠিন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন অতিবড় সৌন্দর্যের উপাসক, তিনি সাধক ছিলেন, দার্শনিক তত্ত্বো ছিলেন না। তাহাতে তাঁহার চিরপূজ্য মহিমা খর্ব হয় না।"[৪৭]

ব্রাহ্ম-আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথ চিরকালের প্রেরণাময় পুরুষ। ধর্মতত্ত্ববিৎ দেবেন্দ্রনাথের অবদানকে মহিমাময় করে তুলে ধরেছেন তাঁর জীবনীলেখক। তিনি লিখেছেন, "এই ধর্মতত্ত্বের মীমাংসার ব্যাপারে, তিনি উপনিষদ-বেদান্তের মূল সত্যগুলিকে মত ও বিশ্বাসের আকার দান করিতে গিয়া পশ্চিমের দেকার্ত হইতে কান্টের দর্শন, স্কচরল থিয়োলজি, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের উপাদান-উপকরণের সাহায্যে ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমনি করিয়া তিনি যে বেদান্ত-উপনিষদের মতগুলিকে একালের ব্যবহারের উপযোগী করিয়াছেন, ইহাই তাহার প্রধান কৃতিত্ব। একদিকে পূর্বদেশের দর্শনের ও সাধনার ধারা, অন্যদিকে পশ্চিমের দর্শনের ধারা—এই দুই বিপরীত তত্ত্ব ও সাধনার ধারাকে জীবনের ভিতর হইতে মিলাইয়া ভাবী যুগের কাছে এক জীবন্ত ধর্মরূপে দান করিয়া যাওয়ার মতো আশ্চর্য ব্যাপার এ যুগে আর কাহারো দ্বারা ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।"[৪৮] ব্রাহ্মনেতার এই অক্ষয়কীর্তি এক আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু ভাবীযুগ তাঁর আবিষ্কৃত জীবন্ত ধর্মকে গ্রহণ করেনি। এর কারণও সুস্পষ্ট। "Philosophy of Brahmoism"-গ্রন্থের লেখক সীতানাথ তত্ত্বভূষণ দেবেন্দ্রনাথের অবদানের মূল্যায়ন করেছেন, অপ্রিয় এক সত্যকথা লিখেছেন: "I concluded that the discarding of Vedantism by the Brahmo Samaj under the Maharshi was a great mistake—one which had done and was going a good deal of harm to the Brahmo Samaj. It had led to a neglect, on the part of the Brahmos, of our ancient scriptures and was thus discouraging scholarship and causing spiritual sterility. It had also created an unnecessary gulf between the old and the new society, leading many Brahmos to call themselves non-Hindus and cease from taking a just pride in the glorious literary and spiritual achievement of the Hindu race."[৪৯] দেবেন্দ্রনাথ জানতেন হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে "এদেশে ব্রাহ্মধর্মের

৪৭। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী: স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী, নবভারত পাবলিশার্স, পৃ: ১১৪-৫

৪৮। অজিতকুমার চক্রবর্তী: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা, পৃ: ২০

৪৯। D. S. Sharma: Hinduism through the Ages, Bharatiya Vidya Bhavan, 1961, p. 64 footnote.

প্রচার বিষয়ে নিঃসংশয়" হতে পারবে না। কিন্তু তিনিই তাঁর ভাব ও বিচারের বিবর্তনের ফলে হিন্দুর শিরোমণি অদ্বৈতত্ত্ব বর্জন করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত সাধনার রূপ একটি মত আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিলেন।

রামমোহনের ধর্মভাবনা দুটি মৌলসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। "মনুষ্যের যাবৎ ধর্মকে দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন : এক এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা, দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যেতে এবং সাধুব্যবহারে কালহরণ করা।"[৫০] এই মৌল সত্যও দেবেন্দ্রনাথের "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধজ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ে" সুমর্যাদায় সুরক্ষিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের মধ্যবর্তী কালেই রামমোহনের নিটোল যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-আন্দোলনসৌধে ফাটল ধরে গেল। রামমোহনের অদ্বৈতবেদান্তের স্থান অধিকার করল দ্বৈত, কখনও বা দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব। ভক্তিবাদের বিচ্ছুরণে ব্রাহ্ম আন্দোলন ক্রমেই অবিভূত হয়ে পড়ে। পরিমণ্ডলের চাপে ও চিন্তানায়কদের বিশেষ মানসিকতার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে স্বাভাবিক কারণেই আদেশবাদ, গুরুবাদ প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজদেহে অনুপ্রবেশ করে। কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে আদেশবাদ, অবতারবাদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রচণ্ড বিরোধ ও বিক্ষোভ হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ নিজে যদিও এই বিরোধের সামিল হয়েছিলেন, অতীতের ঘটনা বিশ্লেষণ করে জানা যায় এসকল 'বিকৃতির' উৎস দেবেন্দ্রনাথের অবিরোধী চিন্তা ও আচরণ। প্রচলিত উপনিষদের বিশুদ্ধাংশ ও স্মৃতিশাস্ত্র হতে সঙ্কলিত অনুশাসন নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম'-গ্রন্থ রচনা করেন। কেশবচন্দ্রকে আচার্যপদে বরণ করে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর হাতে তুলে দেন 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ। সেইসঙ্গে আবেগভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, "এই ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটিমাত্র বিন্দু নষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবে না।" পরবর্তীকালের ঘটনা হতে এই বাণীর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েই নি, উপরন্তু দেবেন্দ্রনাথের উত্তরসাধকদেরকে আদেশবাদ, গুরুবাদ, অলৌকিকতা, মহাপুরুষবাদ ইত্যাদির দিকে প্ররোচিত করেছিল। পাঠক নিশ্চয়ই জানেন যে দেবেন্দ্রনাথ অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্র সেনকে আচার্যপদে বরণ করেছিলেন দৈববাণী মারফৎ প্রাপ্ত ঈশ্বরাদেশ পালনের জন্যই।

এ'প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করা দরকার যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈতবেদান্ত বর্জন করেছিলেন তাঁর স্বভাবজ ভক্তির উৎস শুকিয়ে যাবার আশঙ্কায়। অথচ তাঁর সমকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার উপকণ্ঠে নীরবে নিভৃতে ভক্তিপথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন, চূড়ান্ত অদ্বৈত-তত্ত্বানুভব করেছিলেন, এবং সর্বভূতে তাঁর ব্রহ্মোপলব্ধির নবরূপায়ন করে মানব-সাধারণের চেতনায় রূপান্তর এনেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পুত্র ও আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও দেখি অদ্বৈত-বিদ্বেষী। তাঁর "গীতাপাঠ" (১৩৩২)-গ্রন্থে আমরা পড়ি তাঁর লেখা : শঙ্করাচার্যের মতো অত

৫০। রামমোহন গ্রন্থাবলী (৪) : ব্রহ্মোপাসনা, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ: ৫১

বড় একজন পাকা মাঝি জ্ঞানতরীকে অজ্ঞান সমুদ্রের সাগরপথ নির্বিঘ্নে পার করাইয়া আনিয়া মোক্ষভাণ্ডারে পৌঁছিবার সময়কালে যদি কিনারায় নৌকাডুবি করেন তবে তাহাতে কি প্রমাণ হয়? তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, নৌকার তলায় কোনো না কোনো স্থানে ছিদ্র আছে। সে ছিদ্র হচ্ছে কঠোর অদ্বৈতবাদ।" বলাবাহুল্য এ ধরণের সিদ্ধান্তে যথেষ্ট স্পর্ধার সঙ্গে শঙ্কর অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রমাণ করা হয়েছে। যুক্তিবিচারের চাইতে গোঁড়ামিই মাথা চাড়া দিয়েছে। এই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনী হতে আমরা পাই "অদ্বৈতমতের সমালোচনা" (১৮৯৬) এবং অদ্বৈতমতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা" (১৮৯৭)।

তখনকার দিনে অদ্বৈতবেদান্ত বিষয়ে বাঙালী চিন্তানায়কদের বিভ্রান্তির পরিধি ও গভীরতা ব্যাপক। বাঙালী পাদরী রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "ষড়দর্শন সংবাদে" (১৮৬৭) অদ্বৈততত্ত্বের মৌল বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন: শঙ্করের মতে আত্মাতে অবিদ্যারোপ করা অবিদ্যার কার্য, সুতরাং বস্তুতঃ আত্মা অবিদ্যা সংযুক্ত নহেন, তিনি যদি অবিদ্যা যোগ ব্যতীত সৃষ্টি করিতে না পারেন, তবে তো তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা বলাও অবিদ্যার কার্য। সুতরাং অবিদ্যা একাকিনী জগৎজননী হইলেন।"

বেদান্তচর্চা বাঙ্গালাদেশে অপ্রতুল হলেও অপ্রচলিত ছিল না। রামমোহনের কালেই প্রবীন মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা অদ্বৈতবেদান্তের যথেষ্ট চর্চা করতেন। স্বয়ং রামমোহনের লেখাতেও অন্ততঃ দুটি স্থলে এবিষয়ে স্বীকৃতি দেখতে পাই।[৫১] তবে আলোচ্যকালে বেদান্তচর্চা কি ধরণের হচ্ছিল তার একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় শ্রীশ্রীভাগবতী সভার মুখপত্র "অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা"। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল, "এতৎ পত্রিকার মুখ্য প্রয়োজন সমস্ত-তত্ত্ব স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় পরিকর সহিত নিত্য লীলাবিশিষ্ট নরাকৃতি পূর্ণব্রহ্ম। অভিধেয়তত্ত্ব ভদ্রাগানুগা ভক্তি। প্রয়োজনতত্ত্ব ব্রজবাসী জনানুগত প্রীত্যানুগত প্রীতি"। প্যারীচাঁদ মিত্র রাজা রাধাকান্তদেব ও রামকমল সেনের ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বুঝিয়েছেন সালোক্য, সাযুজ্য ও নির্বাণ সমার্থক এবং শুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বদ্যোতক (Pure monothistic)।

শুধু বাঙ্গালা দেশে কেন, বাঙ্গালার বাইরে বিভিন্ন চিন্তাবিদের চিন্তাপুটে বাসা বেঁধেছিল অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্তির জাল। দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। আলোচ্যকালে হিন্দুধর্মের একজন বলিষ্ঠ ধর্মসংস্কারক। তিনি তাঁর সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থে অদ্বৈতবাদসমীক্ষা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে শঙ্করাচার্য জৈনমত খণ্ডনের জন্য যে মতবাদ খাড়া করেছিলেন সে মতবাদ অদ্বৈততত্ত্ব নামে প্রচলিত। শঙ্করাচার্যের এই মতে আত্মা ছিল না। আর এ মতে যদি তাঁর আত্মা থাকে তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করেছিলেন।

বিদেশিনী থিয়োসফিষ্ট নেতা এনি বেসান্ত ভারতীয় হিন্দু-চিন্তার প্রবল পরিপোষক, তিনি থিয়োসফির অলৌকিক তত্ত্বাবলীর জালে জড়িয়ে বেদান্ততত্ত্বে অনুপ্রবেশ করেছিলেন।

৫১। রামমোহন গ্রন্থাবলী: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮ ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১২৬

বিদেশিনী বিদুষী দেশসেবকের প্রেরণায় দেশে বেদান্তচর্চা পুষ্টিলাভ করে সন্দেহ নাই। কিন্তু বেদান্ত অদ্বৈতবেদান্তের মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেন নি।

নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে উপনিষদ এবং বেদান্ত ও সে-সঙ্গে আদি ব্রহ্মসমাজও বিশিষ্ট ভূমিকার জন্য গৌরবের অধিকারী। কিন্তু রামমোহনোত্তর ব্রাহ্মনেতাদের মধ্যে উপনিষদ ও বেদান্ত সম্বন্ধে বিভ্রান্তির ধূলিজালে বর্তমানের পাঠকদের কাছে মূল তথ্য অনেকাংশে অস্পষ্ট। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অদ্বৈতবেদান্তকে ভয়াবহ দর্শন বলে বর্জন করেছিলেন। এবং রামমোহনের বেদান্তমত ব্রহ্মসূত্রাশ্রিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছেন, "রামমোহন রায় যদিও সকল ধর্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়াই একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজকে একমাত্র উপনিষদ শাস্ত্রের উপরেই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই পন্থাই অনুসরণ করিতেছেন"।[৫২] তিনি ১৯২৩ সালে এই চিঠি লিখেছেন। কিন্তু রামমোহনোত্তর ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ইতিহাস হতে জানি ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি দেবেন্দ্রনাথ সৃষ্ট তথা সঙ্কলিত "ব্রাহ্মী-উপনিষদ" রামমোহন গৃহীত সুপ্রাচীন উপনিষদ গ্রন্থাবলী নয়, অথবা তাঁর প্রদর্শিত বেদান্তভাষ্যও নয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ বেদান্তকে বর্জন করেছিল, কিন্তু অন্যতম নেতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনীতে পাই এই গোলমেলে উক্তি। (ক্রমশঃ)

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণলীলাঙ্গনে : পণ্ডিত পদ্মলোচন ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

॥ দুই ॥

জীবনকথা (অবশিষ্ট) :

[সদাচারিতা ও মহানুভবতা]

'বহু গুণে বিভূষিত প্রতিভা-উজ্জ্বল।
দীনে দয়া ইষ্টনিষ্ঠা উদার সরল॥'—পুঁথি, ১২২

"[ন্যায়-বেদান্তাদির] শব্দজালরূপ মহারণ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে, পণ্ডিতজীর এত সুখ্যাতি লাভ হইয়াছিল, তাহা নহে। লোকে দৈনন্দিন জীবনেও তাঁহাতে সদাচার, ইষ্টনিষ্ঠা, তপস্যা, উদারতা, নির্লিপ্ততা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির পুনঃ পুনঃ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট সাধক বা ঈশ্বরপ্রেমিক বলিয়া স্থির করিয়াছিল।"—লীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্থ, ১০০

পণ্ডিত পদ্মলোচন ভট্টাচার্য কেবল অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বিচারদক্ষতা ও মহোচ্চ পদমর্যাদার জন্যই দেশময় সুপ্রসিদ্ধ এবং আপামর সাধারণের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন না।

৫২। সাহিত্য সাধকমালা (ষষ্ঠ খণ্ড) : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬৬-৭

বস্তুতঃ ঐগুলির সঙ্গে ইনি অন্যান্য আরও বহু মহদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। এঁর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার আড়ম্বরশূন্যতা, সত্যনিষ্ঠা, নির্লোভতা, সদাচারিতা, ঈশ্বরপ্রাণতা প্রভৃতি গুণাবলীও সবাইকে পরম আকৃষ্ট ক'রত।

তর্কালঙ্কার মহাশয় অত্যন্ত সরল, উদার, প্রেমিক, মিষ্টভাষী, স্পষ্টবাদী ও আচারনিষ্ঠ ছিলেন। সেকালের নৈষ্ঠিক ও কুলীন ব্রাহ্মণগণের চিরাচরিত কুলরীতি অনুসারে ইনি কখন নিম্নবর্ণের দান গ্রহণ করতেন না। ইনি অতিশয় দয়ালু, দানশীল এবং মমতাপরায়ণ ছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দীন-দুঃখী ও বিপন্নদের সাহায্য ও সেবায় ইনি মুক্তহস্তে প্রচুর দানধ্যান করতেন। গৃহী এবং বিষয়শালী হয়েও ইনি সংসারে ও বিষয়-আশয়ে সর্বদাই একান্ত নির্লিপ্তভাবে থাকতেন।

(খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা)

দেশে ও বিদেশে সর্বত্রই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এমনই সম্মান, সুযশ ও জনপ্রিয়তা ছিল যে, ইনি যখন যেখানে গমন করতেন, তড়িৎগতিতে সে-সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। তার ফলে, জিজ্ঞাসু পণ্ডিতগণ, তত্ত্বান্বেষী ভক্তবৃন্দ এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা এঁর পূত সঙ্গ ও উপদেশাদি লাভের জন্য দলে দলে সেখানে উপস্থিত হতেন। অনুরাগী ও জিজ্ঞাসুদের পেয়ে ইনি আহার-বিশ্রাম প্রভৃতির কথা ভুলে যেতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় তত্ত্বের আলোচনা ও ধর্মপ্রসঙ্গে নিমগ্ন থাকতেন। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ অবস্থাতেও এঁর ঐ স্বভাবের মধ্যে কোনও পরিবর্তন লক্ষিত হত না।

এঁর মুখে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ শুনে কেবল পণ্ডিতেরাই নন, ধর্মপ্রাণ সাধারণ ব্যক্তিরাও পরম আকৃষ্ট হতেন। এঁর মধুর কথাবার্তা ও অমায়িক প্রকৃতির জন্য সকলেই এঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি ক'রত। ইনি অত্যন্ত গুণগ্রাহীও ছিলেন—কারও মধ্যে কোন সদ্‌গুণের সামান্যতম প্রকাশ দেখলেও মুগ্ধ হতেন এবং তাকে যথেষ্ট উৎসাহ, ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদানে চরিতার্থ ক'রতেন।

(শেষজীবন ও লোকান্তর)

তর্কালঙ্কার মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে 'যৌকালীন জ্বরে' আক্রান্ত হন। এঁর ঐ পীড়া ক্রমশঃ জটিল হয়ে ওঠে। তখনও এঁর নিকট দেশ-বিদেশের পণ্ডিত ও জিজ্ঞাসুগণের আসা-যাওয়া বন্ধ হয় না। ওরূপ অসুস্থাবস্থায়ও ইনি তাঁদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম তত্ত্বালোচনা ক'রতেন, আবার দূরান্তরের অনেক জিজ্ঞাসুকে লিখিতভাবে পত্রাদির মাধ্যমেও তাঁদের প্রশ্নমালার সমাধান ক'রে পাঠাতেন।

যাহোক, বর্ধমানের কবিরাজ-বৈদ্যগণ এঁর বহু চিকিৎসা করেন, কিন্তু তেমন সুফল লাভ হয় না। অবশেষে বায়ু-পরিবর্তন ও আরও উত্তম চিকিৎসাদির জন্য এঁকে ক'লকাতায় নিয়ে আসা হয়। এঁর তত্ত্বাবধানের জন্য সঙ্গে এঁর এক পুত্রও আসেন।

গঙ্গার নির্মল বায়ুসেবনে এবং গঙ্গাজল পানে এঁর উপকার হবে, এই ভরসায় এঁকে কলকাতার অনতিদূরে এঁড়েদার নিকট কামারহাটীতে গঙ্গার তীরে বিল্বলাচরণ বিশ্বাসের বাগানবাড়িতে রাখা হয়। এঁর আগমন সংবাদ শুনে একদিন রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এঁকে বিশেষ সম্মানসহকারে শোভাবাজারের নিজ রাজবাড়িতে আনয়ন করেন। এঁর উপস্থিতির সংবাদে শহরস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও পণ্ডিতবর্গ দলে দলে সেখানে সমবেত হন। ঐ অসুস্থ শরীরেই ইনি সেখানে পরম উৎসাহে শাস্ত্রালোচনা করেন এবং জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নগুলির উত্তরও দেন।

যাহোক, কামারহাটীর ঐ উদ্যানে এঁর আগমন ও অবস্থানের সংবাদ শুনে, সেখানেও প্রতিদিন বহু জিজ্ঞাসু পণ্ডিত ও অনুরাগী ভক্তগণের সমাগম হতে থাকে। এইরূপে এঁর উপস্থিতিতে সেখানে কয়েকটি পণ্ডিতসভারও অধিবেশন হয়। যা হোক, তখনও ইনি জিজ্ঞাসুগণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় তত্ত্বের আলাপন এবং দূরান্তরের পণ্ডিতদেরকে পত্রাদি লিখে তাঁদের প্রশ্নের মীমাংসা-সাধনে বিরত থাকেন না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কামারহাটীর ঐ বাগানবাড়িতে অবস্থানকালেই ইনি পত্রে নিবদ্ধ লিখে পণ্ডিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের শাস্ত্রীয় প্রশ্নের মীমাংসাসূচক উত্তর প্রদান করেন এবং ঐ বাগানবাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে এঁর মধুর মিলন ঘটে।

পণ্ডিত পদ্মলোচন স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে ঐ বাগানবাড়িতে কিছুকাল বাস করেন। কলকাতার চিকিৎসকগণের চিকিৎসায়, বিশেষতঃ গঙ্গার নির্মল বায়ু সেবনের ফলে, গোড়ার দিকে ইনি কিছুটা সুফল পান। কিন্তু পরে এঁর পীড়ার জটিলতা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকে। তখন ইনি আরোগ্যলাভ বিষয়ে নিরাশ হ'য়ে পড়েন।

৺কাশীধামের প্রতি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিশেষ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও আকর্ষণ ছিল। ঐ পুণ্য শিবক্ষেত্রে দেহত্যাগ ঘটলে, পুনর্জন্ম হয় না—এইরূপ বিশ্বাস ও ভক্তির বশে, অবশেষে ইনি নিজ ঐ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পুণ্যধামে গমন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ৺বিশ্বনাথের শ্রীচরণে বিলীন হন।

লীলাবার্তা :

(গোড়ার কথা)

'একরূপ শ্রীপ্রভুর দেখি নিরন্তর।
গুণ বর্ত্তমান যেথা সেখানে আদর॥
দয়াগুণে দাতা কিবা পরহিতাচারী।
সাধারণ মধ্যে যার যশ-মান ভারি॥
শাস্ত্রজ্ঞ সাধক কিবা সাধু কিবা ভক্ত।
যে কোন ভাবের কিবা সম্প্রদায়ভুক্ত॥
স্থানাস্থান মানামান বিচার বিহীনে।
অযাচিত হইয়াও গমন সেখানে॥'—পুঁথি, ১২২

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধু-ভক্ত, দাতা-জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত প্রভৃতির সাহচর্য লাভ এবং তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাদি করতে বিশেষ ভালবাসতেন। দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে ওরূপ কেউ এলে, তাঁর সঙ্গে মেলা-মেশা ও প্রসঙ্গ ক'রে তিনি পরম আহ্লাদিত হতেন। আবার অন্যত্র কোথাও ওরূপ কারও সন্ধান পেলেও তিনি অযাচিতে তাঁর নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটে যেতেন। ঐ অভিলাষে তিনি কোথাও একাকী, কোথাও মথুরবাবুসহ, কোথাও বা ভাগ্নে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে গমন ক'রতেন। ঐ বিষয়ে তাঁর আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য ক'রে মথুরবাবু আবার কখন কখন ঐরূপ সজ্জন পুণ্যাত্মাদের সাদর আমন্ত্রণ ক'রে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতেও নিয়ে আসতেন।

(পদ্মলোচনকে দেখার জন্য ঠাকুরের আগ্রহ)

'লোকপরম্পরা প্রভু করিলা শ্রবণ।
বিখ্যাত পণ্ডিত নাম শ্রীপদ্মলোচন॥
সভাপণ্ডিতের পদে বর্ধমানে আছে।
সসম্মানে তথাকার অধিপের কাছে॥
প্রভুর প্রবল ইচ্ছা হইল তখন।
দেখিবারে কেমন বিখ্যাত পণ্ডিত কেমন॥'—পুঁথি, ১২২

শ্রীরামকৃষ্ণ লোকপরম্পরায় পণ্ডিত পদ্মলোচনের কথা জানতে পারেন। তিনি শোনেন যে, এই পণ্ডিত মহাশয় কেবল বহু শাস্ত্রবেত্তা এবং বিচারদক্ষই নন; একজন অতি উদার, অমায়িক, সদাচারনিষ্ঠ এবং তত্ত্বান্বেষী সাধকও বটে।

সাধারণতঃ পাণ্ডিত্য ও ভগবদ্ভক্তির একত্র সমাবেশ সংসারে দুর্লভ। অতএব এই সদাত্মার মধ্যে উল্লিখিত উভয় গুণেরই মধুর সম্মেলন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। তার ফলে, তিনি এই শাস্ত্রজ্ঞ সাধককে দর্শন করার জন্য এমনই ব্যাকুলিত হন যে, মথুরবাবু তাঁকে ঐ উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বর্ধমানে পাঠানোর জন্য মনস্থ করেন।

এ-প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন,—"ঠাকুরের মনে যখনি যে কার্য করিবার ইচ্ছা হইত, তখনই তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য বালকের ন্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। 'জীবন ক্ষণস্থায়ী যাহা করিবার শীঘ্র করিয়া লও'—বাল্যাবধি মনকে ঐ কথা বুঝাইয়া তীব্র অনুরাগে সকল কার্য করিবার ফলেই বোধহয়, ঠাকুরের মনের ঐরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। আবার একনিষ্ঠা ও একাগ্রতা অভ্যাসের ফলেও যে মন ঐরূপ স্বভাবাপন্ন হয়, একথা অন্য চিন্তাতেই বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, ঠাকুরের ব্যস্ততা দেখিয়া মথুরানাথ তাঁহাকে বর্ধমানে পাঠাইবার সমস্ত করিতেছিলেন ···।"—লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম, ১··

(ক'লকাতায় পদ্মলোচনের আগমন)

এ-বিষয়ে নিম্নোক্ত সংবাদটিও উল্লেখযোগ্য :

"এক দিবস হৃদয় ও মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবের নিকট বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন। এমন সময় বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্যের কথা উঠিল।

ভট্টাচার্য মহাশয় তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে বেদান্ত এবং ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথুরানাথ কহিলেন,—'বাবা, তুমি হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে, আর যত লোকজন দরকার হয় নিয়ে বর্ধমানে যাও। আমি সমস্ত খরচ দেব।"

"রামকৃষ্ণদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া মা কালীকে কহিতে লাগিলেন,—'মা, তুই আমার মা থাকতে বর্ধমানে কি করতে যাব? তুই মা তাকে এইখানে এনে দে।' বারম্বার এই কথা বলিয়া বালকের মত জ্বাবদার করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া তৎপরে কহিলেন,—'দশদিন পরে আসবেক, যেতে হবে না।'...রামকৃষ্ণদেব যখন এইরূপ কহিলেন, তখন হৃদয় ও মথুরানাথ ভাবিলেন যে, বর্ধমানের সভাপণ্ডিত এইখানে (ক'লকাতায়) দশদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আসিবেন, সুতরাং তাঁহাকে আর তথায় (বর্ধমানে) যাইতে হইবে না।

"পূর্বোক্ত ঘটনার দশদিনের মধ্যেই এক দিবস মথুরানাথ অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে রামকৃষ্ণ সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিলেন,—'বাবা, তোমার সেই বর্ধমানের পণ্ডিত ক'লকাতায় এসেছে। রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে তাকে কথাবার্তা কইতে দেখেছি।' রামকৃষ্ণদেব এই সংবাদ পাইয়া হৃদয়কে কহিলেন,—'হৃদু, পদ্মলোচন কোথায় থাকে, সন্ধান ক'রতে পারিস?' হৃদয় দুই-একদিনের মধ্যে সন্ধান পাইলেন যে, পণ্ডিত বৈকালীন জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, (এবং) আঁড়িয়াদহে বিমলাচরণ বিশ্বাসের উদ্যানে আছেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত—১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭-৯৯

'হেনকালে প্রভুদেব পাইলা খবর।
পণ্ডিত অসুস্থাবস্থাপীড়ায় কাতর॥
স্বাস্থ্যোন্নতি-হেতু বাস করে গঙ্গাতীরে।
এ ড়েদহে এখানের অনতি অন্তরে॥'—পুঁথি, ১২২

যা হোক, শ্রীশ্রীঠাকুর অভাবনীয়ভাবে সংবাদ পান যে, তর্কালঙ্কার মহাশয় এঁড়েদার নিকটে কামারহাটীতে গঙ্গার তীরে বিমলাচরণ বিশ্বাসের বাগানবাড়িতে অবস্থান করছেন। এঁর শরীর বেশ কিছুকাল ধরে অসুস্থ। তাই বায়ু-পরিবর্তনের জন্য ইনি সেখানে এসে রয়েছেন এবং গঙ্গার নির্মল বায়ুসেবনে ও চিকিৎসাদির ফলে, এঁর শরীর এখন অপেক্ষাকৃত ভালও আছে।

(পণ্ডিতের নিকট হৃদয়কে প্রেরণ)

'হৃদয় প্রেরিত হইল জানিতে বারতা।
কেমন পণ্ডিত, আর আছে হেথা কোথা॥
অনুমতি মত হৃদু চলিল ত্বরিত।
পণ্ডিতের কাছে গিয়া হয় উপনীত॥'—পুঁথি, ১২২

ঐ সংবাদ সঠিক কি না, তা জানার জন্য ঠাকুর অবিলম্বে ভাগ্নে হৃদয়রামকে সেই বাগানবাড়িতে পাঠান। আর ইনি কেমন লোক, এঁর অভিমান, অহঙ্কার আছে কিনা, সে-সব বিষয়ও তাঁকে জেনে আসতে বলেন।

"রামকৃষ্ণদেব কহিলেন,—'হৃদু, তুই প্রথমে যা, গিয়ে তাঁকে দেখে আয়। যদি অহঙ্কারী না হয়, আর ভাল লোক হয়, তা হ'লে যাব।' হৃদয় পদ্মলোচনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেব মথুরকে কহিলেন,—'হৃদু দেখে এলেই আমার অর্ধেক দেখা হয়'।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত—১ম খণ্ড, পৃঃ ১১

যা হোক, মামার আজ্ঞানুসারে হৃদয়রাম সেখানে উপস্থিত হন এবং পণ্ডিত পদ্মলোচনের সাক্ষাৎ পান। তারপর তিনি এঁকে যথোচিত সম্মান ও অভিবাদন জানিয়ে এঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাশয়কে নিজের আগমনের অভিপ্রায় এবং সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসিক অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষার কথাও জানান।

(ক্রমশঃ)

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(পাঁচ)

আচার্য অভিনবগুপ্ত 'ধ্বনি'-সম্বন্ধে 'লোচন'-টীকায় মন্তব্য করেছেন : "এবং চতুষ্কমপি ধ্বনিঃ। তদ্‌যোগাচ্চ সমস্তমপি কাব্যং ধ্বনিঃ।...তেন বাচ্যোঽপি ধ্বনিঃ, বাচকোঽপি শব্দো ধ্বনিঃ, দ্বয়োরপি ব্যঞ্জকত্বং ধ্বনতীতি কৃত্বা। সংমিশ্রাত্তে বিভাবানুভাবসংবেদনরূপেতি ব্যঙ্গ্যোঽপি ধ্বনিঃ, ধ্বন্যতে ইতি কৃত্বা। শব্দনং শব্দব্যাপারঃ, ন চাসাবভিধারূপঃ, অপি ত্বাত্মভূতঃ, সোঽপি ধ্বননং ধ্বনিঃ। কাব্যমিতি ব্যপদেশশ্চ যোঽর্থঃ সোঽপি ধ্বনিঃ, উক্তপ্রকারধ্বনিষ্টচতুষ্টয়ময়ত্বাৎ"। ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত ও কালীপদ তর্কাচার্য বাংলা-সংস্করণ আনন্দবর্ধন-রচিত 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থে ঐ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করেছেন : "এইভাবে চার প্রকারের বিষয়ই ধ্বনি, তাহাদের সংযোগে যে সমগ্র কাব্যবস্তু হয়, তাহাও ধ্বনি।...তাই 'ধ্বনিত করে'—এইভাবে ধ্বনির অর্থ করিলে বাচ্য অর্থও ধ্বনি, বাচক-শব্দও ধ্বনি। আবার 'ধ্বনিত' হয়—এইভাবে অর্থ করিলে বাচ্য-বাচকের সঙ্গে বিভাব ও অনুভাবের যে সংমিশ্রন হয়, সেই ব্যঙ্গ্য-অর্থও ধ্বনি। শব্দন অর্থাৎ শব্দ বা শব্দব্যাপার। এই ব্যাপার অভিধাদিপ্রকারের নহে, বরং ইহাই আত্মভূত। তাহার দ্বারা ধ্বনন করা হয়, অতএব তাহা ধ্বনি। কাব্য বলিয়া যে বিষয়ের নামকরণ করা হয়, তাহাও ধ্বনি, যেহেতু উক্ত চার প্রকারের ধ্বনি তাহার মধ্যে আছে"।

এখানে দেখা যায়, ব্যাকরণাচার্যদের অভিহিতান্বয়বাদী স্ফোট ও আলঙ্কারিকদের ধ্বনি প্রায় সমপর্য্যায়ভুক্ত—যদিও স্ফোট ও ধ্বনি পরস্পরে স্বতন্ত্র বা পৃথক। 'মঞ্জুষা'-গ্রন্থে পণ্ডিত নাগেশভট্ট স্ফোটবাদীদের ব্যঞ্জনাবৃত্তি গ্রহণ বা স্বীকার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাছাড়া কাব্যের ধ্বনি ও ব্যাকরণের ধ্বনি ঠিক এক নয়। কাব্যের ধ্বনির নাম রসধ্বনি।

পূর্বেই বলেছি যে, আচার্য আনন্দবর্দ্ধন ধ্বনিবাদী[১] ছিলেন—যদিও 'সমাম্নাৎপূর্বঃ'··· পূর্বপূর্ব ধ্বনিবাদীদের মতবাদ তিনি অনুসরণ ক'রে ধ্বনিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আচার্য আনন্দবর্দ্ধন এজন্য ব্যাকরণের মতবাদ অংশত গ্রহণ করলেন ও সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের মতবাদও খণ্ডন করেছিলেন। কথা এই যে, বৈয়াকরণ এবং মীমাংসক ও নৈয়ায়িকরা ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার না ক'রে কেবলমাত্র অভিধা ও লক্ষণাকেই গ্রহণ করেছেন শব্দের বৃত্তি হিসাবে, আর আনন্দবর্দ্ধন শব্দের বৃত্তিসার্থকতার জন্য ব্যঞ্জনাকে স্বীকার করেছেন, কেননা ধ্বনিবাদের রহস্যকথাই ব্যঞ্জনাবৃত্তির সহযোগ ও সার্থকতা। আচার্য আনন্দবর্দ্ধন ব্যঞ্জনাবৃত্তির অনুকূলে বলেছেন: "অপি চ ব্যঞ্জকত্বলক্ষণো যঃ শব্দার্থয়োর্ধর্মঃ ন প্রসিদ্ধ সম্বন্ধানুরোধীতি ন কস্যচিদ্ বিমতিবিকামর্হতি। শব্দার্থয়োর্হি প্রসিদ্ধো যঃ সম্বন্ধো বাচ্যবাচকতাবাখ্যস্তমনুরুন্ধান এব ব্যঞ্জকত্বলক্ষণো ব্যাপারঃ সামগ্রস্যেরসম্বন্ধাদৌপাধিকঃ প্রবর্ততে"।

সুতরাং দেখা যায় যে, আচার্য আনন্দবর্দ্ধন শব্দ ও অর্থের এবং শব্দার্থের ব্যঞ্জকত্ব—দুটি সম্বন্ধ "তন্মধ্যে বাচকত্ব হইতেছে শব্দের নৈসর্গিক, অবিচল ও নিয়ত বৃত্তি, আর ব্যঞ্জকত্ব হইতেছে অনৈসর্গিক ও ঔপাধিক বৃত্তি, ইহার (ব্যঞ্জকত্ববৃত্তির) স্বতঃপ্রতীতি হয় না"।[২]

শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থের ভূমিকায় ধ্বনিবাদ ও রসধ্বনি-সম্বন্ধে যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন তা প্রনিধানযোগ্য। তিনি গুণ, অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতি কাব্যের বহিরঙ্গ উপকরণের পরিবর্তে আচার্য আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বনি ও রসধ্বনি-শব্দের ইঙ্গিতের প্রশংসা ক'রে লিখেছেন: "সংস্কৃত অলঙ্কারিকেরা প্রধানত প্রতীয়মান বা ইঙ্গিতগম্য অর্থটিকে বুঝাইবার জন্যই 'ধ্বনি'-শব্দের প্রয়োগ করিলেন। যদিও ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থ কখনও বস্তুর আকারে, কখনও বা রসের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, তথাপি রসধ্বনিই মুখ্য প্রতীয়মান এবং ইহাই কাব্যের আত্মভূত। আলঙ্কারিকের পারিভাষিক 'রস'-শব্দটি কাব্যপাঠ বা নাট্যাভিনয় দর্শনজনিত লোকোত্তর আহ্লাদাত্মক মানসিক অবস্থাকে বুঝায়। কাব্যপাঠের বা নাট্যাভিনয়দর্শনের সময়ে পাঠক বা দর্শক-চরিত্র, পরিবেশ, চিত্তবৃত্তি-অনুভূতি, দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকারগুলির সহিত যেমন পরিচিত হন, তেমনই সংস্কারের আকারে বিরাজিত অনুভূতিগুলি তাঁহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে।···এইভাবে কাব্য আত্মসাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ পরিবেশন করে। তাই সহজ কথায় বলিতে হয়—ভাবতন্ময়চিত্তে আত্মানন্দের প্রকাশই রস"।[৩]

১। আনন্দবর্দ্ধনের 'ধ্বন্যালোক' কাব্যালোক ও সহৃদয়ালোক নামেও পরিচিত।

২। ডক্টর শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনূদিত বাংলা 'ধ্বন্যালোক', পৃঃ ৪৬ দ্রঃ।

৩। ডক্টর শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনূদিত ধ্বন্যালোকের 'ভূমিকা', পৃঃ ৬

তিনি পুনরায় বলেছেন : "কাব্যের প্রাণকেন্দ্ররূপে রসের স্বীকৃতি মিলিলেও গুণ, অলঙ্কার, রীতি, বৃত্তি প্রভৃতি কাব্যোপকরণগুলি উপেক্ষিত হইল না। রসধ্বনির বন্ধনে আনন্দবর্দ্ধন ইহাদের সকলকে বাঁধিয়া দিলেন। বলিলেন—গুণ, অলঙ্কার, রীতি ইহাদের কাব্যে স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব নাই, ইহারা সম্পূর্ণরূপে রসপরতন্ত্র। রসের আত্মপ্রকাশকে সাহায্য করে বলিয়াই গুণ কাব্যশোভাকর, অলঙ্কার রমণীয়, আর রীতিও বরণীয়। এই কাব্যাত্মাকৃত রস নিজেকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় শব্দ, বাচ্যার্থ, গুণ, অলঙ্কার প্রভৃতি সকল কাব্যোপকরণেরই সৃষ্টি ঘটায়। 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্ত্য' অলঙ্কারই ধ্বনিমার্গের প্রকৃত অলঙ্কার"।[৪]

শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় পুনরায় বলেছেন : "অভিনবগুপ্তাচার্য বলিলেন—সাধারণীকরণ রসাস্বাদের প্রধান সোপান। রসানুভূতির আস্বাদ-গ্রহণের সময়ে আস্বাদক সহৃদয়-সামাজিক এবং আস্বাদ্য কাব্য-নাট্যবর্ণিত বিষয় উভয়েই সাধারণরূপ লাভ করে। সামাজিক সার্বজনীন সত্তায় উন্নীত হয়। বিষয়বস্তুটিও নৈর্ব্যক্তিক আকারে প্রতিভাত হয়, তাই রসাস্বাদের কৌশল—সাধারণীকৃত সহৃদয়ের সহিত নৈর্ব্যক্তিক বিষয়বস্তুর রমণীয় মিলনের লোকোত্তর কৌশলী'। শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি ও বিচার রসোত্তীর্ণ।[৫]

অবশ্য ধ্বনিবাদ যেমন এক সময়ে পণ্ডিতসমাজে ও বিশেষ ক'রে আচার্য আনন্দবর্দ্ধন ও 'লোচন'-টীকাকার আচার্য অভিনবগুপ্তের নিকট বিশেষ ঋণী ও আদরণীয় ছিল, তেমনি অভিনব-গুপ্তের পূর্ববর্তী আচার্য মহিমভট্ট, কুন্তক, ভামহ, দণ্ডী, বামন[৬] প্রভৃতি মহিমভট্টের পরবর্তী আচার্য এঁরা আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বনিবাদ খণ্ডন করেছিলেন। বিশেষ ক'রে, কুন্তক, দণ্ডী ও ভামহ 'বক্রোক্তি'-রূপ কাব্যালঙ্কার-মতবাদ প্রচার ক'রে ধ্বনিবাদ খণ্ডন করেছিলেন। কিন্তু বক্রোক্তিও শব্দালঙ্কার শ্রেণীভুক্ত—যদিও বক্রোক্তির অর্থ ও অভিপ্রায় নিয়ে বক্রোক্তিকারদের মধ্যেই মতভেদ আছে।

ভামহ, দণ্ডী, কুন্তক প্রভৃতি আচার্য বক্রোক্তি-অলঙ্কার স্বীকার করেছেন এবং আরো স্বীকার করেছেন রুদ্রভ (রুদ্রট), মম্মট প্রভৃতি আচার্যেরা। বক্রোক্তিকে একপ্রকার শব্দালঙ্কার বলা যেতে পারে। ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় কুন্তকলিখিত 'বক্রোক্তিজীবিত'-গ্রন্থের ইংরাজী প্রস্তাবনায় (Introduction) লিখেছেন : "A remarkable divergence of conception and treatment is noticable in theory of *vakrokti*, held respectively by Bhāmaha, Dandin, Vāmana on the one hand, and Rudrata, Mammata and his followers, on the other. Both Bhāmaha and Dandin, as well as Vāmana take the *vakrokti* to imply something essentially different from the verval poetic figure (sabdālamkāra)

৪। ডক্টর শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনূদিত ধ্বন্যালোকের 'ভূমিকা', পৃঃ ৭

৫। ঐ পৃঃ ৮

৬। অলঙ্কারশাস্ত্রী বামন ছাড়া আরও দু'জন বামন ছিলেন, তাঁদের নাম বামনগুপ্ত, বামন-ভট্টাচার্য ও বামন।

of the same name difined and illustrated for the first time in Alamkūra literature by Rudrata. According to this last named authority, (ii. 13-17) based upon a play on words and occurs as a kind of *pretended* speech, in which a sentence or word spoken in one sense by a speaker is taken in another sense by another speaker, either because it may be uttered with a peculiar intonation (*ka'ku*) which changes its meaning, or because it may be supposed to admit of a *double meaning* (*s'lesa*), the object of this intentional mistake being that of making a suitable or cleaver reply."[৭]

আচার্য বামন বক্রোক্তিকে অভিপ্রায়োক্তি বা 'লোকাতিক্রান্তগোচরবাচম্'[৮] বা বাক্য বলেছেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত একে ধ্বন্যালোকের 'লোচন'-টীকায় 'লোকত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানম্' বলেছেন। অবশ্য আচার্য কুন্তক 'লোকাতিক্রান্ত' বলতে 'প্রসিদ্ধব্যাপারাতীত' বুঝিয়েছেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বক্রোক্তিকে 'লোকোত্তরত্ব' বলেছেন। আচার্য দণ্ডী বলেছেন: '…দ্বিবিধা তিস্রঃ স্বভাবোক্তির্বক্রোক্তি চেতি বাঙ্ময়ম্'। ডক্টর সুশীল কুমার দে এর ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন: "Poetical speech is divided into *svabha'vokti* and all other figures (collectively called *vakrokti*), in the latter case, generally speaking, *s'lesa* unifolds its beauty." তবে একথা ঠিক যে, কুন্তক বক্রোক্তির অর্থ যেভাবে করেছেন, বামন তার ভিন্ন অর্থ করেছেন।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ লক্ষ্ণৌ হইতে ট্রেনে হরিদ্বার-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হরিদ্বার শ্রীহরি বদরীনাথ-নারায়ণের দ্বার বা প্রবেশদ্বার। এজন্য বহুপ্রাচীনকাল হইতে ঐ স্থান ঋষি-মুনিদের দ্বারা অধ্যুসিত ও পবিত্র। হরিদ্বারের পর হৃষিকেশ ও হৃষিকেশে লছমনঝুলা লক্ষ্মণের নামাঙ্কিত হয়ে বর্তমান। ঝুলা অর্থে পুল বা ব্রিজ—দড়িদ্বারা নির্মিত। বর্তমান ঝুলা বা পোলটি কয়েক বৎসর পূর্বে তৈয়ারী করা হইয়াছিল। পূর্বে কেদারনাথ,

৭। Vide *Vakroktijibita* (Calcutta,) 1961, pp. XV—XVI.

৮। পরে এ' সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

বদরীকাশ্রম ও তাহাদের পথে দেবপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ প্রভৃতি গঙ্গা ও অলকানন্দা নদীর স্থানে স্থানে পবিত্র তীর্থস্থানগুলি যাইবার জন্য লছমন্‌ঝোলার অন্যদিকে রাস্তা ছিল। বর্তমানে ঐ ঝুলা আর অতিক্রম করিতে হয় না, পূর্বদিক দিয়া বাসের রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে।

হরিদ্বার অতিক্রম করিয়া হৃষিকেশে যাইতে হয় এবং হৃষিকেশেই ঐ লছমন্ বা লক্ষ্মণ-ঝুলা। লছমন্‌ঝুলার দক্ষিণদিকে স্বর্গাশ্রম—সাধুদিকের তপস্যা করিবার স্থান এবং পূর্বে বামদিকে কেদারনাথ ও বদরীনাথ-তীর্থে যাইবার পথ ছিল। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ প্রথমে হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া পরে কনখলে দক্ষঘাট (দক্ষযজ্ঞের স্থান) প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিলেন। অবশ্য কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ যখন হরিদ্বার ও হৃষিকেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনকার দৃশ্য ও পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল এবং বর্তমান দৃশ্য ও পরিবেশের বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশে উপস্থিত হইলেন এবং হৃষিকেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং স্বচ্ছতোয়া খরস্রোতবাহিনী গঙ্গা দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। পবিত্র মনোরম স্থান ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য যেন স্বর্গের সুষমা সৃষ্টি করিয়াছে।

কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ একসঙ্গে হৃষিকেশে কিছুদিন থাকিয়া জপ-ধ্যান প্রভৃতিতে রত থাকিবেন মনে মনে স্থির করিলেন। তাঁহারা 'ঝুপড়ী'তে অবস্থান করিবেন স্থির হইল। 'ঝুপড়ী' বলিতে গাছের ডালপালা দিয়া তাবুর ন্যায় একটি কাঠামো তৈয়ারী করিয়া কুশঘাস (টাইগার-গ্রাস) কাটিয়া সেই কাঠামোর উপর ছাউনী তৈয়ারী করা হইত এবং কুশঘাস খড়ের ন্যায় লম্বা লম্বা, আবার তাহার সাহায্যে ঘরের ভিতরে মেঝেতে খড়ের ন্যায় বিছাইয়া তাহার উপর কম্বল পাতিয়া শয়ন, লেখাপড়া ও শাস্ত্রালোচনা করা চলে। কালীপ্রসাদ একাকী জঙ্গলের মধ্যে ও গঙ্গার নিকটে ঐরূপ একটি "ঝুপড়ী" তৈয়ারী করিয়া মহানন্দে বাস করিতে লাগিলেন, এবং তুলসী মহারাজ সন্নিকটে একজন সাধুর কুটিয়াতেই থাকিতেন ও রাত্রি যাপন করিতেন। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ দুইজনে তখনকার বড় বড় বিদ্বান ও ত্যাগী সাধুদিগের সহিত বিভিন্ন শাস্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এইভাবে মহানন্দে তাঁহাদিগের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

সেই সময়ে তাঁহারা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, হৃষিকেশে লছমনঝুলা হইয়া বদরীনারায়ণের পথে যাত্রা করিবেন। হৃষিকেশে থাকিবার সময়ে দুইজনেই কৌপীনপঞ্চক, মোহমুদ্গর প্রভৃতি আচার্য শঙ্কর-রচিত বেদান্তস্তোত্রগুলি উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতেন, আর পাঠ করিতেন ভগবদ্গীতা, বিভিন্ন উপনিষৎ, বাদরায়ণ-ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র এবং তাহাদের উপর শাঙ্করভাষ্য। এইরূপ পরিবেশে তাহাদের নিত্যপঠনপাঠন চলিতে লাগিল। তাঁহারা তাঁহাদিগের মনের চিন্তাধারাকে ভাগবদ্‌ভাবের আলোচনার দিকে নিয়মিত ও প্রসারিত করিতেন এবং তাহার পশ্চাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অদৃষ্ট ইঙ্গিত ও আশীর্বাদের কথা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিতেন। তাঁহারা হৃষিকেশের বিদ্বান সাধু ও ত্যাগী সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া লছমনঝুলা বা

লক্ষ্মণঝুলার দিকে দুইজনে যাত্রা করিলেন। পুলের কাছেই লক্ষ্মণজীর মন্দির এবং তাঁহারই নামানুসারে ঐ পুলের নাম হইয়াছে লছমন বা লক্ষ্মণঝুলা। লক্ষ্মণজীর বিগ্রহ দর্শন করিয়া তাঁহারা তখন স্থির করিলেন যে, সেইখান হইতে বদরীনারায়ণের পথে যাত্রা করিবেন। সম্মুখেই দেখিতে পাইলেন বামদিক দিয়া বদরীকাশ্রমের পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া মনে সাহস সঞ্চয় করিলেন এবং গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া বদরীকাশ্রমের পথ ধরিয়া তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথের ধারে ধারে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। কোথাও গঙ্গা খরস্রোতা, আবার কোথাও মন্থরগতিতে কুলকুল শব্দে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত।

●

॥ দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে ॥

॥ মহীশূর ॥

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

২১শে ডিসেম্বর বেলা ৩-৫০ মিনিটের ট্রেন ধরে তিরুনেলভ্যালি হতে মাদুরা এসে পৌঁছে গেলুম রাত্রি ১০॥ টায়। এখানে আমাদের একদিন বিশ্রাম। পরের দিন মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে রণজিৎভাইসহ চলে গেলুম পুনরায় মীনাক্ষীমন্দির আর সেই সঙ্গে তৎসংলগ্ন সংগ্রহশালাটিও দেখতে। ২২শে ডিসেম্বর রাত্রি ১০॥ টায় গাড়ী চলতে শুরু করল—সকাল ৬টার মধ্যে পৌঁছে গেলুম বৃদ্ধাচলম্ বলে একটি ষ্টেশনে। ট্রেনের যোগাযোগ অভাবে সেখানেও যাত্রাবিরতি ১২ ঘন্টা। এই অবকাশটুকুর মধ্যে অনেকেই ঝটিকা করে দেখে এলুম বৃদ্ধাচলম্ শিবমন্দিরটি। সন্ধ্যা সাতটায় বৃদ্ধাচলম্ হতে রওনা হয়ে মহীশূরের রাজধানী বাঙ্গালোর পৌঁছি সকাল ৭ টায়। বাঙ্গালোরের দর্শনীয় যাকিছু দেখান হবে মহীশূর হতে প্রত্যাবর্তনপথে ম্যানেজার অসিত বসুর নিকট এই আশ্বাস পেয়ে বেলা ১২টার গাড়ী ধরে মহীশূরে পৌঁছে গেলুম ২৪শে ডিসেম্বর বৈকাল ৫ টায়। মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে খ্রীষ্টজন্মের ২৬০ বৎসর পূর্বে মৌর্য-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল মহীশূর পর্যন্ত। লুপ্ত হয় মৌর্য ক্ষমতা। দাক্ষিণাত্যে মহাপরাক্রমশালী হন সাতবাহন বা অন্ধ্রেরা। তার পূর্বে উড়িষ্যার রাজা চেতবংশের খারবেলের অধিকারে আসে মহীশূর। তারপর ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে অধিকারে আসে সাতবাহনদের। বাতাপির চালুক্যবংশের প্রথম পুলকেশী স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য দাক্ষিণাত্যে। তাঁর পুত্র কীর্তিবর্মণের সময় রাজ্যের সীমানা আরও বাড়ে। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি পরাজিত করেন কদম্বরাজ, মহীশূরের গঙ্গরাজ আর কোঙ্কনের মৌর্য রাজাকেও। পরাজিত

হন পল্লব, চোল, চের, কেরল আর পাণ্ড্য রাজারাও। হর্ষবর্ধনের আক্রমণও হয় প্রতিহত। তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয় পূর্বে কৃষ্ণা ও গোদাবরী পর্যন্ত। দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত। আর বিস্তৃত হয় আরবসাগর হতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। তৃতীয় রাজধানী স্থাপিত হয় নাসিকে।

দূত পাঠান পারস্যরাজ খসরুর কাছে। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন স্যাং ৬৪০ খৃষ্টাব্দে পরিদর্শন করেন নাসিকে তাঁর রাজসভা। তারপর রাষ্ট্রকূট, হোয়সল্ প্রভৃতি বংশের উত্থান-পতন শুরু হয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে। রাষ্ট্রকূটরা রাজত্ব করেন ২০০ শত বৎসরের অধিককাল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গ প্রবল হন দক্ষিণ-ভারতে। তাঁর ভ্রাতা প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ইলোরাতে পাহাড় কেটে নির্মাণ করান কৈলাসের মন্দির, ভারতের শ্রেষ্ঠ গুহা-মন্দির। ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হীনবল হয়ে পড়ে রাষ্ট্রকূটরা। পরাজিত হন চালুক্যদের কাছে। হোয়সল রাজারাও ছিলেন শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। তাঁরাও নির্মাণ করেন অপরূপ মন্দির, রাজধানী বেলুড় ও দ্বারসমুদ্রে। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হন হোয়সল্ বংশের শেষ রাজা তৃতীয় বীর বল্লাল মালিক কাফুরের কাছে। হোয়সল্ বংশেরই এক রাজা বিক্কি স্বাধীনতা ঘোষণা করে মহীশূরে স্থাপন করে এক স্বাধীন রাজ্য দ্বারসমুদ্র বা বর্তমান হালবিদে স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী। তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন আচার্য শ্রেষ্ঠ রামানুজের কাছে বৈষ্ণব-ধর্মে। এরপর ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হোয়সল্ রাজা বিরূপাক্ষের মৃত্যুর পর মহীশূর আসে বিজয়নগরের অধিকারে। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ওয়াদিয়ার হন মহীশূরের স্বাধীন নৃপতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ—চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রে ছেয়ে ফেলে ভারতের আকাশ-বাতাস। এই সময় এক প্রতিভাদীপ্ত যুবক মহীশূরের প্রধান সেনাপতি নানরাজের কাছে এসে সৈনিকের পদ প্রার্থনা করেন। নিযুক্ত হন সৈনিকের পদে—ইনিই হায়দার আলি। ক্রমে পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন হায়দার। অধিকার করেন মহীশূরের সিংহাসন। বিতাড়িত হন নানরাজ, বিতাড়িত হন মহীশূরের হিন্দুরাজাও। হায়দার জয় করেন আরও কয়েকটি রাজ্য—সীমানা বর্ধিত হয় মহীশূরের। কিন্তু সহ্য হয়না হায়দরাবাদের নিজামের আর মারাঠাদের। হয়না ইংরাজদেরও, তাঁরাও তখন মসী ছেড়ে অসি ধরেছেন—বাণিজ্য ছেড়ে রাজ্য শাসন। যুদ্ধ বাধে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। হায়দার জয় করেন মাঙ্গালোর। দ্বিতীয়বার যুদ্ধ বাধে হায়দারে ইংরাজে, নিজামে আর মারাঠায়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই ক্যান্সার রোগে মৃত্যু হয় হায়দারের। তাঁর পুত্র টিপু সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৃতীয় যুদ্ধ হয় মহীশূরে আর ইংরাজে। পরাজয় স্বীকার করতে হয় টিপুকে। ছেড়ে দিতে হয় অর্ধেক রাজত্ব মরাঠা আর নিজামকে। আবার চতুর্থ যুদ্ধ হয় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপট্টম্ থেকে ৪৫ মাইল দূরে সিদিয়ার মাঠে। মারাঠা, নিজাম ও ইংরাজের সম্মিলিত শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় টিপুকে। আশ্রয় নেন এসে শ্রীরঙ্গপট্টন দুর্গে। আক্রমিত হন সেখানেও। দুর্গ রক্ষার জন্য অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। অকালে পরিসমাপ্তি ঘটে এক বীরশ্রেষ্ঠের, অবসান হয় মহীশূরের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের।

তিন ভাগে বিভক্ত হয় মহীশূর রাজ্য। ইংরাজ অধিকার করেন কানাড়া, কৈম্বাটুর ও পশ্চিম উপকূলের রাজ্যগুলি। উত্তর-পশ্চিম অংশ লাভ করেন নিজাম। আর ইংরাজদের অধীনে আরোহণ করেন মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু-রাজবংশের ৫ বৎসর বয়স্ক এক বালক কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার। তখন হতেই মহীশূরে প্রাচীন হিন্দুবংশের উত্তরাধিকারসূত্র আজও বর্তমান।

এ' প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে মহীশূর রাজারা ছিলেন প্রগতিশীল। অগ্রণী ছিলেন প্রজার কল্যাণে আর রাজ্যের মঙ্গলে। সজ্জিত হয় মহীশূর অপরূপ রাজপ্রাসাদ ও সুবৃহৎ অট্টালিকায়। নয়নাভিরাম সব রাজপথে শোভিত হয় মহীশূর শহর। পরিণত হয় মহীশূর ভারতের অন্যতম সুরম্য নগরীতে। এশিয়ার মধ্যে এখানেই প্রথম উৎপাদিত হয় জলবিদ্যুৎ। নির্মিত হয় ললিত মহল, জগমোহন আর রাজপ্রাসাদ। মহীশূরই ভারতের প্রথম দেশীয় রাজ্য যেখানে সর্বপ্রথম জনপ্রতিনিধিমূলক বিধান সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এমন কি দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম মহিলা স্নাতকও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রথম পরিবার-পরিকল্পনা শুরু হয় মহীশূর রাজ্যে এখন হতে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে।

এ-হেন মহীশূর রাজ্যে এসে যীশুর শুভ জন্মদিবস ২৫শে ডিসেম্বর সকাল ৯টার মধ্যে প্রাতরাশ শেষ করে ১৯৫৲ টাকা দিয়ে একখানি ট্যাক্সি নিয়ে ছয়জন যাত্রীসহ বেরিয়ে পড়ি মহীশূরের দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখতে। দর্শন শুরু শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আশ্রম হতে। আশ্রমটি খুব বড় নয়। নাটমন্দির বেয়ে গিয়েই মন্দির মধ্যে এই বিশেষ দিনটিতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলোকচিত্রের সামনে প্রণাম করলুম। পাশে কিন্তু শ্রীশ্রীসারদাদেবীর কোন আলোকচিত্র নাই। হল ঘরটিতে নাই সজ্জিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদের কোন আলোকচিত্র। সঙ্গী কুণ্ডুট্যাক্সেলের প্রদর্শকের অনুরোধে সময় সংক্ষেপ করতে প্রকাশনা বিভাগটিও দেখা হয় নাই। সেখান হতে চলে এলুম একেবারে জগমোহন বা আর্টগ্যালারী প্রাসাদের সামনে। পঁচিশ পয়সা দর্শনী দিয়ে প্রবেশ করতে হ'ল আর্টগ্যালারী দেখতে। প্রাসাদটি নির্মিত মুঘল স্থাপত্য পদ্ধতিতে। মহীশূর শিল্পীদের সুন্দর ও সূক্ষ্ম কারুকার্যশোভিত। সুপ্রশস্ত কক্ষ সব সজ্জিত মূল্যবান আসবাবপত্রে। রাজকীয় পরিবেশই বটে। শোভিত অনুপম-চিত্র সম্পদেও। অনেকগুলি বংশানুক্রমিক সুন্দর তৈলচিত্র রয়েছে মহীশূর রাজ-পরিবারের। রয়েছে বহু ব্যবহার্য জিনিসপত্রও। সেই সঙ্গে আছে একটি প্রশস্ত দরবার গৃহও।

আর্টগ্যালারীটি পরিচালক এক অপূর্ব কীর্তির। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীদের অঙ্কিত কত সব চিত্র। সুপ্রসিদ্ধ রুশ চিত্র-শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক, যিনি হিমালয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এসে বসবাস করেছিলেন তিব্বতে, তাঁর অঙ্কিত তিব্বত ও হিমালয়ের বিভিন্ন কতুর দৃশ্য-চিত্র রয়েছে—একটি নির্দিষ্ট কক্ষে। মুগ্ধ হতে হয় তাঁর শিল্প-প্রতিভায়। রয়েছে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্র। আরও কত সব নাম না জানা শিল্পীদের চিত্র, কে তার হিসাব রাখে? তবে এতসব চিত্রগুলির মধ্যে যে চিত্রটি দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা'হল বালিকার অঙ্কিত "Glow of Hope" বা "আশার উদ্দীপনা"-চিত্রটি। পরমা রূপবতী

এক যুবতী হাতে নিয়ে একটি জলন্ত প্রদীপ। প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে প্রতিফলিত মুখমণ্ডল—বুকের উপর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার শিখা। আলো-ছায়ার এক অপূর্ব সমন্বয়ে অপরূপ এই চিত্রটি। ঘুরে ফিরে কেবলই দৃষ্টি পড়ে সেই চিত্রটির উপর। অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধা জানাই শিল্পীকে। সর্বোচ্চ তলায় প্রাচীনকালের বহু বাদ্যযন্ত্র—কে জানে তার সব নাম ?

চলে আসি Chamarajendra Zoological Gardens বা চিড়িয়াখানায়। পঞ্চাশ পয়সা প্রবেশমূল্য দিয়ে সকলে প্রবেশ করি উদ্যানটিতে। বিভিন্ন জাতের .দেশ-বিদেশের পক্ষিকুলের একত্র এত সমাবেশ—অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। জীব-জন্তু খুব বেশী নাই। কিন্তু পক্ষিকুলের দেশী-বিদেশী সংরক্ষণ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। ময়ূরেরই কত জাতিভেদ শ্বেত ধূসর কত রকম। তবে এদের মধ্যে যে একটি বনমানুষ বা ওরাং ওটাং রয়েছে মানুষের দর্শনমাত্রে তার যে ভয়ঙ্কর রোষ-দৃপ্ততা সেটি দর্শনীয়। গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায়ও অবিরত আঘাত করে চলেছে প্রচণ্ডবেগে—গৃহটির লৌহ-কপাটে। ছেলে-মেয়েদের কাছে এই দৃশ্যটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বেলা বেড়ে চলে, কুণ্ডুট্র্যাভেলের প্রদর্শক (Guide) তাগিদ্ দেন সময় সংক্ষেপ করতে—কে শোনে তাঁর কথা—। অবশেষে বাইরে এসে দেখি আমাদের ট্যাক্সিচালক ইতিমধ্যে অন্য যাত্রী নিয়ে কোথায় উধাও। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর নিয়ে চলল চামুণ্ডেশ্বরী দর্শনে।

সর্পিল গতিতে চলেছে পীচের রাস্তা। সেই পথ অতিক্রম করে উঠতে হবে শৈল দেশে। গাড়ী ছুটল ৫০ মাইল বেগে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি ১২-২০। ৩৪৮১ ফুট উচ্চে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি। মন্দির মধ্যে বিরাজিত চামুণ্ডা দেবী। বাস করতো নাকি এখানে মহিষাসুর। দুর্গাদেবী চামুণ্ডারূপ ধারণ করে এখানেই তাকে বধ করেন। তাই মহীশূর নামে পরিচিত এই রাজ্যটি। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে এক অতিকায় আকৃতির অসুর তার একহাতে ধনুকাকৃতি সর্প, অন্য হাতে শোভা পায় একটি ছোরা। এইটিই বোধ হয় মহিষাসুরের কল্পিত মূর্তি।

মহীশূর রাজাদের কুলদেবী এই চামুণ্ডেশ্বরী। দশহারার বিরাট উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে মহীশূর রাজ্য। সজ্জিতা হয় দেবী বহুমূল্য বসনে, ভূষণে আর রত্নে। বহুমূল্য আভরণে ভূষিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে পূজা দিতে আসেন রাজা ও রাণী। আমরা যখন পৌঁছি এই মন্দিরে তখনও অগণিত মানুষের ভিড়। কোনরূপে পৌঁছলুম মাতৃ-সন্নিধানে। দর্শনান্তে বাইরে এসে দেখতে থাকি শৈলদেশের শিল্প-সম্ভার। নির্মিত চালুক্য পদ্ধতিতে। চূড়াটি বিভক্ত দশটি ভাগে। অঙ্গে নিয়ে অসংখ্য কুলুঙ্গী। অনবদ্য, তাদের গঠন-সৌষ্ঠব। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। প্রত্যাবর্তন পথে দেখি এক বিরাট নন্দীকে (বৃষভ)। একটি সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিকপ্রস্তরে নির্মিত এই নন্দী মূর্তি। ভাস্কোভের নন্দীমূর্তির মত আকৃতি ও গঠন। কণ্ঠে শোভে ঘণ্টা মালা, শোভা পায় পৃষ্ঠদেশেও। ফিরে আসি ষ্টেশনে সংরক্ষিত ট্যুরিষ্ট কোচের নির্দিষ্ট কামরাটিতে—বেলা ১-৩০ মিনিটে।

●

॥ স্বামী অভেদানন্দ ॥

(জীবন নাট্য)

বিমলভূষণ

পঞ্চম দৃশ্য

[জুনাগড়। পণ্ডিত মনসুখরাম ত্রিপাঠির বাড়ী। নরেন্দ্রনাথ (সচ্চিদানন্দ) ও মনসুখরাম আলোচনারত]।

সচ্চিদানন্দ। আশাকরি আমি আমার বক্তব্যটুকু বুঝিয়ে দিতে পেরেছি আপনাকে। এ সম্বন্ধে অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্ত নিয়ে আরো বহু কিছু বলা যায় অবশ্য।

ত্রিপাঠি। বেশ তো, বলুন না স্বামীজী।

সচ্চিদানন্দ। আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি না তো ?

ত্রিপাঠি। সেকি কথা স্বামীজী। এমন একটা বিষয়ের এত সুন্দর বিচার এর আগে আমি —[দ্বারে করাঘাত] কে ? [উঠে] আমি এখনি আসছি। [দ্বার খুলতে কালীপ্রসাদের প্রবেশ] আপনি ?

অভেদানন্দ। আমি একজন বাঙালী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। শুনলুম আপনার এখানে আর-এক বাঙালী সন্ন্যাসী এসেছেন। তাই বিনা নিমন্ত্রণেই চলে এলুম।

ত্রিপাঠি। বিলক্ষণ। এ আমার পরম সৌভাগ্য। আসুন, ভেতরে আসুন। [ফিরে নরেন্দ্রকে দেখিয়ে] ঐ যে তিনি।

অভেদানন্দ। [আনন্দে] জয় রামকৃষ্ণ, নরেন।

সচ্চিদানন্দ। [উঠে এসে কালীকে জড়িয়ে ধ'রে] কালী, জয়, জয় রামকৃষ্ণ। [ফিরে] ত্রিপাঠিজী, দেখুন কি গুরুকৃপা ! আপনি অদ্বৈত বেদান্ত বিষয়ে এত আগ্রহী, আর, ইনি আমার গুরুভাই অদ্বৈতবেদান্তী স্বামী অভেদানন্দ। এঁর সঙ্গে আলোচনায় আপনার সব সংশয়ের অবসান ঘটবে। কালী কি বল, এখনি বসে পড়বে না কি বিচারে ?

অভেদানন্দ। বেশ তো, ভালো কথাই। [নরেন্দ্র ও কালী বসলেন]

ত্রিপাঠি। না, না, স্বামীজী, এখনি কেন। আলোচনা তো ক'রবই ওঁর সঙ্গে। তবে, উনি নিশ্চয়ই পথশ্রমে ক্লান্ত। তা ছাড়া, মনে হচ্ছে—দীর্ঘদিন পরে আপনাদের দেখা হ'ল। আপনারা একটু গল্পটল্প করুন। সেই ফাঁকে আমিও অতিথি-সেবার ব্যবস্থা করি।

অভেদানন্দ। আমরা সন্ন্যাসী, তাতে পরিব্রাজক.—তাই উপবাসেও অভ্যস্ত। ও নিয়ে আপনি ব্যস্ত হ'বেন না।

ত্রিপাঠি। আপনারা যে সন্ন্যাসী তাতে সন্দেহ কি। আর আমিও যে গৃহী সেটা প্রমাণ ক'রতে সামান্য ফলমূল আর দুধ দিয়ে আপনাদের সেবা করবার অধিকারটুকু আমায় দিলে কৃতার্থ বোধ ক'রব। সেই সৌভাগ্য থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না। (প্রস্থান)

সচ্চিদানন্দ। (হেসে) সত্যিকার নিষ্ঠাবান গৃহী-ব্রাহ্মণ। তারপর, কালী আমার খোঁজ কোথায় পেলে ?

অভেদানন্দ। পোরবন্দরে, শঙ্কর পাণ্ডুরঙের বাড়ী। শুনলুম—সচ্চিদানন্দ নামে ইংরিজি জানা এক বাঙালী সন্ন্যাসী এসেছিলেন সেখানে কিছুদিন আগে। প্রথমটা ঠাহর করতে পারিনি। কারণ, তুমি তো নাম নিয়েছিলে বিবিদিষানন্দ। পরে মনে হ'ল এ বোধ হয় তুমি।

সচ্চিদানন্দ। তাই নাকি ?

অভেদানন্দ। হ্যাঁ। তারপর জুনাগড়ে এসেও আবার শুনলুম সেই সন্ন্যাসীর কথা। এবারও বললে তার নাম সচ্চিদানন্দ। যাই হোক—আমি উঠে প'ড়ে লেগে ঠিকানাপত্তর জোগাড় ক'রে সোজা চ'লে এলুম এখানে। আর সন্দেহরও নিরসন হ'য়ে গেল।

সচ্চিদানন্দ। ভালোই ক'রেছ। তা, আর-সব খবর কি ? তোমার সংস্কৃতচর্চা চল্‌ছে কেমন ?

অভেদানন্দ। কই আর চ'ল্‌ছে।

সচ্চিদানন্দ। সেকি। মা তোমার লেখা তাঁর বন্দনা-শ্লোক শুনে রুদ্রাক্ষের মালা দিয়ে তোমায় আশীর্বাদ ক'রে বললেন—'তোমার মুখে সরস্বতী বসুক'—সেই জিনিস তুমি ছেড়ে দিলে ?

অভেদানন্দ। না, ছেড়ে দিই নি। তবে পথে পথে ঘুরে ফিরি তো, তাই।

সচ্চিদানন্দ। তাই বল্। ঘোরার নেশা তোরও গেল না, আমারও না। তা—আর কোথায় কোথায় ঘুরলি ? কারো দর্শন-টর্শন পেলি ?

অভেদানন্দ। পাওহারি বাবা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ধনরাজ গিরি এঁদের দর্শন পেয়েছি।

সচ্চিদানন্দ। সে সব শুনেছি। হৃষিকেশে ধনরাজ গিরিজীর সঙ্গে দেখা হ'তে তোর কথা জিজ্ঞেস ক'রেছিলুম।

অভেদানন্দ। তাই নাকি। কি বল্‌লেন তিনি ?

সচ্চিদানন্দ। কি ব'ললেন ? ব'ললেন—'অভেদানন্দ অলৌকিকী প্রজ্ঞা।'

অভেদানন্দ। যাঃ, কি যে বল।

সচ্চিদানন্দ। নারে, ঠাট্টা নয়। তুই তো জানিস ভাই, আমি এসব নিয়ে ঠাট্টা করি না। তোর চলন-বিধি অভেদজ্ঞান, অধ্যয়নবৃত্তি নেওয়া কিম্বা হৃষিকেশে তোর নিজের রোগ কামনা-সবই আমার কানে এসেছে। বলরাম বাবুর দেহান্ত হ'ল তাই কলকাতায় চ'লে যেতে হ'ল, নয়তো তখনি তোর সঙ্গে দেখা ক'রে তোকে ব'লতুম। তারপর বল্, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি, বরানগরে ?

অভেদানন্দ। না, সেখানে তো আমি আর যাই না।

সচ্চিদানন্দ। সেকি, কেন ?

অভেদানন্দ। নরেন, তুমি তো জানো যে, তোমার মতই আমিও ঠাকুরের সঙ্গেও কম তর্ক করিনি। যুক্তি ছাড়া কিছু মেনে নেওয়া আমার স্বভাবে নেই। আর, সেটাই আমার প্রধান অপরাধ হ'য়ে দাঁড়াল এতদিন পরে। তাই, মঠ ছেড়ে চ'লে এলুম।

সচ্চিদানন্দ। কেন, কেউ কি অপমান ক'রেছে ?

অভেদানন্দ। না, তা নয়। তবে, সেখানে আমার মত নিয়েই দেখলুম মত দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। তাই নিজেই বেরিয়ে এলুম সবাইকে সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়ে।

সচ্চিদানন্দ। হুঁ, বুঝতে পেরেছি। তবে কি জানিস ভাই, ঠাকুরের সেই কথাগুলো যে ভুলতে পারি না কিনা তাই দুঃখ হচ্ছে আর কি। সেই যে, আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবার ক'দিন আগের রাতে আমায় ডেকে বললেন না—'এই সব ছেলেদের ভার তোর ওপর রইল। ওদের দেখাশোনা করিস্, একসঙ্গে রেখে দিস্। যেন ছেড়ে দিসনে আমি নেই ব'লে।' তা আমিও তো তাঁর আদেশমত ঠিক্ ঠিক্ দেখাশোনা করতে পারি নি তোদের। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ভালোই ক'রেছিস ভাই, অন্ততঃ আমায় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিস তোরা।

অভেদানন্দ। এসব কি ব'লছ তুমি, নরেন ?

সচ্চিদানন্দ। আমার কেবল কি মনে হচ্ছে জানিস, কালী ? মনে হচ্ছে—ঠাকুরের কাছে কত অন্যায়ই না ক'রেছি। বোকার মত কত তর্ক ক'রেছি তাঁর সঙ্গে, কত আঘাতই না দিয়েছি তাঁকে। এসব তারই ফল আর কি ?

অভেদানন্দ। ঠিক। দেবতা ব'লেই তিনি আমাদের সব অত্যাচার, আবোল-তাবোল তর্ক, আর, শত অন্যায় ক্ষমা ক'রেছেন। কিনা ব'লেছি তাকে—ক্ষমার অবতার, সব অপরাধ ক্ষমা ক'রেছেন নিজগুণে।

সচ্চিদানন্দ। হ্যাঁ রে কালী, হ্যাঁ। তারই প্রায়শ্চিত্ত করতেই সবাই এমনি ছন্নছাড়া হ'য়ে গেলুম কিনা কে জানে।

অভেদানন্দ। (কিছুক্ষণ মুখ নামিয়ে থাকার পর) নরেন !

সচ্চিদানন্দ। কিরে, কালী।

অভেদানন্দ। আমি কি ক'রব তুমি ব'লে দাও।

সচ্চিদানন্দ। আমি কি ব'লব রে। ঠাকুরই তোকে ব'লে দেবেন। তিনি তো আমাদের মধ্যেই র'য়েছেন। মনে নেই—তাঁর উপদেশভরা কথাগুলো ? সবশেষে আমাদের সবাই মিলে তাঁর চিতাভস্ম খাওয়ার কথা ?

অভেদানন্দ। আছে, সব মনে আছে। কিন্তু, মতান্তর থেকে মতান্তর যে অপদস্ত ক'রে, ভাই। সে অপমান সহ্য ক'রতে পারি না যে।

সচ্চিদানন্দ। ওরে, নিজেদের মধ্যেই যদি মতান্তর মানিয়ে নিতে না পারি তো বাইরের লোককে শেখাব কি ক'রে ?

অভেদানন্দ। তা ঠিক, কিন্তু—।

সচ্চিদানন্দ। কোনো কিন্তু নেই রে। আমরা না ঠাকুরের সন্তান ? আমাদের নিয়েই তো মঠ। মঠকে ত্যাগ ক'রব কেন ?

অভেদানন্দ। বেশ, আমি মঠে ফিরে যাবো। তবে, এদিকে যখন এসেছি, তখন এদিককার সব তীর্থস্থানগুলো না দেখে ফিরছি না।

সচ্চিদানন্দ। সে তুই নিশ্চয় দেখে যা। তবে, মঠে ফিরবি কথা দিলি ?

অভেদানন্দ। হ্যাঁ।

সচ্চিদানন্দ। বাক্ বাঁচলুম। (হঠাৎ কালীর পায়ের দিকে দেখে) তোর পায়ের একি অবস্থা হয়েছে রে ? ফুলেছে যে।

অভেদানন্দ। ওই একটু।

সচ্চিদানন্দ। জুতো পরিস কি ক'রে ?

অভেদানন্দ। জুতো কোথায় পাবো ?

সচ্চিদানন্দ। তার মানে ? খালি পায়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিস নাকি ?

অভেদানন্দ। হ্যাঁ।

সচ্চিদানন্দ। সর্বনাশ ! অমন কাজও করিসনিরে, শেষে ফুগতে হবে।

অভেদানন্দ। (হেসে) দেখি।　　(পণ্ডিত ত্রিপাঠির প্রবেশ।

ত্রিপাঠি। বড্ড দেরী হয়ে গেল।

সচ্চিদানন্দ। পণ্ডিতজী, ঈশ্বরের লীলাই এমনি যে, কখন কি জন্যে যে তিনি নির্দিষ্ট ক'রে রাখেন তা বুঝতে দেন না। আপনি ভাবছেন দেরী হ'য়ে গেল। আর, আমরা ভাবছি যে, আপনার দেরীটুকু না হলে আমাদের একটা বিরাট সমস্যার সমাধানটা আর হত কি না কে জানে ?

ত্রিপাঠি। তাই নাকি। তা হলে তো ভালো কথা। (জোড় হাতে) এবার উঠতে আজ্ঞা হয়।

সচ্চিদানন্দ। আচ্ছা, চল কালী।

ত্রিপাঠি। (যেতে যেতে) আপনাদের সমস্যাটা কি অদ্বৈত বেদান্তেরই নাকি ?

সচ্চিদানন্দ। (হেসে) হ্যাঁ, অদ্বৈত বেদান্ত তো বটেই। আমাদের প্রণম্য গুরুদেবের কথার সঙ্গে সন্ন্যাসীর জীবনবেদ জুড়ে গিয়ে একটা নতুন পথের সন্ধান পাওয়া গেছে আর কি। কালী কি বল ?

অভেদানন্দ। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ত্রিপাঠি। বেশ তো। আপনাদের সেবার পর, যদি আপত্তি না থাকে একটু শোনাবেন।

সচ্চিদানন্দ। সে তো আপনার ভালো লাগবে না।

ত্রিপাঠি। তা হ'লে দরকার নেই। এখন চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

●

॥ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কালবিচার ॥

শ্রীজয়জিৎ রায়

(চার)

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাতে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে অনেকদিন। মার্শাল, হুইলার, ম্যাকে, পিগোট, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী প্রভৃতিরা সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে করেছেন আলোচনা। কিন্তু তবু সৈন্ধব লিপির সর্বজনগ্রাহ্য পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি আজ পর্যন্ত। সৈন্ধব অন্ধকারে তাই জ্বলে নি বাতি। তন্ত্রশাস্ত্রের আলোকে সৈন্ধব লিপির নূতন ব্যাখ্যা ও পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করে স্বামী শঙ্করানন্দ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, আর্যরা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাইরে থেকে ভারতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেন নি। সিন্ধু সভ্যতাই আর্য সভ্যতা। সিন্ধু উপত্যকার প্রাপ্ত লিপি থেকেই প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মীলিপি এসেছে। এটা অধ্যাপক ল্যাংডনেরও অভিমত। আর সিন্ধু উপত্যকায় ঘোড়ার নিদর্শন পাওয়া যায় নি বলেই মনে করার কারণ নেই যে, সিন্ধু সভ্যতা অনার্য সভ্যতা। বৈদিক আর্যরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতেন না। বৈদিক ভাষায় অশ্ব শব্দ সূর্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সূর্যই বেদের প্রধান দেবতা। বৃহদারণ্যকের একস্থানে (১।২।৮) স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, অশ্বমেধই আলো দান করে। সংবৎসর তার আত্মা। সে-ই অগ্নি, সে-ই অর্ক। সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রকৃতপক্ষে ছিল সৌর যজ্ঞ বা সূর্যের আবাহন। মিশরীয়, চৈনিক, সৈন্ধব, বাণমুখ বা ক্যুনিফর্ম, জয়পুরীয় প্রভৃতি চিত্রলিপির মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়ে শঙ্করানন্দ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তান্ত্রিক লিপিই সকল লিপির মূলে। বৈদিক আর্যরাই মিশরীয় সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতাও তাঁদেরই সৃষ্টি। মহেঞ্জোদড়োতে মাছ ধরার বড়শি পাওয়া গেছে। মাছ এখানে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত বলে বোঝা যায়। বৈদিক আর্যদের মধ্যে মাংসই ছিল আহার্য। স্বামী শঙ্করানন্দের মতে, বেদে যজ্ঞ প্রসঙ্গে মাছের বহুল উল্লেখ থেকে মনে হয়, আর্যদের মধ্যেও মাছ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হত।

যাঁরা বৈদিক সভ্যতাকে অতিদূরে, প্রাগৈতিহাসিক অতীতের প্রান্তদেশে টেনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী, এস, বি, ভেঙ্কটেশ্বর তাঁদের একজন। ঋগ্বেদে প্রাপ্ত জ্যোতিষিক তথ্যের ভিত্তিতে তিনি বেদের যুগের প্রাচীনতার সীমারেখা ১১,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা বৈদিক আর্যগণেরই সৃষ্টি। যে-সব কারণে সিন্ধু সভ্যতা আর বৈদিক সভ্যতাকে অভিন্ন করে দেখা যায় না, সেগুলি হচ্ছে : বৈদিক আর্যরা নাগরিক জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন, আক্রমণ করার অস্ত্র-শস্ত্রের সঙ্গে আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বর্মের ব্যবহার তাদের জানা ছিল, মাছ তাদের ভক্ষ্য ছিল বলে জানা যায় না, অশ্বের ব্যবহারে তাদের কৃতিত্ব সুবিদিত, ষাঁড়ের চাইতে গোমাতাতেই তাদের আগ্রহ ছিল অধিক, আর্যেরা প্রতিমা-পূজা ও শিব-পূজার বিরোধী, মাতৃকাদেবী বা শিবের পরিবর্তে অগ্নির উপাসনাই ছিল তাদের মধ্যে প্রচলিত। পক্ষান্তরে, সুবিন্যস্ত নাগরিক সভ্যতা,

শিরস্ত্রাণ-বর্ম প্রভৃতির অনাবিষ্কার, দৈনন্দিন যানরূপে ষাঁড়ের ব্যবহার, শীলমোহরগুলিতে ঘোড়ার চিত্রের অভাব এবং উৎখনিত স্তরের গভীরে ঘোড়ার কঙ্কালের অনুপস্থিতি, মাতৃকা-মূর্তি, ধ্যানস্থ যোগিমূর্তি ও ষাঁড়ের চিত্র সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতাকে বিশেষিত করেছে। অধ্যাপক ভেঙ্কটেশ্বরের ধারণায়, পুর শব্দটি বেদে দুর্গ-নগরী অর্থে ব্যবহৃত এবং নাগরিক জীবন আর্যদের অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত ছিল না। সিন্ধু উপত্যকার মানুষ ও বৈদিক আর্যেরা তাম্র, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির ব্যবহার জানতেন। উভয় সভ্যতাই তাম্রপ্রস্তর যুগের। কিন্তু ঋগ্বেদে প্রাচীনতর তাম্রপ্রস্তর যুগের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। অদ্রি, অশনি, বজ্র, অশ্মের বজ্রাস্থি-নির্মিত পরশু প্রভৃতির উল্লেখ প্রাচীনতর যুগের নির্দেশক। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত কয়েকটি মূর্তিতে দেখা যায়, উত্তরীয় বা বস্ত্র দক্ষিণ হাতকে অনাবৃত রেখে বাঁ হাত সমেত শরীরের ঊর্ধাঙ্গ আবৃত করেছে। এ ধরণের পোষাক পরার রীতির উল্লেখ বেদে দেখা যায় না। কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।২) এ রকম পোষাক পরার কথা আছে। সিন্ধু সভ্যতার মাতৃকা-মূর্তি সম্ভবতঃ পৃথিবী দেবী। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে স্ত্রীদেবতার প্রথম উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। কুব্জ-পৃষ্ঠ-ষাঁড় আবিষ্কৃত হয়েছে সিন্ধু উপত্যকার খননকার্যের ফলে। কুঁজের সমার্থক বৈদিক শব্দ হচ্ছে ককুৎ বা ককুদ। ঋগ্বেদের প্রথম দিকে শব্দটি পর্বত-শৃঙ্গ অর্থেই প্রযুক্ত। কিন্তু শেষের দিকে (৮।২০।২১ ; ১০।১০২।৭) শব্দটি বৃষের পৃষ্ঠদেশের কুঁজ নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ ঋগ্বেদ-রচনার শেষ পর্বে গোষাতার সঙ্গে ষাঁড়ও প্রাধান্য পেতে সুরু করেছে। ইন্দ্রকে তো প্রায়ই 'বৃষভ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েকটি শীলমোহরে বাঘের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদে বাঘের উল্লেখ নেই, আছে অন্যান্য বেদে। নাগের চিত্রও মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গেছে। যজুর্বেদে নাগ উল্লিখিত। সুতরাং ঋগ্বেদের যুগ পূর্ববর্তী, কিন্তু ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডল রচনার কাল ও অপরাপর বেদের কাল সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সমসাময়িক। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় অসংখ্য মৃন্ময়ী মাতৃকা মূর্তি পাওয়া গেছে। এই সভ্যতায় তাই প্রতিমা-পূজা প্রচলিত ছিল বলেই মনে হয়। ঋগ্বেদের যুগেও যজ্ঞানুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিমা-পূজা প্রচলিত ছিল বলে অধ্যাপক ভেঙ্কটেশ্বর মনে করেছেন। ঋগ্বেদে (২।৩৩।১) বলা হয়েছে, 'বক্রঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ।' অর্থাৎ বক্র স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত হচ্ছেন। অন্যত্র (১।২১।২) দেখা যায়, 'ইন্দ্রাগ্নী তন্তুভা নরঃ।' অর্থাৎ অলঙ্কার দিয়ে ইন্দ্র ও অগ্নিকে শোভিত কর। এখানে ইন্দ্র, অগ্নি ও বক্রর প্রত্যক্ষগ্রাহ্য মূর্তি ছাড়া অলঙ্করণের সম্ভাবনা নেই। সুতরাং উক্তিগুলি মূর্তিকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। তাছাড়া গাথমেধ ঋষি এক জায়গায় (৪।২৪।১০) বলেছেন, 'কে আমার ইন্দ্রকে দশটি ধেনু দিয়ে ক্রয় করবে? যখন ইন্দ্র শত্রুদের বধ করবেন, তখন তাঁকে পুনরায় আমাকে প্রদান করবে।' সেকালে ইন্দ্রের বিগ্রহ সম্ভবতঃ দশটি ধেনুর বিনিময়ে প্রদত্ত হত এবং অভিপ্রেত ইন্দ্র-পূজার পর তা ফিরিয়ে দেওয়া হত। সিন্ধু উপত্যকায় খননকার্যের ফলে উপরের স্তরেই কেবল ঘোড়ার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলি অপ্রাচীন বলেই অনেক পণ্ডিতের ধারণা। সম্ভবতঃ গভীর স্তরের ভূমি যবচাষযোগ্য বলেই সেখানে ঘোড়ার কঙ্কালের অনুপস্থিতি লক্ষিত হয়েছে। মৃতদেহের সৎকারপ্রথা উভয় সভ্যতায় একরূপ ছিল। ঋগ্বেদে

অসুরদের পুরীকে অশ্মময়ী বা পাষাণ-নির্মিত বলা হয়েছে (৪।৩০।২০)। আর্যদের পুরী ছিল ইষ্টক-নির্মিত। তাছাড়া 'কাল্পস সংহিতা'য় যে ধরণের ইষ্টকের বর্ণনা আছে, মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় সে রকম ইষ্টকই পাওয়া গেছে।

সার মর্টিমার হুইলারের অভিমত অনুসারে, বৈদিক আর্যরাই সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসকারী। শত্রুর পুর বা দুর্গ বিদীর্ণ করেছিলেন বলে ইন্দ্রের আর এক নাম পুরন্দর। রাজা দিবোদাসের সাহায্যার্থে ইন্দ্র শম্বরাসুরের নিরানব্বইটি দুর্গ ধ্বংস করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে কোনোটি ছিল অশ্মময়ী বা প্রস্তরনির্মিত, আবার কোনোটি ছিল আমা বা মৃত্তিকানির্মিত। মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, সুরুগোনদোর, আলিমুরাদ প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত অশ্মময়ী ও আমা পুরীই হচ্ছে ইন্দ্রের দ্বারা বিধ্বস্ত পুরী। প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আর্যদের ভারতে প্রবেশের সময় প্রাকৃতিক কারণে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা হয়ে পড়েছিল ক্ষয়িষ্ণু। আক্রমণকারী বাবাবর আর্যগণের দ্বারা তাই সহজেই এই সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়।

ধাতুর ব্যবহারে বেদ ও মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার মধ্যে ঐক্য দেখা গেলেও দু'টি যে অভিন্ন সভ্যতা নয়, এ অভিমত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর। বৈদিক আর্যরা আত্মরক্ষার জন্য শিরস্ত্রাণ ও কবচ ব্যবহার করতেন। কিন্তু অস্ত্র আবিষ্কৃত হলেও মহেঞ্জোদড়ো থেকে আত্মরক্ষার কোনো সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয় নি। বৈদিক আর্যদের গৃহে অগ্ন্যাধান করে তাতে অগ্নির আহুতি দেওয়া হত। কিন্তু মহেঞ্জোদড়োতে অগ্নিকুণ্ডের চিহ্ন কমই লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার পূর্ববর্তী বলে ধরে নিলে বেদে গোমাতার শ্রেষ্ঠত্ব, তারপর সিন্ধু সভ্যতায় বৃষের প্রাধান্য এবং পরবর্তী যুগে আবার গোমাতার পূজা প্রভৃতি ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী এটাও উল্লেখ করেছেন যে, ঘোড়ার চিত্র বা কঙ্কাল মহেঞ্জোদড়োর নিম্নস্তরে আবিষ্কৃত না হলেও বেলুচিস্তানের রণঘুণ্ডৈ নামক স্থানে প্রাক্-সিন্ধু সভ্যতা যুগের ঘোড়ার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

সিন্ধু-উপত্যকায় ভূমধ্যসাগরীয়, ককেশীয়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় লোকের বসবাস ছিল। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে, 'আর্য' শব্দটি জাতিবাচক নয়, কৃষ্টিবাচক। ঋগ্বেদে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদেরও আর্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর থেকেই মনে হয়, আর্যরা সবাই এক শারীরিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জাতি বা নৃগোষ্ঠী নয়। আর্যদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে শারীরিক গঠনের পার্থক্য থাকাই সম্ভব। আর্যরা নর্ডিক, এ'কথা ডঃ দত্ত স্বীকার করেন নি। সুতরাং নরকঙ্কাল পরীক্ষার দ্বারা সিন্ধুতীরবাসীরা আর্য না অনার্য, তা প্রমাণ করা যাবে না।

সিন্ধুনদের উপত্যকাতেই এ সভ্যতা সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তী খননকার্যের ফলে পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, বেলুচিস্তানে ও গুজরাটে অনুরূপ ও সমসাময়িক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজস্থানের অন্তর্গত কালিবঙ্গানে ঘর্ঘরা নদীর (অবৈদিক সরস্বতী নদী) উপত্যকায় ইষ্টক-নির্মিত গৃহ, বেদী, অগ্নিকুণ্ড প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব সিন্ধু সভ্যতারও পূর্ববর্তী কালের বলে পণ্ডিতদের ধারণা। সেখানে বলরেখার চিহ্নযুক্ত একখণ্ড চাষের জমিও আবিষ্কৃত হয়েছে। বেদে যা উল্লিখিত হয় নি, বৈদিক যুগে তার প্রচলন ছিল না কিংবা

সিন্ধু সভ্যতায় যা পাওয়া যায় নি, সেখানে তা অপ্রচলিত ছিল বলে মনে করলে argumentum ex silentio-কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

॥ অন্যান্যের কালনির্ণয় ॥

যে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে একদিন মহাসমরের তূর্যনিনাদ কম্পিত করেছিল আকাশের বাতাস, ঈর্ষাসিন্ধুমন্থন-সঞ্জাত অমৃতরস পান করবার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন ঋষী-মহাঋষীরা, সেখানে কান পাতলে এখন আর শোনা যাবে না অক্ষৌহিণী পদধ্বনি। কি সে ঘটনার ঐতিহাসিকতা আজ পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত। কেবল সে ঘটনার কাল-নির্ধারণে ঘোচে না মতভেদ।

পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মতে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল হচ্ছে ৩১০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হলে শকাব্দ আরম্ভ হয়েছিল বলে ভাস্করাচার্য তাঁর 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'তে বলেছেন :

যাতাঃ ষণ্মনবো যুগানি ভমিতাস্তন্ধুগাব্দ্যিত্রয়ং
নন্দাব্রীন্দুগতাস্তথা শকনৃপকালান্তে কলের্বৎসরাঃ।

আবার গুজরাটের চালুক্যবংশীয় রাজা, দ্বিতীয় পুলকেশীর ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি শিলাফলকে উৎকীর্ণ দু'টি শ্লোক হচ্ছে এ রকম :

ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দ-শতযুক্তেষু গতেষ্বব্দেষু পঞ্চসু ॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম ॥

অর্থাৎ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের ৩৭৩৫ বৎসর অতীত হলে এবং শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর অতীত হলে শিলাফলকটি উৎকীর্ণ হয়েছিল। ৩৭৩৫ − ৫৫৬ = ৩১৭৯ যুধিষ্ঠিরাব্দ। এই সময় থেকেই শকাব্দ প্রচলিত হয়। অন্যদিকে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শকাব্দ প্রচলিত হয়। সুতরাং ৩১৭৯ − ৭৮ = ৩১০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও পুরাণে বর্ণিত বংশলতিকার ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কাল-বিচারের চেষ্টা করেছেন এমন একজন কৃতবিদ্য গবেষকের মতে, মহাভারতের যুদ্ধের কাল হচ্ছে ১১৫১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। বরাহমিহিরের ভাস্বকার ভট্টোৎপল পরাশর ও গর্গের উক্তি বলে যেটা প্রচার করেছেন, সেটা হচ্ছে এই যে, সূর্য যখন ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে পৌঁছতে না পৌঁছতেই উত্তরায়ণ সূচিত হবে, তখন মহৎ ভয় উপজাত হবে এবং লোকক্ষয় হবে। গাণিতিক হিসাবে ১২১৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এমন হওয়া সম্ভব। সম্ভবত তখন পরাশর এ রকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। পরাশরের পুত্র ব্যাসদেব, ব্যাসদেবের পুত্র পাণ্ডু আর পাণ্ডুর পুত্র অর্জুন। সুতরাং পরাশর থেকে অর্জুন অধস্তন তৃতীয় পুরুষ। উভয়ের বয়সের পার্থক্য ৬১ বৎসর ধরে নিলে ১১৫১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হচ্ছে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের কাল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল থেকে গৌতম বুদ্ধের কাল পর্যন্ত অন্তত তিনটি রাজবংশের বংশানুক্রম নির্ভরযোগ্যভাবে পাওয়া যাচ্ছে। এই তিনটি রাজবংশ হচ্ছে কোশল, মাগধ এবং পৌরব।

কোশল বংশে বৃহদ্বল থেকে প্রসেনজিৎ পর্যন্ত ২২ পুরুষ। প্রতি পুরুষে ২৮ বৎসরকাল ধরে নিলে ২২ পুরুষে ৬১৬ বৎসর পাওয়া যাচ্ছে। প্রসেনজিতের অভিষেককাল হচ্ছে ৫৩৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সুতরাং মহাভারতের যুদ্ধের কাল দাঁড়াচ্ছে ৬১৬+৫৩৩=১১৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। অন্যদিকে মাগধ বংশে সোমাধি থেকে রিপুঞ্জয় পর্যন্ত ২২ পুরুষ। পৌরব রাজবংশে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ থেকে উদয়ন পর্যন্ত ২২ পুরুষ। রিপুঞ্জয় ৫১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিহত হন এবং উদয়নের রাজ্যাভিষেক কাল ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সুতরাং মহাভারতের যুদ্ধের কাল ১১৫১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলে ধরে নিতে পারা যায়। ঋগ্বেদে উল্লিখিত একজন প্রাচীন রাজা হচ্ছেন দিবোদাস। ইনি দাসরাজ শম্বর ও বর্চিকে উদগ্রব নগরে বধ করেন। উক্ত গবেষকের মতে, ইক্ষাকু বংশের দশরথ দিবোদাসের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এই যুদ্ধ প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ঘটনা। সুদাস দিবোদাস থেকে এবং পুরুষ পরবর্তী। সুতরাং অনু, দ্রুহ্য, তুর্বশ, যদু প্রভৃতির সঙ্গে সুদাসের যুদ্ধের কাল প্রায় ১৪৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা হচ্ছে রাম-রাবণের যুদ্ধ, যা কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের ৩০০ বৎসর পূর্ববর্তী।

●

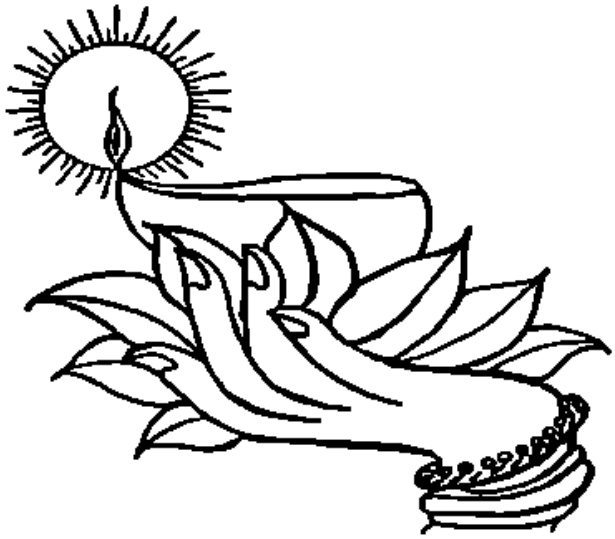

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

(পোড়ামাটির ঘোড়া এবং পেতলের প্যাচা)

বন্ধুগৃহের ড্রইংরুমের এক কোণে কাশ্মিরী টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং একটু দূরে দেয়ালে র‍্যাক্-এর ওপর রাখা ডোকরা শিল্পের নিদর্শন পেতলের প্যাচাটি গম্ভীর মুখে আমাদের নিরীক্ষণ করছে। ড্রইংরুমের সোফায় উপবিষ্ট বন্ধু, বন্ধুপত্নী এবং অপর এক অধ্যাপক বন্ধুর কেউই সম্ভবতঃ এ মুহূর্তে ওই ঘোড়া এবং প্যাচা সম্বন্ধে সচেতন নন্। এমনকি আমাদের সামনের ট্রিপয়ে সুন্দর নকশাঙ্কিত ও ঈষৎ স্বচ্ছ ধবধবে সাদা রঙের পোর্সিলেনের যে-পেয়ালাগুলো থেকে চা-এর ধোঁয়া উঠছে— সে-পেয়ালার শঙ্খ-শুভ্রতা, স্বচ্ছতা কিংবা সূক্ষ্ম নকশার প্রতিও কারুর লক্ষ্য নেই। আলোচনা চলছে সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বগামী বাজারদর নিয়ে। ড্রইংরুমের দেয়ালে প্লাস্টিক পেন্ট-এর মসৃণ গোলাপী রঙ এবং ওই দেয়ালে ঝোলানো দুটি বিদেশী ক্যালেণ্ডারের একটিতে সর্বাধুনিক জেট্ প্লেন এবং অপরটিতে মার্কিনী স্কাই স্ক্র্যাপারের রঙীন ফটোগ্রাফ্। নিওনের উজ্জ্বল সাদা আলোয় ওই জেট্ প্লেন এবং স্কাই স্ক্র্যাপারের পাশাপাশি পোড়ামাটির ঘোড়া এবং পেতলের প্যাচা আমার চোখে এক বৈপরীত্যের সৃষ্টি করছিলো। দুই বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর আলোচনার টুকরো টুকরো কথা কানে ভেসে আসলেও ওই বহু আলোচিত আলোচনায় আমার মনোযোগ নিবদ্ধ ছিলোনা এবং আলোচনায় আমি অংশগ্রহণ করছিলামনা। এর কারণ অবশ্য এই নয় যে, আমার যা আয় তাতে বাজারদরের ঊর্ধ্বগতিতে আমার উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ওই ঘোড়া এবং প্যাচাটির দিকে তাকিয়ে আমার যে-কথা মনে হচ্ছিলো— তা হলো শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে শিল্পকলার সম্পর্ক এবং এদেশের শিল্পীদের বর্তমান অবস্থার কথা।

যতদূর মনে পড়ছে, দিলীপকুমার রায়ের কোনো রচনায় পড়েছিলাম, গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে দিলীপকুমার গান্ধীজীর ঘরের দেয়ালে চিত্রকলার কোনো নিদর্শনের

অনুপস্থিতির হেতু জিজ্ঞেস করায় গান্ধীজী নাকি ঘরের জানলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিলীপকুমারকে বলেছিলেন, 'ওই জানালার ফ্রেমের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিরচিত শিল্পকর্ম সকাল থেকে রাত্রি অবধি দেখা যায়। শিল্পী-রচিত চিত্রকলার কোনো নিদর্শন দেয়ালে রাখবার প্রয়োজন তাই তিনি বোধ করেন না।' এ-কথাটি এখানে উল্লেখ করছি এজন্যে যে, কিছুকাল পূর্বে কোনো বিজ্ঞানের অধ্যাপকের সঙ্গে শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করতে গিয়ে দিলীপকুমার-বর্ণিত এবং গান্ধীজী-কথিত চিত্রকলা সম্বন্ধে উল্লিখিত মন্তব্যের উদ্ধৃতি তাঁর কাছে শুনেছিলাম। উক্ত অধ্যাপকের কাছে এ-ও শুনতে হয়েছিলো যে, তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বিজ্ঞানবিষয়ে তিনি যেহেতু অধ্যাপনা করেন, সেহেতু বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেই তিনি সর্বাধিক আগ্রহান্বিত। শিল্পকলা তিনি বোঝেননা, তাই ওই সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহও নেই। অধ্যাপক মহাশয়ের সারল্য এবং স্পষ্টোক্তির সৎসাহস সন্দেহাতীত। কিন্তু ওই বিজ্ঞানের অধ্যাপককে যদি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের একজন প্রতিনিধি বলে মনে করা যায়, তবে শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর উল্লিখিত মনোভাবের প্রতিফলন যে অন্যান্যদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যেতে পারে—এটা মনে করা সম্ভবতঃ অযৌক্তিক হবেনা।

ড্রইংরুমে যাঁরা বসে আছেন—তাঁদের কথাই এক্ষেত্রে ধরা যাক্। এঁরা হয়তো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, রোঁদা, পিকাসো, মাতিস, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ, অতুল বসু, রামকিংকর প্রভৃতি স্বদেশী ও বিদেশী শিল্পীদের নাম জানেন, হয়তো উল্লিখিত শিল্পীদের কারুর কারুর চিত্রকলা কিংবা ভাস্কর্যের প্রিন্টও দেখে থাকবেন। এঁরা যে-সমাজের প্রতিনিধি—সে-সমাজের কেউ কেউ চিত্রকলা অথবা ভাস্কর্যের প্রিন্ট বসবার ঘরের দেয়ালে হয়তো ঝুলিয়েও রাখেন। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অধিকাংশের ড্রইংরুমে ওই চিত্রকলা-ভাস্কর্যের প্রিন্ট কিংবা পোড়ামাটির ঘোড়া অথবা ডোকরাশিল্পের প্যাঁচা শোভা পায় কেবলমাত্র গৃহসজ্জার অন্যতম উপকরণ হিসেবে। এর বেশি মূল্য ওগুলোকে দিতে ওঁরা রাজী হবেন বলে মনে হয় না। অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি এবং মূল্যবোধকেই মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিতে হবে।

শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে ইদানীং শিল্পকলা—বিশেষ ক'রে লোকশিল্প একটা ফ্যাশানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিত্রকলার প্রিন্ট-এর মতো লোকশিল্পের কিছু নিদর্শন বসবার ঘরে সাজিয়ে রাখবার রেওয়াজ হয়েছে। শিল্পী যামিনী রায় তাঁর রচনার মাধ্যমে বাংলার লোক-শিল্পকে নবতর মহিমা দান করেছেন। এছাড়া সাম্প্রতিককালে লোকশিল্প এবং লোকশিল্পীদের সম্বন্ধে গবেষণা করে অনেকে উচ্চতম ডিগ্রীলাভ করছেন এবং পত্র-পত্রিকায় ওই বিষয়ে রচনা প্রকাশ করে পরিচিতি ও খ্যাতিলাভও করছেন। এর ফলে কর্মস্থলে এঁদের পদোন্নতি হয়তো ঘটছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার লোকশিল্প তথা লোকশিল্পীদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ক'জন খোঁজ রাখেন? এ'সব লোকশিল্পীদের মুষ্টিমেয় দু'চারজন হয়তো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাচ্ছেন। কিছু কিছু লোকশিল্পীর কাজ বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীদের ভবিষ্যত যে আশাপ্রদ—একথা বলা চলে না। যেসব কারণে

লোকশিল্পীদের অনেকেই বংশানুক্রমিক বৃত্তি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন—তার প্রধানতম কারণ অর্থাভাব। তাছাড়া যন্ত্রচালিত শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হস্তশিল্প অনেক জায়গাতে শিল্প হটতে বাধ্য হচ্ছে।

শহরবাসী চিত্রকর কিংবা ভাস্করদের ভবিষ্যতও যে উজ্জ্বল—এ-কথা বলা চলে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরের কথা বলতে পারবো না। তবে কোলকাতা শহরে যে ক'জন ভাগ্যবান চিত্রকর-ভাস্করের চিত্র-ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে বিক্রী হয়—তাঁদের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। চড়া দামে রঙ, তুলি, কাগজ, ক্যানভাস কিনে ছবি এঁকে প্রদর্শনীকক্ষের ভাড়া গুণে প্রদর্শনী করে অধিকাংশ চিত্রকর-ভাস্করের ভাগ্যে জোটে স্থানীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিক পত্রিকার এক কোণে নিন্দা-প্রশংসা মেশানো একটু আলোচনা। তা-ও আবার সকলের ভাগ্যে জোটে না। পূর্বতন 'হায়ার সেকেণ্ডারি কোর্স'এর সিলেবাস-এ অন্ততঃ অতিরিক্ত বিষয়রূপেও চারুশিল্পের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিলো। এতে হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলগুলোতে কিছু শিল্পশিক্ষকের পদ সৃষ্ট হওয়ায় কতক শিল্পীর জীবিকার সংস্থান সম্ভব হয়েছিলো। বর্তমান সিলেবাস-এ নাকি চারুশিল্পের অবলুপ্তি ঘটেছে। শিল্পীদের চাকরী অথবা জীবিকার কথা ছেড়ে দিলেও ভবিষ্যত নাগরিকদের শিল্পচেতনার উন্মেষের বিষয়ে শিক্ষাবিদরাই বা কতোটা সচেতন—এসব কথা ভাবতে ভাবতে ড্রইংরুমের উজ্জ্বল নিয়ন আলোতেও ওই পাঁচমুড়ার ঘোড়া এবং ডোকরা শিল্পের প্যাচা ক্রমশঃ যেন অনুজ্জ্বল ও ম্লান হয়ে যেতে লাগলো। মনে হতে লাগলো এক আশঙ্কার ছায়া। চিত্র-ভাস্কর্যের কথা ছেড়েই দিলাম। ভবিষ্যতে (হয়তো সুদূর) ওই পোড়ামাটির ঘোড়া কিংবা ডোকরাশিল্পের প্যাচার দেখা আর মিলবে তো ?

—দিবাকর সেনরায়

●

মাননীয় পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য জানাই যে, বিশ্ববাণীর বৈশাখ ১৩৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'গ্রন্থ-সমালোচনা'র 'ধর্মঃ আধুনিক অন্বেষা'-গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন অধ্যাপক ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী।

॥ সংঘবার্তা ॥

(বিশেষ বিজ্ঞপ্তি)

গত ১২ই মে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর ও প্রকাশম্ জেলা এবং আশেপাশের বহু অঞ্চলসহ তামিলনাড়ুর কিছু অংশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দ উক্ত পর্যুদস্ত এলাকায় প্রাথমিক ত্রাণকার্যে ব্যাপৃত আছেন। এই ত্রাণকার্যের সাহায্যের জন্য সকলকে মুক্তহস্তে দান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ,
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬।

চেক 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' এই নামে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ত্রাণকার্যের জন্য এযাবৎ যাঁহারা সাহায্য পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

যাঁহারা বন্যাত্রাণে দান করিয়াছেন—

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দাতার নাম		টাকা
শ্রীসবিতা হালদার, গোপালপুর, ভায়া চাপাপুকুর, ২৪ পরগণা	...	৫·০০
শ্রীতনুজ হালদার, গোপালপুর, চাপাপুকুর, ২৪ পরগণা	...	৫·০০
শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ মাহাতো, পো: বেনডোরান আর পি এইচ সি, জেলা পুরুলিয়া	...	৫·০০
শ্রীসুজিত লাহিড়ী, ২৮।১, ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯	...	৩·০০
শ্রীঅনিলকুমার দত্ত, রামকৃষ্ণ বস্ত্রালয়, চুঁচুড়া, হুগলী	...	১০·০০
শ্রীশিশিরকুমার ব্যানার্জি, ধানবাদ, বিহার	...	৯·০০
শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী, কলিকাতা	...	৮·০০
শ্রীমানিক সরকার, চিনসুরা রেলওয়ে কলোনী, চিনসুরা, আসাম	...	৮·০০
শ্রীঅমিয়বালা বসু, সোনারী, জামসেদপুর	...	১০·০০

উক্ত আদায়ীকৃত অর্থ বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে জমা দেওয়ার তারিখ ও রসিদ নম্বর যথা—
১৬।৫।৭৯—রসিদ নং ৪০১৯—৬৩৲ টাকা

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবার নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় নানান দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল'-এর উপরে (দ্বিতলে) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে অনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারেও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রসারতাকে জয়যুক্ত করবে। ইতি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সম্পাদক
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

With the Compliments of :—

TATA STEEL

★

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

রঘুনাথ বিল্ডিংস
৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :—
বারাণসী, কটক।

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট স্থগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী ভগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য বহুল ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ২০·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৪·০০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ৪·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	৫·০০
বীরত্বে বাঙালী	৪·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০
বাংলার কবি	৬·৫০
বাংলার মনীষী	৩·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০
ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৮·০০

(অত্যাবশ্যক অভিনব বাংলা অভিধান)

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1600)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes	
How To Be A Yogi		and its Guide Book	300·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Ideal of Education	3·00	The Steps Towards Perfection	2·00
India and Her People	12·00	The Vedanta Philosophy	
Life Beyond Death	16·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Memoirs of Ramakrishna	12·00	True Psychology	16·00
My Life Story	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
Mystery of Death	18·00	Yoga Psychology	16·00
Path of Relization		Yoga : Theory & Practice	10·00
Philosophy and Religion		Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	20·5

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Swami Abhedananda
VISVAVANI

41st Year. July 1979
VOL. V

Regn. No. WB/NC-141
PHONE : 55-1800

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

কুক্‌মী

ভারতের সেরা

গুঁড়া মশলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুক্‌মী প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী

ফোন-৩৩-০১১৭

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (ফাইন্স) প্রাইভেট লিঃ

২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

PRICE Rs. 1·50

Ramakrishna Vedanta Math.
19-B. Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006.

মূল্য ১·৫০ টাকা

স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

একচল্লিশ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ
১৩৮৬

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ১·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

  বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।
- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র দ্বারা পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·০০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

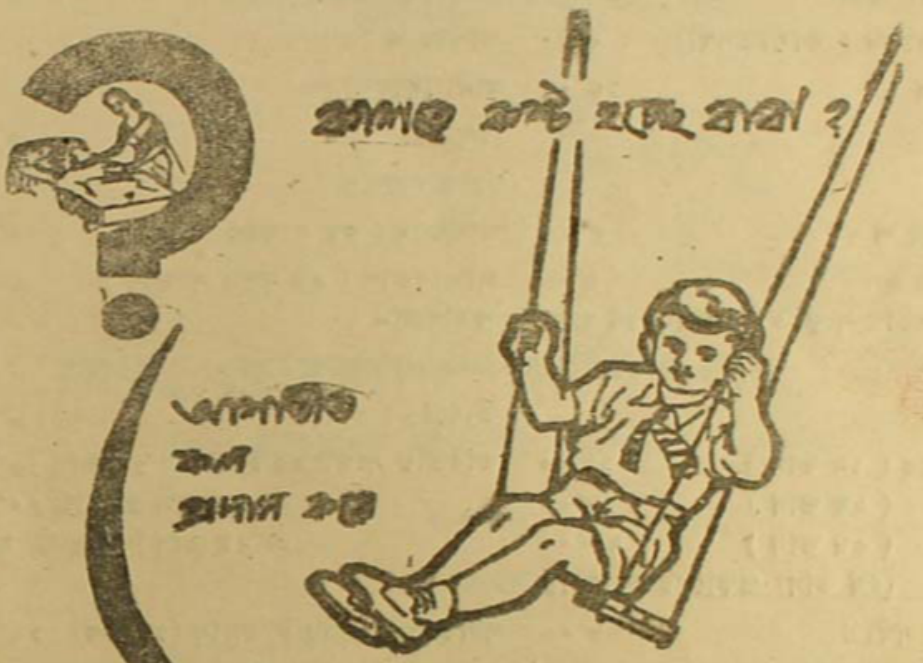

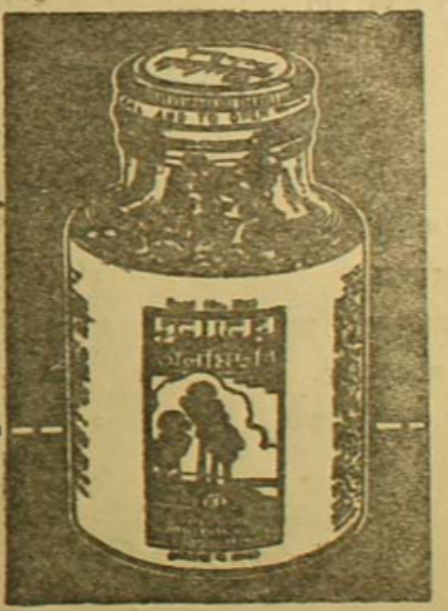

দুলালের
তালমিছরী

শ্রীসুধাংশু চন্দ্র দে
৪, রমানাথ মে, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৫১৩৩

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভাগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী বিবেকানন্দ	
মরণের পারে	১৪·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
যোগশিক্ষা		স্তোত্র-রত্নাকর	
পুনর্জন্মবাদ		আত্মজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)	১০·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	৪.০০	আত্মবিকাশ (৫ম নূতন সংস্করণ)	৬·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	কর্মবিজ্ঞান	
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ			

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ		তীর্থরেণু (বর্ধিত ২য় সং)	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্দ্ধ	যন্ত্রস্থ
ঐ (৪র্থ ভাগ) প্রকাশের অপেক্ষায়			
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা	১০·০০	পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতা চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৪৫-১৮··)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

আয়ুর্বেদীয় পেটেন্ট ঔষধালয়

ডাঃ সেনেক্স

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্রামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডাঃ এম, সি, পালের হস্তে পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০ নং বিধান সরণী, হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

GRAM : PURSHBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4632

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO. 10513. CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

কেশগুচ্ছে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

শ্রাবণ, ১৩৮৬

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীশশিরকুমার মজুমদার

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ

শ্রীদেবাশীষ হোড়

শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :

ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ন

শ্রীরবীরঞ্জন সোদার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥

শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়

মুদ্রণ :

শ্রীকুবের দত্ত

দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস

৬ নং ভাক্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার যোগশিক্ষা' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিভূভূষন ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ন' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.

(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fitings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office ;—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১১৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৪-১৬১৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা

তিল তৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল ঘরোয়া সকল
প্রয়োজনীয় বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • গাজিয়াবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

শ্রাবণ, ১৩৮৬

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। বাণী ও বিচার	২০৩	
২। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাঙ্গনে : পণ্ডিত পদ্মলোচন	২১০	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৩। ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২১৫	স্বামী প্রভানন্দ
৪। সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	২১৯	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৫। বিজ্ঞানীর ধর্মচেতনা	২২২	শ্রীমতী চামেলী বসু
৬। দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে	২২৭	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
৭। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	২৩০	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৮। সৌরসেনী : প্রাচীন ভারতের ভাষা	২৩২	ডক্টর রামজীবন আচার্য
৯। শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	২৩৪	
১০। গ্রন্থ-সমালোচনা	২৩৬	
১১। সংঘবার্তা	২৩৮	
১২। স্বাক্ষর	২৩৯	

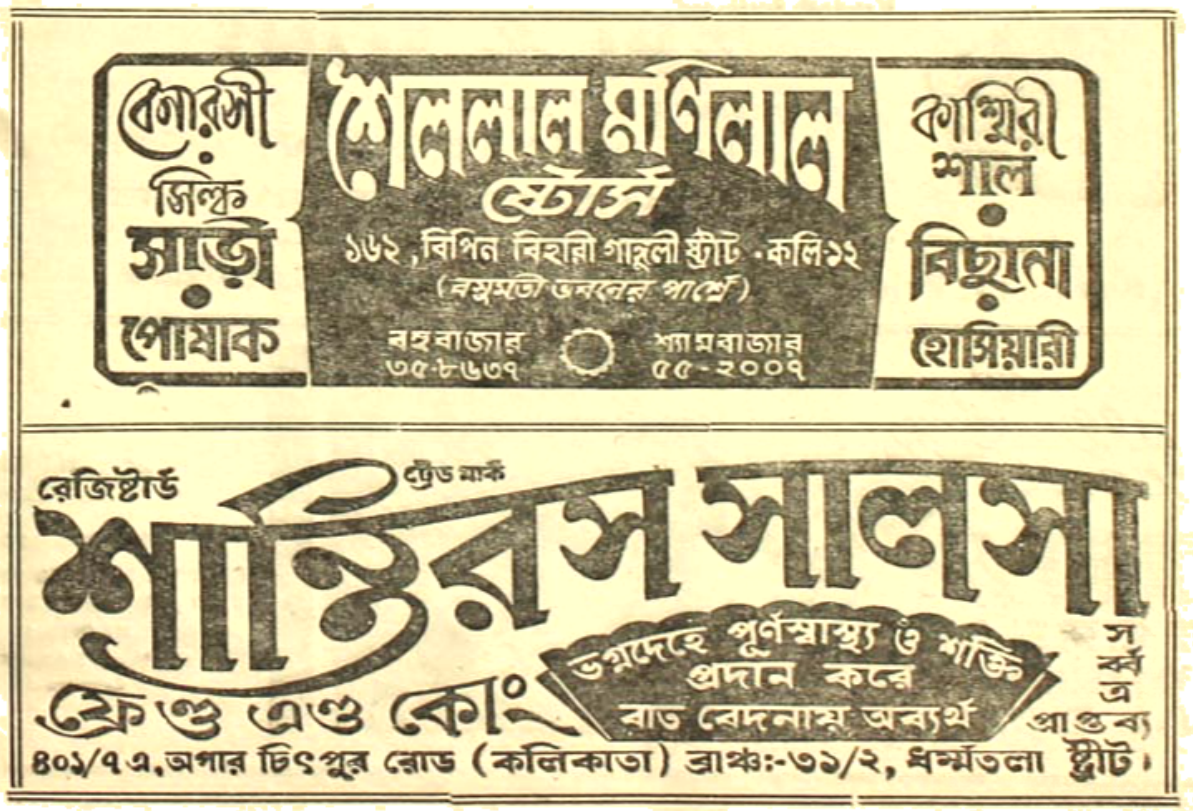

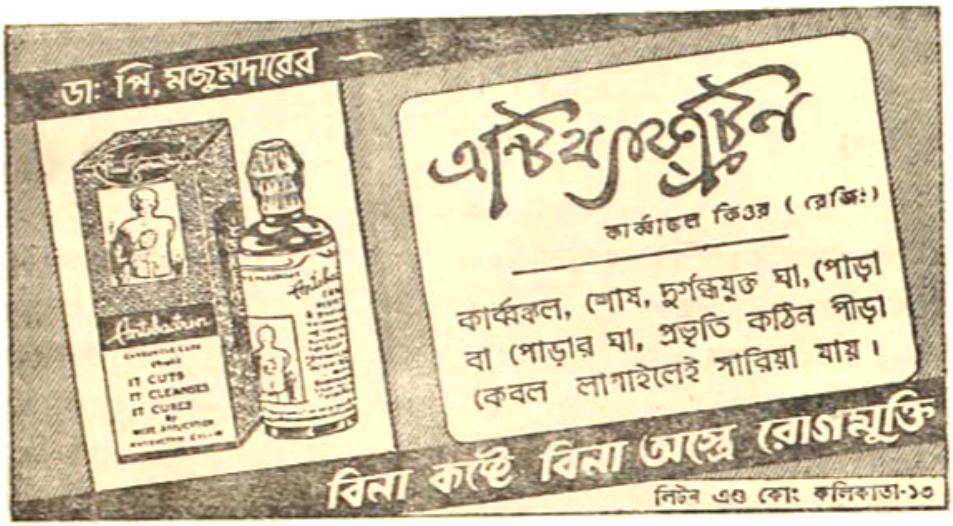

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

89, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

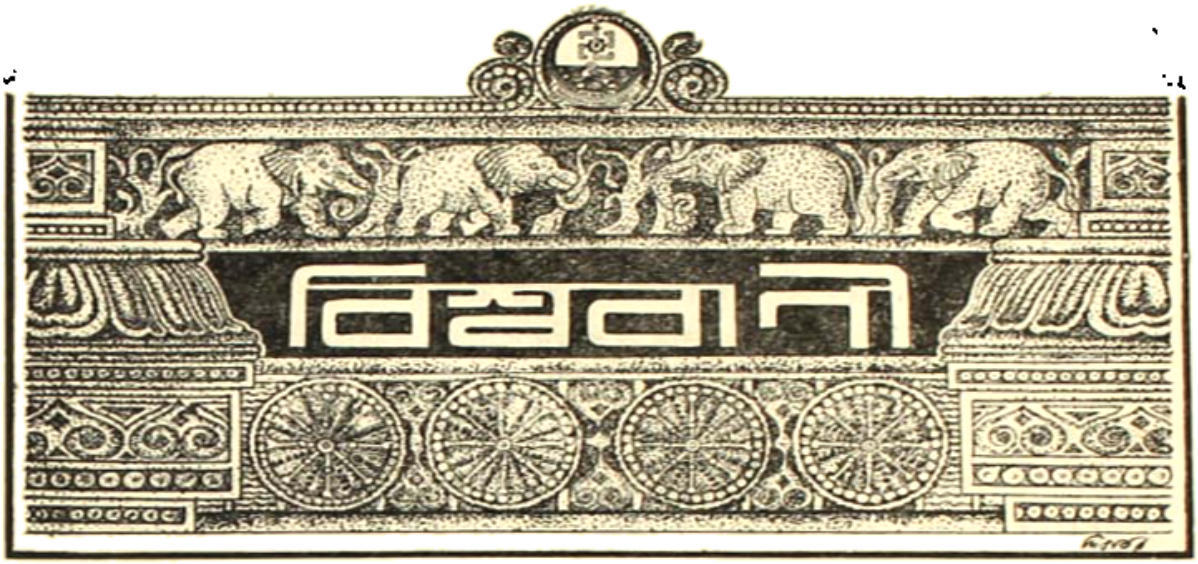

একচল্লিশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা | শ্রাবণ ১৩৮৬

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ বিজয় গোস্বামীর প্রতি উপদেশ ॥

(এক)

"শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি সহাস্যে)—'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো ব'লে তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে ? যে ভগবানের ভক্ত—তার কূটস্থ-বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই, হাতুড়ীর ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। অসৎলোকে তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে, তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য করবে। দুষ্টলোকের মধ্যে কি আর ঈশ্বরচিন্তা হয় না ? দেখনা, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করতো। চারিদিকে বাঘ, ভালুক, নানা হিংস্র জন্তু। অসৎলোকের বাঘ-ভালুকের স্বভাব ; তেড়ে এসে অনিষ্ট করবে"।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১৮৮

পঞ্চদশ খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় লিখেছেন : "বিজয় (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) তখনও সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজভুক্ত : ঐ ব্রাহ্মসমাজে একজন বেতনভোগী আচার্য। আজকাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিতেছেন না। সাকারবাদীদের সঙ্গেও মিশিতেছেন। এই সকল লইয়া সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর হইতেছে। সমাজের ব্রাহ্মভক্তদের অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) হঠাৎ বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতেছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলেছেন: 'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো ব'লে তোমার নাকি নিন্দা হয়েছে?'—শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় তার কারণ দেখিয়ে বলেছেন—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের বিধিবদ্ধ নিয়ম ও বিধি-নিষেধ মেনে চলা তাঁর পক্ষে কর্তব্য। অথচ ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের নিরাকার-উপাসনার পক্ষপাতী, সুতরাং সাকার-উপাসনা তাঁরা স্বীকার করেন না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উদারপ্রকৃতির লোক এবং একান্ত নিষ্ঠাবান ও ভক্তিমান সাধক, ভগবানের (ঈশ্বরের) সাকার-মূর্তি তিনি স্বীকার করেন, আবার নিরাকার-উপাসনার প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে। বিশেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করেন, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যান। তাছাড়া কলকাতায় যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসেন ও ভক্তগণের সঙ্গে বিহার করেন, তখনও মাঝে মাঝে বিজয়কৃষ্ণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্বৈর উদার উপদেশবাণী শ্রবণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার দু'রকম রূপ ও উপাসনাই বিশ্বাস করেন, কেননা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতবাদই হ'ল: জল কখনও বাষ্প হয় গরমে, আবার বরফ হয় ঠাণ্ডায়, কিন্তু আসল উপাদান উভয়ের জলই। তেমনি ঈশ্বর কখনও ভক্তগণের ভক্তিহিমে সাকার হন—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'; আবার সকল নাম-রূপ-উপাধিবিহীন নিরাকারও হন। সাধক রামপ্রসাদ তাই বলেছেন—'সাকারা মা নিরাকারা'। তবে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সত্যকারের রূপ বা স্বরূপ সাকার-নিরাকার উভয় উপাধিরই অতীত, কোন উপাধি বা বিশেষণই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারে না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এ'সকল আলোচনা শুনেছেন, নিজেও একজন সাধক ও উপাসক, সেজন্য সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বেই তাঁর মন সর্বদা থাকতো। গোঁড়ামী ও অনুদার মনোভাব থেকে নিজেকে তাই তিনি পৃথক রাখার চেষ্টা করতেন, সেজন্য "আজকাল (তখন) তিনি ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিতেছেন না। সাকারবাদীদের সঙ্গেও মিশিতেছেন। এই সকল লইয়া সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর হইতেছে। সমাজের ব্রাহ্মভক্তদের অনেকেই তাঁহার (বিজয়কৃষ্ণের) উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন"। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নিজেও বুঝেছিলেন যে, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের একদেশী মতবাদের সঙ্গে এবং সমাজের কর্তৃপক্ষ ও ভক্তদের সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে চলতে পারছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্ব থেকেই ব্রাহ্মসমাজ ও সমাজের ভক্তদের মতিগতি ও ধর্মবিশ্বাস-সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং সমাজমন্দিরে আসন গ্রহণ ক'রেই তাই বলেছিলেন: "শুনলাম, এখানে নাকি সাইনবোর্ড আছে। অন্যমতের লোক নাকি এখানে (সমাজমন্দিরে) আসবার যো নাই।.....আমি বলি—সকলেই তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডাকছে। ঘেঁষাঘেঁষীর দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি—যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism[১]) ভাল নয়.....।" অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'সাইনবোর্ড' ও 'অন্যমতের লোক' শব্দদুটি বলার সময়ে 'নাকি' কথা ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ ঐ কথা সত্য নাও হতে পারে, অথবা লোকমুখে

১। পূর্বেই বলেছি যে, এই ইংরাজী শব্দ মাষ্টার মহাশয় নিজে ব্যবহার করেছেন।

শোনা-কথাও হতে পারে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলার মধ্যে বুদ্ধির বিচক্ষণতা ছিল। তাছাড়া আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার জিনিস যে, তিনি যখন সাকার-নিরাকার-বিষয়প্রসঙ্গে দেবাদেবীর কথা বলেছেন তখন অন্যের কথা বা বিভিন্ন শাস্ত্রবচনের দোহাই না দিয়ে সোজাসুজী স্পষ্টভাবে নিজের মতের কথাই বলেছেন : "আমি বলি সকলেই ডাকছে" ও "আমি বলি—যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়"। মতুয়ার বুদ্ধির অন্য নাম পাটোয়ারী বুদ্ধি, অর্থাৎ যে বুদ্ধি সত্য বা সঠিক কোন জিনিস নির্ধারণ না ক'রে একদেশী ও অনুদার দ্বন্দ্ব-কলহের পরিবেশ সৃষ্টি করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনুদার ও একদেশী (গোড়ামী) ভাবের চিরদিনই বিরোধী ছিলেন। সেজন্য সাধক কবীরের দোঁহার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন—

'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ।
কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী॥'

অর্থাৎ সাকার ও নিরাকারের ওজন একই রকমের, কেননা সাকারবাদী যদি একনিষ্ঠ ও আন্তরিক হয় তবে ঈশ্বরকে পাবে, আর একনিষ্ঠ ও আন্তরিক নিরাকারবাদীও ঈশ্বরকে পাবে। তাই পথ ও মত ভিন্ন হলেও লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থল এক।

ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে প্রার্থনার বেদীর নীচে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসন গ্রহণ করলে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং আরও অনেক ব্রাহ্মভক্ত তাঁর সম্মুখে উপবেশন করেছিলেন। কিন্তু তাহলেও চিরপরিচিত বিজয়কৃষ্ণের দিকেই তাঁর সদয়-দৃষ্টি একান্তভাবে নিবদ্ধ ছিল। পূর্বেই বলেছি যে, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরবিশ্বাস, উপাসনাবিধি ও নিয়মপদ্ধতিসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন এবং ভক্তসাধক বিজয়কৃষ্ণসম্পর্কেও[২] তিনি কিছু কিছু জানতেন। সেজন্য বিজয়কৃষ্ণকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন : "(বিজয়ের প্রতি সহাস্যে) তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো ব'লে তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে? সে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ-বুদ্ধি হওয়া চাই"।

এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'নাকি' শব্দ ব্যবহার করেছেন—"তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মসমাজপতিদের এবং ব্রাহ্মভক্তদের একদেশী একঘেয়ে মনোভাব ও বিশেষ ক'রে উদারদৃষ্টিসেবী সাধক বিজয়কৃষ্ণের অসহায় অবস্থার কথা শুনে বিশেষ মর্মাহত হয়েছিলেন। সেজন্য সমবেদনার সুরেই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লক্ষ্য ক'রে এ'কথাগুলি বলেছিলেন—"তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো ব'লে তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে?"—প্রভৃতি।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন : "যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ-বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ীর ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। অসৎলোকে তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য করবে।"

২। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ ও ভক্তগণের সঙ্গে যে কিছুটা মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল সে-সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্ব থেকেই জানতেন।

কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলেন যেন সেভাবে কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে চিন্তান্বিত এবং মোহ ও অবসাদপ্রাপ্ত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—

'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম্।

* * *

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

* * *

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

* * *

সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

* * *

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থীতধীর্মুনিরুচ্যতে॥'

কিন্তু পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥'

'যুক্ত আসীত মৎপরঃ' অর্থে ঈশ্বরগতচিত্ত হয়ে ও ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে সকল-কিছু স্তুতি ও নিন্দা সহ্য করা উচিত—'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনিঃ' এবং তাহলেই সংসারে স্থিতধীরূপে (সংযতচিত্ত হয়ে) সংসারে থাকা সম্ভব। সহ্যগুণই সংসারে ও জীবনে একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই এ'কথার সমর্থনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন: "যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ-বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালায় নাই, হাতুড়ীর ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। ...তুমি সব সহ্য করবে"।

অদ্বৈতবেদান্তে সর্বাতীত ও সর্বোপরম তুরীয়-ব্রহ্মকে কূটস্থ বলা হয়েছে। বেদান্তদর্শনের 'তত্তু সমন্বয়াৎ' (১।১।৪) সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন: "ইদং তু পারমার্থিকং কূটস্থং নিত্যং ব্যোমবৎ সর্বব্যাপি সর্ববিক্রিয়ারহিতং নিত্যতৃপ্তং নিরবয়বং স্বয়ংজ্যোতিস্বভাবম্। যত্র ধর্মাধর্মৌসহ কার্যেণ কালত্রয়ঞ্চ নোপবর্ত্ততে তদশরীরং মোক্ষাখ্যম্।" ব্রহ্মভাবকেই মোক্ষ বলে। পরে আচার্য শঙ্কর বলেছেন: "ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যত্বস্বাদ্‌যোঽর্থঃ প্রতীয়তে বৃহত্ত্বাদ্যতোরর্থানুগম্য সর্বজ্ঞাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্ব প্রসিদ্ধিঃ।" এই যে কূটস্থ, নিঃসঙ্গ ও সর্বোপরম বিশ্বচৈতন্য বৃহৎসত্তা ব্রহ্ম—প্রত্যক্ষ-অনুভবই তাঁর একমাত্র প্রমাণ—"যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য"। আর এই নিঃসঙ্গ 'কূটস্থ' ব্রহ্ম "ব্যোমবৎ সর্বগতস্য ব্রহ্মণঃ সর্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাচ্চিদ্রূপতয়া চ শারীরেণাবিশিষ্টত্বাৎ সুখদুঃখাদিসম্ভোগোঽপ্য-বিশিষ্টঃ প্রসজ্যতে"। ব্রহ্মসত্তা বা ব্রহ্মবস্তু কূটস্থ ও নিঃসঙ্গ বলেই পার্থিব সকল সুখ ও দুঃখের তিনি অতীত, কোন নিন্দা ও স্তুতিই তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করে না। তাছাড়া তিনি সর্বপ্রাণিহৃদয় সম্বন্ধযুক্ত (হৃদয়বাসী) চিৎ বা চৈতন্য, সুতরাং সর্বব্যাপী ও সর্বানুস্যূত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে সমবেদনার সুরে সান্ত্বনা দেওয়ার সময়ে মায়াতীত ব্যাপকচৈতন্যসত্তা-ব্রহ্মের স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন: "অসৎলোকে তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য করবে"। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ঐ একই কথা বলেছেন—'তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত'। পূর্বেই বলেছি যে, সর্বসংঘাতময় সংসারে সর্বংসহা পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ একান্তভাবে দরকার।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলেছেন: "যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ-বুদ্ধি হওয়া চাই" —তার বক্তব্য এই যে, ভগবানের ভক্ত কথার অর্থই হ'ল অর্জুনের মতো যে 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' (২।৭)—শ্রীভগবানের শরণাগত ও প্রপত্তিযুক্ত, তিনিই একমাত্র ভক্ত হওয়ার উপযুক্ত এবং এই শরণাগত ভক্তই অনন্যভাবে অব্যভিচারী বুদ্ধিযুক্ত বা জ্ঞানযুক্ত হন। অব্যভিচারী বলতে স্থির-ধীর ও অবিচলিত বা কূটস্থ-বুদ্ধিযুক্ত—যে বুদ্ধির কোনদিন নড়চড় বা পরিবর্তন হয় না, সর্বদাই একরকম ও অবিচল থাকে। সুতরাং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীভগবানের ভক্ত, তাঁর বুদ্ধি ও মন অবিচলিত স্থির-ধীর-কূটস্থ হওয়া উচিত, তাহলেই সকল-কিছু স্তুতি ও নিন্দা এবং সুখ-দুঃখ সহ্য করতে সক্ষম হবেন তিনি।

'কূটস্থ'-শব্দটি বিশেষভাবে ব্রহ্মের বা পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই অদ্বৈতবেদান্তে ব্যবহৃত হয়েছে। 'কূটস্থ'-শব্দের অর্থ অবিকারী, অথচ সকল-কিছুর সাক্ষী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার উদাহরণ দিয়েছেন—"যেমন কামারশালের নাই, হাতুড়ীর ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার"। তেমনি সকল বিষয়ে সকলে কামারশালার নাইয়ের মতো নির্বিকার ও সহ্যগুণসম্পন্ন না হলে অনন্ত দুঃখ ও কষ্ট সংসারে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন: "অসৎলোক তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে। তুমি যদি আন্তরিক (অর্থাৎ অকপটভাবে) ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য করবে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বলার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কেউ যথার্থভাবে বা অকপটভাবে মন-মুখ এক ক'রে ভগবানকে চায় অর্থাৎ ভগবানকে পেতে চায়, সে—'তুল্য-নিন্দা স্তুতি-র্মৌনী'—স্তুতি ও নিন্দাকে তুল্য জ্ঞান ক'রে ঐ সকলকে সহ্য করেও বিচলিত হয় না। তবে আন্তরিক হলে তাঁকে (ভগবানকে) পাওয়া যায়। এখানে 'আন্তরিক' হওয়ার উপরই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। আন্তরিক বলতে মন-মুখ এক করা।

কিন্তু 'কূটস্থ-বুদ্ধি'-শব্দটির অর্থ আরো বিশেষভাবে আমাদের বোঝা উচিত। পূর্বেই বলেছি যে, কূটস্থ অর্থে নির্বিকার বা অবিচলভাবে থাকা। অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্ম কূটস্থ, তার অর্থ ব্রহ্ম সকল অজ্ঞানমালিন্য ও অজ্ঞানজন্য সকল বিক্রিয়া ও বিকৃতির অতীত, সুতরাং তিনি অবিচল, অবিকারী ও শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, অথচ তিনি আবার সকল-কিছুর অধিষ্ঠান বা আধার-সত্তা ও সকলের সাক্ষী। তিনি আধার ও শাশ্বত সত্তা বলেই সকল বিকৃতি এবং সৃষ্টিরও সাক্ষী ও উপচাররূপে স্বাধীন-দ্রষ্টা—যেজন্য 'সূর্য-চন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্বমকল্পয়ৎ'—প্রতিকল্পে যথাপূর্ব সৃষ্টি সম্ভব হয় পরমসত্তা ব্রহ্মকে উপলক্ষ্য বা আশ্রয় ক'রে। সেজন্য ব্রহ্ম সর্বোপরম ও সর্বাতীত নিঃসঙ্গ ও উদাসীন-সাক্ষী হলেও সকল-কিছুতে তিনি অনুস্যূত (সম্পর্কযুক্ত) বা অনুস্যূতসত্তা।

তিনি অজ্ঞানের অতীত, আবার সৃষ্টিকালে বা সৃষ্টিক্রমে অজ্ঞানের আশ্রয়ও তিনি,—বলেছেন বিবরণসম্প্রদায়। আচার্য শঙ্করের অনুগামী বিবরণপ্রস্থানের মতে, শুদ্ধব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয়। ব্রহ্মের জীবত্বও অজ্ঞানকল্পিত। সংক্ষেপশারীরককার আচার্য সর্বজ্ঞাত্মমুনি বিবরণসম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি বলেছেন—

'আশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্বভাগিনী নির্বিভাগচিচ্ছিরেব কেবলা।
পূর্বাসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ॥'

অর্থাৎ অজ্ঞানের আশ্রয়তা ও বিষয়তা শুদ্ধচৈতন্যেই আছে, উপহিতচৈতন্যে নয়। পশ্চাৎসিদ্ধ জীব পূর্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় হতে পারে না।

বাচস্পতিমিশ্র 'ভামতী'-ভাষ্যে এই বিবরণমত ঠিকভাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে জীবই অজ্ঞানের আশ্রয়। এজন্য সর্বজ্ঞাত্মমুনি 'সংক্ষেপশারীরক'-গ্রন্থে বাচস্পতির ঐ অভিমত খণ্ডন করেছেন। কিন্তু 'পরিমল'-কার অপ্পয়দীক্ষিত, অমলানন্দ, চিৎসুখাচার্য, অদ্বৈতানন্দ প্রভৃতি বেদান্তবাদীরা 'ভামতী'-র অভিমতই স্বীকার করেছেন। কথা এই যে, বিবরণমতের সঙ্গে ভামতীমতের বহু বিষয়ে মতদ্বৈত আছে, যেমন বিবরণসম্প্রদায় বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদী, আর ভামতী-সম্প্রদায় অবচ্ছেদবাদী। অবশ্য এই অভিমত প্রকাশ করেছেন আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁর 'সিদ্ধান্তবিন্দু'-গ্রন্থে। 'কল্পতরু'-টীকায় আচার্য অমলানন্দ ভামতীকারকে সমর্থন ক'রে বলেছেন যে, জীবই অজ্ঞানের আশ্রয়, শুদ্ধব্রহ্ম নন—'জীবস্থাত্রা অবিদ্যয়া বিষয়ো ব্রহ্ম শুক্তিবৎ, উচে বাচস্পতিভাস্ত-শ্রুত্যোর্হৃদয়বেদিতা', আর বাচস্পতিমিশ্রও 'ভামতী'-ভাষ্যে বলেছেন : "ন অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রয়া কিন্তু জীবে" (১।১।৪)। ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্র নিরুপাধিক-ব্রহ্মে অবিদ্যা বা মায়া স্বীকার করেন না। কিন্তু বিবরণমতাবলম্বীরা বলেন যে, ব্রহ্ম বা শুদ্ধব্রহ্ম জগতের উপাদান, সুতরাং জীবভেদ স্বীকার করলেও ব্রহ্মসৃষ্ট জগৎ একই, অর্থাৎ সকল জীবই এক ও সমগ্র জগৎকে অনুভব করে, সুতরাং শুদ্ধব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয় ও আধার, আর সেজন্য ব্রহ্মই জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান। শুদ্ধব্রহ্ম মায়াকে (অব্যাকৃতিকে) দ্বার বা সহায় ক'রেই (সগুণ-ব্রহ্মরূপে) বিশ্ব সৃষ্টি করেন। সুতরাং মতবাদ ও মতভেদ যেমনই হোক না কেন, একমাত্র অদ্বৈত-ব্রহ্মই বিশ্বের আধার ও আশ্রয় এবং সেজন্য অজ্ঞানেরও আশ্রয়।[৩]

সুতরাং এ'কথাই প্রমাণ হয় যে, অজ্ঞানের আশ্রয় ব্রহ্মই হোক, আর জীবই হোক, অজ্ঞান বা মায়াই সৃষ্টি ও সংসারবন্ধনের কারণ। এই কারণকে অতিক্রম না করলে মানুষের মুক্তি ও শান্তি নাই। কূটস্থ—অচল,[৪] স্থির ও চিরপ্রশান্ত ব্রহ্ম সকল মানুষেরই আরাধ্য, আশ্রয় ও অনুভবের বিষয়। কূটস্থ-বুদ্ধির সার্থকতা বুদ্ধি ও মনকে প্রশান্ত ও ব্রহ্মানুভূতির যোগ্য বা

৩। উল্লেখযোগ্য যে, বিবরণসম্প্রদায় ও ভামতীসম্প্রদায়ের মধ্যে বেদান্তের বহু বিষয়নিয়ে মতভেদ আছে। বিবরণপ্রস্থান আচার্য শঙ্করের সাক্ষাৎশিষ্য আচার্য পদ্মপাদ-প্রবর্তিত। তিনি ব্রহ্মসূত্রের (চতুঃসূত্রীমাত্র) ভাষ্যের উপর 'পঞ্চপাদিকা'-ভাষ্য রচনা করেন ও পরে বাচস্পতিমিশ্র শাঙ্করভাষ্যের উপর 'ভামতী'-ভাষ্য টীকা রচনা করেন। উভয় ভাষ্যই পরবর্তী বেদান্তাচার্যগণ মণ্ডনমিশ্র, সুরেশ্বরাচার্য, সর্বজ্ঞাত্ম-মুনি, মাধব-বিদ্যারণ্য, প্রকটার্থকার অনুভূতিস্বরূপ, ইষ্টসিদ্ধিকার বিদ্যাধীশ প্রভৃতি বেদান্তীগণ-কর্তৃক সমাদৃত।

৪। 'কূটস্থমচলমুদ্ধম্।'

উপযুক্ত করা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিতে বলেছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে উপলক্ষ্য ক'রে বিশ্বের সকল শান্তিকামী ও স্থিরবুদ্ধি মানুষকে। বলেছেন সদ্‌গুণ শিক্ষা করতে, কেননা সদ্‌গুণ মানুষের মধ্যে আনে শান্তি এবং মন ও বুদ্ধিতে সৃষ্টি করে সাম্যভাব—যে সাম্যভাব মনের সকল চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা দূর ক'রে সাধনশীল মানুষকে পরিচালিত ও প্রেরণাদীপ্ত করে ঈশ্বরবিশ্বাসের ও ঈশ্বরলাভের পথে।

পরবর্তী আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন: "দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বরচিন্তা হয় না? দেখনা, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করতো। চারিদিকে বাঘ, ভাল্লুক, নানা হিংস্র জন্তু। অসৎলোকের বাঘ-ভাল্লুকের স্বভাব। তেড়ে এসে অনিষ্ট করবে" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃ: ১৮৮)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বন্যজন্তুদের স্বভাবের কথা বলেছেন, আর বলেছেন সংসারে মানুষদের মধ্যেও বাঘ, ভাল্লুকের মতো হিংস্রস্বভাবের মানুষ আছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর *Reincarnation*-গ্রন্থে এ'সম্বন্ধে বিষদভাবে আলোচনা করেছেন। আমরা ঐ ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'পুনর্জন্মবাদ'-গ্রন্থ থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত ক'রে বলি: "ইহা বিজ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত যে, মনুষ্যশরীর ধারণ করিলেও জীবাত্মারা কর্মফলে নিম্নস্তরের পশুপ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, কেননা মানুষের মধ্যেও কুকুর, বিড়াল, সর্প প্রভৃতির ন্যায় হিংসা-প্রবৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাই। বরং কুকুর, বিড়াল, সর্প প্রভৃতি অপেক্ষা হিংস্রভাব বহু মানুষের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার দ্বারা এ'কথাই বুঝিতে হইবে যে, জীবাত্মারা স্ব-স্ব কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করে। অন্যায় ও নীচ কর্মের ফলস্বরূপে-মানুষের আকারে জীবাত্মারা জন্মগ্রহণ করিলেও পশুপ্রবৃত্তির হীনতর প্রকাশ তাহাদের মধ্যে দেখা যায়।"[৩]

সে' যাই হোক, প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিকযুগে আত্মানুসন্ধানী ও ঈশ্বরবিশ্বাসী মুনি-ঋষিরা গভীর অরণ্যের মধ্যে তপোবন সৃষ্টি ক'রে সেখানেই মনের আনন্দ ও শান্তি নিয়ে ধ্যান-তপস্যাদি করতেন এবং মনুষ্যজীবনের চরমলক্ষ্য ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান লাভ ক'রে জীবনকে কৃতকৃতার্থ করতেন। সুতরাং ধ্যান-জপ ও তপশ্চারণ বৈদিকযুগে তপোবনেই জ্ঞানকামীরা অনুষ্ঠান করতেন এবং তার নিদর্শন বৈদিকসাহিত্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া আমাদের মধ্যেও কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য—এই ছটি রিপু শত্রুর মতোই মানুষকে চিরদিন সংসারে শাসন করে, আবার বঞ্চিত করে যথার্থ শান্তিলাভ থেকে। তাই কঠোপনিষৎ স্পষ্টভাবেই বলেছে: 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ, পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্'—খানি অর্থাৎ আমাদের চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গণকে কাম-ক্রোধাদি রিপু বশীভূত ক'রে হৃদয়মন্দিরস্থিত অন্তর্যামী স্বয়ম্ভূ আত্মার দর্শন থেকে বঞ্চিত করে, কিন্তু 'কশ্চিদ্ধীরা:'—কোন কোন ধীর ও শান্ত-সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি ঐ সকল বাধাবিপত্তিরূপ শত্রু থাকাসত্ত্বেও জীবনে ঈশ্বরচিন্তা করে ও শান্তি লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঙ্গিতে এ'তত্ত্বেরও আভাস দিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে।

●

৩। 'পুনর্জন্মবাদ' (১৩৮০ সাল), পৃ: ১১৫

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে : পণ্ডিত পদ্মলোচন ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

॥ তিন ॥

লীলাবার্তা :

[পণ্ডিত কর্তৃক ঠাকুরকে আহ্বান জ্ঞাপন]

তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য মহাশয় বিশেষ আগ্রহসহকারে হৃদয়ের নিকট হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শোনেন এবং পরম উল্লসিত হন। হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্নে—এই পরিচয় পেয়ে ইনি তাঁকে যথেষ্ট যত্ন-সমাদরও করেন।

অবশেষে, পণ্ডিত মহাশয় সবিনয়ে হৃদয়কে বলেন,—'তোমার মামাকে অবশ্যই এখানে নিয়ে আসবে। তাঁর মত ভক্ত-মহাত্মার দর্শন পেলে আমি নিজেকে অশেষ সৌভাগ্যশালী জ্ঞান ক'রব।

'পণ্ডিত হরষান্বিত বৃত্তান্ত শ্রবণে।
হৃদয়ে আদর কত আনিয়া ভাগিনে॥
পরে সবিনয় কয় ধীর শিরোমণি।
শ্রীপ্রভুর দরশন ভাগ্য করি মানি॥
কিছুক্ষণ পরে হেথা ফিরিল হৃদয়।
শ্রীগোচরে দিল আদি অন্ত পরিচয়'॥—পুঁথি, ১২৩

হৃদয় ফিরে এলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানান যে, পণ্ডিত পদ্মলোচন- সত্যি সত্যিই সেই বাগানবাড়িতে রয়েছেন এবং বর্তমানে অনেকটা সুস্থ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হৃদয়কে প্রশ্ন ক'রলেন—'কি হৃদু, পণ্ডিতকে কেমন দেখলি ?'

হৃদয় ব'ললেন,—'বেশ লোক মামা। খুব ভালো লোক ব'লে বোধ হ'ল মামা'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'তুই কেমন ক'রে বুঝলি' ?

হৃদয়—'মামা, সে ভালো লোক না হ'লে, আমি সামান্য লোক, আমায় এত খাতির-যত্ন ক'রলে কেন ? আমায় পান খাওয়ালে, কতক্ষণ বসিয়ে সদালাপ ক'রলে। তারপর আমি যখন তোমার কথা ব'ললুম, খুব আগ্রহ ক'রে শুনলে'।

'খুবই নিরভিমান, সরল, উদার ও অমায়িক পণ্ডিত। তোমার কথা শুনে খুবই খুশী হ'লো এবং তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ ক'রলো। তার কাছে তোমায় নিয়ে যাবার জন্যও বার বার ক'রে ব'ললো ; আর আমি তোমার ভাগ্নে জেনে আমায় খুব আদর-যত্নও ক'রলো'।

"এই বলিয়া পদ্মলোচনের সহিত তাঁহার যে-সমস্ত কথা-বার্তা হইয়াছিল, আনুপূর্বিক সমস্ত কহিলেন এবং রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার জন্য পদ্মলোচন যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও জানাইলেন"।—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত ১ম, পৃঃ ১১-১০০

[পদ্মলোচন ও ঠাকুরের মিলন]

'যথাদিনে হৃদু-সঙ্গে প্রভুর গমন।
শ্রদ্ধায় পণ্ডিত কৈলা প্রভুকে গ্রহণ॥
পরস্পর সম্মিলনে তুষ্ট অতিশয়।
যেন পূর্বে পূর্বে কত ছিল পরিচয়'॥—পুঁথি, ১২৩

ঠাকুর তার পরদিন বিকেলে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে, একখানি নৌকা ক'রে, পরম আগ্রহে ঐ বাগানবাড়িতে পণ্ডিত পদ্মলোচনকে দেখতে যান। সেখানে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর দেহে ভাবাবেশের সঞ্চার হয়। পণ্ডিত মহাশয় যে-ঘরে ছিলেন, তিনি টলতে টলতে সটান সেই ঘরে প্রবেশ করেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ সময় আলু-থালুভাবে নিজ-শয্যায় শয়ন ক'রে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনমাত্র ইনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর দিকে সবিস্ময়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। তারপর পুলকিত হৃদয়ে ইনি বলেন,—"এ কি আশ্চর্য রূপ দেখলাম, বাইরে মানুষের মত আকার, ভেতরে কালীরূপ"। স্বগতভাবে এই মন্তব্য ক'রে ইনি করযোড়ে তাঁকে ও হৃদয়কে ব'সতে বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মলোচনের সম্মুখে আসন গ্রহণ করেন এবং এঁকে দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েন। তারপর ধীরে ধীরে কতকটা সহজ অবস্থায় নেমে এসে তিনি এঁকে সম্ভাষণ ক'রে বলেন,—'হ্যাঁগা, তোমারই নাম পদ্মলোচন'?

পণ্ডিত মহাশয় সবিনয়ে উত্তর দেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম পদ্মলোচন'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'তুমি নাকি খুব পণ্ডিত'।

পদ্মলোচন—'আপনি যখন পণ্ডিত ব'লছেন, তখন পণ্ডিত'।

'শ্রীপ্রভু অন্তরযামী সব সুবিদিত।
বুঝিলা যতেক গুণে ভূষিত পণ্ডিত॥
শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্ত ইষ্টদেবীর উপরে।
বিভূতি সিদ্ধাই প্রাপ্ত অধিকার বরে'॥—পুঁথি, ১২৩

শ্রীরামকৃষ্ণ ঐরূপ ভাবাবস্থায় ৺জগদম্বার কৃপাবলে, পদ্মলোচনের যাবতীয় সদ্‌গুণ ও মহত্ত্বের পরিচয় জানতে পারেন। তার ফলে, ইনি যে যথার্থই সরল, অমায়িক ও উদারস্বভাব সুপণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান ও ভক্তিমান মাতৃ-সাধক—এসব বিষয়ে তাঁর আর কোনই সংশয় থাকে না।

পক্ষান্তরে পণ্ডিত পদ্মলোচনও নিজ গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনলব্ধ সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহায়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে একজন অতি উন্নত কোটির সিদ্ধ মহাত্মা ব'লে চিনতে পারেন। তার ফলে,

তাঁর শ্রীচরণে এঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তির অবধি থাকে না। যাহোক, উত্তরেই উত্তরকে পেয়ে পরম আহ্লাদিত হন এবং পরস্পর নিবিড় আত্মীয়তার প্রেমাকর্ষণ অনুভব করেন।

[ঠাকুরের গান শুনে পণ্ডিতের কান্না]

'তাই প্রভু বীণাকণ্ঠ মোহিতে পণ্ডিত।
ধরিলেন কালিকার গুণগান গীত' ॥—পুঁথি, ১২৩

তর্কালঙ্কার মহাশয় যে, কেবল মহাপণ্ডিতই নন, একজন অনুরাগী মাতৃসাধক এবং জগন্মাতার প্রসাদে অলৌকিক 'সিদ্ধাই' শক্তির অধিকারী—শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবস্থায় তা জেনে, মাতৃপ্রেমে বিভোর হ'য়ে সুমধুর কণ্ঠে শ্যামা মায়ের গুণ-গীতি আরম্ভ করেন—

"কে জানে গো কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।
কালী পদ্মবনে হংসসনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্যে কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন"॥

এই গানটি শেষ হ'লে সেই ভাবের অবস্থাতেই তিনি আবার গাইলেন—

"বল দেখি ভাই কি হয় মলে, এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে;
(ওরে) শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব ঘোরালে।
এক ঘরেতে বাস ক'রেছে পঞ্চজনে মিলে জুলে,
সে যে সময় হ'লে আপনাআপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে"।

ঠাকুর ঐরূপ আবেশে পর পর আরও দু'-তিনটি গান করেন এবং ভাবের আবেশে আত্মহারা হন। পদ্মলোচন বিমুগ্ধ চিত্তে স্থির দৃষ্টিতে অপার ভাবময় মহাপুরুষকে দেখতে থাকেন। অবিরল অশ্রুধারায় এঁর গণ্ডস্থল প্রবাহিত হ'তে থাকে এবং বাক্-শক্তি রুদ্ধ হ'য়ে যায়।

'গীতে মুগ্ধ পণ্ডিতের অবস্থা এমন।
বাক্‌রুদ্ধ মনস্তত্ত্ব সজল নয়ন'॥—পুঁথি, ১২৩

অবশেষে পদ্মলোচন নিজেকে কিছুটা সংবরণ ক'রে চোখ মুছে হৃদয়রামকে বলেন—"কি আশ্চর্য মশাই! আমার চোখে কখনো জল আসে না। আজ এঁর গান শুনে আমার চোখ জলে ভেসে গেলো"।

তারপর ইনি কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে হৃদয়কেই আবার গদগদ কণ্ঠে বলেন : "আজ এঁর দর্শন পেয়ে আমার জীবন সার্থক হলো। আর আমার শাস্ত্র পড়াও এত দিনে সফল হলো"।

[ঠাকুরের সমাধি-দর্শনে পণ্ডিতের ধাঁধা]

'গাইতে গাইতে গীত ভাবের আবেশ।
গভীর সমাধিমগ্ন প্রভু পরমেশ'।—পুঁথি, ১২৩

শ্রীশ্রীঠাকুর গান গাইতে গাইতে দিব্যভাবের গভীর আবেশে বাহ্য-সংজ্ঞা হারিয়ে আবার সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েন এবং ঐ মহোচ্চ অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ নিমগ্ন থাকেন। সে-সময় পদ্মলোচনের কাছে অনেকগুলি ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও ঠাকুরের সমাধিঅবস্থা প্রত্যক্ষ করেন।

পণ্ডিত মহাশয় তাঁদের বলেন—"তোমরা দেখছ তো? একঘর পুঁথি পড়ে আমার যা লাভ হয়েছে, কিন্তু না পড়ে তাঁর কত কোটীগুণ বেশী এঁর লাভ হয়েছে!"

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই ভাবের আবেশেই পণ্ডিত মহাশয়ের ঐ উক্তি সমর্থন ক'রে বলেন—"হ্যাঁরে হ্যাঁ"।

'প্রভুর প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন না জানে।
ও হেন গোসাঞি এবে রামকৃষ্ণ নামে।
পণ্ডিতেরে হেথা ধাঁধা দিল মহামায়া।
আলোকের মধ্যে যেন আঁধারের ছায়া"।—পুঁথি, ১২৩

ঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ উচ্চভাবাবস্থা এবং সমাধির আবেশে বাহ্য-চৈতন্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি দেখে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে পদ্মলোচনের চিত্ত ভরে ওঠে। ঠাকুর সহজাবস্থায় ফিরে এসে এঁকে বালকের মত প্রশ্ন করেন—"হ্যাগা এটা আমার কি হয়, ব'লতে পার?"

উত্তরে পদ্মলোচন বলেন—"আপনার এটা দেবতার দুর্লভ রত্ন সমাধি।"

সমাধি অবস্থায় কিরূপ দর্শন ও অনুভবাদি লাভ হয়, সেগুলি জানার জন্য পণ্ডিত মহাশয় বিশেষ আগ্রহ ভরে তাঁকে একে একে নানা প্রশ্ন করেন। সেগুলির উত্তরে তিনি নিজের ঐ অপ্রাকৃত অবস্থার যে-সমস্ত আভাস ও ইঙ্গিত দেন, সেগুলি ইনি গভীর মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত সেই বিষয়ক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসমূহের বর্ণনার সঙ্গে যথাযথভাবে মিলিয়ে দেখারও চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠাকুরের ঐ কালীন চরম অবস্থার অনুভব ও দর্শনাদির সঙ্গে সেগুলি মিলাতে গিয়ে ইনি বিষম সমস্যায় পড়েন। কারণ

তাঁর ঐ মহোচ্চ উপলব্ধিসমূহের বর্ণনা বা কোনও আভাস ইনি অধীত শাস্ত্রাদিতে কোথাও খুঁজে পান না।

'বাহ্যেতে আসিলে প্রভু পণ্ডিত জিজ্ঞাসে।
অনুকূতি দর্শনি কি হয় আবেশে॥
সমাধিতে উপলব্ধি কি প্রকার হয়।
যাবতীয় আদি মধ্য অন্ত পরিচয়॥
তত্ত্ব তত্ত্ব বলিলেন প্রভু গুণমণি।
প্রথম হইতে তার চরম কাহিনী॥
চরমের উপলব্ধি প্রভুর কীর্ত্তিত।
বেদান্তের মধ্যে তাহা না পায় পণ্ডিত॥
হেথা যে শ্রীপ্রভুদেব বেদান্তের পার।
কেমনে বেদান্ত পাবে সন্ধাচার তাঁর"॥—পুঁথি, ১২৩

"শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অবস্থাসকলের সহিত ঠাকুরের অবস্থা মিলাইয়া লইতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু ঐরূপ করিতে গিয়া তিনি যে সেদিন ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন এবং কোন একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, ইহাও সুনিশ্চিত। কারণ, ঠাকুরের চরম উপলব্ধিসকল শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে না পাইয়া তিনি শাস্ত্রের কথা সত্য অথবা ঠাকুরের উপলব্ধিই সত্য, ইহা স্থির করিতে পারেন নাই। অতএব শাস্ত্রজ্ঞান ও নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসহায়ে আধ্যাত্মিক সর্ববিষয়ে সর্বদা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত পণ্ডিতজীর বিচারশীল মন ঠাকুরের সহিত পরিচয়ে আলোকের ভিতর একটা অন্ধকারের ছায়ার মত অপূর্ব আনন্দের ভিতরে একটা অশান্তির ভাব উপলব্ধি করিয়াছিল"।—লীলাপ্রসঙ্গ-৪র্থ, ১০১-১০২

পণ্ডিত মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে তাঁর বিচিত্র ভাবাবেশ ও সমাধিকালীন অপূর্ব অবস্থাগুলির কথা শুনে বিষম ধাঁধায় পড়লেও সেগুলি অস্বীকার ক'রে একেবারে উড়িয়ে দিতে ভরসা পান না। যা হোক, সেদিন ঐ প্রথম সাক্ষাতেই উভয়েই উভয়কে কতকালের সুপরিচিত এবং জন্মজন্মান্তরের পরমাত্মীয় জ্ঞান করেন এবং পরস্পর অপার প্রেম ও ভালবাসার প্রগাঢ় বন্ধনে চির-আবদ্ধ হন।

(ক্রমশঃ)

●

॥ ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

(বেদান্তের আলোকে)

স্বামী প্রভানন্দ

দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত আর্যসমাজ, অলকট সাহেবের থিয়োসফি সমাজ, পাশ্চাত্য-শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত দেশীয় নেতাদের ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজের সংস্কারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েও হিন্দুধর্মের প্রাণ-উৎস বেদান্তজ্ঞানকে যোগ্য মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছিলো। সুচিন্তিত লেখক D. S. Sharma মন্তব্য করেছেন, "Dayananda, arbitrarily, limited the extent of the Hindu religious canon and thus to a certain extent stulified himself as the leaders of the Brahmo Samaj stulified themselves by their blatant rationalism and the right of private individual judgement at every step in going through the Hindu scripture." প্রাচীন হিন্দুসমাজের দোষত্রুটির উন্মোচন ছাড়া আর্যসমাজ শুদ্ধি, সংগঠন ও স্বকল্পিত একটি শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠনের মধ্যে নিজেকে সীমিত রেখেছিল। সংস্কারক দয়ানন্দ সরস্বতীর বহু সিদ্ধান্তকেই arbitrary বা খেয়াল খুশীমত এবং অযৌক্তিক মনে করার যথেষ্ট কারণও আছে। কিছুকাল পরে নেতা লালা লাজপত রায়ের মুখে যে বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছ চিন্তার অভিব্যক্তি দেখতে পাই, উদ্ভাবক দয়ানন্দ সরস্বতীর মধ্যে তা পাই না। লাজপৎ রায় বলেছিলেন, "Hinduism created Arya Samaj. Hinduism has vitality enough to save itself by other means, if the Arya Samaj should fail it."[৫৩] লাজপত রায়ের এই সাবধান বাণী বা তার মর্মার্থ আর্যসমাজের নেতারা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বিদেশী নেতৃবৃন্দের আশীর্বাদপুষ্ট থিয়োসফি আন্দোলন হিন্দুধর্মের অনুরাগী ও হিতৈষী সন্দেহ নাই। থিয়োসফির বলিষ্ঠ নেতা এনি বেসান্ত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসের ভাষণে গদ গদ কণ্ঠে বলেছিলেন 'I find none so perfect, none so scientific, none so philosophical and none so spiritual as the great religion known by the name of Hinduism', কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি হিন্দুর প্রাণপাখী বেদান্তের স্বরূপ ও ধারাকে থিয়োসফিও চিনতে বুঝতে বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয় নি।

আর্যসমাজ বা থিয়োসফি প্রমুখ আন্দোলন ছাড়াও জাগরণোন্মুখ হিন্দুসমাজের তদানীন্তন বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের চেতনালোকে উদ্ভাসিত বেদান্তের স্বরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এইকালের যুগান্তকারী প্রতিভাবানদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব একটি সমন্বিত দর্শন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই সমন্বিত আদর্শের মানুষ একটি "মূর্তিমান থিয়োরী" বৈ ত নয়। ঐহিকতাবোধ হতে উদ্ভূত হিতবাদের সঙ্গে ভাগবতগীতার আদর্শের মিলনসাধন করতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

৫৩। The Arya Samaj, p. 280.

নবজাগ্রত হিন্দুসমাজের প্রথমসারির একজন নেতারূপে সমাদৃত বঙ্কিমচন্দ্র। সেই বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে গুরুশিষ্য কথোপকথনের মধ্যে বলেছেন, নির্গুণ একমেবাদ্বিতীয়ের উপাসনা অসম্ভব। তিনি শুরুমুখে বলেছেন, "ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এইজন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয় না ; কেননা, যিনি নির্গুণ তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' চৈতন্য, অথবা যাহাকে হার্বার্ট স্পেন্সর Inscrutable power in nature বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল, কেননা, তিনিই আমাদের আদর্শ হতে পারেন। যাঁহাকে Impersonal God বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল ; যাঁহাকে Personal God বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।"[৫৪] সুতরাং আমরা বিস্মিত হই না যখন দেখি বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে লিখেছেন, "অতএব আইস আমরা নির্গুণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই।" (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)। যাহোক, এবিষয়ে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ঔপনিষদিক নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মবাদের রসগ্রহণে এবং বেদান্তের অদ্বৈতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য ও সামর্থ্য উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুশীলন-ধর্মের প্রবর্তক বলা যেতে পারে। চিন্তাবীর বিপিনচন্দ্র পালের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্ম ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মদলভুক্ত ছিলেন না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী তিনি ব্রাহ্মবিদ্বেষীও ছিলেন না।[৫৫] অধিকাংশ পাঠকই লক্ষ্য করেছেন যে বঙ্কিম-মনীষাতে কোম্‌তের (Comte) গভীর প্রভাব। অনেকে তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন যোগেন্দ্র ঘোষের প্রভাব, মিলির কয়েকটি গ্রন্থের প্রভাব। বঙ্কিম-মানসে চিন্তাবিবর্তন লক্ষ্য করে ইদানীংকালের অনেক লেখক ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন ; তিনি লিখেছেন, "With the advance of age, however, the radicalism of Bankim mellowed down much. The scientific tenor of Comtes' philosophy had now hardly any attraction for him.. .....He came periliously near the Hindu-positivism of Jogendra Ghose. Under its influence Bankim, in his later life, gave a new interpretation of Hinduism which.....was essentially a restatement of Comte's 'anti-theocratic, humanitarian and social service religion."[৫৬] দেশী-বিদেশী বহু ভাবধারার প্রভাবে সঞ্জীবিত বঙ্কিমমানস কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তার মুকুটমণি বেদান্তকে অবধারণ করতে পারে নি, ভারতীয় হিন্দুধর্ম ও দর্শনের সামগ্রিক ভাবাদর্শকেও গ্রহণ করতে সমর্থ হয় নি।

৫৪। বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ সং, দ্বিতীয় খণ্ড / পৃঃ ৫১০।

৫৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ২০৩-৪।

৫৬। Niranjan Dhar : Vedanta and Bengal Renaissance, 1977, p. 179.

হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণে উদ্যোগীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি। তিনি হিন্দুদের যাবতীয় মতপথের যুক্তিসম্মত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, সাময়িকভাবে হলেও হিন্দুদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মানসিক চাঞ্চল্য ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল, কারণ তাঁর বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিনির্ভর ছিল না, হিন্দুধর্মের মূল-আশ্রয় ঔপনিষদ-ভিত্তিকও ছিল না। বরঞ্চ তাঁর ধ্যানধারণায় বেদান্তভাবনার ঋজুতা ও বলিষ্ঠতার অভাব সহজেই ধরা পড়েছিল। হিন্দুসমাজের নবজাগ্রত চেতনালোকে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরে স্বামী কৃষ্ণানন্দ) ও চন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এদের মনন-সাধনাতেও অদ্বৈতবেদান্তের ভূমিকা প্রধান নয়, প্রবলও নয়। অপরপক্ষে সমসাময়িক চিন্তাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় অদ্বৈতবেদান্তে দৃঢ় বিশ্বাসী। তিনি তাঁর সামাজিক প্রবন্ধে (পাশ্চাত্যভাব—সাম্য) লিখেছেন, "হিন্দুদিগের মধ্যে শঙ্করবাদ ও স্মার্তাচার যত ন্যূন হইয়া রামানুজাদি বিখ্যাত দ্বৈতবাদের এবং রামানন্দ-প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের প্রশস্ত জন্মিতেছে ততই হিন্দুর চিত্তে দৌর্বল্য অনুভূত হইতেছে।" ভূদেব শঙ্করপন্থী বেদান্তের একান্ত অনুরাগী। কিন্তু তাঁর মননসাধনায় যুগোপযোগী মূল্যবোধের স্বীকৃতি বা যুগসমস্যার কোনো সুস্পষ্ট সমাধান দেখা যায় না, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক নয়। ভূদেব-প্রতিভা অদ্বৈতবেদান্তের ভাবাদর্শকে আশ্রয় করে তদানীন্তনকালের ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যা সমাধানের কোন পথ-নির্দেশ যে দিতে পারেন নি একথা অনস্বীকার্য।

আলোচিত হিন্দুনেতা বা হিন্দুমতাদর্শে ধরণী চিন্তাবিদ্‌দের* চেষ্টায় যে এক নূতন মননালোকের পটভূমিকার উদ্ভব ঘটেছিল তাঁদের সম্মুখে বেশ কিছুকাল দীপ্তিমান মার্তণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মতে "কেশবচন্দ্রই উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়ভাগের অবিসম্বাদিত ক্ষমতাশালী নেতা।" কেশবচন্দ্র জানতেন, তাঁর অনুগামীরা বিশ্বাস করতেন যে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষ এবং কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত নববিধান ঈশ্বরপ্রাণিত ভাবাদর্শ। কেশবানুগামীদের দৃষ্টিতে "মহাপুরুষ রামমোহন ভগবৎপ্রেরণায় ধর্মের যে উদার আদর্শ জ্ঞাননেত্রে অবলোকন করিয়া আদিব্রাহ্ম-সমাজপ্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহারই ভিতরে নববিধানের ভাব সম্ভাবনারূপে স্থিতি করিতেছিল। ঈশ্বর উপযুক্ত সময়ে কেশবজীবন আশ্রয় করিয়া সেই ভাবকে মূর্তি দান করিলেন।"[৫৭] কিন্তু রামমোহনের যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের চিন্তাবীজ অবলম্বন করে হিন্দুসমাজ আলোড়িত হয়েছিল তার প্রবলতম প্রাণপুরুষ হিসাবে কেশবচন্দ্রই ইতিহাসে সর্বজনস্বীকৃত। হিন্দুধর্ম ও সমাজের পটভূমিকায় এই নূতন ভাবান্দোলনের বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে আলোচনা করে যোগেশচন্দ্র বাগল মন্তব্য করেছেন: 'রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মভাবনা দেবেন্দ্রনাথ হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত অদলবদল হইয়া একটি তথাকথিত হিন্দুব্যতিরিক্ত রূপ পরিগ্রহ করে। হিন্দুধর্মের সার্বজনীনতা তথা বিশ্বজনীনতা কেশবপন্থীরা

৫৭। অক্ষয়কুমার দাস : শ্রীকেশবকাহিনী, পৃঃ ২৬৮

যেন অষ্টাদশকের শেষে ও সপ্তদশকের প্রথমে ধর্তব্যের মধ্যেই আনিতে চাহিতেন না। অথচ তাঁহাদের প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্ম দ্বারা নব্যশিক্ষিত বাঙালীরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইতেছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা আসিয়া এতাদৃশ চিন্তা ও কর্মে এক তীক্ষ্ণ ধাক্কা দিল। নব্যশিক্ষিতেরা আত্মপরীক্ষায় নিবিষ্ট হইলেন। বাংলার নবজাগৃতির দিক হইতে ইহা সত্যই শুভলক্ষণ।"[৫৮] এই 'তথাকথিত হিন্দুত্বাতিরিক্ত'-রূপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, হিন্দুর ঐতিহ্যবাহী বেদান্তভাবনা সম্বন্ধে অস্পষ্টতা ও বিচ্ছিন্নতা। বেদান্তভিত্তিক হিন্দুধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য চেষ্টা করার ফলেই কেশবপন্থীরা হিন্দুর সার্বজনীনতা তথা বিশ্বজনীনতাকে ধারণা করতে পারেন নি। হিন্দুবেদান্তের সর্বানুস্যূত মহৎ ভাবের রস গ্রহণ করতে সমর্থ হন নি।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকটেও রামমোহনের ধর্মমত ও বিশ্বাস ছিল একটি বাধা। তিনি রাজা রামমোহনকে একেশ্বরবাদী (Monotheist) হিসাবে গ্রহণ করেছেন, অদ্বৈতবাদী (Monist) হিসাবে মানেন নি। কেশবচন্দ্রের দীক্ষাচার্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁর গুরু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র প্রচণ্ড আক্রমণের প্রতিবাদে কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল 'The Brahmo Samaj Vindicated'-শীর্ষক ভাষণ দেন। সে-ভাষণে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন, "the Vedas were thrown overboard by Babu Devendranath Tagore : and the Brahmo Samaj bade farewell to Vedantism."[৫৯] কেশবচন্দ্র তাঁর গুরু ও পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবাদর্শে সমাচ্ছন্ন। দেবেন্দ্রনাথের অদ্বৈতবিরোধী জেহাদের সামিল হয়েছিলেন তরুণ নেতা কেশবচন্দ্র। সেই কেশবচন্দ্রের ধর্মচেতনার একের পর এক পরিবর্তন তথা বিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হয়। এই বিবর্তনের যে শেষ চিত্রটি "Liberal" পত্রিকা ৭ই জুন ১৮৮৪ তারিখে প্রকাশ করে, সেখানে দেখতে পাই সুস্পষ্ট ঘোষণা, "Our Return to the Vedanta ; we need not say very much upon our return to the Vedanta. This is a known fact. The foundation of Brahmoism was laid upon the Upanishads. Although we have advanced, the foundation remains the same." কেশবচন্দ্র সেনের ভাবাদর্শে বিপুল পরিবর্তন পাঠককে বিস্মিত করবে সন্দেহ নাই। বেদান্তবর্জনের পর শেষকালে বেদান্তবরণ করে তিনি আত্মসংশোধন করেছিলেন। কিন্তু সে-সঙ্গে দুটি বিষয়ে তাঁর চিন্তার অস্পষ্টতা পাঠককে অধিকতর বিস্মিত করে তোলে। ব্রহ্মসমাজের প্রবর্তক রামমোহন অদ্বৈতবেদান্তবাদী। তাঁর মতবাদ প্রধানতঃ শঙ্করানুগ, ব্রহ্মসূত্রাশ্রিত। তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপনিষদের উপর নির্ভর করেন নি। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মভাবনার বীজ উপনিষদের ভাবভিত্তিক মাত্র। কিন্তু তিনিও উপনিষদবাক্যকেই বা প্রধান উপনিষদগুলির

৫৮। যোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার নবজাগরণের কথা, ১৩৭০, পৃঃ ৭৮

৫৯। Dr. Premsunder Basu : Life & Works of Brahmananda Keshav, 1940, p. 70.

সর্বাংশকে সত্য বলে গ্রহণ করেন নি। সুতরাং ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা উপনিষদের উপর বললে প্রকৃত তথ্যের আংশিক সত্যকে বলা হবে মাত্র। দ্বিতীয়তঃ ঔপনিষদিক ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের অনেক অগ্রগতি কালে হয়েছে, এই অভিমতও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন।

এভাবে ভাবাদর্শের বিবর্তনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শুধু যে একদা ভীতিপ্রদ অদ্বৈততত্ত্বের দিকে অগ্রসর হলেন তাই নয়, তিনি ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের বহু ধিক্কৃত পৌরাণিক ধর্মের দিকে অত্যধিক ঝুঁকে পড়লেন।

(ক্রমশঃ)

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(ছয়)

ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের 'বক্রোক্তিজীবিত'-গ্রন্থসম্বন্ধে কিছু মন্তব্যের এখানে উল্লেখ করি। আলঙ্কারিক কুন্তকের 'বক্রোক্তি'-শব্দের অর্থের মধ্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বা নিজস্ব-বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি—সে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য একদিকে আলঙ্কারিক ভামহ, দণ্ডী ও বামন ও অন্যদিকে রুদ্রভট্ট ও মম্মট ও তাঁদের অনুসারীদের ধারণার সঙ্গে কিছুটা পার্থক্য পাওয়া যায়। আলঙ্কারিক রুদ্রভট্ট 'বক্রোক্তি'-শব্দের বা বক্রোক্তি-অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন কাব্যালঙ্কার-গ্রন্থে। সঙ্গীতে ঐ সকল অলঙ্কারের উপযোগিতা আছে কি-না প্রশ্ন করলে বলা যায়—সঙ্গীত কেবলই সুর তথা বিভিন্ন স্বরের লীলায়ন নয়। সঙ্গীতে সাহিত্য, পাঠ্য বা কথার উপযোগিতা যেমন, তেমনি উপযোগিতা আছে ছন্দের, অলঙ্কারের, রসের ও ভাবের, সেজন্য সঙ্গীত কাব্য, নাটক ও সাহিত্যের মতো রসিকজন ও গুণগ্রাহী মানুষের নিকট অনুশীলনের ও একান্ত সমাদরের বস্তু।

খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকের আলঙ্কারিক রত্নাকর তাঁর 'বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা'-গ্রন্থে 'বক্রোক্তি'-শব্দের বা অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন কিছুটা ভিন্ন অর্থে ও ভাবে। আলঙ্কারিক রুদ্রভট্ট, সুবন্ধু, বাণভট্ট প্রভৃতি গুণীগণের রচিত গ্রন্থেও 'বক্রোক্তি'-শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় কিছুটা শ্লেষ, পরিহাস বা ক্রীড়ালাপ প্রভৃতি প্রসঙ্গে। অবশ্য আলঙ্কারিক ভামহ 'বক্রোক্তি'-শব্দ ব্যবহার করেছেন কাব্যরচনায় গুণ কিংবা অলঙ্কার-অর্থে। বামনও গুণ ও অলঙ্কারের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন নি—যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি অতিশয়োক্তি-প্রসঙ্গে বক্রোক্তি-শব্দ ব্যবহার করেছেন দেখা যায়—'সৈষা সর্বৈ বক্রোক্তিঃ'। অবশ্য অতিশয়োক্তি কোন বিশেষ অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়েছে কি-না তা প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গ্রন্থের ভট্টর যে মন্তব্য করেছেন : "In identifying it (*vakrokti*) with *atiśayokti*, Bhāmah partly implies that the word : 'লোকাতিক্রান্তগোচরম্ বাচঃ', which are given as the essential characteristic of that figures, is also a characteristic of his *vakrokti* as made of expression."

আচার্য অভিনবগুপ্ত (vide লোচনটীকা) বক্রোক্তি-শব্দ বা অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন 'লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানম্'-অভিপ্রায়ে—যার অর্থ কাব্যে ব্যবহৃত অলঙ্কার এবং সেই অলঙ্কার প্রকাশ করে এক উন্নত ধরনের ভাবপ্রকাশকে (expression-কে)। আবার এ'ভাবেই বক্রোক্তি-অলঙ্কার ব্যবহার ক'রে আলঙ্কারিক কুন্তক বলেছেন : 'লোকাতিক্রান্ত···', অর্থাৎ 'পরিসিদ্ধব্যাপারাতীত' অর্থে। কুন্তক বলেছেন—

'অপরা সহজাহার্যকবিকৌশলশালিনী।
নির্মিতিনূতনোল্লেখলোকাতিক্রান্তগোচরা ॥'

এর ভাষ্যে কুন্তক বলেছেন : "তেন লোকাতিক্রান্তঃ প্রসিদ্ধব্যাপারাতীত কোঽপি সর্বাতিশায়ী গোচরা বিষয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তেতি বিগ্রহঃ। তস্যান্নির্মিতিভেদেন রূপেণ বিহিতিরিত্যর্থঃ। ·····যেন কামপি সহৃদয়হৃদয়হারিণী রমণীয়তামধিরোপ্যতে"। আর 'সহজাহার্যকবিকৌশল-শালিনী' শব্দ-সম্বন্ধে বলেছেন : "কীদৃশী—• • সহজং স্বাভাবিকমাহার্যং শিক্ষাভ্যাসমুল্লাসিতং চ শক্তিব্যুৎপত্তিপরিপাকপ্রৌঢ় যৎ কবিকৌশলং নির্মাতৃনৈপুণ্যং তেন শালতে রূপতে যা সা তথোক্তা"।

পূর্বেই বলেছি যে, আলঙ্কারিক ভামহ 'অভিনয়োক্তি'অর্থে বক্রোক্তি-শব্দ ব্যবহার করেছেন কাব্যে। অনেকে অবশ্য বক্রোক্তিকে 'বক্রতা' (crooked) অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা বলেন—যা সোজাসুজিভাবে কাব্য প্রভৃতিতে ব্যবহার ক'রে অর্থ প্রকাশ করা যায় না, তাকে বক্রভাবে ব্যবহার ক'রে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা সহজ হয়।[১] এজন্য তাঁরা বক্রোক্তিকে 'বক্রতা' নামে অভিহিত করেন। মোটামুটি কথা এই যে, 'বক্রতা'-শব্দ যাঁরা ব্যবহার করেন অলঙ্কাররূপে তাঁদের বক্তব্য এই যে, কবি ও শিল্পীদের চিন্তা ও কাব্যপ্রকাশভঙ্গী সাধারণ মানুষের প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে সমগোত্রীয় নয়, তাঁদের প্রকাশভঙ্গী লোকাতিক্রান্তগোচরতাপূর্ণ, সেজন্য সাধারণ রচয়িতা বা লোক থেকে তাঁরা একটু স্বতন্ত্র। আলঙ্কারিক ভামহ অনেকটা এঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত, সেজন্য সোজা-সুজি তিনি 'স্বভাবোক্তি' স্বীকার করতে রাজী নন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ লোকাতিক্রান্তগোচরতার অর্থ আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ ক'রে বলেছেন যে, কবিকৃতি কাব্যের একটি চমৎকৃতিস্বরূপ গুণ এবং তা হ'ল লোকোত্তরত্ব, কেননা লোকোত্তরত্ব অপার্থিব বস্তুরই পরিচয় দান করে, পার্থিব অর্থের প্রকাশ থেকে তা তাই অতিক্রান্ত বা অতীত। কিন্তু আলঙ্কারিক দণ্ডী স্বভাবোক্তির পক্ষপাতী, সেজন্য তিনি ভামহের অভিমতের সঙ্গে একরকম আপোসসম্পর্ক পাতিয়েছেন। আর

১। অথবা এঁদের বক্তব্য হ'ল : যথার্থ কাব্যশিল্পীরা সাধারণ লোকদের বা রচয়িতাদের মতো সাধারণ কথায় প্রকাশ করেন না, তাঁরা কাব্যরচনার ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন ধরনের শৈলী ব্যবহার করেন।

বক্রোক্তি-অলঙ্কারকে দণ্ডী তাকে একটু সীমিত করেছেন এই ব'লে যে, সমস্ত অলঙ্কারকেই একদিক থেকে 'অলঙ্কারসামান্য-রচনা' বলা যায়। এই অভিমত পোষণ করেন আলঙ্কারিক রুদ্রটও। দণ্ডী সেজন্য তাঁর 'কাব্যাদর্শ'-গ্রন্থে স্বভাবোক্তির পরিচয় দেওয়ার সময়ে বলেছেন—'আদ্যঃ-অলঙ্কৃতিঃ' বা অলঙ্কারের প্রাথমিক প্রকাশ স্বভাবোক্তি। তাই তিনি অনন্তর, উপমা-রূপক ও উৎপ্রেক্ষাবয়ব প্রভৃতি অলঙ্কার স্বীকার করেছেন এবং সেজন্য সংসৃষ্টি বা সঙ্কীর্ণ অলঙ্কারপ্রসঙ্গেরও অবতারণা করেছেন। তাঁর প্রধান বক্তব্যশ্লোকটি হ'ল—

'শ্লেষঃ সর্বাসু পুষ্কাতি প্রায়ো বক্রোক্তিষু শ্রীয়ম্।
দ্বিবিধা ভিদ্যতে স্বভাবোক্তির্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্।'

আলঙ্কারিক দণ্ডী বলেন যে, বক্রোক্তি একদিক থেকে বাঙ্ময় বা বাক্যরূপ। তাছাড়া উপরিউক্ত শ্লোক থেকে সাধারণত অনুমান হয় যে, দণ্ডী আলঙ্কারিক ভামহের মতের সমর্থক। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি (দণ্ডী) ভামহের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঠিক একমত নন, কেননা দণ্ডী স্বভাবোক্তি বা সাধারণ বা সোজাসুজি প্রকাশভঙ্গীকে বক্রোক্তি বা ভিন্ন প্রকাশশৈলী থেকে পৃথক ক'রে দেখেছেন—'দ্বিবিধা ভিদ্যতে স্বভাবোক্তির্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্'। ডক্টর সুনীল কুমার দে উপরিউক্ত দণ্ডীর বক্তব্য-শ্লোকটি মোটামুটিভাবে ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন এভাবে: "Poetical speech is divided into *svabhāvokti* and all other figures (collectively called *vakrokti*); in the latter case, generally speaking *śleṣa* unfolds in a somewhat restricted sense from that of Bhāmaha, modifying it and confining it into the more definite significance of a collective designation of the poetic figures in general".[২]

আলঙ্কারিক বামন কিন্তু বক্রোক্তি-অলঙ্কার ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। বলতে গেলে তিনিই বোধহয় প্রথম—যিনি কাব্যালঙ্কারকে একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছেন, সেজন্য আলঙ্কারিক রুদ্রটের অভিমতকে তিনি ঠিক গ্রহণ করেন নি, বরং 'অর্থালঙ্কার'-রূপে ব্যবহারের পক্ষে অভিমত পোষণ করেন। অর্থালঙ্কার-সম্বন্ধে আলঙ্কারিক বামনের অভিমত এই যে, 'সাদৃশ্য'-লক্ষণার প্রকাশ যেখানে থাকে সেখানেই বক্রোক্তি-অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়। বামন 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'-গ্রন্থে[৩] বলেছেন: "সাদৃশ্যলক্ষণা বক্রোক্তিঃ" (৩৮), আর ভাষ্যে বলেছেন: "বহুর্ন হি নিবন্ধনানি লক্ষণায়াম্। তত্র সাদৃশ্যলক্ষণা বক্রোক্তিরসাবিতি।... অসাদৃশ্যনিবন্ধনী তু লক্ষণা ন বক্রোক্তিঃ"। তিনি সাদৃশ্যলক্ষণাবক্রোক্তির উদাহরণ দিয়েছেন—

'ইহ চ নিরন্তরনবমুকুলপুলকিতা হরতি মাধবীহৃদয়ম্।
মদয়তি চ কেসরাণাং পরিণতমধুগন্ধি-নিঃশ্বসিতম্।'

২। এ'সম্বন্ধে 'হৃদয়ম্'-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য—Dr. S. K. De: *Introduction*, p. XXIV.

৩। Vide Poona, Oriental Book Agency (1927), প্রকাশন-বিভাগ, পৃঃ ৯৯

এই অলঙ্কারের যখন প্রয়োগ হয় তখন এর নাম 'অবিবাক্ষিত-বাচ্য-বক্র'—যেকথা আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধনও ব্যবহার করেছেন 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থে। কিন্তু আলঙ্কারিক মম্মট একে বলেছেন—'লক্ষণমূলা-গৌড়-বক্র্যপ্রধান-ধ্বনিঃ'। এই স্বীকারোক্তি-সম্পর্কে ভামহ ও দণ্ডীর সাধারণো ব্যবহৃত 'বক্রোক্তি'-শব্দের বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, কেননা বামন ও রুদ্রতা যখন এটিকে নির্দিষ্ট একটি অলঙ্কার-রূপে স্বীকারের পক্ষপাতী, তখন বোঝা যায় যে, এই 'বক্রোক্তি'-অলঙ্কার হয় শব্দালঙ্কার—নয় অর্থালঙ্কার-রূপে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ভামহের বক্রোক্তি-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত অনেকটা আলঙ্কারিক কুন্তকের অভিমতের অর্থাৎ 'বক্রোক্তিজীবিত'-গ্রন্থানুযায়ী। দেখা যায় যে, কুন্তক ভামহের বক্রোক্তিসম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তকে 'অলঙ্কার-সামান্যলক্ষণ'-রূপে গ্রহণ করেছেন। এই 'অলঙ্কার-সামান্যলক্ষণ' উক্তি-সম্বন্ধে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সাহিত্যদর্পণের ভাষ্যকার (বা টীকাকার) রামাচরণ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কিন্তু কুন্তক-সমর্থিত 'বক্রোক্তি'-বাদকে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি এবং তার নিদর্শনও পাওয়া যায় তাঁর বক্রোক্তিকে 'বক্রোক্তি-অলঙ্কার' বলে স্বীকার করা থেকে। অবশ্য আলঙ্কারিক রুদ্রভার "বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্ ইতি বক্রোক্তিজীবিতকারোক্তম্ অপি পরাক্তম্, বক্রোক্তিরলঙ্কাররূপত্বাৎ" স্বীকারোক্তি থেকে এ'কথা বোঝা যায় আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ এ'সম্বন্ধে 'সাহিত্যদর্পণে' যা সিদ্ধান্ত করেছেন—তা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয়—এ'কথাই বলেছেন ডক্টর দে তাঁর ইংরাজী মুখবন্ধে।

●

॥ বিজ্ঞানীর ধর্মচেতনা ॥

(অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন)

শ্রীমতী চামেলী বসু

'ধর্ম' শব্দটি জড় ও চেতন সকল বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই শব্দটির অর্থ এককথায় বলা কঠিন, এটি একটি বহু-অর্থবোধক শব্দ। বুৎপত্তিগত অর্থে ধর্ম বলতে বোঝায় 'যা ধরে রাখে' অর্থাৎ যা মানুষকে তার জীবনাদর্শের পথে ধরে রাখে, পরিচালিত করে, সমাজ বা সমষ্টি-জীবনকে সংহত করে। এই অর্থ করলে নীতি, সদাচার, মানবিকতা প্রভৃতি মানবমনের উন্নত বৃত্তিগুলি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার 'ধর্ম' শব্দের অর্থ বিশেষ গুণ, যেমন অগ্নির ধর্ম দহন করা, তুষারের ধর্ম শৈত্য, চোরের ধর্ম পরস্বাপহরণ, সাধুর ধর্ম সদাচার ইত্যাদি। জড়পদার্থের ক্ষেত্রে বস্তুর গুণগত ধর্মই তার পরিচয়।

গীতায় আমরা ধর্মের বিভিন্ন অর্থ পাই, শ্রীভগবান বলেছেন :

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

এ ধর্ম কোন্ ধর্ম? এখানে ধর্ম অর্থে ঈশ্বর-চেতনা, সংবুদ্ধি, সদাচার ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। আবার কর্মযোগের মধ্যে শ্রীভগবান বলেছেন :

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।

এইখানে ধর্ম বলতে সামাজিক ধর্ম ও কর্তব্য কর্মের কথা বলা হয়েছে মনে হয়।

আধ্যাত্মিক ধর্ম ও সামাজিক ধর্মের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বস্তুতঃ ধর্মের দুটি দিক আন্তর ও বাহ্য। এক অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত, চিরন্তন সত্তাকে স্বীকার করে তার সম্বন্ধে চিন্তা করা, জ্ঞানলাভ করার প্রচেষ্টার নাম ধর্ম। এই ধর্ম আন্তর ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা, এটি অনুভূতির বিষয়। বাহ্য বা সামাজিক ধর্মের মধ্যে পড়ে পূজা, অর্চনা ও তার আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান। আধ্যাত্মিক ধর্মের আদর্শ সামাজিক রীতি-নীতিকে প্রভাবিত করে, গঠন করে।

প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল ধর্মভিত্তিক অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্যের ইতিহাসেও দেখা যায় ধর্মযাজকদের প্রভাব শিক্ষা, সংস্কৃতি এমন কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর আধিপত্য করেছে। গ্যালিলিও প্রমুখ বহু বিজ্ঞানী ধর্মযাজকদের অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করেছেন। সাম্প্রতিককালে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে সামাজিক জীবনে আধ্যাত্মিক মতবাদের প্রভাব অনেকাংশে শিথিল হয়ে গেছে। অনেকে বলেন, ধর্ম একপ্রকার ভাবাবেগ, যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির বাইরে কোন বৃহত্তর সত্তা নেই।

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" উপনিষদের এই বাণী, অর্থাৎ এই চরাচরে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, পরব্রহ্ম আছেন বলিয়াই সেই সকল বস্তু তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে, এ তাঁরা স্বীকার করেন না। কিন্তু বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যাঁদের অমূল্য অবদানে বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে ও তার পারে এক অপ্রাকৃত অনন্ত শক্তি বা চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

"অনন্তের অনুভূতি বা জ্ঞানই হ'ল ধর্ম" বলেছেন দার্শনিক ম্যাক্সমূলার। মানুষের শক্তি সীমিত হলেও অনন্তকে জানবার আকুলতা ও প্রেরণা তার স্বরূপে নিহিত থাকে। অনন্তের প্রতি মানবমনের এই অনিবার্য প্রবণতা ও আকর্ষণ ধর্ম-চেতনার প্রধান উপাদান। তাই যদিও সাধারণ বিজ্ঞানানুরাগীদের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চান, যাঁরা মননশীল, বিচারশীল বিজ্ঞানী তাঁরা অনেকেই এক বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ শক্তিকে স্বীকার করেছেন। এই সম্পর্কে এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী প্রফেসর অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করা যাক্।

আইনষ্টাইনের মতে বিজ্ঞানের প্রকৃত সেবকই হলেন সবচেয়ে বড় ধার্মিক, কারণ বিশ্বের রহস্যে অভিভূত হওয়া থেকেই ধর্মের অনুসন্ধিৎসা আসে, অভিজ্ঞতা হয়। প্রফেসর অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন কেবল শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিংশশতাব্দীর মনীষীদের অন্যতম,

তিনি ছিলেন এক মহামানব। তাঁর অনন্যসাধারণ মানবিকতার মূলে ছিল তাঁর ধর্ম-চেতনা। বিগত ১৪ই মার্চ ১৯৭৯ প্রফেসর আইনষ্টাইনের জন্মশতবর্ষ স্মরণে আয়োজিত বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে কিন্তু সমাপ্তিপর্বের পরেও চলেছে তাঁকে নিয়ে কত আলোচনা সভা, কত প্রদর্শনী, কত বক্তৃতা। সারা বিশ্বের মানুষ স্মরণ করছে, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছে বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মানবদরদী অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনকে।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন সত্যই একটি বিস্ময়; চমকপ্রদ তাঁর আবিষ্কার এবং তা অত্যন্ত দুর্বোধ্য যে কারণে দেখা যায় তাঁর সমকালীন খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকের তা সম্যক বোধগম্য হয় নি। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের মতই বিস্ময়কর ছিল তাঁর গবেষণাপদ্ধতি। টুক্‌রো টুক্‌রো কাগজ ও কলম এই ছিল তাঁর সরঞ্জাম, যখন তিনি পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ব্রতী হন সে সময় তাঁর না ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ খেতাব, না ছিল গবেষণাগার, শিক্ষক বা সহকর্মী। বার্ণ পেটেন্ট অফিসের কেরাণী অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন সকলের অজ্ঞাতসারে অফিসের টেবিলে বসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে টুক্‌রো কাগজগুলি অঙ্ক কষে ভরিয়ে ফেলেন আর নিজের ডেস্কে ঢুকিয়ে রাখেন। তিন বৎসরের সঞ্চিত এই খণ্ড লিপিগুলি সুসংবদ্ধ হয়ে ১৯০৫ সালে তাঁর জন্য বিশ্বখ্যাতি অর্জন করল। স্বাধীনভাবে গবেষণা করবার মত জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন জুরিখ পালটেকনিকের ছাত্র হিসাবে লাইব্রেরীতে বসে। গভীর মনোযোগ ও তীক্ষ্ণ মেধাদ্বারা কারও সাহায্য না নিয়ে তিনি তাঁর বিজ্ঞান-সাধনায় সাফল্য লাভ করেন, পদার্থবিদ্যা তাঁর মুখ্য পাঠ্যবিষয়, এ ছাড়া তিনি গণিত ও দর্শন সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশুনা করেন।

প্রফেসর আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গভীর চিন্তাপ্রসূত, উপলব্ধ সত্য। তিনি একবার বলেছিলেন আমার মাথাই আমার গবেষণাগার আর কলমটি ধরে হেসে বলেছিলেন "এই আমার যন্ত্র"। তাঁর মস্তিষ্কের বিশেষত্ব অনুসন্ধানে আগ্রহী গবেষকদের জন্য তিনি মৃত্যু-কালে মস্তিষ্কটি দান করে গিয়েছিলেন এবং সেটি আজ রক্ষিত আছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংগ্রহশালায়। প্রফেসর আইনষ্টাইনের মতে বিজ্ঞানসাধনায় চিন্তার একাগ্রতা অত্যন্ত মূল্যবান, বলতেন "Science is purification of daily Thoughts"—প্রাত্যহিক চিন্তাধারার বিশুদ্ধিকরণই হ'ল বিজ্ঞান। মানুষ যে কত সুদূরপ্রসারী এবং কত গভীর চিন্তা করতে পারে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ। কিন্তু তাঁর চিন্তা কেবল বহিঃপ্রকৃতির ঘটনাবলীর মধ্যে বিচরণ করত না, সমগ্র পৃথিবীর মানুষের অন্তরের সুখ দুঃখ তিনি আপন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন। বিজ্ঞানী-আইনষ্টাইনের মতই বিস্ময়কর ছিলেন মানুষ-আইনষ্টাইন। তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু লিখেছেন, "এই মানুষটিকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন তাঁরা স্থির করতে পারেন না যে এই মানুষটির যে-মস্তিষ্কের দ্বারা মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে সেই মস্তিষ্ক বড়, না যে-হৃদয়ে সঞ্চিত থাকত জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের জন্য অপরিসীম সহমর্মিতা ও মঙ্গলেচ্ছা সেই হৃদয়টি বড়"। ধর্ম-চেতনা না থাকলে এরূপ বিশ্বজনীন প্রেমের বিকাশ সম্ভব নয়।

প্রফেসর অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের জীবন কেটেছে বহু ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকে এক দেশ থেকে আর এক দেশে গিয়ে বিদ্যানুশীলন, বিদ্যালয়ের শিক্ষা সুরু হ'লো জার্মানীতে শেষ হ'ল সুইজারল্যাণ্ডে। জীবনে একাধিকবার নাগরিকত্ব পরিবর্তন করেছেন তিনি। জীবনের প্রারম্ভে জার্মান, কৈশোর অতিক্রম করতে না করতেই হলেন সুইস নাগরিক আবার বন্ধু অ্যাডলারকে ফাঁসীর মঞ্চ থেকে উদ্ধার করবার জন্য স্বীকার করতে হ'ল জার্মান নাগরিকত্ব। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় জার্মান নাগরিক হওয়ার ঝুঁকি কত তা তিনি জানতেন কিন্তু এতটুকু দ্বিধা না করে বন্ধুর প্রাণরক্ষার জন্য তা তিনি স্বীকার করেছিলেন। আবার এর পনের বৎসর পরে ১৯৩২ সালে তাঁকে জার্মানী ছেড়ে পালাতে হ'ল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এবং জীবনের শেষ কুড়ি-বাইশ বৎসর আমেরিকান নাগরিক হয়ে কাটালেন। সম্মানের তুঙ্গে উঠেছিলেন আইনষ্টাইন কিন্তু বিদ্বেষ, উপহাস, অসম্মানও ভোগ করেছেন অনেক। আদর্শবাদী এই বিজ্ঞানী কোনদিন তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি, তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বজনীনত তাঁকে তাঁর জীবনসাধনায় অবিচলিত রেখেছে।

বাল্যকাল থেকেই অ্যালবার্ট ছিলেন নির্জনতাপ্রিয় কোমলস্বভাব ও ধর্মপ্রাণ। পিতা হেরম্যান আইনষ্টাইন ছিলেন নাস্তিক, তাঁদের ইহুদী পরিবারে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান তিনি হ'তে দিতেন না, এজন্য বালক অ্যালবার্ট দুঃখ বোধ করতেন। তিনি এমন কোমলস্বভাব ছিলেন যে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখলে বা গোলাবারুদের শব্দ শুনলে অত্যন্ত বিচলিত হতেন, কাঁপতেন, সবাই বলত ভীতু ছেলে, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রফেসর আইনষ্টাইন বলেছেন, 'মানুষকে মারবার জন্য মানুষ সুন্দর সাজপোষাক প'রে বাজনা বাজিয়ে সগর্ব-পদক্ষেপে সকলকে দেখিয়ে মার্চ করে যায় এ তিনি সহ্য করতে পারেন না।' প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সমর্থনে একটি পত্রিকায় সই করতে বললে তিনি বলেছিলেন, 'এই জঘন্য কাজে যোগদান না করার জন্য আমার টুক্‌রো টুক্‌রো কাটলেও ভাল।'

শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মানলাভের পর তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ করেন ও বক্তৃতা দেন। সাধারণ সভায় তিনি জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন না, তিনি শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করতেন। প্রফেসর আইনষ্টাইনের ভাষা-জ্ঞান ছিল সীমিত কিন্তু ভাষার সমৃদ্ধি না থাকলেও তাঁর ভাষণের মধ্যে তাঁর অন্তরের পরিচয়, তাঁর আদর্শের কথা তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

ধর্মযাজকেরা তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, "আপনি ধর্ম মানেন? ঈশ্বরকে স্বীকার করেন?" উত্তরে তিনি বলেছেন, "বোধাতীত বিশ্বে অতি উচ্চস্তরের যুক্তিগ্রাহ্য শক্তির অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসই হ'ল আমার ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা।" বলেছেন, "my God is Spinozas God", "স্পিনোজার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর।" দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করে তিনি দার্শনিক স্পিনোজার মতবাদ দ্বারা আকৃষ্ট হন ও তা বিশ্বাস করেন। প্রফেসর আইনষ্টাইন বলেছেন, "my religion consists of a humble admiration of illimitable superior spirit

who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble minds. That deeply emotional convition of the superior reasoning power. which is revealed in the comprehensible universe forms my idea of God". "যে অসীম উচ্চতর শক্তির প্রকাশিত লীলার অতি ক্ষুদ্রাংশ আমাদের ক্ষীণবুদ্ধিতে উপলব্ধ হয় তার প্রতি মুগ্ধ বিস্ময়ে ও নম্র প্রশংসায় অভিভূত হওয়াই আমার ধর্ম", বলেছেন প্রফেসর আইনষ্টাইন।

স্পিনোজার মত তিনি ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে আলাদা দেখেন নি, তাঁর ঈশ্বর বা প্রকৃতি হলেন এক আদি-অন্তহীন অনন্তগত সত্তা যার বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যেতে পারে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং কবিকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে বিশ্ব থেকে আলাদা বিশ্বাস করেন ?"

১৯১৭ সালে একবার আইনষ্টাইন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন, তিনি নিজে ও তার আত্মীয়-বন্ধুগণ তাঁর জীবনের আশা একরূপ ত্যাগ করেছিলেন। সেই সময়ে একদিন তাঁর বন্ধুপত্নী মিসেস বর্ণ্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "মরতে আপনার ভয় করে না ?" জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বললেন প্রফেসর আইনষ্টাইন, "না, মোটেই না, আমি নিজেকে প্রতিটি জীবন্ত সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে এত জড়িত বলে মনে করি যে এই অনন্ত প্রবাহে কোন একটি মানুষের অস্তিত্বের কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ, সে বিষয় জানতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।" এই বিশ্বাত্মবোধ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনকে করেছিল মহান্।

কি বিজ্ঞানের সাধনায়, কি জীবন সাধনায়, প্রফেসর অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ছিলেন স্বয়ং-সম্পূর্ণ, তিনি ছিলেন একক ও নিঃসঙ্গ সাধক। নিজের সম্বন্ধে তিনি একবার বলেছিলেন, "আমি প্রকৃতই একজন নিঃসঙ্গ পথিক, আমি আমার দেশের গৃহের এমন কি আমার নিকটতম আত্মীয়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হতে পারি নি। সকল বন্ধন থেকে নিজেকে দূরে রাখবার বাসনা আমার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।" তাঁর এই আত্মসমীক্ষা আংশিক। এই আইনষ্টাইনই আবার বলেছেন, "মানুষের প্রকৃত মূল্য তার মেধা, ধন-সম্পদ বা উচ্চ পদমর্যাদা দ্বারা নিরূপিত হয় না, সমাজের দেশের ও বিশ্বের কল্যাণে তার অনুভূতি, চিন্তা কতখানি ক্রিয়াশীল এবং তা কর্মকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করে তার দ্বারাই হয় মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন।" নিজের জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বলেছেন, "আমি প্রতিদিন শত শত বার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিই যে আমার অন্তর ও বাহির দুটি জীবনই নির্ভর করে জীবিত ও মৃত বহু মানুষের শ্রমের উপর তাই আমাকেও চেষ্টা করতে হবে, আমি যতটা পেয়েছি ও পাচ্ছি সেই পরিমাণে অপরকে দিতে।"

প্রফেসর আইনষ্টাইন ছিলেন বিজ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তিনি গবেষণা করেন নি, বিচার করেন নি কিন্তু তাঁর নিজের ঈশ্বরানুভূতির কথা তিনি স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি ছিলেন অসঙ্গ কর্মযোগী, উপনিষদের বাণী, "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তার পরের শ্লোকাংশ "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্"

তাঁর ভাষণের মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে, অন্য ভাষায় বলেছেন, "The way to a joyful and happy state (country) is through renunciation and self-limitation everywhere".

ত্যাগ ও সত্যের মূর্ত প্রতীক অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন গান্ধীজীর সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, সেই কথা তাঁর উদ্দেশ্যে ব'লে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করব, "আমরা ভাগ্যবান যে এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা পেয়েছি এমন এক জ্যোতির্ময় মানুষকে যিনি ভবিষ্যত-বংশধরদের কাছেও আলোর শিখারূপে প্রজ্বলিত থাকবেন।"

●

॥ দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে ॥

॥ মহীশূর ॥

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সামান্য কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল বেলা ৩টায়। যীশুর জন্মদিনে প্রথমেই আমরা উপস্থিত হলুম মহীশূরের বিখ্যাত St. Joseph গীর্জাটিতে। আজকের এই শুভদিনে অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে গীর্জাটি। যীশুর বিভিন্ন সময়ের মূর্তি, গীর্জাটির শুচি-শুভ্র পরিবেশ ও দৃশ্য সজ্জা দেখে সহসা মনে একটি ভাবান্তর উপস্থিত হল। মনে হল আজও তিনি জাগ্রতভাবেই বর্তমান এবং কেবলমাত্র খ্রীষ্ট-জগতের তিনি ত্রাতা নন—পৃথিবীর সকল জাতিরই প্রণম্য তিনি। তাঁর জীবনী সংক্রান্ত কিছু পুস্তক এবং পবিত্র বাইবেলও কিছু কিছু পাঠ করেছি কিন্তু এত জাগ্রতভাবে তাঁকে কোন দিন মনে হয় নি। বিশেষ একটি দিনের, বিশেষ পরিবেশ মানবমনে যে একটি প্রভাব বিস্তার করে একথা তা'হলে মিথ্যা নয়।

সেখান হতে সোজা চলে যাই টিপুর রাজধানী ১০ মাইল পথ শ্রীরঙ্গপত্তনে বেলা ৪টায়। ট্যাক্সি থামল তোরণদ্বারের সামনে। পঁচিশ পয়সা প্রবেশ মূল্য দিয়ে সুকোমল তৃণাস্তরণ আচ্ছাদিত ও চতুষ্পার্শ্বে নানাজাতের রঙ্গগোলাপ শোভিত বিশাল ময়দান অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হই কাবেরী তীরে টিপুর গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের প্রাসাদ "দরিয়া দৌলতে" যার অর্থ হল "সমুদ্রের সম্পদ"। ইংরাজদের সঙ্গে মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে টিপু এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। সমগ্র প্রাসাদটিই কাষ্ঠ-নির্মিত। আগাগোড়া সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণে রঞ্জিত। মুঘল নির্মাণ পদ্ধতির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট—আমেদাবাদে আকবরের সুপ্রসিদ্ধ দরবার হলটি যেমন ভারতীয় ও মুঘল স্থাপত্যের সংমিশ্রণে নির্মিত "দরিয়া দৌলত"ও তদ্রূপ। টিপুর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল এই প্রাসাদটি কর্ণেল আর্থার ওয়েলেস্‌লির অধিকারে ছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এটির পুনঃ সংস্কার সাধন করেন মহীশূরের রাজা চামরাজা ওয়াদিয়ার। প্রাসাদটির

পশ্চিম দেওয়াল গাত্রে অঙ্কিত যুদ্ধচিত্র—টিপু ও তাঁর পিতার ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালীন সমারোহের দৃশ্য। শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে টীপু সুলতান, তাঁর পশ্চাতে উজীর, মন্ত্রী মীর সাদিক প্রভৃতি। সাহায্যার্থে সম্মুখে চলেছেন ফরাসী সৈন্যরাও। সর্বাগ্রে হস্তীপৃষ্ঠে হায়দার আলি খান, মধ্যে দেওয়ান পুরনিয়া। অন্য একটি দেওয়াল-চিত্রে দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের দৃশ্য। এই যুদ্ধও সংঘটিত হয় টিপুর ও ইংরাজদের মধ্যে এবং টিপু ফরাসীদের সহায়তায় জয়লাভ করেন এই যুদ্ধে। এই যুদ্ধে টিপু বহু ইংরাজসহ কর্ণেল বেলীকে বন্দী করে দুর্গ কারাগারে অবরুদ্ধ রাখেন। যার নাম "বেলীজ ডানজেন"। পূর্ব দেওয়াল-গাত্রে শোভিত তৎকালীন দক্ষিণ-ভারতের রাজন্যবর্গের চিত্র—যাঁরা টিপুর দুঃসময়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রায় সমস্ত চিত্র ও গৃহগুলি পুনঃসংস্কৃত ও অলঙ্কৃত হয় চতুর্থ কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ারের সময় ১৯২৪-২৬ সালে।

উপরে একতলায় একটি ছোট যাদুঘরে (Museum) রয়েছে একজন ইংরাজ চিত্রকর অঙ্কিত টিপুর সমাকৃতি (Life-Size) একটি তৈলচিত্র এবং তাঁর দুই পুত্রকে ইংরাজের নিকট প্রতিভূ স্বরূপ প্রেরণ করছেন সেই চিত্র। অপরটি হল শ্রীরঙ্গপত্তনের শেষ যুদ্ধে ইংরাজ কর্তৃক টিপুর পরাজয় ও নিধনের চিত্র। আর দেখা যায় টিপু ও হায়দার আলির সময়ের কয়েকটি সুবর্ণমুদ্রা ও টিপুর পতনের পর বৃটিশ কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত মেডেল। দর্শনান্তে প্রাসাদ হতে বেরিয়ে রক্তগোলাপ শোভিত বিস্তীর্ণ ময়দানের সবুজ তৃণাস্তরণে বসে সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে লাগলুম। সেই অবকাশে বলজিৎভাই প্রস্তুত হয়ে পড়লেন আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য। শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির দর্শনের পথে বেলীর কারাগার (পাতালপুরী) দেখে চলে এলুম মন্দির-চত্বরে। রঙ্গনাথস্বামী এই দেবতার নামানুসারে স্থানটির নাম শ্রীরঙ্গপত্তন। যে সময় এই স্থানটি দণ্ডকারণ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তখনই এখানকার অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে মহর্ষি গৌতম প্রতিষ্ঠা করেন এই মূর্তিটি। গঙ্গরাজের রাজত্বকালে ৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি ছোট মন্দিরও নির্মিত হয়। পরবর্তীকালের হিন্দু-রাজাদের আমলে এই মন্দির বৃহত্তর করা হয়। বিশেষ করে ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে হোয়সলরাজ বিষ্ণুবর্ধনের ভ্রাতা উদয়াদিত্য এই নগরটির পত্তন করেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে কৃষ্ণদেব রায় নির্মাণ করেন সুউচ্চ গোপুরমটি। পঞ্চ-ফণাযুক্ত নাগোপরি অর্ধশায়িত বিষ্ণুমূর্তিটি দর্শন করে মন অভিভূত হয়। পদতলে দেবী কাবেরী ও ঋষি গৌতম তাঁদের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। হায়দার আলি ও টিপু সুলতান বহু মূল্যবান অলঙ্কার উপহার দিয়েছিলেন এই দেবতার চরণে। প্রাকার মধ্যে শ্রীরঙ্গনায়কী বা দেবী লক্ষ্মীর মূর্তিও বর্তমান।

চলে এলুম শ্রীরঙ্গপত্তন হতে তিন মাইলের ব্যবধানে কাবেরী-সঙ্গমের সন্নিকটে—হায়দার আলি, টিপু সুলতান ও তাঁর মাতার স্মৃতিসৌধ 'গুম্বজ' দেখতে। এখানেও গোলাপ ও আম্রবৃক্ষ শোভিত একটি মনোরম বাগিচা 'লালবাগ'। এই উদ্যানটি ছিল হায়দার আলির অতি প্রিয়। এই জন্যই বোধহয় টিপু তাঁর মাতা-পিতার সমাধিক্ষেত্রের জন্য নির্বাচিত করেছেন এই স্থানটি। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে টিপু নির্মাণ করান এই সুরম্য 'গুম্বজ'টি। কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক প্রস্তর নির্মিত জানালা, দরজা ও স্তম্ভ শোভিত 'গুম্বজ'টির দৃশ্য অতি মনোরম। স্তম্ভগুলি এরূপ মার্জিত যেন হ যেন দর্পণের মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। নিশ্চয়ই টিপুর শিল্পীরা পারস্য হতে এই

নির্মাণ-কৌশল শিক্ষা করে এসেছিলেন। সমাধিসৌধের অভ্যন্তরস্থ দেওয়াল চিত্রগুলি দৃষ্টে মনে হয় যেন ভোরাকাটা ব্যাঘ্র সব উল্লম্ফনরত। হায়দার আলিকে 'মহীশূর ব্যাঘ্র' বলে অভিহিত করা হতো বলেই বোধহয় এরূপ চিত্র সংস্থান করা হয়েছে। সৌধের শীর্ষগম্বুজ ও জানালা-দরজার প্রান্তদেশগুলির হস্তিদন্তের অপরূপ কারুকার্য ও মসজিদ্ নির্মাণ পদ্ধতি মোগল স্থপতিদের সূক্ষ্ম কারুশিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গে টিপু নিহত হলে ইংরাজগণ যুদ্ধক্ষেত্র হতে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে এসে পিতা-মাতার পাশেই সমাধিস্থ করেন। কাবেরীর দুটি শাখানদী যেখানে সঙ্গম সৃষ্টি করেছে সেটি দেখেই সকলে চললুম 'নবৃন্দাবন' উদ্যান দেখতে।

ট্যাক্সি ছুটল বৃন্দাবন উদ্যান অভিমুখে সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে। বারো মাইল পথ আধঘণ্টার অতিক্রম করে ৬-৪৫ মিনিটে আমাদের গাড়ী দাঁড়াল 'বৃন্দাবন উদ্যানে'র সুউচ্চ প্রবেশ পথের সামনে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই-প্রবেশপথটি মোগল স্থপতিদের প্রতীক। গাড়ী হতে নেমে ভিতরে প্রবেশ করে স্তব্ধ হয়ে যাই—মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখি তার অপরূপ রূপ।

কাবেরীর জল নিয়ে এসে নির্মিত হয়েছে একটি ড্যাম। ড্যামের বুকে একটি এ্যানিকাট। তার বুকের উপর দাঁড়িয়ে এক বৃহৎ সেতু। সেতুর ফাঁক দিয়ে অমিতবেগে অতিক্রম করে আসছে জল। সেই জল দিগন্তে গিয়ে মিশে রূপ নেয় সাগরের। নির্মাণ করান মহীশূরের রাজা কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার। এই বাঁধ নির্মিত হয় স্যার মীর্জা ইসমাইলের সময়। এখান হতেই হয় এশিয়ার প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। অপর পারে ড্যামের কিনারা দিয়ে রচিত হয়েছে একটি অপ্রশস্ত কন্‌ক্রিটের পথ। পৌঁছেছে গিয়ে একটি রমণীয় উদ্যানে। পরিচিত 'বৃন্দাবন গার্ডেনস্' নামে। এই উদ্যানে আছে তিনটি স্তর। উচ্চতম স্তরে নির্মিত একটি রমণীয় শ্বেত-প্রস্তরের নাটমন্দির। নির্মিত মুঘল পদ্ধতিতে। মন্দিরের একপ্রান্তে বেদীর উপর নির্মিত অপরূপ রাধাকৃষ্ণ মূর্তি। তাঁদের সামনে দুটি অতিকায় ফোয়ারা। বৃহত্তর দ্বিতীয় স্তরটি বেষ্টিত হয়ে আছে সারি সারি ফোয়ারা আর নয়নাভিরাম বৃক্ষ দিয়ে। তার প্রান্তদেশেও দাঁড়িয়ে আছে দুটি অতিকায় ফোয়ারা। বৃহত্তম কিন্তু তৃতীয় স্তরটি। নির্মিত হয়েছে তার বুকে একটি ত্রিভুজাকৃতি সরোবর। শোভা পায় তার দুপাশে ত্রিভুজাকৃতি ক্ষুদ্র বৃক্ষ, দাঁড়িয়ে আছে দূরত্বের সমতা রেখে। রচিত হয়েছে তিনটি সারিতে সারি সারি ফোয়ারা এই সরোবরের বুকেও। বিদ্যুতের বাষ দিয়ে শোভিত সেই সব ফোয়ার অঙ্গ। বিভিন্ন তাদের রং। মুক্ত ফোয়ারার মুখ দিয়ে নির্গত হয় জল অজস্র ধারায়। বিচ্ছুরিত হয় নানা বর্ণের আলোকচ্ছটা ফোয়ারার অঙ্গ দিয়ে, সাদা, লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনি। আলোয় আলোকিত হয় চারিদিক। যেন শুরু হয় অপ্সরার নৃত্য—নানাবর্ণের সাজে সেজে এসেছে তারা।

প্রথমে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি উপর থেকে। মনে হয় এ কোন্ স্বর্গরাজ্যে এলাম। প্রবেশ করি উদ্যানে। প্রথমে নাটমন্দিরে তারপর দ্বিতীয় স্তরে। যত দেখি ততই বিস্ময় বাড়ে। বিস্ময়েমুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে চলে আসি তৃতীয় স্তরে। উপনীত হই সরোবরটির প্রান্তদেশে। ফিরে এসে উপর থেকে আবার দেখি সমগ্র পরিবেশটি, মনে হয় যেন সুরসভাতলে অপ্সরার নৃত্য।

দেখছি, অপরূপ তাদের ছন্দ। নিখুঁত তাদের তাল। অনবদ্য পরিবেশ। মনে একটি মনোজ্ঞ স্মৃতি নিয়ে ধীরে ধীরে এসে উঠে পড়ি আমাদের ট্যাক্সিটিতে রাত্রি তখন ১০-১৫—। ১০টায় বন্ধ হয়ে যাবে এই আলোর নাচন। ফিরে আসি মহীশূর ষ্টেশনে রাত্রি ১০টায়।

২৬শে ডিসেম্বর বিশ্রামের দিন। ২৭শে ডিসেম্বর সকালের দিকে চলে গেলুম কর্ণাটক প্রদেশের "Information Bureau". সেখান হতে কিছু পুস্তকাদি সংগ্রহ করে পাশেই মেডিকেল কলেজের বাড়ীঘর দেখতে দেখতে চলে এলুম কর্ণাটক সরকার পরিচালিত "কাবেরী" প্রদর্শনাগারে (Showroom). নানা জাতের জিনিসপত্রের বিক্রয়কেন্দ্র। মোটামুটি যা কিছু উৎপাদিত কর্ণাটক প্রদেশে যেমন চন্দনকাঠ নির্মিত বহুবিধ দ্রব্যাদিও আছেই তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী—অতি সুন্দর কারুকার্য-খচিত কার্পেটের মূল্যবান আসন পর্যন্ত রয়েছে বিক্রয়ের জন্য। মূল্য অতি উচ্চ। বরং স্থানীয় বিক্রেতা যারা প্রতিদিন ষ্টেশনে আসে তাদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অনেকেই ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন কিনছেন অনেকেই। দুবার ঘুরে ফিরে সব দেখে ফিরে এলাম ষ্টেশনে। রাত্রি ১১-৫০ মিনিটে গাড়ী ছাড়ল বাঙ্গালোর অভিমুখে—তিন দিন মহীশূরে অবস্থিতির পর। ২৮শে ডিসেম্বর সকাল ৫-৩০ মিনিটে বাঙ্গালোর পৌঁছে গেলুম।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ জঙ্গলাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে করিতে বদরীকাশ্রম-অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পথের চারিধারে নানাবিধ পক্ষীর ডাক শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ পথে মাঝে মাঝে প্রায় দশ-পনেরো মাইল অন্তর চটী বা বিশ্রামের স্থান ছিল। ঐ সকল চটীতে যাত্রীরা রাত্রিযাপন ও আহারাদি করিত। যাত্রীদের রান্না করিবার জন্য হাড়ী, থালা, গ্লাস, চাউল, ডাল, ঘৃত, লঙ্কা ও কাঠ প্রভৃতি পাওয়া যাইত এবং যাত্রীদের খুব সুবিধা হইত, পরে, সকল-কিছুর মূল্য ধরিয়া দিত। কিন্তু কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ ত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁহারা পায়ে হাটিয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁদের একমাত্র সম্বল ঠাকুরের আশীর্বাদ ও মনোবল, সুতরাং তাহাই তাঁহাদের পথের পাথেয় ছিল। সঙ্গে কোন রকম অর্থের .বালাই ছিল না। সেজন্য সর্বত্রই মাধুকরী করিয়া তাঁহারা দুইজনে আহারাদি কার্য সম্পন্ন করিতেন, আর রাত্রিকালে গাছতলায় কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিতেন। পাহাড়ী রাস্তা উঁচুনীচু, চড়াই-উৎরাই। পঁয়ত্রিশ মাইল পরে তাঁহারা ব্যাসঘাটে উপস্থিত হইলেন। তাহার অর্ধেক পথ অতিক্রম করিলেই গরুড়চটী। গরুড়চটীতে গরুড়দেবতার মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে তাঁহারা দুইজনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং ব্যাসঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রবাদ আছে যে, বেদবিভাগকর্তা ব্যাসদেব ব্যাসঘাটে আসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার নামানুসারে 'ব্যাসঘাট' নাম হইয়াছে। সেইখান

হইতে নয় মাইল অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দেবপ্রয়াগে উপস্থিত হইলেন এবং চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিদর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন। দেবপ্রয়াগে গঙ্গা ও অলকানন্দা দুইটি নদীর সঙ্গম বলিতে তাহারা ঐ স্থানে মিলিত হইয়াছে। ঐ পবিত্র সঙ্গমস্থলে তাঁহারা দুইজনে স্নান সম্পন্ন করিলেন ও মাধুকরী করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। গঙ্গোত্রীর বহু উপরে গোমুখী, ঐ স্থান হইতে গঙ্গার উৎস প্রবাহিত। ঐ গোমুখী হইতে গঙ্গার জলধারা প্রবাহিত হইয়া দেবপ্রয়াগে আসিয়া অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে গঙ্গার ধার দিয়া গঙ্গোত্রী যাইবার একটি সুন্দর পথও আছে।

কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ দুইজনে প্রথমে বদরীকাশ্রম ও পরে কেদারনাথ দর্শন করিবেন এবং কেদারনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়া গঙ্গোত্রীর পথে যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের আচার্যদেবকে স্মরণ করিয়া যাত্রা শুরু করিলেন। কথিত আছে যে, গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে পূর্বে দেবতারা তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐস্থানের চারিদিকের দৃশ্য অতিশয় মনোমুগ্ধকর। সর্বত্রই হিমালয়ের শুভ্র শৃঙ্গরাজি বিরাজ করিতেছে এবং তাহাদের পাদদেশে গঙ্গা ও অলকানন্দার অমৃতধারা কলকলনাদে প্রবাহিত হইতেছে। মনে হয়, তাহারা উৎসারিত হইয়া দেবলোকে আসীন মহান্‌পুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিতেছে।

তাহার পর তাঁহারা চলিলেন দেবপ্রয়াগ হইতে আঠারো মাইল উপরে শ্রীনগরের অভিমুখে। শ্রীনগরের সন্নিকটে বিল্বকেদার-শিব প্রতিষ্ঠিত। বিল্বকেদারের মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। উচ্চ পাহাড়ে পরিবেষ্টিত ঐ স্থানটি অতিমনোরম। ঐ স্থানে কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ দুইজনে বিল্বকেদার-শিব দর্শন করিলেন। সেখান হইতে শ্রীনগর চারি মাইল এবং শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ আঠারো মাইল।

কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ উভয়ে অবশেষে রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। রুদ্রপ্রয়াগে দুইটি নদী—মন্দাকিনী ও অলকানন্দা মিলিত হইয়াছে। ঐ দুই নদীর সঙ্গমস্থলে স্নান সমাপন করিয়া স্থানীয় তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে তাঁহারা মাধুকরী করিলেন এবং তাঁহাদের আহার সম্পন্ন করিলেন। তাহার পর তাঁহারা প্রাচীন মন্দির রুদ্রেশ্বর-শিব দর্শন করিলেন। সেখান হইতে দুইটি পথ বিভক্ত হইয়া একটি মন্দাকিনীর তীরে তীরে গুপ্তকাশী হইয়া কেদারনাথে গিয়াছে, আর অপরটি অলকানন্দার ধার দিয়াই কর্ণপ্রয়াগ হইয়া বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে।

কথিত আছে যে, ঋষি অগস্ত্যমুনি ঐ তীর্থে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ পথটির নামও অগস্ত্যমুনি। ঐখান হইতে গুপ্তকাশী তেরো মাইল। গুপ্তকাশীতে বিশ্বেশ্বর-শিব ও অন্নপূর্ণার মন্দির আছে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত অর্ধনারীশ্বরমূর্তি, আর আছে একটি মণিকর্ণিকা। মণিকর্ণিকা-স্থানটি অপূর্ব-সুন্দর। ঐস্থানে গোমুখীধারা ও মণিকর্ণিকাকুণ্ড আছে। তাঁহারা দুইজনে ঐ কুণ্ডে স্নান সম্পন্ন করিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন করিলেন এবং হৃদয়ে এক অনাবিল আনন্দ ও শান্তি অনুভব করিলেন। ঐ স্থানটি অতিশয় শান্ত ও স্নিগ্ধকর, অন্তরের সকল তাপ দূর হইয়া যেন শীতল হইয়া যায়।

॥ শৌরসেনী : প্রাচীনভারতের ভাষা ॥

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

মুনি ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে যে সপ্তভাষার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে শৌরসেনীর নাম প্রফুট।

মাগধ্যবন্তিজা প্রাচ্যা শূরসেন্যর্ধমাগধী।
বাহ্লীকা দাক্ষিণাত্যা চ সপ্তভাষাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

তিনি নাটকে শৌরসেনী-ভাষা অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। 'শৌরসেনং সমাশ্রিত্য ভাষা কার্যা তু নাটকে'। এই শৌরসেনী কাহাদের ভাষা হইবে, এই প্রসঙ্গে ভরত লিখিতেছেন : 'নায়িকানাং সখীনাং চ শূরসেনী বিরোধিনী'।

আচার্য দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে প্রাকৃতভাষাপ্রসঙ্গে বিশদ বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতেও শৌরসেনীর সমুল্লেখ দেখি—

মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সমারঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদিযন্ময়ম্॥
শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবম্ ব্যবহারেষু সন্নিধিম্॥

দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্রের ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রকৃষ্ট প্রাকৃত, সেতুবন্ধাদি মহাকাব্য সে ভাষায় রচিত। শূরসেনের ভাষা শৌরসেনী, গৌড়ের গৌড়ী, লাটের লাটী। তাদৃশী শব্দের দ্বারা অবন্তি-সম্পর্কে আবন্তী, মগধ-সম্পর্কে মাগধী, দ্রবিড়-সম্পর্কে দ্রাবিড়ী, বল্লিক-সম্পর্কে বল্লিকী ইত্যাদি অনুমেয়।

শূরসেন কোথায়? মথুরাসন্নিহিত দেশ শূরসেন—'শূরসেনঃ মথুরাসন্নিহিতদেশঃ।' ভাগবতেও দেখি :

শূরসেনো যদুপতি মথুরামাবসন্ পুরীম্।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা।

ভোজরাজের সরস্বতীকণ্ঠাভরণেও শৌরসেনী পাওয়া যায়—

পৈশাচ্যা শৌরসেন্যা চ মাগধ্যান্যা নিবধ্যতে।
ন্যূনাতিঃ কোঽপি ভাষাভিঃ সর্বাভিরপি কশ্চন॥

'প্রাকৃতসর্বস্ব'-রচয়িতা মার্কণ্ডেয়ের মতে ভাষা যে পাঁচভাগে বিভক্ত তাঁহার মধ্যে শৌরসেনী অন্যতম। (১) মহারাষ্ট্রী, (২) শৌরসেনী, (৩) প্রাচ্যা, (৪) অবন্তী, (৫) মাগধী।

বররুচিমতে ভাষা চারপ্রকার—(১) প্রাকৃত, (২) পৈশাচী, (৩) মাগধী, (৪) শৌরসেনী। প্রাকৃতপ্রকাশের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে টীকা করিতে গিয়া ভামহ লিখিতেছেন; "শূরসেনানাং ভাষা শৌরসেনী"। বররুচি শৌরসেনীর উৎস নির্দেশ করিলেন সংস্কৃতকে—'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্'। ভামহ ইহাকে বিশদ করিলেন; 'শৌরসেন্যাং যে শব্দাস্তেষাং প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্'; অর্থাৎ শৌরসেনী প্রাকৃতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর প্রকৃতি বা উদ্ভবস্থল হইল সংস্কৃত।

আচার্য হেমচন্দ্র যে ছয়প্রকার প্রাকৃতের নাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে শৌরসেনী অন্যতম। প্রাচীনভারতে শৌরসেন অঞ্চল সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। তাই স্বাভাবিক

মুনি ভরত নাট্যে মহারাষ্ট্রীর উল্লেখ না করিয়া শৌরসেনীর উল্লেখ করিয়াছেন—'শৌরসেনং সমাশ্রিত্য ভাষা কার্য্যন্তু নাটকে'।

নারী, বিদূষক, অশিক্ষিত শিশু-পুরুষ, অসুস্থ লোকের ভাষারূপে শৌরসেনীকে দেখা দেখা গেলেও ব্যতিক্রম আছে। প্রধানতঃ ইহার গদ্যে ব্যবহৃত। যাযাবর রাজশেখর-প্রণীত সট্টক 'কর্পূরমঞ্জরী'-র নায়ককে শৌরসেনী প্রাকৃত ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। বিস্তৃত নাট্যচর্চিতা ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা'-র ব্যবহৃত প্রাকৃত হইল শৌরসেনী। কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত শৌরসেনী প্রাকৃত ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতের নিকটবর্তী। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখিলেন—

পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্।
শৌরসেনী প্রযুক্তব্যা তাদৃশীনাং চ যোষিতাম্।

শিক্ষিত, উত্তম ও মধ্যমশ্রেণীর পুরুষপাত্রগণের নাট্যভাষা সংস্কৃত। এইরূপ স্ত্রীগণের নাট্যভাষা হইবে শৌরসেনী প্রাকৃত। বিশ্বনাথ আরো লিখিতেছেন—

চেটীনামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা।
বালানাং যত্তকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিনাম্॥

উৎকৃষ্ট পরিচারিণীগণের নাট্যভাষা হইবে শৌরসেনী। বালক, নপুংসক, নীচগ্রহবিচারিদের ভাষা হইবে শৌরসেনী।

সাহিত্যদর্পণের বিখ্যাত টীকাকার পণ্ডিত রামচরণ তর্কবাগীশ এই অংশের ব্যাখ্যা করিতে লিখিলেন : 'অনীচানাবুৎকৃষ্টচেটিনাঞ্চ শৌরসেনী। গ্রহবিচারিণঃ দৈবজ্ঞাঃ। তৈব শৌরসেনী এব'। এখন প্রশ্ন—চেটী বা পরিচারিণী, বালক, নপুংসক ইত্যাদির ভাষা শৌরসেনী হইলেও গ্রহের শুভাশুভ বিচারপটু দৈবজ্ঞের শৌরসেনী ব্যবহারের কারণ সম্যক্ উপলব্ধ হয় না। আরও উপলব্ধ হয় না গ্রহবিচারকের পূর্বে ব্যবহৃত 'নীচ' শব্দের ব্যবহৃতির প্রয়োজন। মানবজীবনের শুভাশুভ ফলনির্দেশক, গ্রহ নক্ষত্রাদির বিষয়ে কুশলী দৈবজ্ঞ, বেদ গণিত প্রভৃতিতে নিষ্ণাত হইবেন—ইহাই যথার্থ। ভারত-সংস্কৃতির একদা কেন্দ্রভূমি শূরসেন-মথুরার জনপ্রিয় ভাষা শৌরসেনী দৈবজ্ঞের ভাষা হইতে পারে কেবল জনসংযোগ রক্ষার্থে। দেবভূমি ভারতবর্ষের জনসাধারণের দৈব-বিশ্বাস ছিল অগাধ। এই কারণে সমাজে দৈবজ্ঞের প্রয়োজন ছিল অনেক। তাই সম্ভবতঃ দৈবজ্ঞকে সংস্কৃতে-বুৎপন্ন হইয়াও শৌরসেনী ব্যবহার করিতে হইত।

History of Bengali Language-গ্রন্থে B. C. Mazumdar লিখিতেছেন : "It appears that the artificial get up standard prakrita obtained the name শৌরসেনী in the নাট্যশাস্ত্র as perhaps the seat of Northern culture was transferred in the days of the Natya Sastra from Magadha to the country watered by the Jamuna, it seems that for similar reasons the standard prakrita acquired the name মহারাষ্ট্রী in the days of Vararuchi'.

শূরসেন বা মথুরা একদা ভারতসভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি হইয়াছিল। তাই সেখানকার জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষাও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। আধুনিক ভারতীয়-ভাষাসৃষ্টিতে শৌরসেনীর দান কম নয়।

●

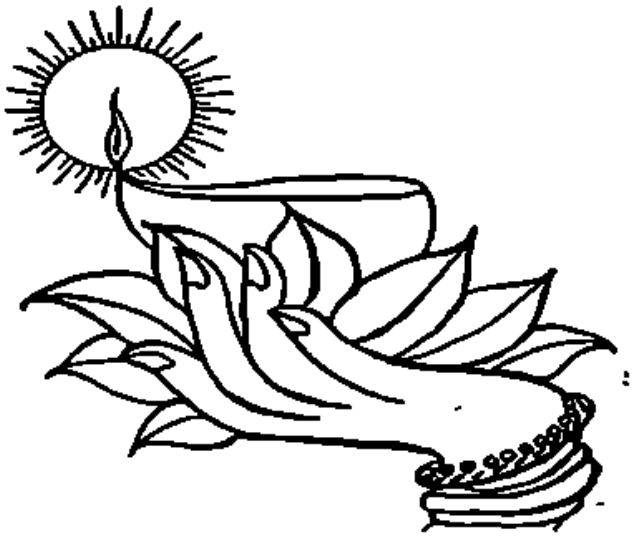

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

য়ুরোপীয় চিত্রশৈলী : অধিবাস্তব (সুররিয়ালিষ্ট) চিত্রকলা প্রসঙ্গে

(এক)

ফ্রান্সের তিন কবি লুই আরাগ, আন্দ্রে ব্রেটন এবং ফিলিপ সউপল্‌ট্ নতুন করে আবিষ্কার করলেন ইসিডোর ডুকাস্-এর রচনা 'কাউন্ট অব্ লট্‌রিমেন্ট'। সময়টা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। কাউন্ট অব্ লট্‌রিমেন্ট রচিত হয়েছিলো তখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। ডুকাস্-এরই লেখা 'চ্যান্টস্ ভি ম্যালডোরো'তে ব্রেটন খুঁজে পেলেন অবচেতন মানসের এক সাহিত্যিক প্রকাশ। চ্যান্টস্ ভি ম্যালডোরো পড়ে ব্রেটন এবং সউপল্‌ট্ এমনই অভিভূত এবং প্রভাবিত হয়ে পড়লেন যে, তাঁরা ডুকাস্-এর রচনাভঙ্গীর অনুসরণে যুগ্মভাবে রচনা করলেন 'লা চ্যামপ্‌স্ ম্যাগনেটিক্‌স্'। এই লা চ্যামপ্‌স্ ম্যাগনেটিক্‌স্-এর রচনার মাধ্যমে সূচিত হলো য়ুরোপীয় সাহিত্যে সুররিয়ালিজম্-এর পদক্ষেপ।

এর কিছুদিন আগে ভিয়েনার ডক্টর সিগমুণ্ড ফ্রয়েড্ মনঃসমীক্ষার মাধ্যমে নির্জ্ঞান মন এবং স্বপ্নের অর্থ বিশ্লেষণ করে সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল মহলে আলোড়ন এনেছেন। লা চ্যামপ্‌স্ ম্যাগনেটিক্‌স্-এর রচয়িতাদের ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো, তাতে সন্দেহ নেই। তৎকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্যের মতো চিত্রকলায়ও বিশেষ প্রভাব ফেললো ফ্রয়েডীয় মতবাদ। প্যারিসের দুই চিত্রকর জর্জিয়ো ডি চিরিকো এবং মারসেল ডুকাম্প-এর চিত্ররচনায় শিল্পীদ্বয়ের নির্জ্ঞান মনের যে-প্রতীকী ব্যঞ্জনা দেখা গেলো, তা সাহিত্যক্ষেত্রে লা চ্যামপ্‌স্ ম্যাগনেটিক্‌স্-এর প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। য়ুরোপীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। শিল্পীর চিত্রপটে রঙ ও রেখায় প্রতিফলিত হলো নির্জ্ঞান মনের প্রতীকী ব্যঞ্জনা।

য়ুরোপীয় চিত্রকলায় কিউবিজম্ রীতির সূচনা এবং প্রসারের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে আবির্ভাব ঘটলো বিমূর্তশিল্প অথবা এ্যাবষ্ট্রাক্ট্ আর্ট-এর। এ্যাবষ্ট্রাক্ট্ রীতির প্রবর্তক চিত্রকর

ক্যাণ্ডিন্স্কি। ক্যাণ্ডিন্স্কি-এর প্রবর্তিত এ্যাবষ্ট্রাক্ট্ রীতি তৎকালীন বেশ কিছু চিত্রকরকে প্রভাবিত করলো। ফলে এই চিত্রকরদের চিত্ররচনায় পরিচিত দৃশ্যজগতের বিলুপ্তি ঘটতে লাগলো। ইতিপূর্বে গুস্তভ মোরো এবং গর্গ্যার চিত্ররচনায় প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তাঁদের অঙ্কিত চিত্র পরিচিত দৃশ্যজগৎবর্জিত হয়নি। ইতিমধ্যে চাগাল এবং পল ক্লি-র মতো চিত্রকরদ্বয়ের আবির্ভাবে য়ুরোপীয় চিত্রকলা নতুন দিকে মোড় নিলো। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আন্দ্রে ব্রেটন যে-উক্তি করেছিলেন, সে-উক্তি প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলো। ব্রেটন বলেছিলেন, 'যদি দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পকলা মানবিক মূল্যবোধের কোনোরকম পরিশোধন করতে সক্ষম হয়—তবে তা হবে ভবিষ্যতে কেবলমাত্র অন্তঃস্থিত বিষয়বস্তুর প্রকাশের মাধ্যমে। অন্যথায় এর (দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পকলার) অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে'।

চিরিকো এবং ডুকাম্প চিত্ররচনায় পুরোপুরিভাবেই অন্তর্জগতের বিষয়বস্তুকে তুলে ধরছিলেন। ইতিমধ্যে জার্মান চিত্রকর ম্যাক্স আর্নষ্ট্ চিরিকো-র আঁকা ছবির সঙ্গে পরিচিত হলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আর্নষ্ট প্রথম স্যুররিয়ালিষ্টিক 'কোলাজ' আঁকেন। কোলাজটির নাম 'প্রিপারেশন অব্ বোন্ ম্যু'। ম্যাক্স আর্নষ্ট্-এর কোলাজ সমকালীন স্যুররিয়ালিষ্ট চিত্রকরদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত করে ফেললো। এই চিত্রকরদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ম্যাগ্রিট এবং টীব্ক্কি।

কোলাজ-কে স্বতঃলিখনের (automatic writing) সঙ্গে তুলনা করা যায়। বলা যেতে পারে, নির্জ্ঞান মানস থেকে ভেসে ওঠা বাক্যাংশের বিণ্যাসই স্বতঃলিখন। কোলাজ-চিত্রেও কোন বিষয়বস্তুর টুকরো টুকরো অংশ একটি পরিসীমার মধ্যে বিণ্যাসিত হয়ে থাকে। তাই কোলাজকে বলা যেতে পারে স্বতঃচিত্রণ। স্বতঃচিত্রণের ভাবধারা যে-দুই চিত্রকর প্রচার করেছেন—তাঁদের নাম লিসেজ্ এবং ক্রেপিন্। লিসেজ্ এবং ক্রেপিন্ বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা বিদেহী আত্মার নির্দেশে চিত্ররচনা করেন। ক্যাণ্ডিন্স্কি-র আঁকা কিছু চিত্রও স্বতঃচিত্রণের পরিচয় বহন করে। এই চিত্রগুলো তিনি আঁকেন ১৯১০ থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে। স্বতঃচিত্রণের প্রসঙ্গে নাম উল্লেখ করতে হয় চিত্রকর এবং ভাস্কর হান্স্ আর্প-এর। এঁর আঁকা ছবিতে দেখা যায় স্বতঃচিত্রণের ছাপ। স্যুররিয়ালিষ্টিক ধারার এক প্রতিভাবান চিত্রকর জন মিরো স্বতঃচিত্রণ রীতিতে অঙ্কিত কিছু চিত্র প্যারিস-এর প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করলে ওই চিত্রগুলো তৎকালীন চিত্রকর এবং সমালোচক মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। আন্দ্রে ব্রেটন মিরো-র আঁকা ছবি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'তাঁকে (মিরো-কে) সঙ্গতভাবেই স্যুররিয়ালিষ্ট চিত্রকরদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। মিরো-র চিত্রে অন্তঃচৈতন্যের যে-রূপ প্রতিফলিত হয়েছে, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে তা হয়তো শিল্পীর দুঃস্বপ্নের বীভৎস প্রকাশ বলে মনে হবে। কিন্তু অভিজ্ঞ এবং রসজ্ঞ দর্শকের চোখে মিরো-র অঙ্কিত চিত্রগুলো শিল্পীর উদ্দাম ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের মৌলিক প্রকাশ বলেই প্রতিভাত হয়েছে। মিরোর সমসাময়িক অপর এক স্যুররিয়ালিষ্ট চিত্রকর ছিলেন ট্যান্গাই। স্বতঃচিত্রণ রীতিতে ট্যান্গাই যে-চিত্রগুলো এঁকেছেন—সেগুলোতে এক অদৃষ্টপূর্ব স্বপ্নিল জগৎ স্থির হয়ে আছে।

স্প্যানিশ চিত্রকর সালভেডর ডালি সুররিয়ালিষ্টিক ধারায় চিত্ররচনা সুরু করেন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। এ্যাকাডেমিক রীতিতে ড্রইং এবং পেন্‌টিং-এ দক্ষ চিত্রকর ডালি-র ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রতি যে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে, তা তাঁর অঙ্কিত চিত্র দেখলেই বোঝা যায়। এঁর আঁকা কোনো কোনো চিত্রে রয়েছে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আভাস। কিন্তু শিল্পী-অঙ্কিত অধিকাংশ চিত্রে অভিজ্ঞ দর্শকের চোখে যা ধরা পড়বে—তা হলো প্রধানতঃ শিল্পীর অবচেতন মনের বিকৃত কামনার প্রতিফলন। ডালি-র অঙ্কিত বহুসংখ্যক চিত্রে একই বস্তু অথবা প্রাণীকে প্রতীকরূপে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে পাউরুটি, সিংহ অথবা ভাঙ্গা ডিম, পিঁপড়ে ইত্যাদি। ডালি অল্পকালের মধ্যেই সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকররূপে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। মতাদর্শের ভিন্নতার জন্যে পরবর্তীকালে ডালি অন্যান্য সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকরদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

যে-মতাদর্শে অধিকাংশ সুররিয়ালিষ্ট লেখক এবং চিত্রকর বিশ্বাস করতেন—তা হলো মানুষের চিন্তা এবং অভিব্যক্তির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। সুররিয়ালিষ্ট লেখক এবং চিত্রকরদের রচনা ও চিত্রে ওই মতাদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

—দিবাকর সেনরায়

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

বীরবাণী—(স্বামী বিবেকানন্দ-বিরচিত সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী কবিতা-সংগ্রহ), প্রকাশক—শ্রীযশোদাকান্ত রায়, সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ১৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য—চার টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন যুগের প্রয়োজনে। দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকা সর্বত্রই প্রসারিত হয়েছিল তাঁর মঙ্গল-হস্তের শুভাশীর্বাদ। মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য ; আর এই উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যেতে মানুষকে তিনি দান করেছেন সর্বস্ব। কোন একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ করা যায় না। যে বিরাট শক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন তা বিকশিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন কর্মে, সাধনায়, সাহিত্যে, ধর্মে, দর্শনে। তাঁর অমর বাণীগুলি আমাদের চিরন্তন সম্পদ। বিশ্বের অভিবড় ধর্ম-সমালোচকও তাঁকে গ্রহণ করেছে। আজ ভারতের এমন সময়, যখন বিবেকানন্দের আদর্শকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। তাঁর বাণী আমাদের হতাশায় যোগাবে আশা, ক্লান্তিতে যোগাবে শক্তি, অন্ধকারের মধ্যেও দেখাবে আলোর দিশা।

বিবেকানন্দ সোসাইটি এই কর্মেই নিরত। অনলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা স্বামীজীর সাধনাকে প্রসারিত করবার জন্তে। "বীরবাণী"র প্রকাশ তারই একটি দিক। স্বামীজীর বিভিন্ন কবিতাগুলিকে সংগ্রহ করে ১৯০৪ সালে প্রথম বীরবাণী প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণে 'বীরবাণী'র কলেবর আরও প্রসারিত হয়েছে নতুন কয়েকটি কবিতা সংযোজনের ফলে।

ইংরেজী ও সংস্কৃত কবিতাগুলি যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা একটি অসাধ্য সাধন করেছেন বলা যায়। দিব্যদৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন স্বামীজী তারই প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে—কবিতারও। সুতরাং সেই পথের পথিক না হলে এ-রস নিষ্কাসন সম্ভব হতো না।

কবিতা লেখার উদ্দেশ্যেই কবিতা লেখেননি স্বামীজী। বিশ্বস্রষ্টার মহান্ কবিত্বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মধ্যে থেকে অতি স্বাভাবিকভাবে। সুতরাং কবিতাগুলি চিরন্তন, এর ভাবধারা স্বর্গীয়। অনাদি-অনন্তকাল ধরে তা বিশ্ববাসীকে অনুপ্রেরণা যোগাবে, আনন্দ দেবে।

বিবেকানন্দ সোসাইটি এই কবিতা সংগ্রহের একটি সুলভ সংস্করণ সাধারণের হাতে এনে দিয়েছেন। কবি-বিবেকানন্দকে তাঁরা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন মানুষের কাছে। এ-জন্ত কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারা যায় না। পুস্তকটির প্রচার যত করবে ততই মানুষের কল্যাণ।

কবিতাগুলির সময় ও কাল নিরূপণ এবং কখন কিভাবে কি পরিবেশে স্বামীজী এগুলি লিখেছেন তার কোন ধারাবাহিক বিবরণী প্রকাশ করা সম্ভব কি না জানতে ইচ্ছা করে। পরবর্তী সংস্করণে, পরিশিষ্টে, কোন নিবন্ধ সংযোজিত করবার কথা সোসাইটি-কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

যষ্টিমধু—(বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৮৬ সংখ্যা) বনফুল প্রণীত, সম্পাদক—শ্রীকুমারেশ ঘোষ। মূল্য—চার টাকা।

বাংলা সাহিত্যের এক দিক্‌পাল বনফুল আর ইহজগতে নেই। চলে গেলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে দিয়ে গেলেন অনেক কিছু। কবিতা, উপন্যাস, গল্প প্রতিটিক্ষেত্রে জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত তিনি নবনব সৃষ্টিতে ভরপুর করে তুলেছিলেন। আরও কিছুদিন থাকলে হয়ত আরও কত কি মূল্যবান সৃষ্টি আমরা পেতাম। কিন্তু কেউতো আর পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হবে না। আসা-যাওয়া এই নিয়েই তো খেলা। বিশ্বস্রষ্টার প্রয়োজনে সৃষ্টি, আবার তাঁরই ইচ্ছায় লয় এবং স্থিতি।

হতাশা, দারিদ্র, সমস্যা, জটিলতায় সবসময়ই আমাদের জর্জরিত করছে। কিন্তু এরই মধ্যে কেউ কেউ আসেন আনন্দ আর আশার বাণী বহন ক'রে। এঁদের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু তাঁরাই ধ'রে রেখেছেন সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টিকে। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-জীবন, পার্থিব-অপার্থিব, জীবন ও আত্মার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা যেন মরুভূমিতে শীতল জলের মত বারিসিঞ্চন করেন। এইরূপ একজন মহান পুরুষ বনফুল,—যিনি সৃষ্টি করেছেন, আনন্দ দিয়েছেন। এঁদের জানা দরকার। যে আনন্দ-ধারা তিনি বহিয়ে গেলেন তার ঢেউ চলবে অনেক দিন। আমরা অনুপ্রেরণা লাভ করবো। বেঁচে থাকবো। চলার পথে এগিয়ে যাব।

এই উদ্দেশ্যে 'ঘণ্টাধ্বনি' বর্তমান সংখ্যাটি অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে। মানুষের কল্যাণ-কামনাই এর উদ্দেশ্য। শ্রীকুমারেশ ঘোষ নিজে সাহিত্যিক, কবি-গুণীজন। তাঁর এই মহান্ উদ্দেশ্য প্রশংসার যোগ্য। বর্তমান সংখ্যায় বনফুল সম্পর্কে প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও গুণীজনের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়েছে। যাঁরা তাঁর সঙ্গে একান্তভাবে মিশেছেন তাঁদের রচনা মানুষ-বনফুলকে জানতে সাহায্য করবে। সৃষ্টির পশ্চাদপটে কোন্ অনুপ্রেরণা কোন্ চিন্তা-ভাবনা ইন্ধন যুগিয়েছে নিশ্চয়ই তা আমাদের জানতে ইচ্ছা করে। আর জীবনের প্রয়োজনেও লাগে তা।

বনফুলের কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনা পুস্তিকাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। তাঁর রোজনামচার কিয়দংশ প্রকাশ ক'রে সম্পাদক বর্তমান সংখ্যাটিকে আরও মূল্যবান ক'রে তুলেছেন।

—রমণীরঞ্জন পোদ্দার

●

॥ সংঘবার্তা ॥

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবার নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় নানান্ দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল্'-এর উপরে (দ্বিতলে) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারেও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রসারতাকে ত্বরান্বিত করবে। ইতি—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সম্পাদক
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

স্বীকৃতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

	দাতার নাম	টাকা
৭৩৪।	ডাঃ বিনোদ বিহারী ঘোষ, "সরলা ভবন" সেনপাড়া, পোঃ + জেলা—জলপাইগুড়ি। (গৃহনির্মাণকল্পে) ...	৪০০·০০
৭৩৫।	শ্রীকালীশঙ্কর বসু ১৪।সি।২, নলিনী সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৪ (গৃহনির্মাণকল্পে) ...	২৪১·০০
৭৩৬।	ডাঃ বিমলচন্দ্র বসাক ১৭বি, মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৪ (গৃহনির্মাণকল্পে)	১০১·০০
৭৩৭।	শ্রীপঞ্চানন মিত্র ১৭৮, অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৭০০০৬ (গৃহনির্মাণকল্পে) ...	১০০·০০
৭৩৮।	শ্রীপ্রবোধ কুমার মুখার্জী, বালিটিকুড়ি গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্স্ পোঃ—বালিটিকুড়ি, হাওড়া (মেরামতি কাজের জন্য) ...	৮·০০
৭৩৯।	শ্রীদমরেন্দ্রকুমার ঘোষ c/o মেসার্স ষ্টীল ষ্টীরোলিং কোং ৪০সি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০০১৬ (গৃহনির্মাণকল্পে)	৪·০০
৭৪০।	শ্রীমতী শক্তি ঘোষ, কলিকাতা (মেরামতি কাজের জন্য)	৩·০০
৭৪১।	শ্রীযশোদাকান্ত বরুয়া, ষ্টপিক্যাল ক্লিনিক পোঃ—হোজাই, নওগাঁ, আসাম (মেরামতি কাজের জন্য) ...	৫·০০

●

অখণ্ড বিশ্বাস

প্রথম ও শেষ কথা

যে কোন জনকল্যাণ সংস্থার পক্ষে এই বিশ্বাস অপরিহার্য।

নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই বিশ্বাস অর্জন করা অসম্ভব। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এই মহানগর। সেখানে প্রথম ভূগর্ভ রেল তৈরির কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত অজস্র কর্মী। আপনাদের এই অখণ্ড বিশ্বাসে তাঁরা আজ অনুপ্রাণিত।

আপনাদের সক্রিয় সমর্থনই আমাদের অগ্রগতির মূলমন্ত্র। এই সমর্থনেই আমাদের কাজের গতি আজ দ্রুততর, সুদূরের স্বপ্ন নিকটতর। প্রয়োজনীয় অর্থের আনুকূল্যে প্রায় সর্বত্রই আমরা কর্মতৎপর। শেষ লক্ষ্যে অব্যাহত গতি।

বিশ্বাস ও সমর্থন এমনি করেই অসম্ভবকে সম্ভব করে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে দূরতম স্বপ্ন নিকটতর হয়ে মধুর বাস্তবে পরিণত হয়।

কলকাতার নতুন যানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ রেল

মেট্রো রেল, কলকাতা

medium

ফোন : ৪৫-৭১০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স

৮১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একসুরে বাঁধা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

'... বেঁধেছি
আমার প্রাণ
সুরের বাঁধনে'

ডানলপ ইণ্ডিয়া
দেশের শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে
এতোরাত্র ঠিক সুরটি বাজিয়ে
যাবার চেষ্টা করছে।
পরিবহন, কৃষি, শিল্প,
প্রতিরক্ষা ও রপ্তানির
ক্ষেত্রে ভারতকে
এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে
ডানলপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডানলপ ইণ্ডিয়া
প্রগতির পথিকৃৎ

শতপ্রতিষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া— কুষ্ঠ-কুটীর

সর্ব্বজনসমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

অসাড়কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, মাংসপেশীর দুর্বলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসালয়ে অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত রোগের জন্য যাঁহারা সর্বচিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর পি, বি, ৭, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৫১)

শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। গৌরকথা (১ম—৩য়) ১ম খণ্ড ৪·০০ ২য় খণ্ড ৪·০০ ৩য়-৫·০০
৩। চণ্ডীচিন্তা ৪·০০
৪। উদ্ধব-সন্দেশ ৫·০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কন্ধ (২য়-৫ম) ৫২·৫০
৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ ৫·০০
৭। উপনিষদ্-ভাবনা (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—
১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫১, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিস্যুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অনূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অদ্বৈতানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহিত ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ২০·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৪·০০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ৪·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	৫·০০
বীরত্বে বাঙালী	৪·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০
বাংলার ঋষি	৬·৫০
বাংলার মনীষী	৩·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০
ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৮·০০

(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization		Why a Hindu Accepts Christ and	
Philosophy and Religion		Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music
by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Published by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R N 13733/57
81st Year, August 1979
VOL VI

Regn No WB NC/94
PHONE 55 1800

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

কুক্‌মী

ভারতের সেরা

গুঁড়া মশলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুক্‌মী প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (ক্ষাইস) প্রাইভেট লিঃ

২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

ফোন-৩৩-০১১০

PRICE Rs. 1·50 Ramakrishna Vedanta Math.
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

মূল্য ১৫০ টা

স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

একচল্লিশ বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা
ভাদ্র
১৩৮৬

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

সদ্য প্রকাশিত হইল।

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সমৃদ্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে
মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
প্রকাশন বিভাগ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৫৫-১৮০০

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	১৪·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা		হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ		স্তোত্র-রত্নাকর	
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	৪.০০	আত্মজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ (৫ম নূতন সংস্করণ)	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ		কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ		তীর্থরেণু (বর্ধিত ২য় সং)	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৫·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্ধ	যন্ত্রস্থ
ঐ (৪র্থ ভাগ) প্রকাশের অপেক্ষায়			
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা	১০·০০	পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	·৬০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চায়েলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৮-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

ভারতীয় পেটেন্ট পীড়াহর

ভাঃ সেনেক্স

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।
১০১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০ নং বিধান সরণী, হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন · ৫৫-২৫৪৯) ৫৫-৬৫৬৫

GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4652

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

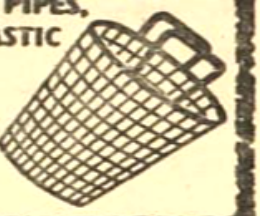

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

ভাদ্র, ১৩৮৬

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

। উপদেষ্টামণ্ডলী ।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

। সহায়কমণ্ডলী ।

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ

শ্রীদেবাশীষ হোড়

শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশস্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :

ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ

শ্রীরথীরঞ্জন পোদ্দার

। প্রচ্ছদপট শিল্পী ।

শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়

মুদ্রণ :

শ্রীসুবের দত্ত

দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস

৬ নং ডাক্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৯ ।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবতগীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.

(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C I. Plain Ended Fitings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office ;—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা তিল তৈল

বিশুদ্ধ ও সুগন্ধিকৃত তিল তৈল বহুকাল প্রস্তুত
গার্হস্থ্য শিল্পোদ্যমে প্রতিষ্ঠিত

অর্দ্ধশতাব্দীর প্রসাদধন্য গার্হস্থ্য শিল্প

ফোন নং ৪৬-৮৯৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, আশুতোষ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০২৫
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • গয়াবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

ভাদ্র, ১৩৮৬

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। বাণী ও বিচার	২৪১	
২। বিংশ শতাব্দীর ধর্ম—স্বামী অভেদানন্দ (অনুবাদ)	২৪৭	শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২৫০	স্বামী প্রভানন্দ
৪। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধর্ম ও স্বামী অভেদানন্দ	২৫৫	শ্রীমিহিরলাল দত্ত
৫। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	২৬২	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৬। সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	২৬৪	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৭। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাঙ্গনে : পণ্ডিত পদ্মলোচন	২৬৭	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৮। দক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে	২৭১	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
৯। শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	২৭৪	
১০। সংঘবার্তা	২৭৮	

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMEO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

89, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

একচল্লিশ বর্ষ | সপ্তম সংখ্যা | ভাদ্র ১৩৮৬

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ বিজয় গোস্বামীর প্রতি উপদেশ ॥

(দুই)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "অসৎলোকের বাঘ-ভাল্লুকের স্বভাব, তেড়ে এসে অনিষ্ট করবে" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮৮)। সৎলোক ও অসৎলোক—সমগ্র বিশ্বসমাজে লোকের দু'টি ভাগ এবং দুটি ভাগকে অবলম্বন ক'রে সকলদেশের সকল সমাজেই ভাল-মন্দ লোকের, ভালমন্দ কর্মের, ভাল-মন্দ চিন্তা প্রভৃতির বিকাশ দেখা যায়—যেজন্য সকল সমাজেই ভাল-মন্দ উভয় পরিবেশই দ্বন্দ্ব-মিলনের পরিবেশ সৃষ্টি করে, ফলে শান্তি ও অশান্তি—সৃষ্টি ও ধ্বংস-লীলার অভিনয় সমাজ-পরিবেশ ও সমাজ-মনকে অমৃতময় বা বিষাক্ত করে। তবে এই ভাল-মন্দ বা ভাল-মন্দের প্রকৃতি ও পরিবেশই আবার পৃথিবীতে স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টি করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পার্থিব-সংসারের পথচারী হলেও অপার্থিব-রাজ্যেরই অধিবাসী, এজন্য স্বর্গ ও মর্ত্য—অপার্থিব ও পার্থিব উভয় রাজ্যের সকল ঘটনা ও রহস্যই তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষে প্রতিভাত। তিনি সেজন্য মানবসমাজের ভাল বা কল্যাণময় যতকিছু সে' সম্বন্ধেও যেমন অভিজ্ঞ, মন্দ বা অকল্যাণময় সমাজবাসীরও সমাজসামগ্রীর খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তেমনি অভিজ্ঞ।

কথাপ্রসঙ্গে তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসারের কতকগুলি জন্তু ও মানুষের কাছ বা সঙ্গ থেকে সাবধান হতে বলেছেন সংসারী মানুষদের। তিনি বলেছেন : "এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান থাকতে হয়।

"(১) প্রথম, বড়-মানুষ। টাকা লোকজন অনেক, মনে করলে তোমার অনিষ্ট করতে পারে, তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বললে সায় দিতে হয়।

(২) তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে—কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ ক'রে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়।

(৩) তারপর ষাঁড়। শুঁতুতে এলে তাকেও মুখের আওয়াজ ক'রে ঠাণ্ডা করতে হয়।

(৪) তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন—বলে গালাগালি দিবে। তাকে বলতে হয়—'কি খুড়ো, কেমন আছ? তাহলে খুব খুসি হয়ে তোমার কাছে বসে তামাক খাবে'।"

সাংসারিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের জ্ঞান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে ছিল অসাধারণ। প্রচলিত ভাষায় ও এমন কি অনুন্নত পাড়াগেঁয়ে গ্রাম্য ও কথ্যভাষায় সাহিত্যরচনায়ও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর চলিত ও সাধারণ গ্রাম্য ও কথ্য-ভাষা সাধারণ গেঁয়ো-মানুষের প্রাণে যেমন আনন্দের ও শান্তির স্তোতনা দিত—তেমনি স্তোতনা ও প্রেরণা দিত অসাধারণ অপার্থিব-পথের মানুষকে; আবার ভাষা ও স্তোতনার ক্ষেত্রে রূপভেদ থাকলেও আনন্দসংকেত বা আনন্দপ্রেরণা ছিল উভয়ের মধ্যে একটু ভিন্ন ধরনের, তবে যথার্থ-আনন্দের হাটে উভয় আনন্দ-সংবেদন এক ও অভিন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাহিত্যজগতে সহিত-ত্ব ও সর্বমানুষের সঙ্গে মিলনমাধুর্য কী ধরনের ছিল তার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'-গ্রন্থে। তিনি বলেছেন: "সাহিত্য মানে কি? সাহিত্য মানে সহিত-ত্ব। সাহিত্যের মধ্যে যে তত্ত্বটি নিহিত আছে সেটি হচ্ছে 'সহিতে'-র তত্ত্ব, মানে মিলিত হওয়া—সংযুক্ত হওয়ার তত্ত্ব। কিন্তু কার সঙ্গে মিলন? কার সঙ্গে সংযোগ?

"উত্তর বিশেষ কঠিন নয়। সমস্ত জীব-জগতের সঙ্গে, সমস্ত সংসার-সৃষ্টির সঙ্গে, সমস্ত প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে। যা-কিছু দৃশ্য জ্ঞেয় স্পৃশ্য গ্রাহ্য ভোগ্য আস্বাদ্য—সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে। গম্য ও গোচর—স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষের সঙ্গে। শুধু স্বসংবেদ্য জিনিসের সঙ্গেই নয়, মানে—আত্মসুখ বা আত্মক্রীড় বা আত্মরতির সঙ্গেই নয়, এই অন্তরঙ্গতা পরসংবেদ্য জিনিসের সঙ্গেও। তার মানে, আমার আশে-পাশের প্রতিবেশী মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা উত্থান-পতন বঞ্চনা-বিক্ষোভের সঙ্গে। এই সংসর্গ প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি মুহূর্তকণা, সংসারসমুদ্রে ঘটনা-তরঙ্গের—প্রতিটি ফেনকণার সঙ্গে। বিশ্বসৃষ্টিতে কিছুই যেমন পরিত্যক্ত হয়নি, উপেক্ষিত হয়নি, সাহিত্যেও তেমনি সমগ্রের জন্যে সমুদয়ের জন্যে উদার-নিমন্ত্রণ প্রসারিত। ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্য মেধ্য-অমেধ্য সকলের জন্যে সমান ছায়াসত্র। অভিজাত-অপজাত, কুলীন-অকুলীন, পাঙক্তেয়-অপাঙক্তেয় সকলের জন্যে নিরপেক্ষ গণতন্ত্র। যেমন সৃষ্টিতে তেমনি সাহিত্যেও পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজ, কামের সঙ্গে প্রেম, বাসনার সঙ্গে বৈরাগ্য। মোটকথা, জীবনের বীণায় যত সুর ওঠে—কড়িতে আর কোমলে, ধৈবতে আর গান্ধারে—সমস্ত সুরের সম্পূর্ণতা এই সাহিত্যে। সাহিত্য কিছুই বর্জন করে না, অস্বীকার করে না, পরিহার করে না, প্রত্যাখ্যান করে না—না ব্যক্তিতে, না সমাজে। খণ্ডকালের সমস্ত খণ্ডতা, সমস্ত কর্মবাহিতার দিকে সে চোখ রাখে। ঘটনার সঙ্গে সে পা মিলিয়ে চলে, সমাজ-সম্বন্ধে সে সক্রিয়-সচেতন হয়, ইতিহাস-সম্বন্ধে সে জাগ্রতদৃষ্টি উদ্যতমুষ্টি

হয়ে ওঠে। সে শুধু কালিতে কলম ডুবিয়ে লেখে না, সে লেখে ঘেমে ক্লেদে শোণিতে কলম ডুবিয়ে। যারা লেখনিক তারা সৈনিক, আর এই অমোঘ লেখনীই তাদের হাতের অব্যর্থ অস্ত্র। শাণিত শায়ক।

"কিন্তু এইখানেই কি সাহিত্যের শেষ? এইটুকুই কি সাহিত্যের পরিধি? না আরো আছে।.....তাই আবার 'সহিত'-র চাই ইন্দ্রিয়াতীতের সঙ্গে, চিরন্তনের সঙ্গে, সনাতনের সঙ্গে। নিত্য-এষ-নির্বিকল্পের সঙ্গে। শুধু ভূমিকে আশ্রয় ক'রে থাকলেই চলবে না, আশ্রয় করতে হবে ভূমাকে। শুধু গম্য ও গ্রাহ্যকে নিয়ে থাকলেই চলবে না, যেতে হবে গোপনের দিকে গভীরের দিকে, গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠের দিকে। ইদানীন্তনের সঙ্গে মেশাতে হবে চিরন্তন। যা ইদানীন্তন তা হচ্ছে সংবাদ, যা চিরন্তন তা-ই সত্য। আর, সাহিত্য শুধু সংবাদ নয়, শুধু সত্যও নয়—দুয়ে মিলে সাহিত্য হচ্ছে সত্যের সংবাদ। এই সত্যের সংবাদটি যিনি সুন্দরের থালায় পরিবেশন করবেন তিনিই কবি।"[১]

সেজন্যই বলি—যিনি কঠিনকে সরল ক'রে, গ্রাম্য ও কথ্য ভাষাকে অভিজাত ক'রে ও অর্থযুক্ত ক'রে সাধারণ্যে পরিবেশন করেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণই নূতন সাহিত্যের পরিবেশক। সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন: "যিনি সকলের চেয়ে সত্য, তাঁকে সকলের চেয়ে সহজ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন সুন্দর ক'রে। রসাত্মক বাক্যের সহযোগে। সুষমান্বিত বিন্যাসে, অফুর একটি অর্থের দ্যোতনায়।"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হতে বলেছেন—বড় মানুষ, কুকুর, ষাঁড়, ও মাতাল। বড়লোক টাকায় বড়লোক। তবে আভিজাত্যে ও সম্মানেও আছে বড়লোক। সে বড়লোকে বড় অন্যায় করে না, কেননা অনেক সময়ে বিচারবুদ্ধি ও উন্নত দৃষ্টি তাঁর মধ্যে থাকে। কিন্তু টাকায় যারা বড়লোক তারা অনিষ্ট করতে পারে, কারণ মেজাজ তাঁদের বেশ উঁচু সুরে বাঁধা, তাই বিবেক-বিচারের দিকে অনেক সময়ে তারা থাকে অন্ধদৃষ্টি। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বলেছেন: "তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বল্লে—সার দিয়ে যেতে হয়", নইলেই মুশকিল, মেজাজ তাদের চড়া, হিতে বিপরীত হওয়াই স্বাভাবিক।

১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' (১ম সং ১৩৫০, পৃ: ১০-১২)

সুন্দর-পরিবেশন বা সুন্দরের প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচক আই. এ. রিচার্ড ভিন্নভাবে লিখেছেন: "In view, then, of the objections to Feeling, something else, some special mode of mental activity, had to be found, to which Beauty could belong. Hence arose the aesthetic mode. Truth was the object of the enquiring activity, of the Intellectual or Theoretical part of the mind, and the Good that of the willing, desiring, practical part; what part could be found for the Beautiful? Some activity that was neither inquisitive nor practical, that did not question and did not seek to use." (Vide *Principles of Literary Criticism*, 1955, p. 13).

২। 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', পৃ: ১০

হুকুর থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আর সাবধান থাকতে বলেছেন ষাঁড় ও মাতাল থেকে। ষাঁড়ের গোঁ একদিকে, দু'দিক সে জানে না। এ'রকম গোঁ একগুঁয়ে মেজাজ মানুষের মধ্যেও আছে। সুতরাং তাদের কাছ থেকেও সাবধান থাকা উচিত। আর মাতালের কথা স্বতন্ত্র। মাতাল সর্বদাই তাল-বেতাল, সাধারণ হুঁস তাদের থাকে না, বরং সর্বদা বেহুঁসই থাকে আর বেতালেও তাদের পা পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে—তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন—গালাগালি দেয়।" মাতাল বেতাল। তালহীনই সে সর্বদা। তাই তাকে বলতে হয়—'কি খুড়ো, কেমন আছ? তাহলেই সে খুশি হয়ে তোমার কাছে তামাক খাবে'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি অপরিসীম ও অন্তর্ভেদী। তিনি মাতালের স্বভাব গভীরভাবেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। রসিকতাপূর্ণ 'খুড়ো'-শব্দটি একটু সাধারণ ও সামাজিক নয়। খুড়ো-কথার ভিতর এমনই আপন-করা আত্মীয়তার সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসার ভাব লুকানো আছে—যা শত্রুকেও মিত্র করে, পরকেও সহজে আপন করে। সাধারণ পল্লীজীবন ও কিছুটা-অসাধারণ নগর-জীবন—এই উভয় জীবনসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবেই ছিল। তাছাড়া বাল্যকালে তিনি পাড়াগাঁয়ে বা পল্লীতেই জীবন অতিবাহিত করেছিলেন আমোদ-প্রমোদে, পাঠশালে, পাড়াগাঁয়ের যাত্রাভিনয়ে এবং আরও কত-কিছুতে। তাই সকল শ্রেণীর লোকের স্বভাব-চরিত্র ও আচার-বিচার তাঁর নিখুঁতভাবেই জানা ছিল, আর সেজন্য তাঁর ভাষার ও ভাবের মধ্যে ছিল সরলতা, আবার গভীরতা, ছিল রসিকতা, আবার সরলতা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের স্বভাব-সম্বন্ধেও দিয়েছেন পরিচয় এবং এ' পরিচয়ের মধ্যে একদিকে যেমন আছে সাবধানতা, অপরদিকে তেমনি আছে রসিকতা ও সরলতা। বলেছেন: 'অসৎ লোক' দেখ্‌লে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে—'ও হে, হুঁকোটুকো আছে?' আমি বলি—'আছে'।" এই 'আছে'-কথার মধ্যে আছে সুকলুষ্টি, আবার সদাচার; আছে ভয়, আবার প্রীতি ও ভালোবাসার প্রলেপ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আন্‌তে হয়। তা না হ'লে হয়তো তোমার এমন রাগ হ'য়ে গেল যে, তার আবার উল্টে অনিষ্ট করতে ইচ্ছা হয়। তবে মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ করলে তবে সদসৎ বিচার আসে"।

এ'কথাগুলির মধ্যে পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক অভূতপূর্ব চেতনা মনুষ্য স্বভাবসম্বন্ধে, আর মানুষের জন্মান্তরবাদ বা মানুষের পূর্বজন্মের স্বভাবের পুনরাবৃত্তি বা তার ফলের সম্বন্ধে। এ' ফলকে আমরা বলি কর্মফল। কর্ম ও তার ফল কার্য-কারণসূত্রে বাঁধা। বর্তমান জীবন পূর্বজন্মের নূতন সংস্করণ হলেও পূর্বজীবনের সকল সংস্কারেরই হয় পুনরাবৃত্তি। পূর্বজন্মের কোন সংস্কারের তাই নাশ হয় না, বরং পুরাতন নূতনের পরিবেশ নিয়ে প্রকাশ পায় আরও জীবন্ত হয়ে। কর্মফল সকল দেশের সকল জাতিই স্বীকার করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও কর্মফল বিশ্বাস করতেন, আর বিশ্বাস করতেন জন্মান্তররহস্য। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর 'পুনর্জন্মবাদ'-

গ্রন্থে[৩] 'কর্ম ও কর্মফল'-সম্বন্ধে বলেছেন: "কর্ম করিলে তাহার একটি পরিণতি-রূপ ফল আছেই। কর্মের ফল সর্বদা কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী হয়। যে ধরনের কর্ম হইবে, তাহার ফলও তদনুযায়ী হইবে। আবার ফলের অনুযায়ী তাহার কর্ম হয়, যেমনা কর্ম ও তাহার ফল সমপ্রাকৃতিক। সুতরাং কার্য ও কারণ—কর্ম ও তাহার ফলের মধ্যে একটি সামরস্য ও মিলন-মৈত্রীর ভাব সর্বদাই থাকে। .....মানবাত্মারা তাহাদের পূর্ব-পূর্ব জীবনের বাসনা ও প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে প্রাণ বা প্রাণবীজের পরিণতি ছাড়া অন্য-কিছু নয়।"

'পুনর্জন্মবাদ'-গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখেছেন: ".....জীবাত্মারা স্ব-স্ব কর্মানুযায়ীই ফল ভোগ করেন। অন্যায় ও জীব কর্মের ফল-রূপে মানুষের আকারে জীবাত্মারা জন্মগ্রহণ করিলেও পশুপ্রবৃত্তির হীনতর প্রকাশও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। এ'ধরনের হীন জন্ম গ্রহণ করা সেই সকল জীবাত্মাদের পক্ষেই সম্ভব—যাহারা মনুষ্যশরীর ধারণ বা গ্রহণ করিলেও পূর্বপূর্বজন্মে অন্যায় কার্য ও অসৎ-চিন্তা করার জন্য তাহারই ফলরূপে পশুর ন্যায় হীন প্রকৃতি ও হীনপ্রচেষ্টা লইয়া জীবন অতিবাহিত করে।"[৪]

মানুষ মৃত্যুর পর তার হীনকর্মফলের জন্য পুনরায় নিম্নশ্রেণীর পশুরূপে জন্মগ্রহণ করে এ' নিয়ে যথেষ্ট মতবাদ ও কিছু-কিছু মতভেদ থাকলেও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ, মিসেস ব্লিস্কলপ্যাটিসন, স্বর্গত ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি সেকথা স্বীকার করেন না। ডারুইন, লামার্ক প্রভৃতি বিবর্তবাদ বিকাশবাদীদের অভিমত হ'ল যে, একবার ঊর্ধগতিসম্পন্ন মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করলে জীবের আর নিম্নগতিরূপ নীচ পশুজন্ম গ্রহণ করার কোন সার্থকতা থাকে না। এ'সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বিচারের অবতারণা ক'রে তাঁদের অভিমত বা সিদ্ধান্ত তাঁরা সমর্থন করেছেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর সুবিখ্যাত *Reincarnation*-গ্রন্থে লিখেছেন: "The Platonic theory teaches that human souls migrate into animal bodies or angelic bodies and return from the angelic to the human or the animal, and that some of them prefer to become animals; while the theory of Reincarnation, taking its stand upon the scientific truth of gradual evolution, *teaches* that the human souls have already passed through different grades of the animal, nay, of the vegetable kingdom, by the natural process of evolution. After having *once* received the human organism, *why should a soul choose to go back to the lesser and more imperfect organism of an animal* (p. 97).[৫]

৩। 'পুনর্জন্মবাদ'-গ্রন্থ ইংরাজী Reincarnation-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকার বিদ্বজ্জন সমাজে Reincarnation-সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেছিলেন।

৪। 'পুনর্জন্মবাদ' (১৩৮০), পৃঃ ১২১

৫। 'পুনর্জন্মবাদ' (১৩৮০), পৃঃ ১২৫—১২৬

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বক্তব্য হোল : "গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বিশ্বাস করতেন মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় কোন নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বা দেবদূতরূপে জন্মগ্রহণ করে, আবার পশুজন্ম বা দেবদূতজন্ম থেকে ফিরে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক পুনর্জন্মবাদতত্ত্ব এ'কথাই প্রমাণ করে যে, একবার জীব (প্রাণবীজ) ক্রমোচ্চগতির জন্মধারা অতিক্রম ক'রে মনুষ্যজন্মে উপনীত হলে সেই প্রাণবীজ (জীবাত্মা) আবার কেন নিম্ন বা অপরিণত জন্মগ্রহণ করবে ? প্রকৃতির নিয়মও তা নয়। তবে পাপ ও অসৎ কর্ম করার পরিণতিরূপে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করলেও জীবাত্মার নৈতিকজগতে (ethical plane-এ) অধোগতি হতে পারে, সেজন্য মানুষের মধ্যে পবিত্র ও সদ্‌গুণসম্পন্ন মহামানবদের পাশাপাশি হিংস্র ও অসৎপ্রবৃত্তিযুক্ত মানুষ দেখা যায় সমাজে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাই বলেছেন : "Although there are passages in the scriptural writings of the Hindus which *apparently* refer to the retrogression of the human soul into animal nature, *still such passages do not necessarily mean* that the souls will be obliged to take animal bodies. *They may live like animals* even when they have human bodies as we may find among us many people like cats and dogs and snakes in human form and *they are often more vicious than* natural cats, dogs or snakes".—অর্থাৎ 'যদিও হিন্দুদের অনেক শাস্ত্রগ্রন্থে মানবাত্মার পশুযোনিতে জন্মগ্রহণের কথা আছে, তবুও সেগুলির ব্যাখ্যা এভাবে না ক'রে ঊর্ধ্বগতি-বিকাশবাদের দিক থেকে বলা যায় যে, বহু মানুষের মধ্যে কুকুর, বিড়াল ও হিংস্র সর্পের ক্রূর-স্বভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া দেখা যায় যে, ঐ সকল অসৎ ও ক্রূর-স্বভাবসম্পন্ন মানুষের ব্যবহার বরং হিংস্র সর্প প্রভৃতির চেয়েও অধিক'। এই সব ক্ষেত্রে ঐ সকল মানুষের মধ্যে নৈতিকপ্রকৃতিরই অবনতি ঘটে। বিকাশের ক্ষেত্রে এই অবনতি লক্ষ্য করেই অধ্যাপক হাক্সলি (Prof. Huxley) বলতে বাধ্য হয়েছেন : "None but hasty thinkers will reject it on the ground of inherent absurdity. Like the doctrine of evolution itself that of transmigration has its roots in the world of reality." অধ্যাপক হাক্সলির মতো স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দ, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন প্রভৃতির অভিমতও তাই। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Life Divine*-গ্রন্থে বিস্তৃতভাবেই এই পুনর্জন্মবাদ-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সুতরাং বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক ডারুইন, লামার্ক প্রভৃতির মতবাদকে যুক্তিসম্মতভাবে বিচার না ক'রে 'hasty thinkers' বা অগ্র-পশ্চাৎ-বিবেচনাবিহীন তথাকথিত চিন্তাশীলরা ভিন্নমত পোষণ করেন—এটাই সারমর্ম হ'ল অধ্যাপক হাক্সলির অভিমতের।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন : "কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না—তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল-সামলাতে অনেক বিচার আন্‌তে হয়। তা না হ'লে হয়তো তোমার এমন রাগ হ'য়ে গেল যে, তার আবার উল্‌টে অনিষ্ট করতে ইচ্ছা হয়"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'উল্‌টে

অনিষ্ট করার বিপক্ষে ছিলেন। ঈশাবতার যীশুখৃষ্টও বলেছিলেন 'একগালে চড় মারলে সেই চড়-মারার প্রতিবাদস্বরূপ চড় না মেরে অপর গাল ফিরিয়ে দিতে'। এ'সবের কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ একবার বলেছিলেন আমাদের: 'সাপে কামড়ায়, আর ওঝা ঝাড়ে (বিষ ঝাড়ে), তা তোমরা ঐ ওঝার বৃত্তি গ্রহণ করবে', আর এর অর্থ হোল কেউ অনিষ্ট করলে উল্টে অনিষ্ট না ক'রে বরং তার ইষ্টসাধন করবে'। অবশ্য অনিষ্টকারীর ইষ্টসাধন করার জন্য অন্তরে শক্তিসঞ্চয় করা ও মনবল থাকা দরকার। একমাত্র সৎস্বভাব ও ক্ষমাদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁরা তাঁদের পক্ষেই এ'রকম অনিষ্টকারীর প্রতি ইষ্টসাধন করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'সম্বন্ধেই বলেছেন: "ছোবল্-সামলাতে অনেক বিচার আন্‌তে হয়"। 'বিচার' বলতে অনিষ্ট করার বিপরীত ইষ্ট-সাধন করার ইচ্ছা ও মনোবৃত্তি। এরই জন্য সাধুসঙ্গ করা দরকার। সাধুসঙ্গ কিনা সৎস্বরূপ ভগবানের দিকে যাঁদের লক্ষ্য স্থির ও অবাচিতভাবে মানুষের উপকার সাধন করা যাঁদের স্বভাব —একমাত্র তাঁদের মধ্যেই থাকে সদসৎবিচার, সুতরাং তাঁদের সঙ্গ করা সদসৎবিচার অন্তরে থাকলে প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তি মনে থাকে না, বরং থাকে ক্ষমা ও দয়ার মনোভাব। আর এই ক্ষমা ও সর্বজনের প্রতি দয়াপ্রদর্শনের অভ্যাস থেকেই আসে সর্বজনের অন্তরে শায়িত বা বিরাজিত অন্তর্যামী ভগবানের প্রতি প্রথমে বিশ্বাস ও পরে জ্ঞান ও জ্ঞানের অনুভূতি। যথার্থ-মানুষ বা মানুষ-হংস যাঁরা—তাঁদের মধ্যেই পাওয়া যায় এই দৃষ্টি ও ব্যবহার। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "তবে মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ করলে তবে সদসৎবিচার আসে"। সৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ এককথা। সাধু তিনিই—যিনি সৎস্বরূপ ভগবানের একান্ত অনুরাগী ও যিনি তাঁর স্বরূপকে মন-প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে চান। ঈশ্বর-অনুরাগী ও ঈশ্বরদৃষ্টিসম্পন্ন না হলে জীবনে বিপদ ও বিপর্যয় সর্বদাই সম্ভব।

●

॥ বিংশ শতাব্দীর ধর্ম ॥

স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

(দুই)

পুনর্জন্মবাদ পুনরায় প্রাণবীজ কিংবা ব্যষ্টি-আত্মাকে স্বাধীন-স্বতন্ত্র প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার এবং কারণ ও পরিণামের নিয়মাধীন হয়ে নিজ নিজ চিন্তা ও কর্মফল ভোগ করায়। তারা তাদের নিজ নিজ ভবিষ্যৎকে গঠন করে, নিজ নিজ অদৃষ্ট বা নিয়তিকে সৃষ্টি করে এবং বিবর্তনের নিয়মাধীন হয়ে তারা তাদের নিয়তর হ'তে ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরে আরোহণ ক'রে অগ্রগতির পথে শেষ লক্ষ্যে উপস্থিত হয়। তারা অবিনশ্বর। তারা এই গ্রহেই হোক, বা অন্য কোন গ্রহেই হোক বেঁচে থাকে। জন্মগত অধিকার বলেই আত্মা অবিনশ্বর ও

শাশ্বত—ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-ঋষিদের এই মতবাদ উপলব্ধি করতে এইটি আমাদের সাহায্য করে। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রাণবীজ বলতে যা' বোঝায়, তাঁরা "আত্মা" বলতে তাই বুঝেছেন।

এইভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পর্যালোচনা করে আমরা বুঝলাম যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবিধানই প্রকৃতির অভিপ্রায়। আর এমন একটি চরম-উপাদান আছে—যা' মহাবিশ্বের বাস্তব ও সক্রিয় কারণ ; প্রাণবীজগুলি অনুৎপাদিত, অবিনাশী এবং মুক্ত প্রতিভূ।

এ'গুলিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাদের উপর নির্ভর ক'রে বিজ্ঞান পৃথিবীর দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ধর্মগুলির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। প্রাচীন যুগে ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং তাদের কারণসমূহ ব্যাখ্যার চেষ্টা ক'রে বিজ্ঞানের করণীয় কর্তব্যই সম্পন্ন করেছে। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর গোঁড়া-ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মশিক্ষকদের ভুলত্রুটিগুলি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করেছে। ফলে তাঁরা আধুনিক যুগের প্রাগ্রগামী বৈজ্ঞানিক চিন্তাশীলদের বহু পিছনে পড়ে রয়েছেন।

শেষপর্যন্ত বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছিল গত শতাব্দীতে এবং আজও-পর্যন্ত অমীমাংসিত রয়েছে তার ফলাফল। অধুনা-প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলির মূলভিত্তি পর্যন্ত এর ফলে বিপর্যস্ত ও কেঁপে উঠেছে। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করবার চেষ্টাও হয়েছে নানাপ্রকার, কিন্তু সে'সকল প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থও হয়েছে। তবে অধুনা-প্রচলিত ধর্মমতগুলি অপেক্ষা বিজ্ঞান ক্ষমতায় অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ধর্মগুলি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করে যাচ্ছে। যে-সকল তত্ত্ব ও বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরন্তু প্রচলিত প্রথাভিত্তিক, সেগুলিকে ঐ সকল ধর্ম আজ বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে।

খুব বেশীদিন আগের কথা নয়, লণ্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার অব্ এ্যাবীর উপাচার্য এক ভাষণপ্রসঙ্গে বলেছিলেন : "আমাদের পূর্বপুরুষগণ হুবহু যা' মেনে নিয়েছিলেন, আমরা কিন্তু আজ আর তা' সেভাবে মেনে নিতে পারি না। পৃথিবী মাত্র ছ'দিনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, —'জেনেসিস্'-এর প্রথম অধ্যায়ের এ'কথা আমাদের কাছে আজ একেবারেই অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈশ্বর কাদামাটি দিয়ে মানবদেহ গঠন করেছিলেন, আর তার উপর শ্বাসকার্য চালিয়েছিলেন, কিংবা তিনি আদম্-এর একখানি পাঁজর নিয়ে ইভ্কে সৃষ্টি করেছিলেন,—আমাদের কাছে 'জেনেসিস্'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই কাহিনীও আজ প্রায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এগুলি এবং অন্যান্য আরও অনেক কাহিনী—যেমন বাক্‌শক্তিসম্পন্ন সাপ ও গাধা প্রভৃতিকে আজ আর আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করি না ; —বরং কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষার আবরণে আবৃত কাল্পনিক কাহিনী হিসাবেই আজ আমরা গ্রহণ করি"।

যারা এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ধর্মশাস্ত্রগুলি ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট বাণী এবং সেগুলি অভ্রান্ত, তাঁদের মানসিক অবস্থা কিন্তু আজ সর্বাধিক শোচনীয়। জনগণের দৃষ্টি আজ বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি নিবদ্ধ এবং পৃথিবীর মানুষ আজ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রত্যাশা করে।

এভাবে, ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক-মনোভাবাপন্ন মানুষ যখন অলৌকিক ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'ল এবং নিরপেক্ষ সমালোচনার দ্বারা এর ভুলত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিল ; তখন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্য প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী উপস্থিত-বুদ্ধিসম্পন্ন সমর্থকরা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল যে, হয় ইতিহাসের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে ও তাদের ধর্মকে 'ইতিহাস-আশ্রিত ধর্ম' আখ্যায় বিশেষিত ক'রে, আর না হয় শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তারা ধর্মীয় মতবাদগুলিকে সমর্থন করবে, কারণ তাদের কাছে বিশ্বাস সকলপ্রকার সমালোচনার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং খৃষ্টধর্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির প্রতিটির উৎস, গ্রন্থকারের বৃত্তি ও রচনার সন-তারিখ প্রভৃতি ব্যাখ্যা দ্বারা প্রাচীন ও নূতন টেস্টামেণ্টের সূক্ষ্ম সমালোচনা-সমূহ বর্তমান বংশধরদের মনের অজ্ঞতা অনেকটা দূর করেছে। আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করি, তবে দেখবো যে, কোন-এক ধর্ম অপর যে-কোন ধর্মের মতোই ভাল এবং কতকগুলি শাস্ত্রীয় লেখা—যা'কে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ-প্রত্যাদিষ্ট বাণী হিসাবে দাবী করা হয়। তবে এই দাবীর জন্য যতখানি যুক্তি দেখান হয়, অপরগুলির দাবীর ক্ষেত্রেও ঠিক ততখানি যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে। আর যদি আমরা কোন একটি শাস্ত্রকে ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট বাণীরূপে গ্রহণ করি, তবে বিশ্বের অন্যান্য শাস্ত্রকেও সেইভাবে আমাদের গ্রহণ করতে হয়। মোটকথা আমরা কোনটিকেই বাদ দিতে পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি আমরা খৃষ্টানদের বাইবেলকে ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট বাণীরূপেই গ্রহণ করি, তবে বেদ, কোরাণ, জেন্দবেস্তা প্রভৃতি গ্রন্থকেও ঐভাবে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হয়, কেননা প্রতিক্ষেত্রেই এজন্য একই যুক্তি প্রদত্ত হয়ে থাকে। অধিকন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা আমাদেরকে এই একটি মহতী শিক্ষা দিয়েছে যে, ছোট হোক, বড় হোক, কোন ধর্মেরই সৃষ্টি কখনও অলৌকিক কারণে হয় নি, বরং প্রতিটি ধর্মই কোন-না-কোন একটি সত্যকে অবলম্বন ক'রে আছে। সুতরাং প্রপঞ্চময় বিশ্বের রহস্যগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য মানব-মনের প্রচেষ্টা এক স্বাভাবিক কারণের ফলশ্রুতি।

তুলনামূলকভাবে পুরাণগুলি অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, তারা প্রমাণ করেছে কাল্পনিক বিষয় খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে যেমন দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও ঠিক তেমনি দেখা যায়। কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী ছিল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে বাস্তবে পরিণত করা ও কতকগুলি ছিল প্রাচীন কুসংস্কারের উদ্ঘর্তন। অপরদিকে অন্যান্যগুলি ছিল জনসাধারণ-কর্তৃক দেবতার ন্যায় পূজ্য কোন মহান্ আধ্যাত্মিক নেতা বা সাধুসন্তের জীবনের অতিরঞ্জিত বিবরণ, অথবা তাঁদের জীবনের কয়েকটি প্রকৃত ঘটনার বর্ণনামাত্র। [ক্রমশঃ]

॥ ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

(বেদান্তের আলোকে)

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী প্রভানন্দ

একসময়ে বেদান্তের অনুরাগী দেবেন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করে বলেছিলেন, "If I could preach the Brahma Dharma as based upon the Vedanta, then all India would have one religion, all discussions would come to an end, all would be united in a common brotherhood, her valour and power would be received and finally she would regain her freedom.[৩০] বেদান্তভিত্তিক ব্রাহ্মধর্মের উদ্গাতা এই দেবেন্দ্রনাথই পরবর্তীকালে অদ্বৈততত্ত্বের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন, ফলে তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত ধর্মভাবনাগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দেবেন্দ্রশিষ্য কেশবচন্দ্রও উত্তরাধিকার সূত্রে অদ্বৈতবিরোধী। শুধু তাই নয়। অদ্বৈতবেদান্ত কেশবচন্দ্রের মনজগতে বহু বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করেছিল।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। নিকট-আত্মীয় ও ব্রাহ্মনেতা কৃষ্ণবিহারী সেন Mirror পত্রিকাতে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, "অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের নিশ্চিত প্রকৃষ্ট উপায় কি ?" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উত্তরে বলেন, "অদ্বৈতবাদীর স্বানুভবের নিকটে দৃঢ়তাসহকারে নিবেদন করিলেই, আমরা বিশ্বাস করি, তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। ধ্যানের সময়ে তিনি আপনাকে ঈশ্বরেতে মগ্ন করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু শক্তিতে, জ্ঞানে বা পবিত্রতায় তিনি আপনি অনন্ত, ইহা মনে করিতে পারেন না। সিন্ধুতে বিন্দু মিশিয়াছে, আত্মসম্বন্ধে তিনি এরূপ তুলনা করিতে পারেন ; কিন্তু তাঁর স্বানুভূতি বলিয়া দেয় যে, তিনি সমুদ্র নহেন। যে অদ্বৈতবাদী জড়জগতের সহিত ঈশ্বরকে এক করেন, তাহার নিকটে সহজে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, জড় ও চৈতন্য এক নহে, সুতরাং উহা সর্বোচ্চ জ্ঞানের সহিত এক হইতে পারে না।"[৩১] খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব ও দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের গভীর প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত বা বিচারশৈলী সম্বন্ধে যে বড় গোলমালে পড়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মভাবনায় ক্রমবিবর্তন ঘটে। তাঁর ঘোর দ্বৈতবাদের চিন্তা-ভাবনা ক্রমে অদ্বৈততত্ত্বাভিমুখী হয়। আমরা জানি ব্রাহ্মনেতাদের মধ্যে কেশবচন্দ্রই শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ নৈকট্যে এসেছিলেন। ভাবগ্রাহী কেশবচন্দ্রই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ বেশ কিছু গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের বলেছিলেন, "তোমাদেরও ভক্তিযোগ, তোমরা হরিনাম কর, মায়ের নাম গুণগান কর, তোমরা ধন্য। তোমাদের ভাবটি বেশ।

৩০। Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore, translated by Satyendra Nath Tagore, p. 102, quoted by K. S. R. Sastri in Vedanta Kesari, Vol. II, No. 4, p. 113

৩১। গৌরগোবিন্দ রায় : আচার্য কেশবচন্দ্র, শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃঃ ১৩৩।

বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎ স্বপ্নবৎ বলো না। ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলো, এও বেশ। তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে অবশ্যই পাবে।" (কথামৃত ১।২।১) শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিপথের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। 'স্বপ্নবৎ' বলে না, তবে বলে, তিনিই এইসব হয়েছেন।" (কথামৃত ৫।১৭।১) শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছিলেন, "তোমরা সাকার মানো না, তাতে কিছু ক্ষতি নাই; নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলেই হলো। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে। মা বলে তাঁকে ডাকলে ভক্তি-প্রেম আরও বাড়বে। কখনও দাস্য, কখনও সখ্য, কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুর ভাব। কোন কামনা নাই তাঁকে ভালবাসি, এটি বেশ। এর নাম অহেতুকী ভক্তি।.....বেদ, পুরাণ, তন্ত্র এক ঈশ্বরেরই কথা আছে ও তাঁহার লীলার কথা; জ্ঞান ভক্তি দুইই আছে।.....তোমরা যে নির্জনে সাধন করছো, এ খুব ভাল, তাঁর কৃপা হবে। জনক রাজা নির্জনে কত সাধন করেছিলেন, সাধন করলে তবে তো সংসারে নির্লিপ্ত হওয়া যায়।" (কথামৃত ৫।১।৩) ঐক্যাত্মক তত্ত্ব শেখাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তদের সমস্বরে উচ্চারণ করতে বলেন, "গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব'; কেশবচন্দ্র হাসতে হাসতে মৃদু প্রতিবাদ করেন, 'মশাই, এখন অতদূর নয়; লোকে বলবে গোঁড়া।" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলেন, "বেশ তোমরা যতদূর পারো তাহাই বলো।" শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবনা লজ্জাঘৃণা বাদ দিয়ে কেশবচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও ভক্তিসাগরে সন্তরণকারী ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্রকে অদ্বৈত-অভিমুখীন লক্ষ্যে অগ্রসর হতে দেখি। প্রার্থনার দ্বারা পরিপুষ্ট ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট ব্রহ্মানন্দ তাঁর 'দেবালয়ে' প্রার্থনা করেন, "হরি, সুধা পান করে যেন অচেতন হই।.....দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরূপে ডুবে গেলাম। আমি খালি জল, তুমি সরবৎ; আমার জল তোমাতে ঢালিলাম, তোমার জল আমাতে ঢালিলাম, ঢালিতে ঢালিতে আমিও মিষ্ট সরবৎ হয়ে গেলাম।" আবার দেখি তিনি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রার্থনা করছেন, "কে তুমি, কি তুমি কেহই জানে না, কিছুই বুঝা যায় না। আমরা কিছু বুঝিতে পারি না। অচিন্ত্য পরব্রহ্ম। আমি ডুবিব হরিতে, না হরি ডুবিবে আমাতে? আমি যাব হরির বাড়ীতে, না হরি আসবেন আমার বাড়ীতে? একই কথা। প্রবিষ্ট আর প্রবেশ। নির্বাণ হয়ে গেল। আমি আনন্দ হয়ে গেলাম, পুণ্য হয়ে গেলাম, ব্রহ্মেতে মিশে গেলাম।" কেশবচন্দ্রের ভাবনালোকে পরমাত্মা জীবাত্মার চালক, পথ-নির্দেশক। জীবাত্মা তাঁর বিবেকজ্যোতির সাহায্যে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের উপলব্ধি করে থাকেন। এবং এই উপলব্ধির স্বরূপ নিঃসন্দেহে অভেদাত্মক। যেমন বিভিন্ন প্রার্থনার মধ্যে তেমনি কেশবচন্দ্রের জীবনীস্তন-কালের বিভিন্ন ভাষণের মধ্যে অভেদাত্মক ভাব ও ব্যঞ্জনা সুপরিস্ফুট। তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "Vedantic or Subjective yoga : Its process" শীর্ষক ভাষণে বলেন, "He will have no other salvation than the absorption of I, Mine and Me in the Godhead. And this absorption he endeavours to bring about by

constant contemplation. So thoroughly does he concentrate his attention in the reality of the Infinite spirit that his little unreal self gradually wanes and fades away, like the borrowed and reflected radiance of the moon before the rising sun. When the real comes the unreal disappears"[৬২] এখানে কেশবচন্দ্র অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। জীবাত্মা তার 'আমি' 'আমার' ভাব নিয়ে পরমাত্মায় মিলিয়ে যায়, বিন্দু তার স্বাতন্ত্র্য হারায় সিন্ধুতে, বিন্দু সিন্ধুর মাহাত্ম্য লাভ করে, ক্ষুদ্র তার গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহৎ হয়। ভক্তির রস শুকিয়ে যাবার আশঙ্কায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অদ্বৈতবেদান্তকে বর্জন করেছিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ভক্তিপথ ধরেই অদ্বৈততত্ত্বের প্রশস্ত ও অনন্ত রাজপথে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর এই মানসিক বিবর্তন এবং ধর্মভাবনায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব তাঁর অনুগামীদের অনেকেই ধরতে বুঝতে পারেন নি। তাঁর অন্যতম জীবনীকার শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে লিখেছেন, "What was there common between him and Keshab...he the *yogin* whose *sadhana* brought him unconsciousness and trance. Keshab the new *yogin* whose *yoga* lay in the joy of conscious duality? The two would seem to be like polar opposites".[৬৩] অপরপক্ষে দার্শনিক সীতানাথ তত্ত্বভূষণ অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বৈতমতবাদ কিভাবে একপ্রকারের অদ্বৈতভাবাদর্শে রূপান্তরিত হয়েছিল। সাধক কেশবচন্দ্র তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনভজনের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন একটি নিগূঢ় তত্ত্ব। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখেছেন, "Mr. Sen recognises that there is a stage of spiritual development at which the human soul really sees itself spiritually, not naturally, merged in the supreme soul and becomes one with it".[৬৪] জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরমঐক্য কেশবচন্দ্রের শুধুমাত্র বৌদ্ধিক স্বীকৃতিমাত্র নয়, কেশবচন্দ্রের চেতনালোকে একটি উপলব্ধ তত্ত্ব। এই ঐক্যবোধের পূর্ণ বিকাশ কেশবচন্দ্রের মধ্যে স্ফুরিত হয় নি, কিন্তু ঐ ঐক্যবোধের নৈকট্য তাঁর ধ্যানধারণাকে উদ্ভাসিত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তত্ত্বভূষণ মশাই বলেছেন কেশবচন্দ্র প্রথমাবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের মত একজন Intuitionist Dualist ছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে Modified Vedantist-গোছের দৃঢ়বিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু এই তাত্ত্বিক পরিবর্তনে কেশবচন্দ্রের প্রকৃত সচেতনতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। আমরা দেখি তিনি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখের Sunday Mirror পত্রিকায় লিখছেন, "Though the New Dispensation supersedes the two older churches, it includes them and fulfils them....The New Church is the old church developed

৬২। Dr. Prem Sunder Basu : Life & Works of Brahmananda Keshev, 1940, p. 552.

৬৩। P. K. Sen : Biography of a new faith, 1954, Vol. II. p. 69.

৬৪। Sitanath Tattvabhusan : Philosophy of Brahmoism, p. 27.

and perfected....But let us not leave the old church behind. Let us rather carry it with us, the whole Samaj, if possible, so that the Brahmo Samaj and the New Dispensation may become convertible term" বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্মের পরিণত ও সুষ্ঠু রূপ বলে নববিধানকে স্বীকার করলেও ব্রাহ্মসমাজ অর্থাৎ আদি সমাজ বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নববিধানের সমতুল্য বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্রের শক্তির উৎস তাঁর ধর্মানুভূতি ও আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ আবেগ। এবং এদ্বারা যুক্তিধর্মের মূলে আঘাত করা হয়েছে একথা মানতে হবে।

কেশবচন্দ্রের পরবর্তী সারির ব্রাহ্মনেতাদের প্রধান এবং পরবর্তীকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান স্তম্ভ শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনিও সুস্পষ্টভাবে অদ্বৈততত্ত্বের বিরোধী। তিনি লিখেন, "যদি জীবন চাও তবে সেই মঙ্গলময় পুরুষে প্রীতিস্থাপন কর, ভক্তিমার্গের পথিক হও। এখানে বেদান্তমতাবলম্বী হয়তো তর্ক তুলিবেন। তিনি প্রশ্ন করিবেন, যে পদার্থ নির্গুণ, যাহা অজ্ঞেয়, তাহাতে প্রীতিস্থাপন করিব কিরূপে? ও ঢেঁকির কচকচি অনেক শুনিয়াছি। ব্রহ্মের দুই ভাব শাস্ত্রে প্রথিত আছে। ব্রহ্মের যে দিক সৃষ্টিলীলায় অভিব্যক্ত, এই জড়জগতে ও মানবজীবনে অভিব্যক্ত, তাহা তাঁহার ঈশ্বরভাব আর যেভাব সৃষ্টিলীলার অতীত তাহা নির্গুণ ব্রহ্মভাব। এই নির্গুণ ব্রহ্মভাব লইয়া কে টানাটানি করিতেছে?.....বেদান্তের নামে এই রূপান্তরিত নাস্তিকতা হইতে আমাকে দূরে রাখ"।[৬৫] সংস্কৃতপণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে বেদান্ত অর্থাৎ অদ্বৈতবেদান্ত রূপান্তরিত নাস্তিকতা বৈ ত নয়। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক লালিত-পালিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে তাঁর অজ্ঞাতসারেই বোধকরি তাত্ত্বিক ভিত্তির পরিবর্তন করে ফেলে ছিল। চিন্তাশীল সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখেছেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। তিনি লিখেছেন,".....I think the prevailing system is what I have already characterised as Argumentative Theism with a distinct tendency to Monism, while there is a residuum which has not gone on along the advancing tide, and for which the Old Intuitional Dualistic Theism is still living.[৬৬] এইকালের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দার্শনিক স্বরূপ সম্বন্ধে তত্ত্বভূষণ মশাই আরও সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, "...there has appeared a species of Monistic Theism allied both to Vedantism and the Absolute Idealism of Europe". (ঐ, পৃঃ ১৫১) সেকালে সাধারণ সমাজের ধর্মতত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে অদ্বৈততত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, কালপ্রবাহে তৎকালীন মানসিকতার চাপে বোধকরি অজ্ঞাতসারেই এই ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠেছিল।

এভাবে দেখা যায় ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের মধ্যে অদ্বৈতবেদান্ত সম্বন্ধে বিচিত্র ধারণা, কখনও বা অনীহা, কখনও বা বিরুদ্ধাচারণ। এগুলি বেদান্ত সম্বন্ধে জনমানসকে বিভ্রান্ত করেছিল। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রমুখ শাস্ত্রবিদেরা বেদান্ত চর্চা করলেও

৬৫। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'প্রবন্ধাবলী', পৃঃ ১৬৭-৬৮।
৬৬। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ : 'প্রবন্ধাবলী', পৃঃ ৬৮।

আধুনিককালে রাজা রামমোহনই বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্মকে ভারতবাসীর কাছে দেশীয় ভাষায় সর্বপ্রথম তুলে ধরেছিলেন। রামমোহন ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ বলিষ্ঠ চিন্তাবিদ, কিন্তু তাঁর মধ্যে ধর্মাচার্যের হৃদয়ের উত্তাপের অভাব ছিল। আবার যুক্তিনিষ্ঠ রামমোহনের যুক্তিবাদের উপর সন্দেহের কালোমেঘ ছায়া বিস্তার করেছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে ভাওকোর্ড আর্ণট রামমোহনের জীবনলেখের মধ্যে মন্তব্য করেছেন, শেষজীবনে রামমোহনের মনে সন্দেহ জেগেছিল যে শুধুমাত্র যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মমত সমাজের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে কি না।[৬৭] কিন্তু মননশীল অধিকাংশ ব্রাহ্মনেতাদের মানসিকতার প্রধান নিয়ামক ছিল নিটোল যুক্তিবাদ। যদিও দার্শনিক তত্ত্বভূষণ মশায়ের মতে যুক্তিনিষ্ঠ ও দার্শনিক ব্রাহ্মমতের সঙ্গে জনপ্রিয় ব্রাহ্মধর্মমতের ছিল গভীর পার্থক্য, তথাপি বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিসূত্রের প্রতি সকল নেতাদের প্রীতি সুস্পষ্ট। কিন্তু একথাও ঐতিহাসিক সত্য যে এসকল নেতাদের যুক্তিবাদের রূপ ও শৈলীর মধ্যে বারংবার পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটেছিল। কার্পেন্টার প্রমাণ করেছেন, "…the rationalism has not remained constant, but has altered in the course of the history; under Rammohan taking its colour from Deism, under Debendra from Ramanuja, under Keshab from unitarianism in the early period, from Christianity in the later".[৬৮] রামমোহন হতে শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত সকল নেতৃবৃন্দের কেউই ভারতাত্মার প্রাণসম্পদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্যানধারণাকে পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারেন নি। এদের মননভূমি পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় সিক্ত, উজ্জীবিত। একারণেই গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী যথার্থই লিখেছেন যে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের পুরোভাগে বেদান্তের কলকলধ্বনি থাকিলেও দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দার্শনিক ভিত্তি যথাক্রমে ফরাসী, স্কটল্যাণ্ড, জার্মাণী ও ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।[৬৯] যদিও গিরিজাশঙ্করের মতে রাজা রামমোহন শাঙ্কর অদ্বৈতবাদকে পুনঃস্থাপনা করেছিলেন, আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনাতে প্রমাণিত হয়েছে যে রাজার ধ্যানধারণায় বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব বিকশিত হতে পারে নি। বরঞ্চ ইদানীংকালের অন্যতম চিন্তাশীল লেখকের মন্তব্য এবিষয়ে অনেকাংশে বস্তুনিষ্ঠ। তিনি লিখেছেন, "আর কিছু না হোক রামমোহনের মত বলিষ্ঠ বৈদান্তিকের চিন্তাধারার মধ্যেও দ্বৈতবাদের বীজ রয়ে গেল।"[৭০] আর ব্রাহ্মধর্মের যথার্থ প্রবর্তক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন 'আত্মতত্ত্ববিদ্যার' চতুর্থপ্রস্তাবে। তাঁর মতানুসারে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত স্বীকার করলে 'নির্বিকার নিরবয়বকে বিকৃত মানিতে হয়, সর্বজ্ঞ সর্ববিৎকে ভ্রান্ত বলিতে হয়, পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপকে সাংসারিক সুখদুঃখের ভোক্তা করিতে হয়।" অদ্বৈততত্ত্বের বিরুদ্ধে এই বিভ্রান্তিকর অভিযোগ সম্বন্ধে বর্তমানে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

●

৬৭। অমিতাভ মুখোপাধ্যায় : উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, ১৯৭১, পৃঃ ১০৮।
৬৮। Encyclopaedia of Religion & Ethics, Vol. II, p. 823.
৬৯। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দী, পৃঃ ৩০০।
৭০। ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩১।

॥ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধর্ম ও স্বামী অভেদানন্দ ॥

মিহিরলাল দত্ত

যে বিজ্ঞান আন্তরিকতার সহিত নিরপেক্ষভাবে অভিজ্ঞতার সত্যতাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে তাকেই আমরা সাধারণভাবে বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান বা Pure Science বলতে পারি। অনুরূপভাবে, মানুষের জীবনকে ঐ জ্ঞানের আবিষ্কারের দ্বারা আরও সমৃদ্ধতর ও উন্নত করা—প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ করাকে ফলিতবিজ্ঞান বা applied science বলা যেতে পারে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার অত্যাশ্চর্য উন্নতি সম্ভব হ'য়েছে মানুষের মনের দ্বারা নব নব রহস্য উদ্ঘাটনে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বিজ্ঞানের নব নব সূত্র যেখানে উদ্ঘাটন হচ্ছিল সেই পাশ্চাত্যে, এতকাল খ্রীষ্টধর্ম ওখানকার মানুষের প্রধান আশ্রয় ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের নিত্য নূতন তথ্যের উদ্ভাবন, খ্রীষ্টধর্মের সৃষ্টি-বিষয়ে ও নিখিলবিশ্ব সম্বন্ধে যে তত্ত্ব এতদিন প্রচার ক'রে আসছিল, সেইসকল বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল ক'রে দিল, কারণ ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ। বিজ্ঞান মানুষের সামনে জীবন-ধারণের মানোন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা তুলে ধরলো। বিজ্ঞানের অগ্রগতি পাশ্চাত্য জীবনদর্শনে আমূল পরিবর্তন এনে দিলো। বস্তুবাদের চরম উৎকর্ষ সাধনই মানব প্রগতির ও কল্যাণের পথ এই প্রত্যয় জেগে উঠ্‌লো। এই সময় বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য ছাড়া অন্য কোনও চরম সত্য আছে তা স্বীকার ক'রত না। বর্তমান যুগে অবশ্য শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির গূঢ় রহস্য—আণবিকবিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণায় কৃতকার্য হ'য়ে ব'লতে আরম্ভ ক'রেছেন যে, বিজ্ঞান আধুনিক যুগে, বস্তুর বাহ্য অবস্থার বা রূপের (appearances) পরিমাপ ক'রে কিন্তু ঐ বাহ্যপ্রকৃতির পিছনে অন্তঃপ্রকৃতির পরম অস্তিত্ব (reality) সম্বন্ধে যথার্থ কিছু পরিমাপ ক'রতে পারে না। তাঁরা স্বীকার করেন যে, বিজ্ঞান কেবল বস্তুর বহিরঙ্গের বিষয়ে আলোকপাত করে; এই দৃশ্যমান (observable) জগতের পিছনে এক অদৃশ্য (unobservable) অন্তর্জগৎ রয়েছে তা তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছেন। এমনকি আইন্‌স্টাইন্ বলেছেন 'বিজ্ঞান প্লুটোনিয়ামের গুণ পরিবর্তন ক'রতে পারে কিন্তু সে মানুষের অন্তঃকরণের অসৎকে (স্বভাব) পরিবর্তন ক'রতে পারে না। "Science can de-nature plutonium but it cannot de-nature the evil in the heart of man".

বিজ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখে ও তার পরিমাপ করে কিন্তু তার পশ্চাতে শক্তির উৎস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব বা অক্ষম। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা—যাকে বিজ্ঞানের নূতন প্রেরণা বলা যেতে পারে। এই চিন্তাধারা ব্যক্ত বা প্রকাশিত জীবজগতের অতীত যে অব্যক্ত অস্তিত্ব বা মৌলিক ভিত্তি রয়েছে তার সম্বন্ধে গভীরতর অনুসন্ধানের নির্দেশ ক'রছে। আইন্‌স্টাইন্ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ ব্যতীত একটি চতুর্থ-স্বরূপমূলক পরিমাপ···নূতন শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য—"সময়" প্রবর্তন ক'রলেন। "His space-time unit brings an intuitive quality to his concept of a comprehensive

past-present-future continuum which is independent of the linear-casual relationships expressed in the course of succession of past, present and future". ক্রমশঃই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি যে অতীতের বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদ নূতন অদ্বৈতবাদের অভিগমন ক'রছে এবং পরিপূরক স্বরূপ ধারণা বা এক, অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় সেই অদ্বিতীয় ঐক্যের দিকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

যদিও জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মযোগের মূর্ত প্রতীক স্বামী অভেদানন্দ, তবুও প্রধানতঃ ছিলেন তিনি জ্ঞানপন্থী। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রাদির বিষয়ে যেমন ছিল তাঁর জ্ঞানের পরিধি তেমনই আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখায় তাঁর ছিল দৃপ্ত অনায়াস বিচরণ। আজন্ম সাধক ও উপলব্ধিবান ছিলেন বলেই, নব্য বিজ্ঞানের অমীমাংসিত সমস্যাগুলি তিনি ধর্মের মাধ্যমেই দিয়েই উপযুক্ত সমাধানের পথ দেখিয়েছিলেন। ইয়োরোপ, আমেরিকা চরম ব্যক্তিস্বাবাদের গণতান্ত্রিক দেশ। কোনও মতবাদকে বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগারে বিশ্লেষণ না ক'রে সহজে বা অন্ধ বিশ্বাসে মেনে নেওয়া তারা কোনও দিন স্বীকার করেনি। তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বুদ্ধির পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হ'লেই জীবনের প্রশ্নগুলি এখানে গ্রহণযোগ্য হয়। স্বামী অভেদানন্দ যখন পাশ্চাত্যে গমন ক'রলেন, তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ। তখনকার বিজ্ঞানের মতবাদ ও বস্তুবাদের প্রতি এই প্রত্যয় যে স্থায়ী হ'তে পারে না, এবং তা যে যুদ্ধ-বিগ্রহের রূপ ধরে আত্মঘাতী নীতিতে রূপান্তরিত হয়, পাশ্চাত্যের জীবন দর্শনের এই শূন্যতা তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন ক'রেছিলেন। যেমন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ-বিচ্ছিন্ন ধর্ম মানুষকে কুসংস্কারের অন্ধকারে আবৃত রাখে। অপরদিকে ধর্মবিচ্ছিন্ন-বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ মানুষকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে। তাই ভারতের শাশ্বত বেদান্তধর্ম, যার সাথে বিশ্বের কোনও ধর্মের বিরোধ নাই, আবার যার সঙ্গে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদেরও বিরোধ নাই, তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সাহায্যে পাশ্চাত্যের কাছে উপস্থাপিত ক'রলেন।

তিনি বলেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবনকে বিচ্ছিন্ন অথবা নিখিলবিশ্ব থেকে পৃথক এক বস্তু হিসাবে গণ্য করি, ততক্ষণ জীবনসমস্যা অব্যাখ্যেয় থেকে যায়। সুতরাং বিশ্বজনীন প্রাণশক্তির আদিকারণ প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র ধারায় যার প্রকাশ, তাঁর সঙ্গে আমাদের জীবনের কি সম্বন্ধ, বেদান্ত তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। আমাদের জীবন সেই শাশ্বত মূল কারণের স্থানকালে সীমাবদ্ধ প্রতীক ভিন্ন অন্য কিছু নয়। নিখিলবিশ্ব অনন্ত এক পরম সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র। মূলে জড় বা চেতন বস্তু বলে পৃথক কিছু নাই। স্থানকালের সীমায় যখন সেই শাশ্বত প্রাণশক্তির প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয় তখন ইহা বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। সেই শাশ্বত প্রাণশক্তির আদি কারণ হ'তে উদ্ভূত পরমাণু সমূহের প্রতিটি বিকাশ পাচ্ছে—অসীম-সসীমের মাঝে। এইরূপ প্রক্রিয়ার প্রতি ধাপে প্রতি পরমাণুর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।···প্রতিটির লক্ষ্য রয়েছে। সেই লক্ষ্য বিশেষ অবস্থাধীনে বিশেষ অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত হ'তে পারে। তথাপি অপুৎকর্ষ (সসীম) থেকে চরমোৎকর্ষের (অসীম) দিকেই এর গতি। কাজেই বেদান্ত নির্দেশ দেয় যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য চরমোৎকর্ষ লাভ করা (সসীম থেকে মুক্তি)।

তিনি বিজ্ঞানের সাথে বৈদান্তিক ধর্মের সমন্বয় সাধন ক'রেছিলেন। বিজ্ঞানের নীতি হ'ল শোনা কথা বা অন্ধ বিশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপন না ক'রে, পরীক্ষাগারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের দ্বারা সত্য আবিষ্কার করা—যদিও বিজ্ঞানের আদর্শ পার্থিব স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত বিজ্ঞানসম্মত চরম আদর্শকে অতিক্রম ক'রে অতীন্দ্রিয় আত্মা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান অনুভূতির রাজ্যে যেতে সাহায্য করে। ধর্মের দুটি দিক স্পষ্টভাবে দেখিয়ে তিনি বললেন, গৌণ বা অপর-ধর্ম হচ্ছে—প্রচলিত মতবাদ, বদ্ধমূল ধারণা, শাস্ত্রীয় আচার, বাহ্যিক অনুষ্ঠান, পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতির উপর আস্থা স্থাপন ক'রে তদানুযায়ী আচরণ করা, আর মুখ্য (সার) ধর্ম হচ্ছে আত্মসংযম—আত্মবিকাশ বা আত্মজ্ঞান—দিব্যচেতনার উন্মেষ। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ (অহংকে) পরিহার ক'রে বিরাট বিশ্বের সাথে একাত্ম উপলব্ধি করার নামই আত্ম-জ্ঞান। এই জ্ঞান যথার্থভাবে হ'লেই দেশ-কালের পরিচ্ছিন্নতার সীমা বিশ্বচেতনার সহিত একাকার হ'য়ে যায়। আসলে সংবিৎ বা চেতনা সকল জিনিসের উৎস। মৌল জ্ঞান বা আত্মাই (প্রকাশ) আমাদের স্বরূপ ; তাই তাকে অতিক্রম করা যায় না। জ্ঞানকে অস্বীকার বা অতিক্রম করতে গেলে সংবিৎ বা জ্ঞানের সাহায্যেই তো অতিক্রম করতে হয়। তাই জ্ঞানকে অস্বীকার বা অতিক্রম ক'রতে গেলে যা দিয়ে অতিক্রম বা অস্বীকার ক'রবে তাকে আবার স্বীকার ক'রতে হবে। "But the very fact of denying existence of soul, consciousness or mind pre-supposes another mind which is denying". প্রকেসর হাল্ডেন ও বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সম্যাক উভয়েরই এই একই মত। ম্যাক্সম্যাক বলেছেন "আমরা সংবিৎকে অতিক্রম ক'রতে পারি না। যা কিছু বলি, যা কিছু আমরা 'আছে' (সত্তা) ব'লে গণ্য করি, সে সবই জ্ঞানের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে।" কাজেই সকল বস্তুর অধিষ্ঠান-সত্তা হচ্ছে ব্রহ্ম এবং তা নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা বা সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করাই মনুষ্য জীবনের মহান উদ্দেশ্য। অবিরাম অনুসন্ধান, অক্লান্ত চেষ্টার দ্বারা যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব, তেমনই অধিকতর ধৈর্যসহকারে কঠোরতর অনুশীলনের ও সাধনার মাধ্যমে যথার্থ সত্য বা স্বরূপজ্ঞান এই জীবনেই অপরোক্ষভাবে অনুভব করাও সাধ্যগত, একথা তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলে গেছেন। বেদান্তধর্ম বিশ্লেষণ ক'রতে গিয়ে বলেছিলেন "The universal religion of Vedanta alone can stand the test of dialectical logic and objective science. Vedanta is the science of all sciences. Religion is the science of life....The intimate reality of the universe is the One Absolute Substance which is beyond subject and object, which is infinite source of intelligence or knowledge of consciousness and blissfulness, which is one and not many" "সংস্কৃতে ইহাকে ব্রহ্ম, গ্রেটো ইহাকে সৎ ব'লে অভিহিত ক'রেছেন। ইমার্সন তাঁকে 'ওভারসোল' বা পরমাত্মা বলেছেন। স্পিনোজা তাঁকে পরমবস্তু বা সত্তা এই সংজ্ঞায় অভিহিত ক'রেছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁকে 'অজ্ঞাত' এবং অপরিজ্ঞেয় রূপে ব্যাখ্যা ক'রেছেন। কান্টের দর্শনে তিনি 'কুটস্থ' সম্বন্ধিত পরমবস্তু

বা সত্তা ; সোপেন্‌হাওয়ার তাঁকে বলেছেন ইচ্ছাশক্তি, আর্ণষ্ট্ হেকেল্ বলেছেন পরমবস্তু। তিনি খ্রীষ্টিয়দিগের পবিত্র পিতার দিব্যসত্তা ও মুসলমানগণের আল্লাহ্। ইহা বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের যথার্থ স্বরূপ ; এই জগতের পরমবস্তু, অনাদি ও অনন্ত সৃষ্টির চিন্তা ও পার্থিব বিষয়বস্তুর কারণ, কেহ ইহাকে বিভক্ত ক'রতে পারে না, ইহা অবিভাজ্য। এই অব্যক্ত, অনির্বচনীয় শক্তি বা সত্তাকে আমরা ভগবান, পরমেশ্বর প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত ক'রে আরাধনা করি।"

তিনি দেখিয়েছেন যে বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। খ্রীষ্ট প্রভৃতি বিশ্বের অন্যান্য ধর্মগুলি সৃষ্টির বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব প্রচার ক'রে এসেছে সেগুলির সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ স্পষ্ট। পুরাতন টেস্টামেণ্টে ও জেন্দাবেস্তাতে সৃষ্টির যে বিবরণ আছে, সেরূপ কোনও বর্ণনা বেদের মধ্যে নাই। প্রাচীনতম শাস্ত্র ঋক্‌বেদ, উপনিষৎ, সাংখ্য প্রভৃতিতে ক্রমবিকাশবাদের যে উল্লেখ আছে, তার প্রতি স্বামীঅভেদানন্দ দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন। কপিলের সাংখ্যদর্শনে ক্রমবিকাশবাদের রূপ স্পষ্ট হ'য়েছে। নিখিল বিশ্বপ্রকৃতিতে যে বিবর্তন প্রক্রিয়া চলেছে, ক্ষুদ্রতম জীবকোষ থেকে কালের বিবর্তনে কি প্রকারে মানুষের উদ্ভব হ'লো, সাংখ্যে তার আভাস র'য়েছে। তিনি অধ্যাপক হপ্‌কিন্স্ ও গার্বের মত উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে পিথাগোরাস্, প্লোটো প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা সাংখ্যদর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন স্পিনোজার জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বেই ভারতীয় ঋষিগণ স্পিনোজাধর্মী ছিলেন। তিনি শোনালেন সত্যধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মূলতঃ কোনও বিরোধ নাই। শিব ও শক্তি যেমন অভিন্ন, তেমনক'রেই তিনি সমন্বয় সাধন ক'রেছেন বিজ্ঞান ও ধর্মকে। বিজ্ঞানের সহায়তায় তিনি বেদান্তধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। "All varieties of phenomena have come out of this one source, Brahman and into it they will be reduced at the time of dissolution. It is the universal Energy, the mother and producer of all forces. We know that all forces are related to one another and that they are, as modern science explains, manifestation of the same eternal energy or the infinite substance from this one source all mental and physical phenomena and material forces have come into existence and evolved into various forms and shapes.....As one 'Air' passing through various holes of a flute produces various notes of music, so the one eternal substance manifests itself in the various phenomena of the Universe".

তাঁর মতে এই জগৎটা নিয়তই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এই পরিবর্তন প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রমবিকাশের ধারায় চলেছে। নাম ও রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনও কিছুরই বিনাশ হচ্ছে না। আবার যাহা নাই তাহা সৃষ্টি হচ্ছে না। মৃত্যু বা রূপের অবলুপ্তিতে তার উপাদানের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে শক্তির তারতম্য হচ্ছে না। যাহা পূর্ব্বে ছিল তাহাই এখন আছে এবং দৃষ্টি গোচর হচ্ছে এবং পরেও হবে। প্রত্যেক স্থূল আকৃতি

একটি সূক্ষ্ম শক্তির স্থূলকণার উপর বহিঃপ্রকাশ মাত্র। "When a subtle force becomes objectified, it appears as a gross object. Therefore, we can say, that every gross form is an expression of some subtle force acting upon the subtle particles of matter" যেহেতু, বস্তুর রূপান্তর ঘটে স্থান, কাল ও নিমিত্তের মধ্যে; কিন্তু অব্যক্ত অবস্থায় স্থানও নাই, কালও নাই এবং নিমিত্ত কারণও থাকে না,—আধুনিক বিজ্ঞানও বলে যে শক্তির রূপান্তর ঘটে কিন্তু হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। বিজ্ঞান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সৃষ্টির ভব অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হ'য়েছে একথা বলে কিন্তু এই অব্যক্ত অবস্থা কোথা থেকে এল তার হদিস ক'রতে পারে নি। তিনি জগৎকে একটি চুম্বক পাথরের সঙ্গে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন উহার positive pole (ইতিবাচক মেরু বা প্রান্ত) হ'চ্ছে চেতন পদার্থ (spirit) এবং Negative pole (নেতিবাচক মেরু) হ'চ্ছে জড় পদার্থ (matter) এবং নিরপেক্ষ (Neutral point) নির্লিপ্ত উদাসীন শক্তি হচ্ছে সাক্ষী-চৈতন্য বা তুরীয়-ব্রহ্ম। অবশ্য আমাদের বেদান্ত শাস্ত্র বলে যখন আমরা সমাধিস্থ অবস্থায় সেই সত্য উপলব্ধি করি তখন ব্যক্ত বা অব্যক্ত অবস্থা একই জিনিস, জড় ও চৈতন্যে তফাৎ কিছু নেই। অপূর্ব বিশ্লেষণ ক'রে তিনি ব'লেছেন "This world is not made up of dead matter alone. It is not the product of the combination of these minute particles called atoms. Until lately, the western Physicists, Chemits and the meterialists believed that these atoms were indivisible units floating in the infinite space attracting and repelling one another mechanically producing the elements of nature and creating the phenomenal world. But now, through the application of electricity.. ...has proved that the so called indivisible atoms can be sub-divided into still finer electrons which are nothing but the force centres of the ancient Hindu scientists. If atoms are made up of electrons and electrons are but force centres, where do they exist ? They exist in the primordial ocean of infinite substance or Brahman, the receptacle of the eternal energy, which in term, the mother of all forces. Then we can understand how matter and force are related to one substance or Brahman. The objective side of the substance appears as matter and the subjective side as spirit". বিজ্ঞান যে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন ক'রতে পারে না তার কারণও তিনি দেখিয়েছেন। বিজ্ঞান জগতের অর্ধাংশ সম্বন্ধে সচেতন মাত্র। "Scientists have studied the objective phenomena which are one part and percel of the sense perception. But the objective world is only one half of the source,.....nor they can discover the

ultimate truth by the study of the objective phenomena only..... Starting from that ground we have to go on to that which is beyond sense perception". বর্ত্তমান যুগের এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যার্ জেম্‌স্ জিন্স্ তাঁর "The New Back Ground of Science" এ বলেছেন "Physical science set out to study a world of matter and radiation, and finds that it cannot describe or picture the nature of either, even to itself.....the advance of knowledge is at present reduced to what Einstein has described as extracting one incomprethensible from another incomprethensible".

বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে, বিজ্ঞানের উন্নতির উচ্চশিখরে বসেও বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এখনও কিছু সাধু-সন্তদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন এবং যাঁরা এইরূপ কিছু কিছু শক্তি প্রদর্শন করেন, তাদের কাছে চিরঋণী হ'য়ে থাকেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস ও নির্ভর ক'রতে নিষেধ ক'রে গেছেন—কারণ তাহলে মানুষ আত্মবিশ্বাসহীন হ'য়ে যন্ত্রপুত্তলিকায় পরিণত হয়। তিনি বলেছেন আমাদের মনের শক্তি অসীম কারণ প্রাণশক্তি বা চিৎশক্তিই তাহার উৎস। লোকে অসাধারণ যা কিছু দেখে তাকেই অলৌকিক ব'লে গ্রহণ করে, যদিও উহা অনন্ত মনঃশক্তির বিকাশ ছাড়া কিছু নয়। মানুষ তীব্র মনঃসংযোগ, একাগ্রতা এবং যোগসাধনার মাধ্যমে প্রসূত মনের শক্তি সঞ্চার ক'রতে পারে এবং তাহার সাহায্যে তারপক্ষে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ বস্তু শ্রবণ ও দর্শন, ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে অপরের মনের কথা জ্ঞাত হওয়া, লঘু শরীর অবলম্বন ক'রে যত্র তত্র ভ্রমণ করা ইত্যাদি অসাধারণ ক্ষমতা আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করে। আমরা যদি আমাদের ব্যষ্টি মনের স্পন্দন (vibrations of our minds) সমষ্টি মনের অনুসরণের সঙ্গে (vibration of the cosmic mind) সমতায় আনতে পারি তাহলে আমরা অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতা ও সম্ভবনার অধিকারী হ'তে পারি। যাকে আমরা অলৌকিক শক্তি বলি তা কেবল বিচারবিহীন অবৈজ্ঞানিক লোকদের কাছে, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও বিচারসম্পন্ন মানুষের কাছে তা লৌকিক, সাধারণ কারণ তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃহত্তর ও সার্বভৌম। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি উল্লেখযোগ্য "The forces of nature that move the world, such as the powers of attraction, gravitation, heat, light, motion, electricity etc, are also operating through, the microcosmic body of a human being ; the difference between them lies only in degree, as on a physical plane, so on the psychical plane. The mental powers which have been from time immemorial exhibited on the human plane of existence, demonstrate the fact that these powers also exist in the cosmic or universal mind, only in an infinitely longer proportion. All mental powers which human mind manifests, proceed from the cosmic mind which is

the store-house of the infinite powers and the infinite phenomena, and which forms the background of individual minds.....So there are many wonderful prodigies in various departments of the psychic field.....like hypnotism, telepathy, or thought transference, mind reading, clarivoyance and clariaudience are the marvellous psychic phenomena .....we must not forget that there are these spaces : physical, mental and spiritual.....The spiritual space is higher than the mental space, and mantal space is behind the physical.....The thought vibrations run more quickly than any other known power of vibration. Therefore, it is said that the mind can go anywhere, to the moon, to the sun, and to all directions through infinite space in no time. Ordinarily, our minds are engaged within the limits of the sense organs and the sense powers. We depend for our perceptions upon these organs or senses, but not with the psychic, as it is different. A psychie does not depend on the sense powers and the sense organs.....But those who are living on the sense plane, depending upon the sense powers, do not realize that mind is the seer and the hearer".

অধুনাতম বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার ক'রছেন যে শুধুমাত্র বিজ্ঞান মানুষের সুখ ও আনন্দ নিশ্চিত ক'রতে পারে না—ইহা কেবল সুখ বা আনন্দের অবস্থা বা পরিবেশ সৃষ্টি ক'রতে পারে। স্যার জেম্‌স্ জিন্‌স্ তাঁর "The New Background of Science" এ বলেছেন "The final picture of the universe emerging from twentieth century physical science was one in which matter was completely eliminated, mind reigning supreme and alone". কতদিন পূর্বেই না স্বামী অভেদানন্দ বলে গেছেন যে সুখ বা দুঃখ আমাদের ইন্দ্রিয়াদির সহজাত প্রকৃতি বা গুণ নয়, বরং ঐসকল ইন্দ্রিয়াদির সরাসরি সংস্পর্শে যে দেহ ও মন আসে তাদের অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। প্রফেসর Errol. E. Hanis তাঁর "Nature, Mind and Modern Science" গ্রন্থে লিখেছেন ".....consequently the existence of God is the absolute and most indispensible pre-supposition of science and so far from there being alienation of science from religion in the modern era, there is and can only be the closest re-approachment between them if both scientific and religious concepts are nightly interpreted".

মহাযোগী-কালী-তপস্বী, যিনি বেদান্তের মূর্ত বিগ্রহ এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, বিশ্ববিখ্যাত ধর্মপ্রচারক, সেই পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ

ধর্মের দুর্বোধ্য, সূক্ষ্ম, জটিল তত্ত্বগুলি অতি সহজ সরল ভাষায়, অসাধারণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি-নৈপুণ্যে সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেশন ক'রে গেছেন তাদের সহজে বোধগম্য হবার জন্য। তিনি গতানুগতিক যুক্তি বিরুদ্ধ মতবাদের বিরুদ্ধে দৃপ্তকণ্ঠে সর্বদাই বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছেন। তাই মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের উক্তি "ধর্ম বর্জিত বিজ্ঞান খঞ্জ, বিজ্ঞান বর্জিত ধর্ম অন্ধ" বিশেষভাবে এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। বিজ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা যে শাশ্বত ধর্মকে অবলম্বন ক'রে ভাগবত জীবনে উন্নীত হওয়া যায়—তা সমাধান করবার যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি বৈজ্ঞানিক পন্থায় ক'রে গেছেন। তিনি বলেছিলেন "বিংশ শতাব্দীতে এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন, যে ধর্ম আধুনিক বিজ্ঞানের নব নব সত্য আবিষ্কারের সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রাখ্‌বে, যার ভিত্তি হবে "বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য" এই তত্ত্বের উপর এবং যা এই বস্তুগত জগতের ক্রমবিকাশের ফলপ্রসূ কারণকে এক এবং অদ্বিতীয় ব'লে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'রবে ও সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সমন্বয়পূর্ণ হবে।

কত স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী মনীষাদীপ্তিত দৃষ্টিই না ছিল এই সর্বত্যাগী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর। তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিরাট মহিমা ও অসাধারণ মনীষার সম্যক পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তথাপি, এই প্রচেষ্টা বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের বাস্তববাদী সাধারণ মানুষকে সঠিক ধর্ম অবলম্বন ক'রতে সাহায্য করুক এই প্রার্থনা।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গুপ্তকাশীর কুণ্ড হইতে তিন মাইল উচ্চে গমন করিলে একটি গরম ও ঠাণ্ডা জলের প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীরা ঐ প্রস্রবণের নিকট অনেক সময়ে পিণ্ডদানাদি-কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বদরিকাশ্রমের পথের সহিত উখীমঠ ও চামৌলী বা লালসাঙ্গা মিলিত হইয়াছে। এই উখীমঠটী প্রধান ও বিশেষ সমৃদ্ধ। এখানে মধ্যবৃত্ত পার্বত্য-অধিবাসীদের জন্য ডাকঘর, থানা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ধর্মশালা, বাজার প্রভৃতি আছে। প্রবাদ আছে যে, বাণরাজার কন্যা উষা এবং এই উষার নাম হইতে উখীমঠের নামকরণ হইয়াছে। হিন্দিভাষী লোকে "ষ" কে "খ" উচ্চারণ করিয়া থাকে। সুতরাং উষা বা উখীমঠ ক্রমে উখীমঠ-নামে পরিচিত হইয়াছে মনে হয়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, পৌরাণিক যুগে এইস্থানে বাণরাজার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। (অবশ্য) পুরাণে বর্ণিত আছে উষা ও অনিরুদ্ধের গুপ্তপ্রণয়ের কাহিনীও।

কেদারনাথের মন্দিরের দ্বার (দরজা) খোলা হয় বৈশাখমাসে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন, এবং কার্তিকমাসে দীপান্বিতার দিন ঐ দ্বার (দরজা) বন্ধ করা হয়। কেদারনাথের পূজারীকে বলা হয় "রাওল" বা "মহান্ত"। অধিকাংশ সময়ে ঐ মহান্ত উখীমঠেই থাকেন। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ দুইজনে ক্রমে উখীমঠে উপস্থিত হইলেন। শোনা যায় যে, ঐ স্থানে মহাভারতের তথা মহাভারতপুরাণের যুগে দানবীর কর্ণ কর্ণপ্রয়াগে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামানুসারে কর্ণপ্রয়াগের নামকরণ করা হইয়াছে। উখীমঠের চারিদিকে ছোট ছোট বহু মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল মন্দিরে উষা, অনিরুদ্ধ, পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তীদেবী, পঞ্চমুখ কেদারেশ্বর ও ওঁকারেশ্বর প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিয়মিতভাবে ঐ সকল দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। উখীমঠ হইতে বদরীনাথের এই আট মাইল পথ গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে। অবশ্য ঐ অরণ্য বা জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝেই চটী দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া ঐ পথে তিনটি পার্বত্য ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তিনটি ঝরণার গভীর ঝরঝর শব্দ গভীর অরণ্যের নিস্তব্ধতাকে উপেক্ষা করিয়া উদাম বেগে ঝরস্রোতা হইয়া বহিয়া যাইতেছে। তাহাতে নিস্তব্ধতার সহিত গভীর শব্দ মিশ্রিত হইয়া প্রকৃতির ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশকে আরও গম্ভীর ও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ দুইজনে প্রকৃতির ঐ অভূতপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে অবশেষে বদরীকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দীর্ঘদিনের আশা ও আকাঙ্খা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া দুইজনেই মহানন্দে "জয় বদরীবিশালকী জয়" বলিয়া বদরীনারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইতে লাগিলেন। ঐ স্থানের মাহাত্ম্য প্রাচীন ও পবিত্র। শোনা যায়, আচার্য শঙ্কর ঐ বদরীনারায়ণতীর্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার পর (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের পর) হইতে বহু ঋষি-মুনি ও মহাত্মা ঐ বদরীকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ-ভগবানের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়াছেন। বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাস বদরীকাশ্রমের কিছুদূর একটি গুহায় তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম ব্যাসগুহা। বদরীকাশ্রমের দুইদিকে দুইটি বিশাল পর্বত যেন প্রাচীর নির্মাণ করিয়া বদরীনাথকে রক্ষা করিতেছে। ঐ দুইটি পর্বতের একটির নাম "নর" ও অপরটির নাম "নারায়ণ"। কিংবদন্তি আছে যে, এইখানে বহু প্রাচীনকালে ঐ পর্বত-দুইটিতে নর ও নারায়ণ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহারপর হইতে তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতিস্বরূপ পর্বত-দুইটির নামাকরণ হইয়াছে 'নর' ও 'নারায়ণ'। পূর্বেই বলিয়াছি যে, কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ বদরীকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া হৃদয়ে অশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। বদরীকাশ্রমে একটি 'উষ্ণকুণ্ড' বা গরমজলের কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের জল বারোমাসই গরম থাকে। তীর্থযাত্রীরা ঐ উষ্ণকুণ্ডের জলে স্নান করিয়া পথক্লান্তি দূর করেন। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজও ঐ উষ্ণকুণ্ডে স্নান করিয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিলেন। তাঁহারা তিনদিন তিনরাত্রি বদরীকাশ্রমতীর্থে অতিবাহিত করিলেন এবং প্রতিদিন বদরীকাশ্রমে বদরীনারায়ণের পূজাদি সমাপন করিয়া যাত্রীগণের নিকট মাধুকরী করিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতেন।

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(সাত)

ডক্টর শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর বাংলা 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থে আলঙ্কারিক কুন্তকের কাব্যতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রে লিখেছেন: "কুন্তক-কথিত বক্রোক্তি কেবলমাত্র একটি অলংকার নহে, কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজনে কাব্যরচনাকারী কবির প্রতিভাসমুদ্ভাবিত উপাদানই শব্দ, অর্থ, রীতি, গুণ, অলংকার, ধ্বনি, রস—সবই এই বক্রোক্তির অন্তর্গত"। প্রকৃতপক্ষে আলঙ্কারিক কুন্তক 'বক্রোক্তিজীবিতম্'-গ্রন্থের ১।৭ শ্লোকে বলেছেন—

'শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি॥

কুন্তক স্বভাষ্যে বলেছেন: "শব্দার্থৌ কাব্যং বাচকো বাচ্যং চেতি দ্বৌ সংমিলিতৌ কাব্যম্। দ্বাবেকমিতি বিচিত্রৈবোক্তিঃ। তেন যৎকেবাঞ্চিন্মাত্রং কবিকৌশলকল্পিতকমনীয়তাতিশয়ঃ শব্দ এব কেবলং কাব্যমিতি কেষাঞ্চিৎ বাচ্যমেব রচনাবৈচিত্র্যচমৎকারকারি কাব্যমিতি, পক্ষদ্বয়মপি রিক্তং ভবতি। তস্মাদ্ দ্বয়োরপি প্রতিতিলমিব তৈলং তদ্বিদাহ্লাদকারিত্বং বর্ণ্যতে, ন পুনরেকস্মিন্ ··।" পরে তিনি পুনরায় বলেছেন: "অত্র হি শুষ্কতর্কবাক্যবাসনাধিবাসিত-চেতসা প্রতিভাপ্রতিভাতমাত্রমেব বস্তু ব্যসনিভরা কবিনা কেবলমুপনিবদ্ধম্। ন পুনর্বচিক-বক্রতাবিচ্ছিত্তিলবোঽপি লক্ষ্যতে···"। ভাষ্য সুদীর্ঘ, সুতরাং এ'পর্যন্তই কুন্তকের বক্তব্যের উল্লেখ করি। ডক্টর শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় আলঙ্কারিক কুন্তকের এই ব্যাখ্যাকে (চারটি কাব্যলক্ষণকে) অপূর্ব ও আভিপ্রায়িক বলে মন্তব্য করেছেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "কুন্তক বলিতে চাহেন যে, কবিপ্রতিভার অপূর্ব স্পর্শে প্রচলিত শব্দার্থই এরূপ বিদগ্ধভণিতি-বিচ্ছিত্তিতে নিবদ্ধ হয় যে, তাহারা অতিশয় গৌরব ও শোভা লাভ করে। কাব্যে কবিপ্রতিভাজাত এই বৈদগ্ধ্যভঙ্গী 'ভণিতি'[১] থাকিতে হইবে। সর্বশেষে কুন্তক বলিয়াছেন যে, এইরূপ রচনাকে 'তদ্বিদাহ্লাদকার' করিতে হইবে"।[২] অবশ্য এ' মন্তব্যের মধ্যে সাবলীলতার পরিবর্তে কিছুটা বক্রতাকাঠিন্য বর্তমান। সেজন্য কুন্তকের শ্লোকের ও ভাষ্যের মর্মার্থকে সহজ করার জন্য আমরা ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-লিখিত 'কাব্যবিচার'-গ্রন্থ থেকে তাঁর মন্তব্যের উল্লেখ করি। ডক্টর দাশগুপ্ত লিখেছেন: "ধ্বনিকেও তিনি (কুন্তক) বক্রতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাঁহার উপচারবক্রতা আনন্দবর্দ্ধনের লক্ষণামূল-ধ্বনির অনুরূপ। আনন্দবর্দ্ধনাদির ন্যায় তিনি (কুন্তক) ধ্বনিকেই একমাত্র কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন না। ইঁহাদের মতে[৩] ধ্বনি

১। কুন্তকের উদাহরণ—

'তব তরলি রমণমন্দিরমাপতন্তিমুদ্বেল্লমুখি।
যদি সন্নীলোল্লাপিনি গচ্ছসি তৎ কিং ত্বদীয়ং যে॥—প্রভৃতি

২। 'পুস্তকশ্রী'-প্রকাশিত, 'ধ্বন্যালোক', পৃষ্ঠা ৭০-৭৪ দ্রষ্টব্য।

৩। কুন্তক ও আনন্দবর্দ্ধনের মতে।

প্রধান নয়, ধ্বনি গৌণ বা ত্যক্ত। বক্রোক্তিই প্রধান, ধ্বনি তাহার অন্তর্ভূক্ত।···পদ-বক্রতা, রচি-বক্রতা, পর্যায়-বক্রতা ও উপচার-বক্রতা স্থলেও কুন্তক ধ্বনি অস্বীকার করেন নাই।···কুন্তক যে কেবলমাত্র লক্ষণামূলক ধ্বনি স্বীকারই করিয়াছেন—তাহা নহে, তিনি বস্তুধ্বনি এবং রসধ্বনি ও অলংকারধ্বনি—এই ত্রিবিধ ধ্বনিও স্বীকার করিয়াছেন"।[৪]

কুন্তক বস্তুধ্বনি, রসধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি স্বীকার করেছেন—যেমন আনন্দবর্দ্ধন রসধ্বনি, ভাবধ্বনির মতো রসাভাস ও ভাবাভাস স্বীকার করেছেন। আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধন ধ্বন্যালোকের ২।৩ উদ্যোতে বলেছেন : "তত্র—

রস-ভাব-তদাভাস তৎ-প্রশান্তাদিরক্রমঃ।
ধ্বনেরাত্মাঙ্গিভাবেন ভাসমানো ব্যবস্থিতঃ॥ ৩

রসাদিরর্থো হি সহৃদয় বাচ্যেনাবভাসতে। স চাঙ্গিত্বেনাবভাসমানো ধ্বনেরাত্মা"।

অর্থাৎ রসাদি অর্থ যেন বাচ্যের সঙ্গে একত্রই অবভাসিত হয় ও অঙ্গীরূপে ভাসমান বা প্রতীয়মান হলে তা ধ্বনির আত্মা (প্রাণ) হয়।

ডক্টর শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর বাংলা-সংস্করণ ধ্বন্যালোকে[৫] বাসুদেব-ব্যাখ্যার উল্লেখ ক'রে বলেছেন : অসংলক্ষ্যক্রম ও সংলক্ষ্যক্রম—এ'দুটি ধ্বনির মধ্যে রস, ভাব, রসাভাস, রসশান্তি, ভাবশান্তি প্রভৃতি বলতে ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশবলতা প্রভৃতির অন্তর্নিবেশ আছে। তার মধ্যে রসধ্বনি ও ভাবধ্বনির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"রসধ্বনি—'কাব্যপ্রকাশ'-কার বলেন : 'ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ীভাবো রসঃ স্মৃতঃ'—স্থায়ীভাব হইতেই রসধ্বনি হয়।

ভাবধ্বনি—পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলেন : 'বিভাবাদিব্যঞ্জ্যমানহর্ষাদ্যন্যতমত্বং তত্ত্বম্'—অর্থাৎ 'ভাবধ্বনিত্বম্'—বিভাবাদির দ্বারা হর্ষ প্রভৃতি সাকাঙ্ক্ষীভাবের ব্যঞ্জনা হইলে ভাবধ্বনি হয়"।

'ভাব' কাকে বলে? সে'সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের অভিমত উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন—

'সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ।
উদ্বুদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥'

অর্থাৎ প্রধান প্রধান সঞ্চারীভাব, দেবাদিবিষয়ক রতি ও উদ্বুদ্ধমাত্র স্থায়ীভাবকে ভাব বলে। তারপর রসাভাব ও ভাবাভাস-সম্পর্কেও তিনি সাহিত্যদর্পণের উক্তি দিয়ে বলেছেন : 'অনৌচিত্যপ্রবৃত্তত্বে আভাসৌ রসভাবয়োঃ', অর্থাৎ ঔচিত্যহীনতা সত্ত্বেও রস ও ভাবের আভাস (প্রকাশ) হয় রস ও ভাব যদি থাকে। তাছাড়া ডক্টর বিমলাবাবু সাহিত্যদর্পণ থেকে ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবলতার (যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে—তার) উল্লেখ করেছেন : 'কাব্যস্য শান্তাবুদয়ে সন্ধিমিশ্রিতয়োঃ ক্রমাৎ, ভাবস্য শান্তিরুদয়ঃ সন্ধিঃ শবলতা মতা', —অর্থাৎ ভাবের উপশম, উদয়, সন্ধি ও মিশ্রণ হলে যথাক্রমে ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবলতার প্রকাশ হয়। আসলে সকল কাব্যেই রস প্রভৃতি থাকে, রসাদি ছাড়া

৪। কাব্যবিচার, পৃঃ ৮৫-৮৬।
৫। পুস্তকশ্রী-প্রকাশিত, ৩০/১, কলেজ রো, কলি-৯।

কোন কাব্যই সৃষ্টি ও সার্থক হতে পারে না, কেননা রসই কাব্যের প্রাণ। শুধু কাব্য কেন, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতিও রসস্পর্শ ছাড়া প্রাণবান হতে পারে না। কাব্য ও কাব্যের অলঙ্কার-সম্বন্ধে কুন্তক প্রথমোন্মেষের দ্বিতীয় ষষ্ঠ শ্লোকগুলিতে বিশেষভাবে বলেছেন—

'লোকোত্তরচমৎকারকারিবৈচিত্র্যসিদ্ধয়ে।
কাব্যস্যায়মলঙ্কারঃ কোঽপ্যপূর্বো বিধীয়তে ॥'

ভাষ্যে কুন্তক লিখেছেন: "অলংকারো বিধীয়তে অলংকরণং ক্রিয়তে"। কাব্যকে কবিকৃতি বা কবিকর্ম বলে। এই কবিকৃতি অলঙ্কারমাধুর্যে পূর্ণ না হ'লে মনোহারী কাব্য বলে পরিচিত হয় না। নাটকে এবং সঙ্গীতেও কথাপূর্ণ ও কাব্যসুষমাপূর্ণ পাঠ্য বা সাহিত্য থাকে। কুন্তক বলেছেন অলঙ্করণ কার প্রয়োজন? "কস্য—কাব্যস্য। কবেঃ কর্ম কাব্যং তস্য।...তদপূর্বস্য তদুৎকৃষ্টস্য তদ্বিকৃষ্টস্য চ দ্বয়োরপি সংভবতীত্যাহ—কোঽপি, অলৌকিকঃ সাতিশয়ঃ"। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট দু'রকম কবিকৃতির মূল্যই একদিক থেকে সমান—রচনাচাতুর্য ও রচনাবিকৃতির জন্য। তবে উৎকৃষ্ট ও রসসমৃদ্ধ কাব্য ও সাহিত্য বা পাঠ্যকে অলৌকিক বা "লোকোত্তরচমৎকারিবৈচিত্র্য-সিদ্ধয়ে অনাসাদ্যাহ্লাদবিধায়িবিচিত্রভাবসম্পাদনায়",—আহ্লাদজনক ও চিত্তমনোহারী রচনা-বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিও সেখানে অধিক। কাব্যশরীরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে 'শোভাতিশয়কারিত্ব' —'অলঙ্কারস্য শরীরস্য (কাব্যশরীরস্য) শোভাতিশয়কারিত্বাম্ মুখ্যতয়া...'। তাছাড়া—

'ধর্মাদিসাধনোপায়ঃ সুকুমারক্রমোদিতঃ।
কাব্যবন্ধোঽভিজাতানাং হৃদয়াহ্লাদকারকঃ ॥'

কুন্তক এর ভাষ্যে বলেছেন: "হৃদয়াহ্লাদকারী কশ্চিত্তানন্দজনকঃ কাব্যবন্ধঃ সর্গবন্ধাদিভবতীতি সম্বন্ধঃ।...সুকুমারঃ সুন্দরঃ সহৃদয়হৃদয়হারী ক্রমঃ পরিপাটিবিন্যাসস্তেনোদিতঃ কথিতঃ সন্..."।

সুকুমার ও অনিন্দ্যসুন্দর কাব্য। চতুর্বর্গ বলতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-ফলদায়ী এবং এটিই কাব্যবন্ধের পুরুষার্থ। সেজন্য কুন্তক তার উত্তরে উল্লেখ করে ভাষ্যে বলেছেন: "যোঽসৌ চতুর্বর্গলক্ষণঃ পুরুষার্থস্তদুপার্জনবিষয়ব্যুৎপত্তিকারণতয়া কাব্যস্য পারম্পর্যেণ প্রয়োজনমিত্যুক্তঃ... কিমপি সহৃদয়হৃদয়সংবাদসুভগং তদাস্বাদনীয়ং প্রয়োজনান্তরমভিধাতুমাহ—

'চতুর্বর্গফলাস্বাদমপ্যতিক্রম্য তদ্বিদাম্।
কাব্যামৃতরসেনান্তশ্চমৎকারো বিভন্যতে ॥'

কুন্তক ভাষ্যে 'চতুর্বর্গফলাস্বাদঃ...' প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন: 'যোঽসৌ চতুর্বর্গ-ফলাস্বাদঃ প্রকৃষ্টপুরুষার্থতয়া সর্বশাস্ত্রপ্রয়োজনত্বেন প্রসিদ্ধঃ সোঽপি কাব্যামৃতচর্বণচমৎকার-কলামাত্রস্য ন কামপি সাম্যকলনাং কর্তুমর্হতীতি'। পরবর্তী ৬ষ্ঠ শ্লোকে আলঙ্কারিক কুন্তক কাব্য যে অলঙ্কারসমৃদ্ধ ও রসপূর্ণ হওয়া উচিত সে'সম্পর্কে বলেছেন: "তদুপায়তয়া তদ্বৎ সালংকারস্য কাব্যতা", অর্থাৎ 'তদ্বৎ সালংকারস্য কাব্যতা'। অন্যত্র পরমার্থ—সালংকার্যা-লংকরণসহিতস্য সকলস্য নিরন্তরাবয়বস্য যতঃ সমুদায়স্য কাব্যতা কবিকর্মত্বম্"। প্রকৃতপক্ষে কথাই তাই যে, কবিকৃতি বা কবিকর্ম কাব্যের সরসতা, চমৎকারিতা ও আহ্লাদজনকত্ব বজায় রাখতে হ'লে অলংকরণরূপ অঙ্গভূষণ অলংকারের একান্ত প্রয়োজন।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : পণ্ডিত পদ্মলোচন ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

॥ চার ॥

লীলাবার্তা :

[পদ্মলোচন ও ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা]

সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিদায় গ্রহণের পরেও পণ্ডিত পদ্মলোচন তাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে নানা কথা ভাবতে থাকেন এবং তাঁর মহিমা বিষয়ে যতই চিন্তা করেন, ততই অবাক্ ও বুদ্ধিহারা হ'য়ে পড়েন। এইরূপে তাঁর সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে ইনি ক্রমশঃ তাঁর প্রতি এক দুর্নিবার টান ও মমতায় অস্থির হ'য়ে ওঠেন। বস্তুত চুম্বকের আকর্ষণে লোহার যে অবস্থা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের টানে এঁর অবস্থা সেইরূপ হ'য়ে ওঠে। শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে—সমস্ত অবস্থাতেই এঁর অন্তরে তার ক্রিয়া একই ভাবে চলতে থাকে। কখন ইনি আহ্লাদে মৃদু মৃদু হাসেন, আবার কখন বিমর্ষভাবে অশ্রু বিসর্জন করেন। আলো ও আঁধারের বিচিত্র খেলায় ইনি ক্রমশঃ অধীর হ'য়ে ওঠেন।

'বুদ্ধিশুদ্ধিহারা এবে ভাবে মনে মন।
যা দেখিনু যা শুনিনু সত্য কি স্বপন॥
মনচিত্ত দিবারাত্র ভাবিছে প্রভুকে।
লোহার অবস্থা যেন টানিলে চুম্বকে।
প্রকৃত সঠিক তত্ত্ব করিতে নির্ণয়।
পণ্ডিত অস্থিরচিত্ত হইল অতিশয়॥'—পুঁথি, ১২৩

পক্ষান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণও এই ভাগ্যবান সাধক-পণ্ডিতের প্রতি প্রবল প্রেমে আসক্ত হ'য়ে পড়েন এবং প্রায় প্রতিনিয়তই এঁর নিকট যাওয়া-আসা ক'রতে থাকেন। এইভাবে অচিরেই উভয়ের মধ্যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও সুমধুর প্রেম-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তার ফলে, পদ্মলোচন শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা আরও গভীরে অনুভব ক'রতে থাকেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে এঁর মানসিক দ্বন্দ্বও ক্রমশঃ প্রশমিত হ'তে থাকে।

গঙ্গাতীরস্থিত ঐ বাগানবাড়িতে পণ্ডিত পদ্মলোচনের অবস্থানের সংবাদ অবিলম্বে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে, প্রায় প্রতিদিনই সেখানে এঁর নিকট নানা স্থান থেকে জিজ্ঞাসু পণ্ডিতগণ ও ধর্মানুরাগী ভক্তবৃন্দেরা সমাগত হ'তে থাকে। অসুস্থতা সত্ত্বেও ইনি নিরলসভাবে সমাগত সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ও তাঁদের প্রশ্নগুলির উত্তরদানে তাঁদের চরিতার্থ করতে থাকেন। এঁর অধ্যক্ষতায় কোন কোন দিন সেখানে পণ্ডিতগণের বিচারসভাও অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে।

ঐ বাগানে অবস্থানকালে ইনি দূরান্তরের অনেকের জিজ্ঞাসার সমাধানকল্পে, পত্রে নিবন্ধ লিখেও উত্তরদান ক'রতে থাকেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সেখানে থাকাকালেই ইনি ক'লকাতার বিখ্যাত পণ্ডিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ এবং আরও বহু পণ্ডিতের সঙ্গে পত্রে লিখিত নিবন্ধে শাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের বিচার-মীমাংসা করেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেন—"আমি এদেশে এসে ক'লকাতার পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের পিতা উৎসবানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে লিখে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বিচার ক'রেছি, সে সমস্ত পড়ে আপনাকে শোনাব। আপনি শুনলে আমার সে-সব বিচার করা সার্থক হবে।"—চরিত—১ম। ১০২।

যা হোক, ইনি উৎসবানন্দকে যে পত্রখানি লেখেন, সেটি শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়ে শোনান। এ-বিষয়ে ঠাকুরের নিজ উক্তি,—"[পদ্মলোচন] বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার ক'রেছিল। আমায় আবার [পদ্মলোচন] ব'ল্‌লে,—"আপনি একটু শুনুন"।"—কথামৃত—১ম। ৬।১।১১২।

তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে, নিজ অন্তরের 'ভক্তসঙ্গ' করার দুর্নিবার বাসনার কথাটি জানান। তার উত্তরে, স্নেহবশে ইনি তাঁকে ঐ বিষয়ে সর্বদাই সজাগ থাকার জন্য উপদেশ দেন—"ভক্তের সঙ্গ ক'রব, এ কামনা ত্যাগ করো; নচেৎ নানারকমের লোক তোমায় পতিত ক'রবে।"—কথামৃত-১ম। ৬।১।১১১।

আর একদিন ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের বিষয়টি এঁকে বলেন। তা শুনে ইনি তাঁকে বুঝান—"ওসব ত্যাগ ক'রেছ কেন? এটা টাকা, এটা মাটি—এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়।"

তার উত্তরে এঁকে ঠাকুর সবিনয়ে বলেন,—"কে জানে বাপু, আমার টাকাকড়ি, ওসব ভালো লাগে না।"—কথামৃত-১ম। ৬।১।১১২।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধিকাংশ দিনই ভাগ্নে হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে সেই বাগানবাড়িতে পণ্ডিত পদ্মলোচনের নিকট উপস্থিত হ'তেন। আবার মধ্যে মধ্যে ইনিও নিজ পুত্রকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ঠাকুরের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। সেই পুত্র ঠাকুরকে সঙ্গে ক'রে ঐ বাগান-বাড়িতে এঁর নিকট নিয়ে আসতেন।

[ঠাকুর কর্তৃক পণ্ডিতের সিদ্ধাই হরণ]

'পরস্পর দেখা শুনা হয় বারম্বার।
পণ্ডিতের প্রতি হৈল কৃপার সঞ্চার॥
সত্যতত্ত্ব-অন্বেষক উদার সরল।
সন্দেহ মোচনে প্রভু করিলা কৌশল॥'—পুঁথি, ১২০

একদিন বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ কোনও জটিল তত্ত্বের সুমীমাংসার জন্য ঐ বাগানবাড়িতে সম্মিলিত হন। তাঁদের উদ্দেশ্য, তাঁরা ঐ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর পদ্মলোচনের সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণ ক'রবেন।

ঘটনাচক্রে সেদিন ঐসময় সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরও উপস্থিত হন। তিনি ৺জগদম্বার প্রেরণায় 'ভাবমুখে' তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিচার-মীমাংসায় আশ্চর্য সাফল্যের গূঢ় রহস্যটি, অর্থাৎ এঁর 'সিদ্ধাই' শক্তির ওষ্ঠকলা-কৌশল অবগত হন।

"ঠাকুর বলিতেন, জগদম্বা তাঁহাকে পণ্ডিতজীর সাধনলব্ধ শক্তি সম্বন্ধে একটি গোপনীয় কথা ঐ সময় জানাইয়া দেন। তিনি জানিতে পারেন, সাধনায় প্রসন্না হইয়া পণ্ডিতজীর ইষ্টদেবী বরপ্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এতকাল ধরিয়া অগাধ পণ্ডিতসভায় অপর সকলের অজ্ঞেয় হইয়া আপন প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন।"—লীলাপ্রসঙ্গ- ৪র্থ। ১০২।

'অদ্যাপি এ সন্ধান কেহ নাহি জানে।
সংগোপনে প্রাপ্ত যেন রক্ষা সংগোপনে॥
জগতে যাবৎ সব বিদিত প্রভুর।
ভাবমুখে অবস্থিত অচেনা ঠাকুর॥'—পুঁথি, ১২৪

অন্তর্যামী ঠাকুর সেদিন সুকৌশলে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জলপূর্ণ ঐ গাড়ু ও গামছাখানি একান্ত গোপনীয় স্থানে লুকিয়ে রাখেন। তারপর যথাসময়ে সেই বিচারসভায় গমনের সময় ইনি ঐ গাড়ু ও গামছাটি নিতে যান। কিন্তু ইনি দেখেন যে, যেখানে তা সর্বদাই রাখা থাকত, সেখানে নেই। তখন ইনি ব্যস্তভাবে সেই ঘরের সর্বত্রই তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজেন; কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পান না। তার ফলে, ইনি বিশেষ বিচলিত ও বিপন্ন হ'য়ে পড়েন।

অবশেষে, ইনি বুঝতে পারেন যে, অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ এঁর রহস্য-বিদ্যাটি জানতে পেরেছেন এবং এঁর 'সিদ্ধাই' শক্তিটি হরণের জন্য ঐ গাড়ু ও গামছা নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।

'ভৃঙ্গার গামছা তাঁর ভেল্‌কির মূল।
যথাস্থানে না পাইয়া চিন্তায় আকুল॥
যাহার আধার বিনা হারা-বুদ্ধি বল।
পশ্চাতে জানিল ইহা প্রভুর কৌশল॥'—পুঁথি, ১২৫

[পণ্ডিত কর্তৃক ঠাকুরকে ইষ্টরূপে দর্শন]

তর্কালঙ্কার মহাশয় তখন ব্যাকুলচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধানে ব্যাপৃত হন। কিন্তু তাঁকে ইনি কোথাও খুঁজে পান না। অবশেষে, ইনি ঐ সভাস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তখন ইনি দেখেন যে, সেখানে এঁর জন্য রক্ষিত আসনের পাশে স্বয়ং ইষ্টদেবী জগদম্বা সশরীরে ব'সে আছেন।

এঁর ঐ অদ্ভুত দর্শন চোখের ভ্রম না যথার্থই—তা নিরূপণের জন্য ইনি বারবার নিজের চোখদু'টি ঘষছেন। তবুও সাদা চোখে পরিষ্কার দেখেন যে, সেখানে সত্যি-সত্যিই সাক্ষাৎ ইষ্টদেবী মহাকালিকা উপবিষ্টা রয়েছেন।

এইরূপে যখন ইনি সেই আশ্চর্য দর্শন সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য একান্তই ব্যাকুল, সে-সময় দেখেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর সহসা এঁর সম্মুখে আবির্ভূত—সহাস্য বদনে দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ।

তখন ইনি নিজেকে আর কোনক্রমে সংবরণ ক'রতে না পেরে, ভক্তি-আপ্লুত চিত্তে তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে ভূলুণ্ঠিত হন এবং সজল নয়নে গদগদ কণ্ঠে তাঁকে সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি জগন্মাতা জ্ঞানে সুমধুর স্তব-স্তুতি করেন।

'ছুটিল সন্দেহ-তমঃ উদিল চেতন।
প্রভু তাঁর ইষ্টদেবী করে নিরীক্ষণ॥
পদপ্রান্তে উপবিষ্ট বিহ্বল আতুর।
ইচ্ছা দেখে আঁখিভরে প্রেমের ঠাকুর॥

কিন্তু তার এবে নাহি পূরিল কামনা।
অবরিল অশ্রুজল দিল তাহে হানা॥
আঁখি দৃষ্টি রুদ্ধ দেখি গদগদ স্বরে।
ইষ্টজ্ঞানে প্রভুদেবে স্তব-স্তুতি করে॥'—পুঁথি, ১২৪

যা হোক পণ্ডিতজীর আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন রঙ্গচ্ছলে এঁর ঐ 'সিদ্ধাই' শক্তিটি হরণ ক'রে নেন। আর ঠাকুরের মহোচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে এঁর মনে তখনো সংশয়-দ্বন্দ্বের যে ক্ষীণ স্রোতটি প্রবাহিত ছিল, তাঁর দিব্য স্বরূপদর্শন ক'রে সমূলে তার নিরসন ঘটে।

[পণ্ডিত কর্তৃক ঠাকুরকে অবতার জ্ঞান]

একদিন হৃদয়রাম কথাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত পদ্মলোচনকে বলেন,—"অনেক বড় বড় পণ্ডিত মামাকে অবতার বলেন। কিন্তু সে-কথা থাক। মশাই, আপনি এঁকে কি বলেন?"

হৃদয়ের এই কথা শুনে পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে কিছুটা উত্তেজিত হ'য়ে পড়েন; তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন,—"অবতার। এঁকে অবতার ব'ললে তো সামান্যই বলা হয়। এঁর যদি কৃপা হয় তো অনেকে অবতার হ'তে পারেন।"

পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে এ-কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর এঁকে বলেন—"ওগো। তুমি রাজার সভাপণ্ডিত; তুমি যে আমাকে এত মান্য ক'রছ, কি জন্যে?

উত্তরে পদ্মলোচন ভক্তি গদগদ স্বরে তাঁহাকে জানান,—আপনার পায়ের ধুলা পেলে কত শত মহামূর্খ আমার চেয়েও বড় পণ্ডিত হ'তে পারে।"

তারপর ইনি একটু নীরব থেকে আবার বলেন,—"মশাই, অবতার তো সামান্য কথা; যাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে অবতারদের উৎপত্তি হয়, আপনি স্বয়ং সেই তিনি। আচ্ছা, আমি আপনাকে যা ব'লবুম, তা কারুর সাধ্য থাকে খণ্ডন করুক; আমি শাস্ত্রমতে তর্ক ক'রতে প্রস্তুত আছি।"

'উচ্ছ্বাস বিগতে পুনঃ কহে আরবার।
আপনি স্বয়ং সেই ঈশ্বরাবতার॥'—পুঁথি, ১২৪

"তদবধি পণ্ডিতজী ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেন ও তদ্রূপ ভক্তি করিতেন।.....

"ইহার বহুকাল পরে ঠাকুরের কলিকাতার ভক্তেরা যখন তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছে এবং ভক্তির উত্তেজনায় তাহাদের ভিতর কেহ কেহ ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রকাশ্যে নির্দেশ করিতেছে, তখন ঐ সকল ভক্তের ঐরূপ ব্যবহার জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান এবং ভক্তির আতিশয্যে তাহারা ঐ কার্যে বিরত হয় নাই, কয়েক দিন পরে এ-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিরক্ত হইয়া একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"কেউ ডাক্তারি করে, কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে বসে অবতার ব'ল্‌লেন। ওরা মনে করে, 'অবতার' ব'লে আমাকে খুব বাড়ালে—বড় ক'রে। কিন্তু ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি? ওদের এখানে আসবার ও 'অবতার' বলবার ঢের আগে পদ্মলোচনের মত লোক—যারা সারাজীবন ঐ বিষয়ের চর্চায় কাল কাটিয়েছে, কেউ ছটা দর্শনে পণ্ডিত, কেউ তিনটে দর্শনে পণ্ডিত—কত সব এখানে এসে অবতার ব'লে গেছে। অবতার বলায় তুচ্ছ জ্ঞান হয়ে গেছে। ওরা অবতার ব'লে এখানকার (আমার) আর কি বাড়াবে বল?"—লীলাপ্রসঙ্গ-৪র্থ। ১০৩—১০৫।

(ক্রমশঃ)

●

॥ দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে ॥

॥ বাঙ্গালোর ॥

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

২৭শে ডিসেম্বর। রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে গাড়ী ছাড়ল মহীশূর ষ্টেশন হতে—বাঙ্গালোর পৌঁছে গেলুম ভোর ৫।০টায়। মহীশূরের রাজধানী বাঙ্গালোর ভারতের সুরম্য শহরগুলির অন্যতম। ষ্টেশন-চত্বরের এমন অপরূপ সজ্জা অন্য কোথাও দেখিনি। বড় বড় ইউক্যালিপ্‌টসের বৃক্ষ-শোভিত দুপাশের পথ। সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত শহরটির উচ্চতা প্রায় ৩০০০´ ফুট। আমেজী ঠাণ্ডা। বাঙ্গালোর শব্দের ইংরাজী অর্থ হল 'The town of the boiled beans'—'সিদ্ধ সীমের শহর।' এই অদ্ভুত নাম করণের কোন কারণ খুঁজে পাইনি। তবে এই শহরের ঐতিহাসিক পটভূমিকা হল ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন সাহসী সেনাধ্যক্ষের একটি মৃত্তিকা দুর্গ নির্মাণ হতে—তারপর দুইশত বৎসর অতিক্রান্ত হল। তখন হায়দর আলি এটি প্রস্তর-নির্মিত করেন। তাঁর পুত্র টিপু এর আরও উন্নতি সাধন করেন। অষ্টাদশ শতকে এটি একটি সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে ওঠে। তারপর হতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এই শহরটি।

প্রাতরাশ শেষ করে সকল ১১০টায় বেরিয়ে পড়লুম একদল যাত্রীসহ। Sandal Soap Factory বা "চন্দন-সাবানের কারখানা" দেখতে। দরজা খুলল ১০-১৫ মিনিটে। প্রবেশ-পথের বামপার্শ্বেই 'চন্দন' আর 'জেস্‌মিন্' সাবানের বিক্রয়কেন্দ্র—নীচেই একটি ছোট চন্দন গাছ। চন্দন-সাবান প্রস্তুত কারখানাটি দর্শনের জন্য অনুমতি নিয়ে একজন প্রদর্শক (Guide) চললেন মূল কারখানাটিতে যেখানে চন্দন-সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত হচ্ছে। তারপর ক্রমান্বয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন সাবান প্রস্তুতের প্রণালী। প্রথমে বিরাট ছুটি পাত্রে দ্রব অবস্থায় রক্ষিত সাবানের উপাদান দেখালেন। দ্বিতীয় স্তরে সেটি কিভাবে পর্যায়ক্রমে এসে পরিশেষে কঠিন সাবানের আকারে বেরিয়ে আসছে সেগুলিও দেখালেন। দেখে বেশ বিস্ময় জাগে। অনেকক্ষণ যাবৎ সকলেই প্রস্তুতকরণের প্রণালীগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে আনন্দ পাই। কোথাও বা সাবানের মোড়কগুলিই প্রস্তুত হচ্ছে কোথাও স্ত্রী-পুরুষ কর্মীরা অবিরত সেগুলি মোড়কজাত করছে। সেখান হতে বাহির দরজায় বিক্রয়কেন্দ্রে এসে অনেকে সারিবদ্ধভাবে (que) দাঁড়িয়ে সাবান ক্রয় করতে শুরু করে দিলেন। এদিকে সময় সংক্ষেপ। কর্তৃপক্ষ তাগিদ্ দিচ্ছেন সত্বর বাইরে এসে অন্য দর্শনীয়গুলি দেখার জন্য।

সেখান হতে চলে এলুম সেনানীবাস অঞ্চলে (Cantonment Area) উল্‌সুর লেক দেখতে। তেমন কিছু চিত্তাকর্ষক নয়। এর চেয়ে শিলংএর উমিয়াম লেক্ অনেকাংশে দর্শনীয় ও উপভোগ্য। অন্যান্য লেকের মত এখানেও নৌকা-বিহারের ব্যবস্থা আছে যেমন আছে নৈনীতাল ও উমিয়াম লেকেও। তারপর যাদুঘর (Museum) পাশে রেখে একেবারে প্রবেশ করলুম বিশ্বেশ্বরাইয়া ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ও টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটে। মুগ্ধ হতে হয় চতুর্থশ্রেণী বিশিষ্ট এই প্রদর্শনীটি দেখে। একদিনে সব কিছু দেখে শেষ করা যায় না। বিশেষ করে উপযুক্ত একজন প্রদর্শক (Guide) থাকা দরকার। তবু মন ভরে ওঠে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমবিকাশের বিবিধ আকর্ষণীয় পর্যায়গুলি দেখে। যেমন টেলিফোন আবিষ্কারের প্রথম যন্ত্রটি কেমন ছিল এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নতির ফলে বর্তমানে কি পর্যায়ে এসে সেটি পৌঁছেছে। এমন কত রকমের যন্ত্রপাতি তার উদ্ভবকালের পর হতে কেমন করে আধুনিক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেগুলি স্বচক্ষে দেখে একটা ধারণা আসে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সামান্য কিছুই দেখা যায় মাত্র। এরূপ একটি প্রদর্শনশালা ভারতে দ্বিতীয় কোথাও নাই। ছুটির দিন ও সোমবার ব্যতীত প্রত্যহ বেলা ১০টা হতে ১টা এবং ২টা হতে পাঁচটা পর্যন্ত সাধারণের জন্য এটি উন্মুক্ত থাকে। কোন দর্শনী নাই। মাত্র ১।০ ঘন্টার মধ্যে সংক্ষেপে ষোড়শা পর্যন্ত দেখে মহীশূর-রাজ্যের নবনির্মিত বিধান-সভাভবনের পাশ দিয়ে চলে এলুম কুবন পার্কে। নানা জাতের পুষ্পশোভিত উদ্যানটি বিশেষ মনোরম। মাঝে মাঝে পথচারী ও দর্শনার্থীদের বিশ্রামের জন্য বেঞ্চ পাতা। সেখান হতে অল্প দূরত্বের ব্যবধানেই 'লালবাগ গার্ডেন' মহীশূর রাজাদের নির্মিত। কলিকাতার বোটানিকেল গার্ডেনের মত। বিশাল আয়তন, নানাপ্রকার দেশী-বিদেশী-গাছের সমারোহ উদ্যানটিতে। মোটর চালক গাড়ী ঘুরিয়ে সমগ্র অঞ্চলটি দেখিয়ে দিল। সেখান হতে চলে এলুম টিপু সুলতানের রাজপ্রাসাদে যেটি নির্মিত হয়েছিল ১৭৭৮-৮১ সালের

মধ্যে। তবে এটি শ্রীরঙ্গপত্তনমে অবস্থিত টিপুর গ্রীষ্মাবাসের মত দেওয়াল-চিত্রশোভিত ও অলঙ্কৃত নয়। একটি প্রাচীন বাড়ীর নিদর্শন মাত্র বলা যেতে পারে। দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে চলে। ট্যাক্সি ছুটল 'বুল টেম্পল' দেখাতে। এটির এত মূল্যায়নের প্রথম ও প্রধান কারণ সুবিশাল নন্দীমূর্তি বা শিবের বাহনের জন্য। পৌঁছে গেলুম 'বুল টেম্পল'। মন্দিরমধ্যে দেবতা—সিমেন্ট-নির্মিত সুবৃহৎ ষণ্ড-জোড়া বৃষ মূর্তি। সারা দক্ষিণ-ভারতে এত বড় নন্দীমূর্তি আমরা দেখিনি। তার সারা দেহ প্রদক্ষিণ করে গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দিলাম। ফিরে এলুম বাঙ্গালোর ষ্টেশনে সংরক্ষিত বগিটিতে বেলা ১-২০ মিনিটে।

মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রামের পর বৈকাল ৪টায় সাহাঙ্গপতি ও অভয়বাবুসহ আমরা চারজনে একখানি ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন আশ্রম দেখতে। নানা জাতের ফল-ফুলের বৃক্ষশোভিত বিরাট আশ্রম পরিধি স্মরণ করিয়ে দেয় কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কথা। তবে এখানকার বিরাট মন্দির ও তৎসংলগ্ন হলঘরটি আরও মনোরম। মন্দির অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর প্রতিকৃতি। হলঘরের বাহির-দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্যদের আলোকচিত্র। সেদিন ছিল ২৬শে ডিসেম্বর যীশুর জন্মের প্রাক্কালে। মন্দির সংলগ্ন হলঘরটির দক্ষিণাংশ রং-বেরংএর ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক বাল্বে সজ্জিত। তারই একাংশে মাতৃক্রোড়ে নিষ্কলঙ্ক, অপাপবিদ্ধ, সরলতামাখা একখানি শিশুমুখ। মনে করুণা জাগে তাঁর ক্রুশ-বিদ্ধ মূর্তিটির কথা স্মরণ করে। বহুজনের মুক্তিপথের সন্ধান দিতে যাঁরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তাঁদের জীবন কি এমনিই দুঃখবহ হয়?

এই আশ্রমেই একদা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণসংঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী বাস করেছিলেন। মনে পড়ে সেই সময়ের বিশেষ একটি দিনের ঘটনা। অপরাহ্ণে তিনি গাড়ী করে গেছেন গাভীপুরা গুহামন্দির দর্শনে সঙ্গে তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন আশ্রমে। সময়ের ব্যবধান স্বল্পই। আশ্রম হতে যাত্রাকালে সেখানে আশ্রমস্থ সাধু-ব্রহ্মচারী ব্যতীত কেউ ছিলেন না। কিন্তু প্রত্যাবর্তন মুহূর্তেই দেখা গেল আশ্রম-প্রাঙ্গণ দর্শনার্থীদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠেছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর গাড়ী আশ্রমে প্রবেশ মাত্রই সকলে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত করলেন। গাড়ী হতে অবতরণমাত্র এই দৃশ্য দর্শনে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে আশীর্বাদচ্ছলে পাঁচ মিনিট নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলেন। চতুর্দিক কিছুক্ষণের জন্য শান্ত-নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল। সমগ্র পরিবেশটি হল অধ্যাত্মভাব-স্ফুরিত। তারপর ধীর পদক্ষেপে আশ্রমে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষটিতে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। দর্শনার্থী ভক্তগণও সেখানে সমবেত হলেন। নীরবতার মাধ্যমে শাস্ত্র যে ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দ-স্ফুরণের কথা ব্যক্ত করেছে এখানে তিনি দর্শনার্থী ভক্তদের প্রাণে সেই আনন্দই সঞ্চার করলেন। প্রশ্নোত্তরের কোন প্রয়োজন হল না। অথচ সকলের মনের সব প্রশ্নের সমাধান হল। সেই অবস্থা হতে উত্থিত হয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বামী বিশুদ্ধানন্দের মাধ্যমে সকলকে জানালেন "কি দুঃখের বিষয়—আমি এদের ভাষা জানি না। আমার সান্নিধ্যে কি সান্ত্বনা এরা লাভ করবে যদি না দু-একটি কথা এদের বলি"? এই কথা

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর মুখে শুনে ভক্তেরা সকলে একবাক্যে বলে উঠলেন, "না, না, এই যথেষ্ট আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। এরূপ পরিবেশে বাক্যস্ফূর্তির প্রয়োজন কিছুই নাই।"

উঠে গেলুম সামনেই "Holy Mother's Rock"এ। আশ্রমের একটি উঁচু জায়গায় ছোট্ট একটি মন্দির—সামনে লেখা "The Holy Mother's Rock—Sanctified by the Mother's sitting here on March. 1911". সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষদের বুঝতে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় ইংরাজী ভাষায় লেখা। মনে পড়ে ১৯১১ সালের মার্চ মাসে এইখানেই উপবিষ্ট হয়ে দু'একজন ভক্তসহ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সুধাস্তের রমণীয় দৃশ্য দর্শন করেছিলেন। সে সময় স্বামীরামকৃষ্ণানন্দ একথা শোনামাত্রই বলে উঠেছিলেন "মা সম্ভবতঃ পর্বতবাসিনী হয়েছেন"। বলেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন তাঁর শ্রীচরণে মস্তক রেখে আর চণ্ডী হতে' 'সর্বমঙ্গলা-মন্ত্রটি উচ্চারণ করে বলতে লাগলেন "মা দয়া কর, দয়া কর"। সস্নেহে সন্তানের মস্তকে হাত বুলিয়ে তাঁকে শান্ত করতেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর অপার করুণা অনুভব করলেন।

চলে এলুম 'প্রকাশনা বিভাগে'। শিকাগো হতে আগত একজন সাহেব ব্রহ্মচারী হাসিমুখে জানতে চাইলেন আমরা কোন বই নেব কিনা। বই কেনার ইচ্ছা কিছু ছিল না। তবে একত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল সন্ন্যাসী-সন্তানগণের একটি ফটো কিনেই সন্তুষ্ট হলাম। আর খুসি হলাম এখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমেও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পুস্তকাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে দেখে।

সেখান হতে চলে এলুম ১৯০৬ সালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কর্তৃক ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউটটি দেখতে। ভিত্তিফলকে উৎকীর্ণ "Ramakrishna Mission Institute, Bangalore, foundation stone was laid down by Swami Abhedananda on the 20th August during the reign of Krishna Chamaraja Wadiyar Bahadur IV. The Dewan being P. Mahadeva Rao, C. I. E."

সেখান হতে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামীআদিদেবানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতেই ঠাকুরের মিছরী প্রসাদ দিলেন সকলের হাতে। ফিরে এলুম ব্যাঙ্গালোর ষ্টেশনে সংরক্ষিত কোচটিতে—সন্ধ্যা ৬টার পূর্বেই।

●

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

য়ুরোপীয় চিত্রশৈলী : অতিবাস্তব (সুররিয়ালিষ্ট) চিত্রকলা প্রসঙ্গে

(দুই)

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে ফ্যাসিজমের উদ্ভব হলো। সুররিয়ালিষ্ট সাহিত্যিক এবং চিত্রকরদের সৃষ্টিকর্মে ব্যক্তিস্বাধীনতার অকুণ্ঠ ও বলিষ্ঠ প্রতিফলন ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের ওই সাহিত্য ও চিত্রকলার প্রতি বিরূপ করে তুললো। ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রনায়কেরা সুররিয়ালিষ্টিক সাহিত্য ও শিল্পকলাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, অবাস্তব এবং অবক্ষয়ী বলে ঘোষণা করলেন। এর প্রতিবাদে সারা পৃথিবীর সুররিয়ালিষ্ট সাহিত্যিক এবং শিল্পীমহলে যে-আলোড়ন এবং আন্দোলনের সৃষ্টি হলো—তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সুররিয়ালিষ্টিক মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়লো। ইতালীর ভি চিরিকো, জার্মানীর ম্যাক্স আর্নষ্ট, আমেরিকার মান্ রে এবং স্পেনের মিরো, ডালি এবং পিকাসো প্যারিসে সুররিয়ালিষ্টিক রীতিতে চিত্ররচনা করে ওই চিত্ররীতিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও পরিচিত করে তুললেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ইংল্যাণ্ড, ডেন্মার্ক, রুমানিয়া, জাপান এবং ক্যানাডিস্-এর চিত্রকরেরা নিজের নিজের দেশে সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকলার প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিস-এ সুররিয়ালিষ্টিক চিত্রকলার যে-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো—তাতে পৃথিবীর চোদ্দটি রাষ্ট্র থেকে সত্তরজন চিত্রকর তাঁদের অঙ্কিত চিত্রকলার নিদর্শন পাঠালেন। প্যারিস প্রত্যাগত বেলজিয়ান চিত্রকর রেনে ম্যাগ্রিট্ ব্রাসেলস্-এ সুররিয়ালিষ্টিক চিত্ররীতির প্রবর্তন করলেন। ইংল্যাণ্ডের রোনাল্ড্ পেন্রোজ এবং চেকোস্লোভাকিয়ার জিওরিথ টীস্কি স্বদেশের সুররিয়ালিষ্টিক চিত্ররচনার ধারাটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যেসব সুররিয়ালিষ্টিক চিত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অঙ্কিত হয়েছিলো—সেগুলোকে প্রধানতঃ দুটো ধারায় ফেলা যেতে পারে। প্রথম ধারার অঙ্কিত চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ভি চিরিকো প্রবর্তিত কোলাজ-এর বিন্যাস এবং দ্বিতীয় ধারার অঙ্কিত চিত্রগুলোর প্রায় সবই হচ্ছে স্বতঃচিত্রণের

নিদর্শন। গত অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রে নানান্ মতাদর্শ এবং বহু বিচিত্র চিত্রাঙ্কণরীতির পরীক্ষানিরীক্ষা চলে আসছে। ওইসব মতাদর্শ এবং চিত্রাঙ্কনরীতির কোনো কোনো ধারা আজ প্রায় বিলুপ্ত। এই পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে সুররিয়ালিষ্টিক চিত্রকলা মাঝে মাঝে হয়তো কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে, কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং ইদানীংকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেশ কিছু সংখ্যক চিত্রকর সুররিয়ালিষ্টিক ধারায় চিত্রচর্চা করে চলেছেন।

আমাদের দেশে সুররিয়ালিষ্টিক চিত্রকলার প্রবর্তকরূপে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম করা যেতে পারে। পরিণত বয়সে চিত্রচর্চা সুরু করে সম্ভবতঃ এদেশে তিনিই প্রথম নির্জ্ঞান মনের অচেনা, অজানা জগতকে সর্বসমক্ষে চিত্রপটে তুলে ধরেন। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আমাদের দেশের কিছুসংখ্যক সমকালীন চিত্রকর সুররিয়ালিষ্টিক ধারায় চিত্রচর্চা করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ শিল্পরসিক ও সমালোচক মহলে সুপরিচিত। তবে যেক্ষেত্রে এদেশে জনসাধারণের অতি নগণ্য অংশের মধ্যেও চিত্র-ভাস্কর্যের প্রতি আগ্রহ অথবা অনুরাগের লক্ষণ দেখা যায় না, সেক্ষেত্রে এখানে সমকালীন সুররিয়ালিষ্টিক চিত্রকলার ভবিষ্যৎ কি—তা বলা বোধকরি সম্ভব নয়।

সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকলায় প্রতীক ব্যবহারের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। আদিম শিল্পকলায়ও প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া কবি, মরমিয়া সাধক অথবা চিত্রকরেরা যে যুগে যুগে নির্জ্ঞান মনের অতল রহস্যকে অনুভব করেছেন এবং বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন—সে-তথ্যও তো সুবিদিত। সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকরদের বৈশিষ্ট্য তবে কোথায়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকরেরা তাঁদের অঙ্কিত চিত্রে বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করেছেন সচেতনভাবে—ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের সূত্রগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে। আমাদের মনোজগতের দুটো স্তরের সজ্ঞান স্তরটি মোটামুটি স্পষ্ট—পরিচিত বাস্তব দৃশ্যজগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু নির্জ্ঞান স্তর, অথবা মনের বৃহত্তর স্তরটি আমাদের অচেনা, অস্পষ্ট এমন কি অবাস্তব। মনের এই দ্বিতীয় স্তরটিকেই বুঝতে এবং প্রকাশ করতে চান্ অধিবাস্তববাদী শিল্পীরা। তাঁরা বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে রঙ এবং রেখায় মনের নির্জ্ঞান স্তরের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। যেমন, মনে করা যাক্, একটি বৃত্তকে ধরা যেতে পারে পরিপূর্ণতার প্রতীকরূপে; তেমনই বৃত্তকে আবার মনে করা যায় কোনো নিখুঁত বস্তুর প্রতীক—এমনকি মহাবিশ্বের প্রতীকরূপে। একটি পিরামিডকে মনে করা হয় দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্বের প্রতীক। কোনো সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রপটে উল্লিখিত প্রতীকগুলো অঙ্কিত হতে পারে সজ্ঞান অথবা নির্জ্ঞান মনের প্রেরণায়। প্রতীকের সাহায্যে চিত্রাঙ্কন আদিম যুগেও দেখা গেছে—কিন্তু আদিম মানুষের প্রকাশের মাধ্যম ছিলো একেবারেই সীমাবদ্ধ।

ফ্রয়েডের মতে কতকগুলি আদিম জৈব কামনা জীবনের মূলে রয়েছে। জীবনের এই মৌল বেগকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন 'ইদ্'। সভ্য মানুষের জগতে এই ইদ্-এর চরিতার্থতা সবসময়ে সম্ভব হয় না। এর কারণ বাস্তব জগতের নানান্ বাধা, তাছাড়া সামাজিক নীতি ও

রীতির শাসন। এই শাসনের বাধায় ফলে ইদ্ সভ্য মনের প্রকাশ স্তরে আসতে পারে না। ইদের শক্তি কিন্তু অত্যন্ত প্রবল। সভ্য মনের প্রকাশ স্তরে আসতে গিয়ে বাধা পেয়ে ইদ্ বাসা বাঁধে মনের অবচেতনের গভীরে। ঘুমের মধ্যে বাস্তব জগতের বাধাগুলো আলগা হয়ে পড়ে, তাছাড়া সামাজিক নীতি-রীতির শাসনও হয়ে যায় শিথিল। এই শিথিলতার সুযোগ নিয়ে আদিম জৈব কামনাগুলো স্বপ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতীকের ছদ্মবেশে তৃপ্তি খোঁজে। সভ্য চেতন মনে আদিম জৈব কামনাগুলো যতোই উদ্ভট, অসভ্য কিংবা নির্লজ্জ বলে মনে হোকনা কেন, ফ্রয়েডের মতে মনের অবচেতন স্তরই কিন্তু চেতন মনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

একথা আগে বলা হয়েছে, সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকরেরা সজ্ঞান মনের ধরাছোঁয়ার বাইরে ইদ্-এর লুকোচুরিকেই চিত্রপটে প্রকাশ করতে চান্। এই প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তাঁরা বেছে নিয়েছেন জীবনের মৌল কামনার ছদ্মবেশী প্রতীকগুলোকে। এ কারণেই একসময়ে কিছুসংখ্যক সমালোচক অবিবাস্তববাদী চিত্রকলাকে শিল্পতত্ত্বের প্রচলিত কানুন অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হয়ে ওই রীতিতে অঙ্কিত চিত্রকে বাতিল করে দিয়েছেন চিত্রকলার তালিকা থেকে। হার্বার্ট রীড্ এর ভাষায়: 'Many critics, too occupied with the symbolic content of paintings such as Max Ernst's, do not stop to consider their aesthetic merits, and condemn them outright as being psycology and literature, anything but painting'. কিন্তু স্বয়ং ম্যাক্স আর্ণষ্ট এ-সম্বন্ধে কি বলেন? তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সুররিয়ালিষ্টিক চিত্রকলার প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। ম্যাক্স আর্ণষ্ট বলছেন: 'The aim of the super-realists (surrealists) is not to gain access to the unconcious and to paint its contents in a descriptive and realistic way; nor is it even to take various elements from the unconcious and with them construct a sepatate world of fancy; it is rather their aim to break down the barriers, both physical and psychical, between the concious and the unconcious, between the inner and the outer world, and to create a super reality in which real and unreal, meditation and action, meet and mingle and dominate the whole of life.'

—দিবাকর সেনরায়

●

॥ সংঘবার্তা ॥

পশ্চিমবঙ্গ বস্ত্রাত্রাণে এ পর্যন্ত যাঁহারা দান করিয়াছেন—

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দাতার নাম		টাকা
শ্রীপদ্মচরণ বিসওয়াল, কটক		৫·০০
শ্রীস্বপনকুমার হাজরা, ৫, শহরপাড়া রোড, পো: ভাটপাড়া, জেলা ২৪ পরগণা।	...	২১·০০
ডঃ বিনোদবিহারী ঘোষ, সেনপাড়া, পো: + জেলা জলপাইগুড়ি।	...	১০০·০০
শ্রী আর, নন্দন.		
ডেন্টাল ক্লিনিক, ঘোষ মার্কেট, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩, বর্ধমান।	...	১৫·০০

উক্ত আদায়ীকৃত অর্থ (বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে জমা দেওয়ার তারিখ ও রসিদ নম্বর যথা :—

৩১।৭।৭৯—রসিদ নং ৪১১৫—১৪১৲ টাকা।

●

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবার নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় নানান্ দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল্'-এর উপরে (দ্বিতলে) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারেও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রত্যয়তাকে অক্ষুণ্ণ করবে ইতি—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স্

৮১, বিপ্রদাস সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

জ্যোতির্বাণী

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয়

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক : শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী

সাংখ্যাদিতীর্থ, দর্শনাচার্য, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের, রাজ্যপাল-অনুমোদিত সদস্য।

ডাইরেক্টরী পত্রিকার প্রধান জ্যোতিষী।

এই পত্রিকায় প্রতি মাসে বিস্তৃত ব্যক্তিগত রাশিফল থাকে। বেদ, দর্শন, তন্ত্র, জ্যোতিষ ও ধর্ম-সম্পর্কীয় আলোচনা থাকে।

প্রতি সংখ্যা ২ টাঃ। ২০·০০টাকা পাঠাইয়া বার্ষিক গ্রাহক হইলে ডাক-ব্যয় লাগে না।

৬/১, বিন্দু পালিত লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬
ফোন : ৫৫-৫১১৫

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট স্থপার-ফক্-বিস্কুযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৫৫ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের **শ্রীগীতা** ২২·০০
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহিত ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ৯·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৪·০০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ৪·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

সুলেখক **শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ** প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	৫·০০
বীরত্বে বাঙালী	৪·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০
বাংলার ঋষি	৬·৫০
বাংলার মনীষী	৩·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০
ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৮·০০

(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)

RAMAKRISHNA VEDANTA MATI.
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization		Why a Hindu Accepts Christ and	
Philosophy and Religion		Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 57
41st Year, September 1979
VOL. VII

Regn. No. WB/NC-141
PHONE : 55-1800

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

কুক্‌মী
ভারতের সেরা
গুঁড়া মশলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুক্‌মী প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী
ফোন-৩৩-০৯৯৫
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (ক্সাইস) প্রাইভেট লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

PRICE Rs. 1·50
Ramakrishna Vedanta Math.
19-B. Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006.
মূল্য ১·৫০ টাকা

স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

চল্লিশ বর্ষ
নবম সংখ্যা
কার্তিক
১৩৮৬

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পত্রিকা 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·০০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে 'বিশ্ববাণী' অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র দিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

সদ্য প্রকাশিত হইল !

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সমৃদ্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে
মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
প্রকাশন বিভাগ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৫৫-১৮০০

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কাশীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	১৪·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ		স্তোত্র-রত্নাকর-	
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ		তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ) প্রকাশের অপেক্ষায়			
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ		নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা	১০·০০	পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ দোস্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১১-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

যাবতীয় পেটের পীড়ায়

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্রামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।
১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, স্যুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০ নং বিধান সরণী, হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন: ৫৫-২৫৪৯ । ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

"JECT" BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,

"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC

COMBS & NOVELTIES.

"SANKHA"

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

কেশরঞ্জে পাতার

রসে ও গন্ধে

কেশুত

কেশতৈল

নিবারণ ফারমাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস

(প্রাঃ) লিমিটেড

কলিকাতা-১

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

কার্তিক, ১৩৮৬

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীজ্ঞাশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ

শ্রীদেবাশীষ হোড়

শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১১ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট.

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :

ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ

শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥

শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়

মুদ্রণ :

শ্রীকুবের দত্ত

দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস

৬ নং ভাক্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্. বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fitings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

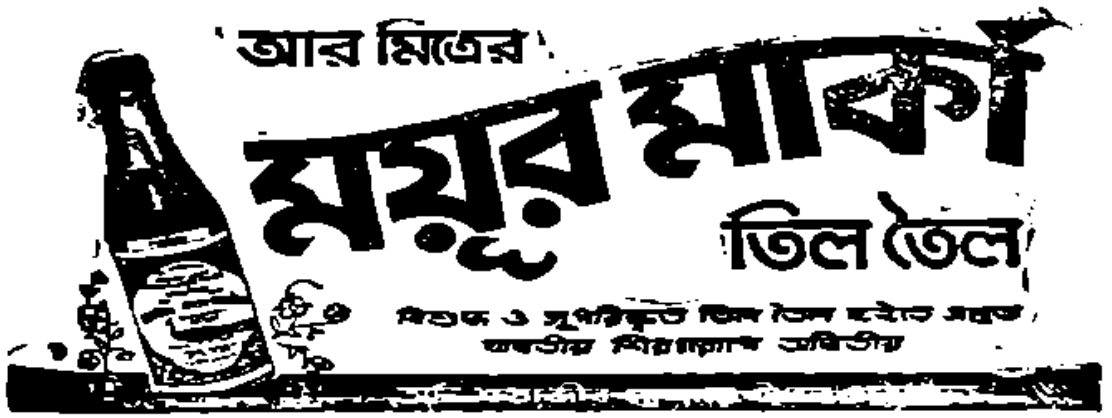

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা—৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

কার্তিক, ১৩৮৬

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৩৭১	
২।	মাতৃ-সঙ্গীত	৩৭৬	শিবানন্দ তীর্থনাথ
৩।	গুহ্যকালী	৩৭৮	শ্রীসত্যেশ্বর অধিকারী
৪।	ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ	৩৮০	স্বামী প্রভানন্দ
৫।	শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য ভবনাথ	৩৮৩	ব্রহ্মচারী প্রণবচৈতন্য
৬।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	৩৮৭	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৭।	রামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	৩৯০	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৮।	বিংশ শতাব্দীর ধর্ম-স্বামী অভেদানন্দ (অনুবাদ)	৩৯১	শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৯।	দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে	৩৯৪	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
১০।	বঙ্গের সুসন্তান যদুলাল মল্লিক	৩৯৭	বনফুল
১১।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : পণ্ডিত পদ্মলোচন	৩৯৯	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
১২।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্প-সমালোচনা	৪০৪	
১৩।	গ্রন্থ-সমালোচনা	৪০৬	
১৪।	সংঘ-বার্তা	৪০৮	

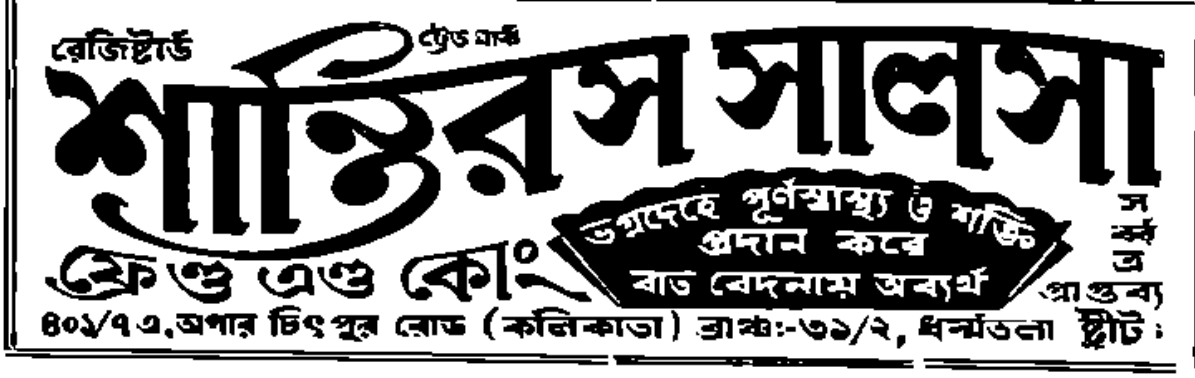

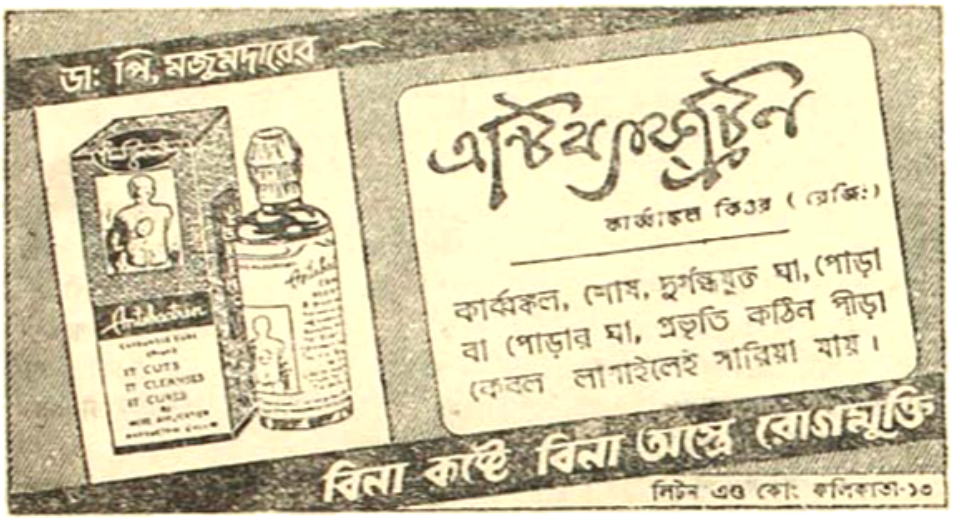

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

69, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

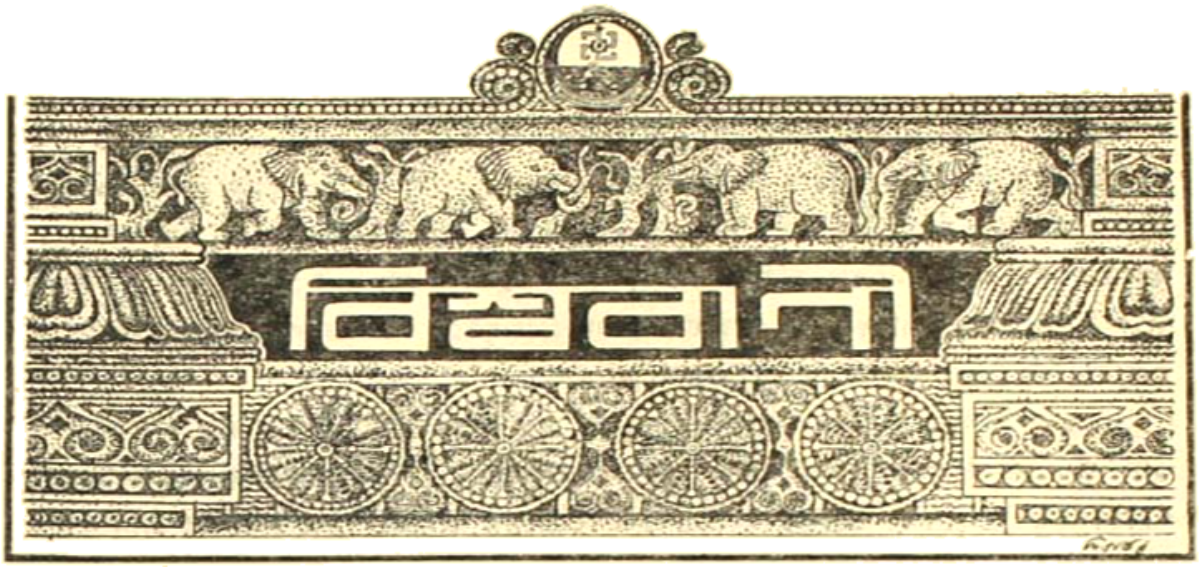

একচল্লিশ বর্ষ | নবম সংখ্যা | কার্তিক ১৩৮৬

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ সংসার-ত্যাগ নয়, মনে ত্যাগ ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। 'আমি মনে ত্যাগ করতে বলি, সংসার-ত্যাগ বলি না। অনাসক্ত হয়ে সংসার থেকে আন্তরিক চাইলে তাঁকে পাওয়া যায়'।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ (১৩১১), পৃঃ ১৯০

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮শে সেপ্টেম্বর। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রসঙ্গ হওয়ায় পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন: "তা হোক। আন্তরিক হলে সংসারেও ঈশ্বর লাভ করা যায়"। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে প্রসঙ্গের কথা কিছুপূর্বে আলোচনা করেছি। ঐ আলোচনার মধ্যে সারকথা হোল: "'আমি' ও 'আমার'—এইটি অজ্ঞান, 'তুমি' ও 'তোমার' এইটি জ্ঞান"।

অজ্ঞান ও জ্ঞান আলোক ও অন্ধকারের মতো পরস্পরপৃথক ও বিরুদ্ধভাবসম্পন্ন। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে এর পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "…বিষয়বিষয়িণোঃ তমঃ-প্রকাশবদ্‌বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ…"। এ'সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করেছি। 'আমি' ও 'আমার' এ'দুটির মধ্যে থাকে সীমা ও সংকীর্ণতার ভাব। 'আমি' ও 'আমার'-ভাব ব্যক্তি বা ব্যষ্টিচেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সমষ্টিচেতনার সম্প্রসারিত বিরাটের ধারণাকে সংকীর্ণ করে। তাছাড়া স্বার্থকেন্দ্রিক ধারণায় ও ভাবে উদ্বুদ্ধ করে 'আমি' ও 'আমার' চিন্তা ও ভাবনা। তাই 'আমি' ও 'আমার'-ভাবকে বলে 'অজ্ঞান'—যা সর্বতোপ্রসারী-ভাব, ধারণা ও জ্ঞান থেকে ভিন্ন। অজ্ঞানে যথার্থতত্ত্বের দ্বার অবরুদ্ধ থাকে, আর জ্ঞানে সেই তত্ত্বের

ভাব উদ্ঘাটিত ও সম্প্রসারিত হয়। 'তুমি' ও 'তোমার' ধারণার সসীমতার পরিবর্তে অসীমতার উন্মুক্ত আলোকে মন হয় চিরস্নাত এবং ব্যষ্টিচিন্তা তখন সমষ্টিচিন্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বসত্তার চেতনায় মনকে প্রবুদ্ধ করে। মোটকথা সীমার বন্ধন তখন অসীমের উন্মুক্ত পরিবেশে মহিমান্বিত হয়। এ'তত্ত্ব বোঝানোর জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে সাধনা করতেন এই মহান্ সত্যের—'নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ'। কথা এই যে, জীব ও ঈশ্বর—মায়া ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে সাধারণ-দৃষ্টিতে ভেদজ্ঞান ও অসাধারণ-দৃষ্টিতে অভেদজ্ঞানকে উপলব্ধি করার ও করানোর জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অনন্তসাধনা।

পুনরায় বলি, অজ্ঞানে 'আমি' ও 'আমার' এবং জ্ঞানে 'তুমি' ও 'তোমার'-ধারণার মধ্যে একটি অসংপূর্ণ ও সংকীর্ণ এবং অপরটি পূর্ণ ও সম্প্রসারিত। তাছাড়া অজ্ঞান আবরণ ও জ্ঞান আবরণভঙ্গরূপ প্রকাশ বা প্রসারণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেজন্য সংসারী-মানুষকে সংসার ত্যাগ করতে বলেন নি, বলেছেন ভোগে নিস্পৃহ থেকে সংসারে থাকতে ও সংসারের সকল কাজ করতে, কেননা সংসার তখনই বন্ধন ও বাধা সৃষ্টি করে—যখন সংসার 'আমার' অর্থে স্বার্থের সংসারে পরিণত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "সংসারে থাকো—যেমন বড় মানুষের বাড়ির ঝি। (ঝি) সব কাজ করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে 'আমার হরি', কিন্তু মনে মনে বেশ জানে—এ' বাড়ি আমার নয়, এ' ছেলেও আমার নয়। সে' সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে। তেমনি সংসারে সব কর্ম করো, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রাখো। আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার, পুত্র—এ'সব আমার নয়, এ'সব তাঁর (ঈশ্বরের), আমি কেবল তাঁর (ঈশ্বরের) দাস"।

এই 'দাস'-ভাব মনের অহংকারকে চূর্ণ ক'রে কর্তৃত্বের অভিমান দূর করে। কর্তৃত্বের অভিমানই অহংকার, আর অহংকারই অজ্ঞান। জ্ঞান এর বিপরীত। জ্ঞানে 'আমির' অভিমান দূরীভূত হয়ে 'তুমির' আলোকে উদ্ভাসিত হয় মন। তাই মনেই আলোক ও মনেই অন্ধকার। মনেই 'আমির' সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয় মন যখন মলিন হয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে, আবার সীমার সংকীর্ণতা দূর হলে মনে সৃষ্টি হয় 'তুমির' প্রসন্নতা। তুমির ভাবই আত্মসমর্পণের ভাব—যেভাবে সৃষ্টি হয় মনে সর্ববাধাহীন উদারতা। তাই মনেই বন্ধন, আবার মনেই মুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "আমি মনে ত্যাগ করতে বলি, সংসার ত্যাগ বলি না। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে আন্তরিক চাইলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায়"। সেজন্য আকুলতা ও আন্তরিকতা ঈশ্বরদর্শনের পথে একান্ত সহায়ক।

এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ করি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গপার্ষদ জীবন্মুক্ত স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সিদ্ধান্তের কথা। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁর 'ভারতে শক্তিপূজা'-গ্রন্থের নিবেদনাংশে উল্লেখ করেছেন: "ভারতের ঋষিরাই প্রথম জ্ঞাত হইয়া প্রচার করিয়াছেন যে, জগদম্বা সগুণা এবং নির্গুণা উভয়ই। পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া বলিয়া ভারতের দর্শনাকার যে দুই পদার্থ জগতের মূল নির্দেশ করিয়াছেন, উহা একই বস্তুর একই কালে বিদ্যমান দুই বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশ-বিশেষ। তবে দেশকালাবচ্ছিন্ন বা নামরূপাবলম্বনে সর্বান্তর্জগৎ

উপলব্ধিকারী মানব-মন একই কালে একেবারে জগদম্বার ঐ দুই ভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম। কারণ, মানব-মন স্বভাবতঃ এমন উপাদানে গঠিত যে, উহা আলোকান্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ভাবকে একত্রে একই সময়ে জগদম্বার নির্গুণ ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না এবং সমাধিসহায়ে উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া যখন সে জগন্মাতার নির্গুণ স্বরূপের প্রত্যক্ষ করে তখন আর তাহার নয়নে সগুণভাবের ও সগুণভাবপ্রসূত জগতের উপলব্ধি হয় না"।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের বক্তব্য এখানে সুপরিস্ফুট। তাঁর বলার উদ্দেশ্য যে, সাধারণ-জ্ঞান অজ্ঞানে, পুরুষ-প্রকৃতি, ব্রহ্ম-মায়া, নির্গুণ-সগুণ—এই দ্বৈতভাবের ধারণা সম্ভব, কিন্তু নির্বিকল্পসমাধিতে যখন যথার্থজ্ঞানরূপ ব্রহ্মোপলব্ধির প্রকাশ পায় তখন অনুভব হয় 'উহা একই বস্তুর একই কালে বিদ্যমান দুই বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশ-বিশেষ'। তাই সাধারণ-জ্ঞান অজ্ঞানে দুই-দুই বা দ্বৈতদর্শন ও অসাধারণ-জ্ঞান জ্ঞানে (ব্রহ্মজ্ঞানে বা আত্মজ্ঞানে) এক ও অদ্বৈত দর্শন সম্ভব। এই দর্শনের নাম প্রত্যক্ষানুভূতি—সে অনুভূতিতে 'আমি' বা 'আমার'-অভিমান সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে 'তুমি' বা 'তোমার' দিব্য-অভিমানরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। 'নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ'-সাধনার মর্মকথাও তাই।

জ্ঞানরূপ ঈশ্বরজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি হয় অনাসক্ত হলে ও আন্তরিক-ভাবে চাইলে। অনাসক্ত হওয়ার অর্থ স্বার্থের ('আমি' ও 'আমার') আসক্তি বা অভিমান না থাকা। সংসারে ও জীবনে সকল কর্মের পিছনে সংকল্প বা কামনা কিছু-না-কিছু থাকেই এবং থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কামনা, আসক্তি বা সংকল্প স্বার্থের ও নিঃস্বার্থের দু'রকমই হতে পারে। স্বার্থের আসক্তি বা কামনা সাধারণ ও স্বাভাবিক, আর নিঃস্বার্থের আসক্তির পিছনে থাকে ত্যাগের ভাবনা ও বৈরাগ্যের সাধনা। মন পরিশুদ্ধ বলতে মনে স্বার্থের সংকল্প ও বিকল্প-বিবর্জিত হওয়া। এজন্য 'আমি' ও আমার'-সংকীর্ণতাকেন্দ্রিক বা ব্যষ্টিকেন্দ্রিক মনকে 'তুমি' ও 'তোমার' অসংকীর্ণ ও সর্বতোপ্রসারী করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে সার্থক ও সফল করার পিছনে থাকে যত্ন বা অভ্যাস ও বৈরাগ্য-রূপ সাধনা। এই সাধনাই শিক্ষিত ক'রে তোলে মনকে অনাসক্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু অনাসক্তির আশীর্বাদ লাভ করলেও জীবনের মধ্যে আন্তরিকতার ভাব থাকা প্রয়োজন। আন্তরিকতার অর্থ মন ও মুখকে এক বা সমান্তরাল ক'রে জীবনসিদ্ধি লাভ করার জন্য আকুল প্রার্থনা করা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "আন্তরিক চাইলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায়"। ঈশ্বর চৈতন্যরূপে বিশ্বের সর্বত্র ও সকল প্রাণীতে বিদ্যমান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: 'ঈশ্বরঃ [সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি' (১৮।৬২)। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদেও (৬।১১) আছে—

'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ।'

ত্যাগের অর্থই বাসনা বা আসক্তির ত্যাগ। সংসার ত্যাগ ক'রে কেউ সন্ন্যাসী হলো, কিন্তু শত শত কামনা ও ভোগের আসক্তি তার মনে হয়তো জমা থেকে গেল। এই ত্যাগ তাই

সত্যকারের সংসারের বা বিষয়াসক্তির ত্যাগ নয়। মনের মধ্যে যার অনাসক্তি ও বৈরাগ্যের ভাব থাকে, সে ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। তাই ত্যাগ বলতে সম্যক্‌রূপে অনাসক্তি বা বৈরাগ্য—যাকে বলে সন্ন্যাস। খাঁটি অর্থে ত্যাগ। এই ত্যাগে কোন-কিছু পাওয়ার ও চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "আমি মনে ত্যাগ করতে বলি"।

যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে মনকেই সৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে। মন দিয়েই অর্থাৎ মনের ইচ্ছাতেই ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেন—'একোঽহম্ বহু স্যাম'—'আমি এক আছি, বহু হব'। এই বহু হওয়ার অর্থ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। ঈশ্বরের ইচ্ছা বলতে হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বরের ইচ্ছা। হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বরকে কার্যব্রহ্ম বলে। কারণব্রহ্ম ঈশ্বর বীজময়ী অব্যাকৃতি বা মহাপ্রকৃতির সঙ্গে থাকেন। তবে ঈশ্বর অব্যাকৃতি মায়ার অধীশ্বর। ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিশ্বসৃষ্টি হয় সমষ্টিবীজরূপিণী মহামায়া থেকে। এই মহামায়াকে সমষ্টি-অজ্ঞান, মায়া বা মহামায়া বলে। যোগমায়া ঐ মহামায়ারই আর একটি রূপ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যোগমায়ারূপিণী মহামায়ার উল্লেখ আছে। সমষ্টি-অজ্ঞান মায়া কারণব্রহ্ম ঈশ্বরের সহচরী; কিন্তু ব্যষ্টি-অজ্ঞান জীবকে নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য এটি 'ভামতী'-ভাষ্যকার আচার্য বাচস্পতি মিশ্রের ও তাঁর অনুগামীদের অভিমত।[১] শঙ্করানুসারী পদ্মপাদ প্রভৃতি বিবরণসম্প্রদায়বিশ্বাসী আচার্যদের মতবাদ এ' থেকে ভিন্ন—সেকথা আলোচনা করেছি। অজ্ঞান সমষ্টি বা ব্যষ্টি হলেও উপাধি বা ভেদ সৃষ্টি করে। কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের 'আমি এক, বহু হব'—এই অভিমানও বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী অজ্ঞান। এই অজ্ঞান বা 'আমি'-অভিমান মায়ালেশশূন্য ব্রহ্মেও মায়িক ভেদ সৃষ্টি করে। এই ভেদ সৃষ্টি করে দু'রকম—মায়োত্তীর্ণ-ব্রহ্ম ও মায়াসবলিত ব্রহ্ম। ব্রহ্মের দুটি ধারণা সৃষ্টি করে ব'লে তা অজ্ঞানের রাজ্য বা উপাধির রাজ্য। জ্ঞানের রাজ্য তার পারে। জ্ঞানের রাজ্যে দুইয়ের ধারণা নাই। তখন মনে হয়, এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই (তুরীয়-ব্রহ্মই) উপাধিভেদে সগুণ ও নির্গুণ। তখন একমাত্র একমেবাদ্বিতীয়-সত্তা।

চৈতন্যময় ঈশ্বর সকল প্রাণী ও সকল বস্তুর অন্তরে থেকে সকল-কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, সুতরাং তিনি নিত্যপ্রাপ্ত। তাই "তাঁকে পাওয়া যায়" কথাও ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বোঝে না অজ্ঞানের জন্য। অজ্ঞান জ্ঞানকে ভুলিয়ে দেয় বলতে জ্ঞানকে আবৃত ক'রে রাখে। অজ্ঞানের কাজ বা স্বভাবই তাই। অজ্ঞানের অন্ধকারকে দূর করতে গেলে তাই প্রয়োজন জ্ঞানের আলোক। জ্ঞানে ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলে উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধিকেই রূপক ভাষায় 'পাওয়া' বা 'লাভ' বলে।

এই পাওয়া-রূপ ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই বলে: "(বিজয়ের প্রতি) 'আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান করতুম। তারপর ভাবলাম—এমন করলে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন করলে (চক্ষু খুললে) কি ঈশ্বর নাই?।" তারপর তিনি

১। পূর্বে আলোচনা করেছি যে, ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে অজ্ঞান জীবাশ্রিত। কিন্তু বিবরণকার আচার্য পদ্মপাদ প্রভৃতির মতে অজ্ঞান ও মায়ার মধ্যে কোন ভেদ নাই। তাঁদের মতে মায়া বা অজ্ঞান ব্রহ্মাশ্রিত। এজন্য মায়া বা অজ্ঞানের তিরোধানে ব্রহ্মের প্রকাশ হয়।

বলেন : "চক্ষু খুলেও দেখ্‌ছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য সকলের মধ্যে, জলে-স্থলে-সর্বভূতে তিনি আছেন"।

এরই নাম সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন। চেতন ও অচেতন সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মচৈতন্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই অনুভূতির নাম আত্মদর্শন বা ব্রহ্মের অনুভূতি। ব্রহ্মানুভূতি প্রথমে হয় নিজের মধ্যে—'অহং ব্রহ্মাস্মি', পরে সঙ্গে সঙ্গে হয় বিশ্বচরাচরের সকল-কিছুর মধ্যে—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। 'ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু' সমস্তই ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা আবৃত—এই জ্ঞানদৃষ্টি হয় ব্রহ্মানুভূতি হ'লে। ব্রহ্মানুভূতির অপর নাম সমদর্শন বা সমানুভূতি। দর্শন ও অনুভূতি একার্থক। কোনটাই আগে পরে নয়, দুটি অনুভূতিএকই সময়ে হয়, সুতরাং সমকালীন। প্রতিটি প্রাণীর (প্রাণবান জীবের) মধ্যে ও প্রতিটি বস্তুর মধ্যে সেই একই অখণ্ড চিৎ বা চৈতন্যসত্তার অনুভূতি হলে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতি হয়। ব্রহ্মানুভূতির লক্ষণই তাই যে, সকল মানুষের, সকল প্রাণীর ও সকল বস্তুর প্রাণের ও অনুভূতির সঙ্গে নিজের একযোগ। এই সহযোগের নাম সমানুভূতি বা সর্বাত্মক-সহানুভূতি (sympathy)। এই সহানুভূতিরূপ একত্বানুভূতির নাম জ্ঞান বা বিজ্ঞান। এই একাত্মানুভূতির অভাবের নাম অজ্ঞান। গীতায় (৬।২৯) সমদর্শনের কথা আছে। এই সমত্ববুদ্ধিকে যোগ বলে। এই যোগের নাম জীবে ও ব্রহ্মে অভিন্ন জ্ঞান। অনাসক্তবুদ্ধি না হলে এই অভিন্নতাপ্রতিপাদক অদ্বৈতজ্ঞান হয় না। গীতায় (১৮।৪৯) এ'সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনাসক্ত হয়ে সংসারে কর্ম করতে বলেছেন : "অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে থেকে……তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায়"। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ (৩।১৯) বলেছেন—

'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥'

'অসক্ত' বলতে শ্রীধর-স্বামী বলেছেন 'ফলসঙ্গ'-রহিতঃ সন্'—ফলাসক্তিবিহীন হয়ে কর্ম করলে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষ লাভ করে।[২] কর্ম ক'রে কর্মের ফলে আসক্তিই বন্ধন। মোটকথা কোন-কিছু চাইলেই তার ফল পেতে হয়—'where there is demand, there is supply'। তাই নেওয়া-দেওয়া বা দেনা-পাওনার সংসারের পারে যেতে হয়, তবেই শান্তি। আর তাঁকে বা ঈশ্বরকে পেলেই সব-পাওয়া হয়, আর কিছু জীবনে পাওয়ার থাকে না। তখন এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে অন্য হাতে সংসারে কর্ম করা যায়। কর্ম তখন ফলাভিমানশূন্য অকর্মে পরিণত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'কথাই বলেছেন সকল মুক্তি ও শান্তিকামী মানুষকে।

২। চিত্তশুদ্ধি বলতে চিত্তে কোন বৃত্তি থাকে না। চিত্তের বৃত্তি সংকল্প ও বিকল্প। চিত্তশুদ্ধির অর্থ তাই চিত্তের চৈতন্যে রূপান্তর।

॥ মাতৃ-সঙ্গীত ॥

শিবানন্দ তীর্থনাথ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবী-মাহাত্ম্যের চরিত বা আখ্যান-তিনটিকে শাস্ত্রকারেরা "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ"—এই তিনটি ব্যাহৃতিরূপে আলোচনা করেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে প্রথম চরিত, দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত দ্বিতীয় বা মধ্যম চরিত এবং পঞ্চম অধ্যায় থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ অধ্যায় অবধি তৃতীয় বা উত্তর চরিত বিবৃত হয়েছে। প্রথম চরিতের বিষয়বস্তু মহামায়া দেবীকে প্রীত করে প্রলয়সলিলে যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুকে জাগরিত করে তাঁর দ্বারা নিহত মধু ও কৈটভ দৈত্যের মেদ দ্বারা মেদিনীর সৃষ্টি। এই চরিতের "ভূঃ" ব্যাহৃতির ঋষি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, দেবতা মহাকালী, ছন্দ গায়ত্রী, শক্তি নন্দা, বীজ রক্তদন্তিকা, তত্ত্ব অগ্নি ও স্বরূপ ঋগ্বেদ। মধ্য চরিতের আখ্যানভাগ দেবতাদের তেজরাশি সম্মিলিত হয়ে অনিন্দ্যসুন্দরী দেবীমূর্তি পরিগ্রহ করে প্রবল-পরাক্রান্ত মহিষাসুরকে বধ করে ত্রিলোক-পালন। এই চরিতের "ভুবঃ" ব্যাহৃতির ঋষি পালনকর্তা বিষ্ণু, দেবতা মহালক্ষ্মী, ছন্দ উষ্ণিক্, শক্তি শাকম্ভরী, বীজ দুর্গা, তত্ত্ব বায়ু ও স্বরূপ যজুর্বেদ। উত্তর চরিতের কাহিনী গৌরীদেহসম্ভূতা এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী দেবী-কর্তৃক মদগর্বী শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যসংহার। এই চরিতের "স্বঃ" ব্যাহৃতির ঋষি সংহারকর্তা রুদ্র, দেবতা মহাসরস্বতী, ছন্দ অনুষ্টুপ্, শক্তি ভীমা, বীজ ভ্রামরী, তত্ত্ব সূর্য ও স্বরূপ সামবেদ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী পূজাকালে বা পাঠকালে প্রথম চরিত পাঠের পূর্বে মহাকালীর ধ্যান, মধ্যম চরিতের পূর্বে মহালক্ষ্মীর ধ্যান এবং উত্তর চরিতের পূর্বে মহাসরস্বতীর ধ্যান করিতে হয়। এই ধ্যান তিনটিকে অবলম্বন করে মাতৃসঙ্গীত তিনটি রচিত হয়েছে। পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সঙ্গীতগুলির পরে মূল ধ্যানগুলি পাঠান্তরসমেত উদ্ধৃত করে বাংলায় অনুবাদ করলুম।

॥ এক ॥

নীলকান্ত মণিদ্যুতি বিরাজিছে অঙ্গে,
নানাবিধ অলঙ্কার শোভিছে সর্বাঙ্গে।
মধু ও কৈটভ নাশে, ব্রহ্মা যাঁর কৃপা যাচে,
প্রলয়সলিলে বিষ্ণু যোগনিদ্রা ভজে॥

দশহস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, ধনু, তীর,
লগুড়, ভুশুণ্ডী, শূল, শঙ্খ, নরশির।
দশটি বদন শোভে, দশপদ মনলোভে,
ত্রিনয়না মহাকালী ভয়ঙ্করী রঙ্গে॥[ক]

(ক) । প্রথম চরিত—মহাকালীর ধ্যান ।

ওঁ খড়্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং[১] সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্ব্বাঙ্গভূষাবৃতাম্[২] ।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌচ্ছয়িতে[৩] হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্ ।

পাঠান্তর :—১। পাশান্, ২। ভূতাম্, ৩। ঘসিতে।

যিনি দশহস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনুক, পদ্ম, শূল, ভুশুণ্ডী নামক অস্ত্র এবং নরমুণ্ড ও শঙ্খ ধারণ করেন, যিনি ত্রিনয়না ও সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে আবৃতা। যিনি নীলকান্তমণির ন্যায় দ্যুতিময়ী, দশটি বদন ও দশটি পদযুক্তা। বিষ্ণু যোগনিদ্রাবস্থায় হলে মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশের জন্য ব্রহ্মা যাঁর স্তব করেছিলেন, আমি সেই মহাকালীর ধ্যান করি।

। দুই ।

রক্তিমপ্রবালপ্রভা তনুর লাবণী,
কমল উপরে কে গো আসীনা জননী ।
দেবতা মানব ত্রাস সৈরিভমর্দ্দিনী,
নমি মহালক্ষ্মী দেবী সন্মিতবদনী ।

অক্ষমালা, টাঙ্গী, গদা, বাণ, বজ্র, ধনু,
দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, শঙ্খ, কমণ্ডলু ।
ঘণ্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ, সুদর্শন,
অষ্টাদশ করপদ্মে শোভিছে আপনি ।খ

(খ) । মধ্যম চরিত—মহালক্ষ্মীর ধ্যান ।

ওঁ অক্ষস্রক্পরশুং[১] গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্ ।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং[২]
সেবে সৈরিভমর্দ্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্[৩]।

পাঠান্তর :—১। অক্ষস্রক্পরশু, ২। প্রভাসদৃশাং।

যিনি অষ্টাদশহস্তে অক্ষমালা, কুঠার, গদা, বাণ, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শনচক্র ধারণ করেন, এখানে আমি সেই প্রবালপ্রভা মহিষাসুরমর্দ্দিনী সরোজাসীনা মহালক্ষ্মীকে ধ্যান করি।

। তিন ।

নীলনবঘনে শশধর সম,
কে তুমি শীতল তনু অনুপম ।
মহাসত্ত্বতী নমো নমঃ ॥

গৌরী দেহ হ'তে, এসেছ জগতে,
আধাররূপিনী, দৈত্যবিনাশিনী,
মহাসরস্বতী নমো নমঃ ॥

অষ্টকরমূলে, ধৃত ঘণ্টা, শূলে,
শঙ্খ, চক্র, হল, ধনু, শর, মুসল,
মহাসরস্বতী নমো নমঃ ॥[গ]

(গ) । উত্তর চরিত—মহাসরস্বতীর ধ্যান ।

ওঁ ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছোভাংশুতুল্যপ্রভাম্ ।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্ ॥

যিনি অষ্টহস্তপদ্মে ঘণ্টা, শূল, লাঙ্গল, শঙ্খ, মুসল, চক্র, ধনু ও বাণ ধারণ করেন। যিনি মেঘমধ্যে বিচরণশীল চন্দ্রতুল্য স্নিগ্ধকান্তিযুক্তা, গৌরীদেহ উদ্ভূতা, ত্রিভুবনের আধার-স্বরূপিনী ও দৈত্যবিনাশিনী —সেই অপূর্বা মহাসরস্বতীকে এখানে ভজনা করি।

●

॥ গুহ্যকালী ॥

[বীরভূম জেলার অন্তর্গত "নলহাটী" হইতে ১২ মাইল দূরে "আকালীপুর" গ্রামে
মহারাজা নন্দকুমার কর্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ।]

শ্রীসত্যেশ্বর অধিকারী

কিম্বদন্তী আছে,—পুরাকালে দ্বাপরযুগে মহারাজা জরাসন্ধ কর্তৃক "গুহ্যকালী" নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীরাজ চৈতসিংহ কর্তৃক সেবিত হয়। পরবর্তীকালে উক্ত মূর্তি কোন কারণে নদীগর্ভে অন্তর্হিত হয়। মহারাজা নন্দকুমার স্বপ্নাদেশ লাভ করেন, নদীগর্ভ হইতে উক্ত মূর্তি উদ্ধার করেন ও তাঁর রাজ্য 'ভদ্রপুরের' পার্শ্ববর্তী গ্রাম 'আকালীপুর'-এ প্রতিষ্ঠা করেন।

সাধারণতঃ আমরা কালীমূর্তির পূজা করি—শায়িত মহাদেবের উপরে দণ্ডায়মানা চতুর্ভুজা মূর্তি। মহাকালরূপে কালনাশিনী সংহারিনী মূর্তি। এক হাতে খড়্গ ও এক হাতে অসুর আক্রমণ, সব অসুরকে নাশ করে চলেছে। সে মূর্তি প্রলয়করী, ভয়ঙ্করী। অন্য দুইটি হাত বরাভয় প্রদানকারী। অন্য কথায় সাধারণতঃ আমরা যে কালীমূর্তির পূজা করি, তাহাতে একাধারে সংহারময়ী ও কল্যাণময়ী উভয় রূপটি বর্তমান। কিন্তু সংহারময়ী রূপটি অধিকতর-ভাবে প্রকাশিত। এই মূর্তির মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বও নিহিত আছে ব্রহ্ম ও শক্তি। ব্রহ্মের তিনটি অবস্থা,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন (স্থিতি)

করেন, আর মহাদেব লয় (সংহার) করেন। কালীমূর্তির নাভিদেশ থেকে নিম্নাংশ 'সৃষ্টির' প্রতীক। কটিদেশ হইতে অবলম্বিত করগুলি কর্মের নিদর্শন। যিনি যেমন কর্ম করিবেন, তদনুযায়ী পরবর্তী জন্ম লাভ করিবেন। কণ্ঠদেশ হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত 'স্থিতির' প্রতীক, স্তন দিয়া জীবকে লালন পালন করেন। কণ্ঠদেশ থেকে উর্দ্ধাংশ 'লয়ের' প্রতীক। করালবদনা, ভীষণদশনা, জীবকে গ্রাস করে চলেছেন। সুতরাং কালীমূর্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রতীক অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মের প্রতীক।

মহারাজা নন্দকুমার কর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 'গুহ্যকালী' মূর্তির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। বৃহৎ একখণ্ড কষ্টিক প্রস্তর দ্বারা নির্মিত মূর্তি। অনন্তনাগের উপর উপবিষ্টা দ্বিভুজা মূর্তি। এক হাতে অভয়দানকারী, অন্য হাতে বরপ্রদানকারী। এই মূর্তিতে খড়্গধারিণী ও অসুরদলনী হস্ত দুইটি নাই। সর্ব অঙ্গে নাগের ভূষণ। দুই পদে নাগের বলয়। দুই হাতে নাগের কঙ্কন। কটিদেশে নাগের অলঙ্কার। গলায় নাগের হার। হারের উপর নরমুণ্ড সজ্জিত, অসুরমুণ্ড নহে। দুই কর্ণে দুই শিশুর পদ, ও শিশুর মস্তক দুইটি মায়ের বক্ষদেশে স্তনের উপর। মায়ের মস্তকে অসংখ্য নাগের ফণা আচ্ছাদন। সর্বোপরি মায়ের মূর্তিটি লাস্যময়ী, সংহারময়ী নহে, বরাভয় প্রদায়িনী মাধুর্য্যময়ী মূর্তি। এরূপ মূর্তি অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ কালীমাতার সংহারময়ী মূর্তি বহিরঙ্গ, মাধুর্য্যময়ী মূর্তি অন্তরঙ্গ, গুহ্য। আলোচ্য কালীমূর্তি কেবল অন্তরঙ্গ। মাধুর্য্যময়ীরূপের স্তোতকরূপে প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত হইতেছে। অন্যকথায় সংহারিণী রূপটি সুপ্ত ও মাধুর্য্যময়ী রূপটি ব্যক্ত। এইরূপে ভীতির অবকাশ নাই, অভয়ের প্রকাশ। ক্রোধের দৃশ্য নাই, শান্তির দ্যোতক। নাগের ভূষণ ক্রোধাদি রিপুদমনের প্রতীক। স্তনদেশে সন্তানের মস্তক স্নেহময়ী জননীর বাৎসল্যময়ী রূপের প্রকাশ। গলার হারের উপর নরমুণ্ডগুলি জগৎ রক্ষিত্রীর প্রতীক। অন্য ভাষায় ব্রহ্মার কেবল 'স্থিতি' (পালন) অবস্থার প্রতীকস্বরূপ বিদ্যমানা। এই কারনেই গুহ্যরূপের অধিষ্ঠাত্রী বলেই এর আখ্যা 'গুহ্যকালী'। সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত কালীমূর্তি নহে। ইহাকে 'ম' কালী— আকালীও বলা যায়। অনুধান উক্ত মূর্তির মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত স্থানের নামকরণ হইয়াছে "আকালীপুর"।

প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা-তিথির পরবর্তী 'চতুর্দ্দশী'-তিথিতে 'আকালীপুরে' 'গুহ্যকালী'র বিশেষ পূজা ও উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

●

॥ ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

(বেদান্তের আলোকে)

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী প্রভানন্দ

ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও রূপটি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুমাত্রেরই কয়েকটি প্রশ্ন। সর্বপ্রথমেই চোখে পড়ে 'rational ও philosophical Brahmoism' এবং 'practical Brahmoism' এর মধ্যে বৈষম্য প্রচুর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনপনেয়। কথা ও কাজের, মন ও মুখের মধ্যে যে দুস্তর বৈষম্য এবং ফলতঃ অনির্দিষ্টতা দেখা দিয়েছে তার ধূলিজাল পরিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি ১৩১৮ সালে লেখা "ধর্মশিক্ষা" প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "ব্রাহ্মধর্মের ভিতরকার এই অনির্দিষ্টতাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহাকে এক জায়গায় চিরন্তনরূপে স্থির রাখিবার জন্য আজকাল ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে একটি ধর্মতন্ত্র, একটি ফিলসফি বলিতে ইচ্ছা করেন। .....কিন্তু যিনি যাহাই বলুন ব্রাহ্মধর্ম কোনো একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সুপ্রণালীবদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা নহে।.....কোনো দর্শনতন্ত্র এই ধর্মকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁস লইয়া ছোটে তবে একথা তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ইহাকে বন্দী করিতে হয় তবে তাহার আগে ইহাকে বধ করিতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথের মতে কোন সুনির্দিষ্ট দর্শনতন্ত্র ব্রাহ্মধর্মের স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি ব্রাহ্মধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে দেবেন্দ্রনাথ এই ধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শিবনাথ শাস্ত্রী পুনঃ পুনঃ তাত্ত্বিক মূল্যায়ণ করে ব্রাহ্মধর্মকে জীবন্ত শক্তিমান প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

হিন্দুচিন্তার শিরোমণি অদ্বৈতবেদান্তের নবভগীরথ বলে রামমোহনকে চিহ্নিত করতে আধুনিককালের কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্থ। তাঁদের মতে রামমোহনের প্রবর্তিত 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' ধর্মের লক্ষণে পুরোপুরি 'সেকুলার', যাবতীয় ধর্মীয় সংস্কারের বাঁধন হবে মুক্ত। তাঁর পরিকল্পিত ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য উদারতা, বিশ্বজনীনতা। এই মতানুসারে হিন্দুদের তথা ভারতীয়দের অদ্বৈতবেদান্তের সুদৃঢ়বাঁধনে সীমিত তত্ত্ব রামমোহনের মতাদর্শকে ধারণ করতে সমর্থ হয় নি এবং তাঁর নির্দেশিত নতুন পথের সঙ্কেত তাঁর উত্তরসূরিগণ বুঝে উঠতে পারেন নি। যদিও কেশবচন্দ্র হতাশ হয়ে বলেছিলেন "it appears strange that the real creed of such a great reformer and extraordinary theologician should be a subject of such wild surmise and conflicting opinions and even of severe criticism"। তাঁর পরাণুসারিদের অধিকাংশই বিশ্বাস করতেন যে, রামমোহনের জীবন-উৎস ধর্ম এবং অনেকের মতে সে-ধর্ম হচ্ছে শঙ্করাচার্য যেঁষা অদ্বৈতবেদান্ত।

ব্রাহ্মধর্মের চরিত্র নিরূপণ করতে গিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন যে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মাতিরিক্ত (অবশ্যই অদ্বৈতবেদান্তাতিরিক্ত), খ্রীষ্টধর্মোত্তীর্ণ ও ইসলামের একেশ্বরবাদের চাইতে মহত্তর। ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "It is the aim of modern theism to combine in itself the best spirits of these three forms of faith ; and to infuse into them the spirit of universal religion."[১১] সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রীজীর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মধর্মের তুলনায় ভারতীয় বেদান্তত্ত্ব নেহাৎ-ই সীমিত ও পরিমিত। এদিকে দেখতে পাই শাস্ত্রীজীর আত্মজীবনে ভিন্ন এক চিত্র। তিনি তাঁর ডায়েরীতে ১৮৮৮ খ্রীঃ ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছেন যে তাঁর প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা লৌকিক নীতির প্রতি দৃষ্টি অধিক। তিনি আরও লিখেছেন, "আধ্যাত্মিক জীবন সম্পূর্ণরূপে ঐশীশক্তির খেলা। ঈশ্বর জীবন্ত শক্তিরূপে যখন হৃদয়ে বাস ও ক্রীড়া করেন তখনই তাঁহার ফল আধ্যাত্মিক জীবন। ঐশী শক্তি গুরু হইয়া মানবের চক্ষু খুলিয়া দেয়; ঐশী শক্তিই চক্ষের জ্যোতি হইয়া গূঢ় তত্ত্বসকল প্রকাশ করে, ঐশী শক্তিই কথাতে কার্যেতে আধ্যাত্মিক জীবন আনিয়া দেয়। আমাকে কি প্রভু এরূপে সহায়তা করিবেন না? আমি যে নিতান্ত তাঁহার অনুগত। আমাকে এইরূপে ঐশীশক্তি ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।"[১২] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে আবদ্ধ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর প্রার্থিত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে সমর্থ হন নি। পরবর্তীকালের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অদ্বৈততত্ত্বমূলীন মতাদর্শ শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নেতাদের আধ্যাত্মিক-অনুভূতি-সঞ্জাত নয়, বুদ্ধি ও যুক্তি প্রসূত। সে-কারণেই শাস্ত্রীজীর প্রাগুক্ত আত্মবিলাপ বারংবার শুনতে পাই।

যে কালে ব্রাহ্মনেতাদের যুক্তিবিচারের আড়ালে ভক্তির প্রাধান্য প্রকট হয়ে উঠেছিল সে সময়ে স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু-পুনরুত্থান ঘটেছিল। শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, বিচারপতি উডরফ ও তাঁর তান্ত্রিক গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, কর্ণেল অলকট ও এনিবেসান্ত প্রভৃতিকে দেখতে পাই এই পুনরুত্থিত আন্দোলনের সম্মুখে। কিন্তু এই আন্দোলনও সার্থক হয়ে উঠতে সক্ষম হয় নি, তার প্রধান কারণ নেতৃবর্গের ভারতাত্মা অদ্বৈতবেদান্তের উৎস হতে শক্তি-সংগ্রহে ব্যর্থতা।

ইতিমধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যে ঐশীশক্তির অভাবের জন্য শিবনাথশাস্ত্রী বিলাপ করেছিলেন সেই ঐশীশক্তির ক্রোড়ে লালিতপালিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি বিস্ময়কর। রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্ম-নেতাগণ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অব্রাহ্ম নেতাগণ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ হিন্দু নেতাগণের কারুরই ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাঁদের অধিকাংশই পরম্ব আহরণ করতে গিয়ে নিজস্ব সম্পদের যোগ্য মর্যাদা দিতে পারেন নি, বরঞ্চ নূতন নূতন ভাবতরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে

১১। Pandit Shivnath Sastri : The Mission of the Brahma Samaj, 2nd Edn., 1910, p. 92.

১২। 'আলোচনা'—৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৯০।

জনসাধারণের মধ্যে প্রায়ই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। এককালে ব্রাহ্মমতাবলম্বী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব লিখেছেন, "এই বিপ্লবে সমাজ-ভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনের বলে এক অপূর্ব সমন্বয়ের পন্থা খুলিয়া দিয়াছেন। ঐ পন্থা ধরিলে গৃহচ্যুত হইতে হয় না, অথচ পরকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায়। নবাগত শক্তি ও ভাব-সকলকে অগ্রাহ্য করিলে বাঁচিতে পারা যাইবে না—উহারা তোমার গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিবে।...ভগবান রামকৃষ্ণ খাঁটি হিন্দু সাধক ছিলেন। আগন্তুক ভাববিরোধগুলি ব্রহ্মবিজ্ঞানে মিলিত করিয়া লোকরক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর লোকরক্ষার সেতু।" [৭৩]

সাহিত্যিক রোমা রোলাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ "ভারতীয় মহাসঙ্গীত" (Symphony)। ধর্মেতিহাসের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ বিস্ময়। তিনিই হিন্দুর বেদান্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তিনিই হিন্দুধর্মের সামগ্রিক ও বিশ্বজনীন প্রতিভূ। তাঁর সাধনা ও সিদ্ধিতে বিধৃত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পরিচয় দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, "সমগ্র ধর্মটাই বেদান্তের মধ্যে আছে—অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি স্তর বা ভূমির ভিতর আছে,—একটি আরেকটির পর এসে থাকে। এই তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিকা। ইহার প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। ইহাই ধর্মের কথা। ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার ও ধর্মমতের ভেতর প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যেরূপ নিয়েছে, সেটাই হচ্ছে হিন্দুধর্ম।" শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই একালে সর্বগুণান্বিত বৈদান্তিক জীবন। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর মতে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশই এ যুগের উপনিষদ। শ্রীঅরবিন্দের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন, অধ্যাত্মরাজ্যের দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে জনসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্বন্ধে ভয়-বিস্ময়-মেশানো একটি কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল। নবীন শিক্ষিত অনেকের কাছেই সে-সকল উপলব্ধি ছিল মস্তিষ্ক বিচারপ্রসূত। দেশীয়ধারায় শিক্ষিত পণ্ডিতদের কাছে ধর্ম সীমাবদ্ধ ছিল দার্শনিক চুলচেরা বিচার ও লৌকিক আচার-আচরণের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভের পূর্বে ভারতীয়দের বেদান্তবিষয়ে ধ্যানধারণা ছিল যেমন অস্পষ্ট তেমনি বিচিত্র। তদানীন্তনকালের যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতার পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বেদান্তধর্মের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সে-কারণে রামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক বেদান্ত-আন্দোলনের স্বরূপ ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকেই প্রথমদিকে ধারণা করতে পারেন নি। রামকৃষ্ণ-জীবন সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি স্বামী শিবানন্দকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "তাঁহার জীবন অনন্তশক্তিপূর্ণ একটি সন্ধানী আলো; ইহা ভারতের সমগ্র ধর্মভাবের উপর বিচ্ছুরিত হইয়াছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন এবং এক জীবনে ভারতের জাতীয় ধর্মজীবনের সমগ্র কল্পটি অভিব্যাহিত করিয়াছেন।" (অনুদিত) শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর

৭৩। উদ্বোধন, ৩১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩৫।

একার বছরের জীবনে জাতির পাঁচ হাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেছিলেন। উনিশ শতকের ধর্মান্দোলনের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব বেদান্তের অভ্যুদয়ের সূচক, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি বেদান্তের ভাবাদর্শের যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠাভূমি। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের পটভূমিকায় ভারতাত্মার মূলশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা বেদান্ত বিশ্বমূর্তিতে উপস্থাপিত হয়েছিল, 'অদ্বৈততত্ত্বসমাহিতচিত্ত' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে বেদান্ততত্ত্ব বিবিধ ও বিচিত্র শক্তিতে স্ফুরিত হয়েছিল। এই শতাব্দীর ধর্মসংস্কারের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলাফল সম্বন্ধে ডঃ রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "The Brahmo-Samaj and the Arya Samaj are the outcome of the contact with western influences, and yet Hinduism is not to be dismissed as a mere flow and strife of opinions, for it represents a steady growth of insight, since every form of Hinduism and every stage of its growth is related to the common background of the Vedanta. Though Hindu religious thought has traversed many revolutions and made great conquests, the essential ideas have continued the same for four and five milleniums. The germinal conceptions contained in the Vedanta standard."[১৪] বেদান্তবীজে অন্তর্নিহিত অনন্তশক্তির বিকাশ ও তার সামগ্রিক স্ফূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের মহৎ কীর্তি। নূতন যুগের মানুষের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে বেদান্তকে মানবজীবনের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্তর কীর্তি। উনিশশতকের জড়বাদভিত্তিক মানবিকতাকে বেদান্তের আলোকে চেতনান্বিত করে মানববিবর্তনের অনন্ত-সম্ভাবনাময় দিগন্ত উন্মোচন শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্তম কীর্তি। সেকারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ এযুগের দিগ্‌নির্দেশক আলোকবর্তিকা।

●

১৪। Radhakrishnan Reader : An Anthology, edited by K. M. Munshi & R. R. Diwakar, p. 136.

ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ভবনাথ ঃ

ব্রহ্মচারী প্রণবেশচৈতন্য

(এক)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের বলেছিলেন, "সাধ ছিল—মাকে বলেছিলাম, 'মা, ভক্তের রাজা হব।'[১] আর মা ভগদম্বার কাছে প্রার্থনা ছিল তাঁর 'জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ'[২] করবেন বলে। তাই কথায় কথায় একদিন 'বাবা' মথুরকে বললেন, "দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে; তারা সব আসবে; এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে; প্রেমভক্তি লাভ করবে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবেন, অনেকের উপকার করবেন, তাই খোলটা এখনও ভেঙ্গে দেন নি—রেখেছেন। তুমি কি বল? এ সব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখছি, বল দেখি?" মথুর বললেন, "মাথার ভুল কেন হবে, বাবা? মা যখন তোমায় এ পর্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে।" "এখনও তারা সব দেরি করছে কেন? (অন্তরঙ্গ ভক্তেরা) শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি।"[৩] কিন্তু মথুরের জীবদ্দশায় ভক্তেরা কেউ আসেনি। এজন্য ঠাকুরেরও ভাবনার অন্ত ছিল না। 'মা' ত' তাঁকে কখন ভুল দেখাননি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যোগারূঢ় হয়ে পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তসকলকে দেখবার জন্য এবং তাঁদিগের অন্তরে নিজ ধর্মশক্তি সঞ্চার করবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ঠাকুর বলতেন, "সেই ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। দিবাভাগে সর্বকাল ঐ ব্যাকুলতা হৃদয়ে কোনরূপে ধারণ করিয়া থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়া যখন বিষবৎ বোধ হইত, তখন ভাবিতাম, তাহারা সকলে আসিলে ঈশ্বরীয় কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিব, শ্রবণ জুড়াইব, নিজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল তাহাদিগকে বলিয়া অন্তরের বোঝা লঘু করিব। ঐরূপে প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদিগের আগমনের কথায় উদ্দীপন হইয়া তাহাদিগের বিষয়ই নিরন্তর চিন্তা করিতাম—কাহাকে কি বলিব; কাহাকে কি দিব, ঐ সকল কথা ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার সমাগম হইত, তখন ধৈর্যের বাঁধ দিয়া ঐ ব্যাকুলতাকে আর রাখিতে পারিতাম না, মনে হইত আবার একটা দিন চলিয়া গেল, তাহাদিগের কেহই আসিল না। যখন দেবালয় আরাত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টারোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন বাবুদিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়া হৃদয়ের যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস্, আয় রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারছি না' বলিয়া চীৎকারে গগন পূর্ণ করিতাম।...ঐরূপ হইবার কয়েকদিন পরেই উক্ত সকলে একে একে

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ (১৩৮১), পৃঃ ২৪০ [এর পর থেকে শুধু কথামৃত]।

২। ঐ, ৪র্থ ভাগ (১৩৮১), পৃঃ ৩৮।

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ (১৩৮০), ভক্তভাব-পূর্বার্ধ, পৃঃ ৫১৮ (এর পর থেকে লীলাপ্রসঙ্গ)

উপস্থিত হইতে লাগিল।"[৩] তাঁর ব্যাকুল আবেদনে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগিন প্রভৃতি ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপস্থিত হন। ঠাকুরের অনেক গৃহী-শিষ্যদের জীবন আমাদের কাছে অজানা। বিশেষ করে ভবনাথ, ছোট নরেন, পল্টু প্রভৃতি ভক্তদের। তাই এই প্রবন্ধে অনেকের একজন—ভবনাথের একটি ছোট্ট জীবন-চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করব। ভবনাথকে আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন। কারণ, ভবনাথের উদ্যমে ও চেষ্টায় ঠাকুরের সর্বত্রপূজিত ফটো আমরা পেয়েছি। আমরা তাঁর কাছে ঋণী।

শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো তোলার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা স্মরণ করব না ভবনাথের, স্মরণ করব তাঁকে তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চ ধারণার জন্য। তিনি ভবনাথকে নরেন্দ্রনাথ, রাখালের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন। তিনি বলতেন, "নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এরা সব নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বর-কোটি।"[৫] শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী একবার ঠাকুরের পিতার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "অমন ছিলেন বলেই ভগবান তাঁর ঘরে এসে জন্ম ছিলেন। তিনি এসেছিলেন—আর তাঁর এইসব সাঙ্গোপাঙ্গরাও এসেছিল—নরেন, রাখাল, বলরাম, ভবনাথ, মনমোহন, কত বলবো মা, ...।"[৬] শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টিতে ভবনাথ হলেন ঠাকুরের পার্ষদ। আর লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সাধনানন্দজী লিখেছেন, "বিনয়, নম্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস-ভক্তির জন্য ভবনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল।"[৭]

ভবনাথের পুরো নাম ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলকাতার বরাহনগর অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জি লেনে ভবনাথের জন্ম। তাঁর বাবার নাম রামদাস চট্টোপাধ্যায় ও মাতা হলেন ইচ্ছাময়ী দেবী। ভবনাথ ছিলেন মা-বাবার একমাত্র পুত্র। তাঁদের একটি কন্যাও ছিল। নাম—ক্ষীরোদবালা। ভবনাথ দেখতে অতি সুপুরুষ, গায়ের রঙ অতি উজ্জ্বল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিকার ভবনাথের পরিচয় দিয়েছেন :

"জুটিলেন ভবনাথ পরম সুন্দর।
বরাহনগর কাছে গঙ্গাতীর ঘর।
নবীন তেঁহ ব্রাহ্মণের ছেলে।
উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ হয় এই কালে।"[৮]

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের অনুকরণ কলকাতা যুব সমাজের মধ্যে বেশ চালু হয়ে গেছে। বরাহনগরও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ঠিক এ সময় শশীপদ ব্যানার্জি নামে এক

৩। ঐ, সাধকভাব, পৃঃ ৩৩৮৪।
৪। কথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৭১), পৃঃ ১০২।
৫। উদ্বোধন, মাঘ, (১৩৭১), পৃঃ ১০৩।
৬। লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম ভাগ, দিব্যভাব, পৃঃ ২৩৯।
৭। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, (১৩৮০), পৃঃ ২১১ [এরপর থেকে শুধু 'পু থি']।

যুবকের নেতৃত্বে এক যুব-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই যুব-গোষ্ঠীর সদস্যরা ছিলেন ভবনাথ, কালীকৃষ্ণ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, দাশরথি সান্যাল প্রভৃতি। পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরে এরা সবাই শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য দর্শনে ধন্য হয়েছিলেন। এই যুবক-দল 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন ১৮৭৬ সালে। সভার কাজ ছিল বিভিন্ন জনহিতকর সেবা। শশীপদ ব্যানার্জি তখনকার দিনে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। সস্ত্রীক ইংল্যাণ্ডেও গিয়েছিলেন। বরাহনগরে শ্রমজীবিদের একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন এবং শ্রমিকদের জন্য একটি পত্রিকাও প্রকাশিত করেছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানকে স্বামীজী আমেরিকা থেকে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। এই শশীপদ ব্যানার্জি অগ্রণী হয়েছিলেন পাশ্চাত্য-সভ্যতার অনুকরণ থেকে যুবকদের রক্ষার জন্য। সেই উদ্দেশ্যে ঐ 'আত্মোন্নতি সভা' স্থাপিত হয়েছিল। এতে একটি পাঠাগার ছিল। এ-ছাড়া সদস্যরা সমাজসেবামূলক অনেক কাজও করতেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এরা 'দক্ষিণ বরাহনগর পাব্লিক লাইব্রেরী' নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পরে ১৮৯৩ সালে উপরোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠান এক হয়ে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। নাম 'বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী'। আজও বরাহনগরে এই লাইব্রেরী আছে। ভবনাথ আজীবন এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তখনকার দিনে কলকাতার যুবদলের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপত্তি ছিল। ব্রাহ্ম-নেতাদের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে যুবকেরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে লাগলেন। ভবনাথ ও তাঁর বরাহনগরে বন্ধুরা এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ভবনাথ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যপদ গ্রহণ করলেন। এখানেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভবনাথের পরিচয় হয়। পরিচয় ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আর এ বন্ধুত্ব ছিল আজীবন। ভবনাথ ও নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) মধ্যে ভালবাসা ও মিল দেখে পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্য করে বলতেন, "জন্মান্তরে তুই নরেন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী ছিলি বোধ হয়।"[৯] তিনি আরও বলতেন, "নরেন্দ্র আর ভবনাথ দু'জনে তারী মিল—যেন স্ত্রী-পুরুষ।"[১০] "ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ী—দু'জনে যেন স্ত্রী-পুরুষ। তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে-বাসা করতে বললুম। ওরা দু'জনেই অরূপের ঘর।"[১১]

ভবনাথের বন্ধুদের সঙ্গে ক্রমশঃ নরেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। সাতকড়ি লাহিড়ী নরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। আর দাশরথি সান্যাল তাঁর সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। সুবিধা পেলেই ভবনাথ নরেন্দ্রনাথকে নিজের বাড়িতে আনিয়ে আহারাদি করাতেন। ভবনাথ ও তার বন্ধুরা নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে মাঝে মাঝে কয়েক ঘণ্টা কাল বা দু'এক দিন কাটাতেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁদের সমাজসেবামূলক কাজের খুবসী প্রশংসা করতেন। প্রয়োজনমত পরামর্শও দিতেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যেদিন নরেন্দ্রনাথ বন্ধুগণের সঙ্গে বরাহনগরে

৯, ১২। লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব, পৃঃ ২৩১-৩৩।

১০। কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১০২।

১১। ঐ, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৩৪।

গিয়েছিলেন এবং রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত ভজনাদিতে অতিবাহিত করে আহারের শেষে তাঁহাদিগের সহিত এক ঘরে শুয়ে নানান আলাপে নিযুক্ত ছিলেন, সেইদিনই তিনি সেখানে রাত্রি প্রায় দুটোর সময় তাঁর বাবার হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হবার খবর পান।[১২]

ভবনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের ছেদ কোনদিনই পড়েনি। এমনকি, যখন নরেন্দ্রনাথ আমেরিকার চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুধর্মের উপর বক্তৃতা দিয়ে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, তখনও তিনি এই বরাহনগরের বন্ধু ভবনাথকে ভুলেননি। গুরুভাইদের সঙ্গে তাঁকেও স্মরণ করেছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন। "ভবনাথ কেমন আছে, কি করছে? তোমরা তার কাছে যাও কিনা—তোমরা তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর কিনা?···ভবনাথ তোমাদের ভালবাসে কিনা? তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা দিও—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ লিখেছেন গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দজীকে।[১৩] ব্রহ্মানন্দজীর কাছে তিনি লিখছেন, "···কালীকৃষ্ণ, ভবনাথ, দাশু, মাতু, হরি চাটুয্যে সকলকে তোমরা ভালবাস কিনা—সব লিখবে।"[১৪] তিনি গুরুভাইদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভবনাথের সংগঠন ক্ষমতা। তিনি লিখেছেন, "হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু, তারকদা প্রভৃতি সকলে মিলে যুক্তি কর।"[১৫] "···ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে।"[১৬]

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(নয়)

পূর্বে রামায়ণ-মহাকাব্যে সঙ্গীতের পাঠ্য বা সাহিত্যের কথা উল্লেখ করেছি। রামায়ণের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ সর্গে 'কুশীলবৌ তু ধর্মজ্ঞৌ রাজপুত্রৌ যশস্বীনৌ'—রাজপুত্র কুশী-লব যে রামায়ণ তথা রামচরিত গান করেছিলেন সপ্তজাতি বা সাতটি জাতিরাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ক'রে সে সম্বন্ধে মহাকবি বাল্মিকী অতিসুললিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন রামায়ণে।

রামায়ণ-মহাকাব্য রচনা করেছিলেন মহাকবি বাল্মিকী তেরোটি ছন্দে লীলায়িত ক'রে—যেমন বেদব্যাস আঠারোটি ছন্দে লীলায়িত মহাভারত রচনা করেছিলেন রামায়ণোত্তর যুগে। তেমনি পরবর্তীকালে পনেরোটি ছন্দে শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যূন পঞ্চাশটি ছন্দে লীলায়িত 'শিশুপালবধ'-কাব্য রচনা করেছিলেন মহাকবি মাঘ।

১২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, (১৩৭১), পৃঃ ৬০।
১৩। তদেব, পৃঃ ৮৪।
১৪। তদেব, ৬ষ্ঠ ভাগ (১৩৭১), পৃঃ ৪৮২।
১৫। তদেব, ৬ষ্ঠ ভাগ পৃঃ ২৪৭।

মহাকাব্য রামায়ণ পদ্যে রচিত। পরবর্তী মহাভারতও তাই। ছন্দশাস্ত্র পঞ্চমবেদাঙ্গ ও অষ্টাদশ বিদ্যার অন্যতম। কথিত যে, সৈতব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, মাণ্ডব্য প্রভৃতি মুনিরা সংস্কৃত ছন্দোশাস্ত্রের প্রচার করেন। ছন্দ বৈদিক ও লৌকিক দু'ভাগে বিভক্ত। নিরুক্তকার যাস্ক 'ছন্দ'-শব্দের ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে বলেছেন : 'ছন্দাংসি ছাদনাৎ'। মহামতি পাণিনি 'ছন্দস্'-শব্দ আনন্দ বা আহ্লাদনার্থে নিষ্পন্ন করেছেন—'ছন্দয়তি হ্লাদয়তীতি ছন্দঃ'। গদ্যসাহিত্য ও পদ্য-সাহিত্য উভয়েই ছন্দের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে গদ্যের চেয়ে পদ্যের রসশালিত্য অধিক—এ'কথা সাহিত্যরসিকেরা স্বীকার করেন, কেননা পদ্যে গভীর ভাবকে সহজে প্রকাশ করা যায়। সেজন্য মহাকবি বাল্মিকী পদ্যেই রামায়ণ-মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। মহাভারত, হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণসাহিত্যের কথাও তাই। তাছাড়া পদ্যের প্রধান গুণ যে, পদ্য সহজেই মুখস্থ করা যায়, সুতরাং স্মৃতিপথে তা রক্ষিত থাকে।

বেদে পদ্য ও গদ্য উভয় রচনাশৈলীই দেখা যায়। পদ্য ঋক্ বা মন্ত্র নামে পরিচিত, আর গদ্য ব্রাহ্মণ ও নিগদ নামে পরিচিত। রামায়ণে, মহাভারতে, হরিবংশে ও অন্যান্য পুরাণ-সাহিত্যে ছন্দের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্যে অনুষ্টুপ, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিল, ইন্দ্রবংশা, বৈশ্বদেবী, প্রহর্ষিণী, রুচিরা প্রভৃতি ত্রিশটি ছন্দের সমাবেশ দেখা যায়। 'শিশুপালবধ'-কাব্যে আরও কুড়িটি অধিক ছন্দের সমাবেশ আছে। বেদে গায়ত্রী, উষ্ণিহ্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী—এই সাতটি ছন্দের সমাবেশ দেখা যায়। গায়ত্রীছন্দ তিনটি পদযুক্ত—ত্রিপদা ও আটটি অক্ষরযুক্ত। গায়ত্রীর তিনটি পদে বা চরণে চব্বিশটি অক্ষর থাকে। গায়ত্রীই সকল ছন্দের মূল বা কেন্দ্র। এভাবে বৈদিক ছন্দগুলির বিভিন্ন পদের ও অক্ষরের পরিচয় আছে। অমরসিংহ পদ্যকেই ছন্দ বলেছেন—'যথা ছন্দঃ পদ্যে চ বেদে চেতি'। তাছাড়া পদ্যকে ছন্দোবদ্ধ পদ বলে—'ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্'। আসলে লঘু-গুরু-স্বরের ব্যবস্থাকেই ছন্দ বলে। স্বরবর্ণই ছন্দের নিয়ামক ও প্রাণ। তন্ত্রশাস্ত্রে স্বরবর্ণ শক্তি নামে পরিচিত। রুদ্রযামলে বলা হয়েছে : "স্বরা অক্ষরসংজ্ঞা স্যুর্হলস্তদনুযায়িনঃ'। ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের অনুযায়ী বা অনুসঙ্গমাত্র। মোটকথা ছন্দঃশাস্ত্র ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদির মতো সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কাব্যে ও সাহিত্যে রসপ্রকাশে বা রসপরিবেশনে সাহায্য করে ছন্দ। এজন্য অলঙ্কারাদি রসশালিত্যের আলোচনায় ছন্দের আলোচনা অপরিহার্য।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'রামায়ণ'-মহাকাব্য প্রথমে মুখে মুখে স্বরসংযোগে গান করা হোত। গান করতেন দেশে দেশে ভ্রাম্যমান চারণদল। এদের অধ্যাপক ভিন্টারনিজ বলেছেন—'Wandering Bards'। কুশী-লবকে মহাকবি বাল্মিকী ধর্মজ্ঞ রাজপুত্র—'কুশীলবৌ তু ধর্মজ্ঞৌ রাজপুত্রৌ' বলেছেন, আর বলেছেন গান্ধর্ববিদ্যাবিশারদ যশস্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়—'ভ্রাতরৌ যশসান্বিতৌ'।

'কুশী-লব'-শব্দের অর্থ সাধারণত চারণদল—যারা রামায়ণ প্রভৃতি দেশে দেশে, বিদ্বৎসমাজে ও রাজদরবারে গান ক'রে বেড়াতেন। পূর্বে বলেছি এবং এখনও বলি যে, মহাকবি বাল্মিকী-কর্তৃক গ্রন্থাকারে রামচরিতকাহিনী রচনা করার বহুপূর্ব থেকে মুখে মুখে রামায়ণকাব্য গান

করা হোত। সুতরাং যদিও রামায়ণরচনার কাল বর্তমানে নির্ধারণ করি খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ শতক, কিন্তু এই রচনাকালের নির্ণয় ঠিক ইতিহাসসম্মত নয়। মহাভারতের কথাও তাই।

রামায়ণকাব্য রামচরিতগানের কথা বা সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যকে বাল্মিকী 'পাঠ্য' বলেছেন। রাম-কৃত 'তিলক'-ব্যাখ্যায় পাঠ্য-সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "পাঠ্য ইতি। ইত: শ্লোকচতুষ্টয়মেকান্বয়ম্। পাঠ্যগেয়য়োর্ভাবে পক্তৌ। তেন পাঠে গানে চেত্যর্থ:"। মোটকথা গেয় বা গান করার উপযুক্ত সাহিত্যের (কথার) নাম পাঠ্য, সুতরাং পাঠ্য গানোপযোগী সাহিত্য। 'পাঠ্য'-শব্দ 'পদ্য'-শব্দের অনেকটা সমানার্থক, কেননা 'পদ্য'-শব্দের অর্থও গান। টীকাকার মল্লিনাথ বলেছেন: "অর্থপ্রকাশকম্ পদ্যম্"। অবশ্য 'পদ্য'-শব্দ নিয়ে বাদানুবাদের অন্ত নাই। মোটকথা রামায়ণ গান বা রামচরিত গানের সাহিত্যকে প্রধানত 'পাঠ্য' বলা হোত।[১]

রামায়ণের যুগে সঙ্গীতের সাহিত্য 'পাঠ্য' মন্দ্র, মধ্য, তার এই তিন স্থান (সপ্তক), বিবিধ মূর্ছনা, শৃঙ্গার প্রভৃতি রস ও মধুর, বীরাদি ভাবসম্পন্ন ছিল। গানে ব্যবহৃত হোত 'রাগ' এবং সেই রাগের নাম 'জাতি' বা 'জাতিরাগ'। জাতিরাগ, গ্রামরাগ নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বদের আবিষ্কৃত বা রচিত 'গান্ধর্ব'-গানের অপরিহার্য অঙ্গ। তখন শুদ্ধ সাতটি জাতি তথা জাতিরাগের অনুশীলন ছিল। পরে জাতিরাগ থেকে মিশ্রজাতিরাগ ও গ্রামরাগের সৃষ্টি হয়। রামায়ণের যুগে শুধু নয়, বৈদিক যুগে সামগানের প্রায় পাশাপাশি গান্ধর্বগানের প্রচলন ছিল। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০—খ্রীষ্টীয় ২৯০ শতক) নাট্যশাস্ত্রে গান্ধর্বগানের পরিচয় দিয়েছেন। গান্ধর্বগানের স্বর-তাল-পদ ও গান্ধর্বোত্তর মার্গ ও অভিজাত দেশীগানের নৃত্য-গীত-বাদ্য অর্থে ও উপকরণে যথেষ্ট ভিন্ন। রামায়ণের যুগে গান্ধর্বগানের প্রচলন থাকলেও বৈদিক গান সামগানের ও বিচিত্র রকমের গানেরও অনুশীলন হোত। কুশী-লব রাজপুত্র হউন, আর চারণ-দলভুক্ত গীতিকারই হউন—তাঁরা ছিলেন গান্ধর্বগানের শিল্পী ও প্রচারক—"তৌ তু গান্ধর্ব-তত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্ছনকোবিদৌ"। 'জাতিভি: সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্"।

'তিলক'-টীকাকার এই অংশের শ্লোকগুলির অর্থ অনেকটা বিকৃত করেছেন। তিনি সপ্তজাতির অর্থ করেছেন সপ্তস্বর—"সপ্তজাতয়: ষড়্জাদয়: সপ্তস্বরা:। সপ্তস্বরবিশিষ্ট-গানানুরোধীতি যাবৎ"। লৌকিক ষড়্জাদি সাতস্বরের নামাঙ্কিত হলেও ষাড়্জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী, নৈষাদী বা নিষাদবতী সাতটি শুদ্ধজাতিরাগ বা স্বরের সমজাতীয় বা সমগোত্রীয় নয়, সুতরাং টীকাকার রাম এক্ষেত্রে অর্থকে যথেষ্ট সংকীর্ণ করেছেন। মনে হয়, তিনি জাতিরাগের অর্থ ও সার্থকতা ঠিক অবধারণ করতে পারেন নি।

জাতি জাতিরাগেরই নামান্তর। জাতিরাগ বৈদিকোত্তর গান্ধর্বগানের বীজরাগ। জাতিরাগ থেকেই পরে সকল রাগের সৃষ্টি ও বিকাশ হয়েছিল—'জাতিসম্ভবত্বাৎ গ্রামরাগানি' বা 'সর্বরাগানি'।

১। অনেকের মতে যা পড়া হয়, তাই পাঠ্য। পাঠ্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত-ভেদে দু'রকম—সংস্কৃত-পাঠ্য ও প্রাকৃত-পাঠ্য। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে এদের উল্লেখ আছে।

ষাড়্‌জী প্রভৃতি জাতিরাগ ও জাতিরাগ থেকে সৃষ্ট গ্রামরাগ প্রভৃতি রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০—২০০ শতক) পূর্বে গানে ব্যবহৃত হোত, কেননা 'রাগ' ছাড়া সঙ্গীতে মাধুর্যরস ও লালিত্যের বিকাশ করা সম্ভব নয়। রাগে যে মধুর-সংস্কারের সৃষ্টি হ'য়ে শিল্পী ও শিল্পসম্ভোগী শ্রোতার হৃদয়কে আনন্দরসে প্লাবিত করে তার নিদর্শন ক্লাসিকাল যুগের ইতিহাসেও পাওয়া যায়। মনে হয়, রামায়ণের 'তিলক'-টীকাকার গান্ধর্বগান বা গান্ধর্ব-সঙ্গীতের সঙ্গে পরবর্তী মার্গ ও অভিজাত ও পরিশুদ্ধ দেশী বা লৌকিক সঙ্গীতের পার্থক্যের কথা অবগত নন।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভিক্ষান্নকে অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। কারণ ভিক্ষান্নে কোন কামনা-বাসনা থাকে না। ফলে কামনার সংস্কার আর অন্তরের সংস্কারকে মলিন করিতে পারে না। স্বার্থের সঙ্কল্পযুক্ত কামনাই মনের সঞ্চিত সংস্কারকে মলিন করে, তাই ভিক্ষান্ন পবিত্র। বদরীকাশ্রমতীর্থের কিছু দূরে ব্যাসগুহা অবস্থিত। বদরীনাথের মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া চড়াইপথে ব্যাসগুহায় যাওয়া যায়। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ ঐ চড়াইপথ অতিক্রম করিয়া ব্যাসগুহায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গুহাটি বরফে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে দেখিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পৌরাণিক যুগে বেদবিভাগকর্তা ব্যাসদেব ঐ গুহায় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শীতকালে তীর্থযাত্রীরা ঐ গুহা দেখিতে পায়েন না, কেননা তখন চড়াইয়ের পথও বরফে পিচ্ছিল থাকে। 'ব্যাসগুহা' অতিক্রম করিয়া কিছুটা যাইলে দেখিতে পাওয়া যায় "বসুধারা" বা 'সহস্রধারা' নামে একটি প্রকাণ্ড জলপ্রপাত। অবিরত জলপ্রবাহ পর্বতের উপর হইতে নিম্নে গভীর শব্দ করিয়া পতিত হইতেছে। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রবলবেগে জলস্রোত অবিরত পতিত হইয়া সহস্রভাগে বিভক্ত হইতেছে এবং সেই অসংখ্য ধারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঐ জলপ্রবাহ পার্বত্য-অরণ্যের নিস্তব্ধতা ও শান্তি ভঙ্গ করিয়া মহানন্দে যেন বিশ্বপিতার মহিমা উচ্চৈস্বরে গান করিতেছে, সেইজন্য জলপ্রপাতের শব্দ গভীর হইলেও মনোমুগ্ধকর। ঐ ঝরণার জলে সকল তীর্থযাত্রীই স্নান করিয়া দেহের ক্লান্তি দূর করেন। সহস্রধারার পার্শ্ব দিয়া একটি অপূর্ব আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথও গিয়াছে তিব্বতের ভিতর দিয়া মানস-সরোবরের দিকে। ঐ আঁকাবাঁকা পথের চিহ্ন দেখিয়া কালীপ্রসাদ ঐ পথে তিব্বত যাইবার আকুল আগ্রহ দেখাইলে তুলসী মহারাজ তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, তিব্বতের দিকে অসম্ভব ঠাণ্ডা ও সর্বদাই বরফ জমিয়া থাকে। কালীপ্রসাদের নিকট

যথেষ্ট শীতবস্ত্র ছিল না—সেইকথা তুলসী মহারাজ জানিতেন, সুতরাং কালীপ্রসাদকে বিশেষভাবে তিনি ঐ তিব্বতের দুর্গম পথে যাইতে নিষেধ করিলেন। তুলসী মহারাজের একান্ত নিষেধ-বাক্যে কালীপ্রসাদ ঐ তিব্বতের পথে যাইতে নিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু মনের প্রবল ইচ্ছাকে তখনকার মতো চাপা দিলেও ভবিষ্যতে যে তিনি তিব্বতে গমন করিবেন তাহা স্থির করিলেন এবং তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর হইয়া তিনি যখন তিব্বতে গিয়াছিলেন।

কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ বদরীকাশ্রম দর্শন করিয়া কেদারনাথের পথে চলিলেন। পরে কেদারনাথ দর্শন করিয়া ত্রিযুগীনারায়ণ ও উত্তরকাশী হইয়া গঙ্গোত্রী যাইবেন এইরূপ একটি ছক করিয়া তাঁহারা যাত্রা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কেদারনাথ। এই দুর্গম পথই পৌরাণিক যুগের পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পথ। মহাভারতে পাওয়া যায় যে, ঐ দুর্গম পথে যাইতে যাইতে প্রথমেই দ্রৌপদী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আরও কিছুদূর অতিক্রম করার পর নকুল ও সহদেব এবং পরে ভীম ও অর্জুন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কেদারনাথের মন্দিরের পশ্চাতে তুষারশুভ্র বরফের পাহাড় আছে। শোনা যায়, তাহার উপর আরোহণ করিবার সময়ে অর্জুন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই স্থানের পাণ্ডারা পৌরাণিক যুগের প্রবাদের কথা বর্ণনা করিয়া ও ঐ সকল স্থান দেখাইয়া যাত্রীদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। পুনরায় যাত্রীদের তর্পণ, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান, স্নান ও পূজাও করাইয়া থাকে। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ দুইজনে মন্দাকিনীর তীর ধরিয়া নগ্নপদে কেদারনাথের দিকে চলিতে লাগিলেন। এই সকল পথ সর্বত্রই বরফে ঢাকা থাকে। সুতরাং পথ চলিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন তাঁহারা। বরফের ঠাণ্ডায় তাঁহাদিগের পা যেন অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহারা বরফের পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

●

॥ বিংশ শতাব্দীর ধর্ম ॥

স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

(তিন)

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেকন বলেন : "জেনেসিস্-এর প্রাচীনতম বর্ণনাগুলি ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐগুলি মানুষের কাছে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে প্রচলিত লৌকিক কাহিনী কিংবা রূপকথার রূপান্তরিত হয়েছিল।" দৃষ্টান্তস্বরূপ, আব্রাহাম-সম্পর্কে ঐ বিদগ্ধ অধ্যাপক বলেন : মনে হয়, "আব্রাহামের চরিত্রটি প্রাগৈতিহাসিক সেই ইজরাইলের মতই পবিত্র ও সরল,—যে ইজরাইলকে ইরাকে যারা দূর প্রাচ্য হ'তে কাস্পান্ দেশের উত্তরাধিকারী

হিসাবে আনা হয়েছিল"। তিনি আরও বলেন: "নিউ-টেস্টামেন্ট-এর আব্রাহাম কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না—যদিও অবশ্য জনৈক আব্রাহাম ছিলেন। তিনি ইয়াভের কাল্পনিক উত্তরাধিকারী। প্রকৃত আব্রাহামই যথার্থ ব্যক্তি এবং কাল্পনিক আব্রাহাম কেবলমাত্র অবতার ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের মনেই বেঁচে ছিলেন"। হাক্সলে ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ 'মহাপ্রলয়' ও 'নোহের নৌকা'-কাহিনীকে অসম্ভব ও আজগুবি ব'লে মন্তব্য করেছেন। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে 'ডিউকালিওন'-এর পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে নোহের (বা নোওয়ার) কাহিনীর তুল্য অপর এক কাহিনীও দেখা যায়। এ'ধরনের বিভিন্ন কাহিনী প্রাচীন হিন্দু, চীনা ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও ছিল অনেক বিভিন্নভাবে।

বিশ্বের মহান্ ত্রাণকর্তাদের (তাঁদের অধিকাংশই খ্রীষ্টের জন্মের বহু বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন) জীবন-সম্পর্কে নিষ্কলঙ্ক গর্ভসঞ্চার ও কানীন্ সন্তান জন্মদানের বিবরণ দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক-চিকিৎসক এস্‌ক্লেপিয়াসের ক্ষত-নিরাময়ের অলৌকিক কাহিনীগুলি নিউ টেস্টামেন্ট-এর কাহিনীগুলির সঙ্গে অনেক মিল পাওয়া যায়। এইপ্রকারে আমরা দেখি যে, উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ চিরাচরিত ধর্মের ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর কুয়াসা দূর ক'রে দিয়েছে।

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে খ্রীষ্টধর্ম কেবলমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তির উপরই দণ্ডায়মান, তাঁরা মনে হয় 'বিশ্বাস' কথাটির প্রকৃত অর্থের অপব্যবহার করেন এবং ঐটিকে বিশুদ্ধতম বিশ্বাস-প্রবণতা বলে মনে করেন। তাঁদের অধিকাংশের মতে 'বিশ্বাস'-কথাটির অর্থ অন্তরঙ্গ, কারণ বিজ্ঞ ফাদার টারটুলিয়ান যখন বলেছিলেন 'আমি বিশ্বাস করি, কারণ এটা অসম্ভব' তখন তিনি 'বিশ্বাস'-কথাটি-দ্বারা অল্প-কিছু বুঝেছিলেন। কিন্তু যুক্তিবাদী ব্যক্তিরা এই জাতীয় অযৌক্তিক প্রত্যয় বা অন্ধবিশ্বাসকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা বিংশ শতকের ধর্মকে এই ধরনের অনিশ্চিত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

বিংশ শতকের জন্য এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন—যা' আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্যের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করবে। এ'টি অবশ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবে এবং একটিকে—মাত্র একটিকেই মহাবিশ্বের বাস্তব ও কার্যকরী কারণ হিসাবে স্বীকার করে নেবে।

বিংশ শতাব্দীতে এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন যা' মুখ্যতঃ চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতাকে সমর্থন করবে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এ'টি এমন একটি ধর্ম হ'বে যা' অদ্বৈত মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা'র প্রতিটি সোপান উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর সমালোচকের প্রচণ্ড আক্রমণের ঊর্ধ্বে, সুদৃঢ় প্রস্তরতুল্য সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞানের মূলভাব হচ্ছে চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতা, ব্যক্তি ও শাস্ত্রের মত প্রকাশে স্বাধীনতা,—এবং যেহেতু বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সত্যকে আবিষ্কার ও শুধুমাত্র সত্যেরই পূজা, সেজন্য ধর্মেরও মূলভাব, আদর্শ ও উদ্দেশ্য হ'বে সেই প্রকার। সেই ধর্মই হ'বে বর্তমান শতাব্দীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম। আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্বাবিষ্কৃত সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তরের উপরেই সে দাঁড়িয়ে থাকবে। বর্তমান শতাব্দীর সকল

সত্যান্বেষীর মনে সেই যথার্থ ধর্মই চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করবে। সেই বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মে মুক্তির পরিকল্প, স্বর্গ-নরকের মতবাদ, শাশ্বত শান্তির ভীতি থাকবে না।

প্রেততত্ত্ববিদ্‌দের আন্দোলন এবং আত্মাসম্পর্কীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনারত প্রতিষ্ঠান-গুলি ইত্যবসরে নরকাগ্নি মতবাদ, শাশ্বত শাস্তির মতবাদ ইত্যাদির উপর কঠিন আঘাত হেনেছে। বর্তমান শতাব্দীতে পাশ্চাত্যবাসীদের অর্জিত এই দৃষ্টিসূচক অভিজ্ঞতার মূল্য নিতান্ত কম নয়। বিংশ শতাব্দীর জন্য যে ধর্মব্যবস্থার প্রয়োজন—তা' কেবল পুরোহিত বা ধর্মযাজকদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, যাজকদের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও অধিকারকে স্বীকার করবে না, ধর্মগ্রন্থ বা অন্যকোন গ্রন্থ বা কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বের দ্বারাও সেই ধর্মব্যবস্থা শাসিত হ'বে না। ঐ ধর্মের গৌণ অংশ অর্থাৎ শুধুমাত্র অনুষ্ঠানগুলির আচরণও কর্মকাণ্ডের উপর, কিংবা অনন্তনরকভোগের হাত থেকে আত্মার মুক্তির জন্য যা' একান্ত প্রয়োজনীয় নয়—তেমন কিছুর উপরও নির্ভর করবে না।

তাছাড়া বিংশ শতাব্দীতে এমন এক ধর্মের প্রয়োজন যা' অবৈজ্ঞানিক কোন নীতি বা মতবাদকে সমর্থন করবে না। বিংশ শতাব্দীতে এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন যা' সর্বপ্রকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা থেকে মুক্ত। কোনকিছু না হ'তেই আকস্মিকভাবে মানবজাতির সৃষ্টি হ'য়েছে বলে যে-সকল মতবাদ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, এই ধর্ম তা' থেকেও অনেক দূরে অবস্থান করবে।

বিংশ শতাব্দীর ধর্মে এমন এক ঈশ্বরের ধারণা প্রয়োজন—যিনি ব্যক্তিক, নৈর্ব্যক্তিক আবার এতদুভয়েরও অতীত, যাঁর চরমবিকাশ বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে অভিন্ন ও সঙ্গতিপূর্ণ। বিশ্ব প্রপঞ্চের এই বাস্তবতাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে,—যেমন স্পিনোজার সাবস্ট্যান্‌সিয়া (substatia), হার্বার্ট স্পেন্‌সারের 'আন্‌নোয়েবল' (unknowable), প্লেটোর 'গুড' (Good), ইমার্সনের 'ওভার-সোল' (Over-Soul), কাণ্টের 'ডিং অন্ সিচ্' (Ding on sich) অথবা লোকোত্তর 'থিং-ইন্-ইট্‌সেলফ্' (Thing-in-itself) ইত্যাদি। এই ঈশ্বর তুরীয়, আবার বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বগত। তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, —প্রাণের প্রাণ। তাঁকে কোনও বিশেষ নামে অভিহিত করে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়।

●

॥ দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে ॥

তিরুপতি বালাজী

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

২৮শে ডিসেম্বর রাত্রি দশটায় গাড়ী ছাড়ল বাঙ্গালোর ষ্টেশন হতে। পরের দিন রাত্রি ১০-২৫ মিনিটে পৌঁছে গেলাম অন্ধ প্রদেশের রেণিগুন্টায়। সুন্দর আর পবিত্রকে তামিল ভাষায় বলা হয় 'তিরু' স্থানকে বলা হয় 'পদ' তা থেকে চলিত ভাষায় 'পত্ত'। পরে নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হল 'পতি'। সোজা ভাষায় 'তিরুপদ', 'তিরুপদী' বলতে বোঝায় একটি পবিত্র স্থান। সেই স্থানের দেবতা হলেন 'পতি'। পরিশেষে দেবতাটির নাম হল 'তিরুপতি'। ৩০শে ডিসেম্বর চৌদ্দজন যাত্রীসহ আমাদের একটি দল ৯'০৫ মিনিটে রেণিগুন্টা ষ্টেশন হতে ট্যাক্সি নিয়ে ১০ টার মধ্যে পৌঁছে গেলুম তিরুপতি শহরে। শহরটি পূর্বঘাট পর্বতমালার সানুদেশে এক অতি রমণীয় পরিবেশের মধ্যে। সেখানে শ্রীরামস্বামী আর গোবিন্দরাজ স্বামীর মন্দির। যাত্রীদের অনেকেই এখানে কপিলতীর্থে স্নান সেরে নেন। সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা এখানে এই জলপ্রপাতের পাশেই তপস্যা করেছিলেন এরূপ কিংবদন্তী। শহর থেকে সাতটি পাহাড় অতিক্রম করে ২৮০০ ফুট উচ্চে সপ্তম পাহাড়ের শীর্ষে চৌদ্দ মাইল পথের শেষে একটি মন্দির—সেই মন্দিরে বিরাজ করেন বালাজী বেঙ্কটেশ। দক্ষিণ ভারতের জাগ্রততম দেবতা—তাই এক মহাতীর্থে পরিণত এই তিরুপতি। এক সময় সাত মাইল পথ পায়ে হেঁটে বা ডুলিতে উঠতে হতো। এখন মোটর বাস দু-ই-ই চলে। দেশ-বিদেশ হতে দর্শনার্থী আসেন হাজার হাজার। করেন দেব-দর্শন, ধন্য হয় তাঁদের জীবন। পাহাড়ের নীচে প্রায় দু'হাজার যাত্রীর জন্য আছে ধরমশালা। এখনও অনেকে সারারাত্রি পদব্রজে এই সাতটি পাহাড় অতিক্রম করে আসেন দেব-দর্শনে। তাই পায়ে হাঁটা পথটি বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল সারারাত্রি। যাতে সহজ আর নিরাপদ হয় চলার পথ। সে দৃশ্য নীচে থেকে দেখে মনে হয় যেন পাহাড়ের অঙ্গে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে আলোর মালা। শোভিত হয়ে আছে আলোর মালায় তার কণ্ঠ ও শীর্ষদেশ। অপরূপ সে দৃশ্য। তিরুপতি শহরে রাত্রি নাই। আলোয় আলোকিত হয়ে থাকে শহর। যাত্রী সমাগমে সর্বক্ষণই মুখর। আমাদের ট্যাক্সিটি চলেছে সর্পিল গতিতে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে। বিশাল সব মহীরুহ আকাশ-স্পর্শ করে যেন দাঁড়িয়ে। আবার ছোট ছোট গাছ-গাছরাগুলি জড়া-জড়ি করে জট পাকিয়ে একে অপরকে যেন মনের কথা বলতে চায়। গতকাল তিরুপতি দর্শনের জন্য সকাল ৯ টায় সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে তিরুপতির দর্শন লাভ করেন ভক্ত-যাত্রীরা বেলা তিনটায়—চত্বরের বাইরে আসতে হয়ে যায় প্রায় ৪টা এ'কথা বললেন কুণ্ডু ট্রাভেলের প্রথম শ্রেণীর অনৈক যাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তবে এক মাইলের মত পথ সারি দিয়ে যেতে কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় না। কারণ তিরুপতি বালাজীর দেবোত্তর এষ্টেট্ এই সমগ্র যাত্রাপথটিতে আচ্ছাদনী, জলের কল, বিশ্রাম স্থান ও আশেপাশে ছবিও পুস্তকের দোকান প্রভৃতির সুব্যবস্থা করে যাত্রীদের একঘেয়ে অবস্থা বোধার কোন অবকাশ

দেন নি। ভারতের কোনও তীর্থে এমন সুষ্ঠু সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা তো দেখিনি। এইভাবে সারিবদ্ধ যাত্রা হল দর্শনী-মুক্ত দেবদর্শন। আরও সহজ ব্যবস্থায় দেবদর্শনের উপায় হল—২৫৲ টাকা দর্শনী দিয়ে। এই ব্যবস্থায় যাঁরা দেব-দর্শন করেন তাঁদের ১ মাইল পথে সারিবেওয়ার কষ্ট পশ্চাতে রেখে একেবারে মূল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেখান হতে ধীরে ধীরে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হতে হয়। এক মাইল সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দুর্ভোগ হতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ২৫৲ টাকা দর্শনী দিয়েই দেবদর্শনের জন্য মন স্থির করে ফেললাম। ম্যানেজার অসিত বাবুই এ সাধে বাদ সাধলেন। বললেন "আপনার সুবিধা কিছু তাতে হবে না। কারণ দেব-দর্শনের পর আপনাকে আমাদের সকলের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে রেণিগুন্টায় ফেরার জন্য। সুতরাং এক যাত্রায় পৃথক ফলের বাসনা না করে এক সঙ্গেই সকলে সারি দিয়ে দর্শন করাই ভাল"।

সৌভাগ্যের বিষয় সে দিন কিছুক্ষণ পূর্বেই দর্শন শেষ হওয়ায় এবং আর একটি বিশেষ দর্শনের ব্যবস্থা থাকায় মাত্র ১ মাইল পথটিতে কোন দর্শনার্থীর সারি ছিল না। আমরা দ্রুতপদে ২০ মিনিটে সমস্ত পথটি অতিক্রম করে একেবারে মূল দরজায় গিয়ে পৌঁছলাম। তারপর প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে একটি বাঁধান প্রাঙ্গণে এসে প্রবেশ করলুম। এই প্রাঙ্গণটির কেন্দ্রস্থলেই দাঁড়িয়ে আছে মূল মন্দিরটি। মন্দির সম্মুখে একটি নাটমন্দির। এর বিপরীত দিকেই মস্তক মুণ্ডন বা মানতের স্থান। দৈনিক ১৫ হাজার টাকা আয় হয় এই মস্তক-মুণ্ডনের বা মানতের টাকা হতে। যাত্রাপথের বামপার্শ্বে দর্শনীর হিসাবরক্ষকের ঘর। সেখানে খুড়ি খুড়ি টাকা পয়সা নোট এসব এসে পড়ছে। কয়েকজনে সেই টাকা, পয়সা ও নোটের তাড়া পৃথকভাবে সাজিয়ে রাখছেন। দেখে মনে হয় টাকশালের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। শোনা যায় যে পৃথিবীর সব চাইতে সম্পদশালী মন্দির এই তিরুপতি। তাছাড়া দ্রাবিড় স্থানের রাজাদের দেওয়া জমি-জমা এসব সম্পত্তিও আছে প্রচুর। দেব-দর্শনের জন্য কোন দর্শনী না থাকলেও পূজা, ভোগ, আরতি এসবের জন্য দর্শনী আছে। বিভিন্ন তাদের হার, সর্বনিম্ন ১৩৲ টাকা।

মূল মন্দিরের দরজা অতিক্রম করে তার প্রান্তদেশে আছে আর একটি বিশাল দরজা তার স্বর্ণময় অঙ্গে শোভা পায় সুন্দরতম আর সুশ্রুতম দ্রাবিড়ী শিল্প-সম্ভার। শিল্পে-কলায় শোভিত এই মন্দিরটির বিশিষ্ট একটি স্থান আছে দক্ষিণ-ভারতে। দাঁড়িয়ে পড়ি একেবারে দরজার সামনে—যাত্রী সংখ্যা তখন কমই বলা যায়। সেই দরজার অন্তরালে বেদীর উপর দণ্ডায়মান বালাজী বেঙ্কটেশ দক্ষিণ-ভারতের জাগ্রততম দেবতা। শিব ও বিষ্ণুর মিলিত-মূর্তি। তাই হাজার হাজার শৈব-বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়েরই ভিড় এই মন্দিরে দেব-দর্শনে। একই দেহে মূর্ত স্থিতি ও প্রলয়ের দেবতা। পশ্চাতের হাত দুটিতে শঙ্খ ও চক্র। সামনের একটিতে অভয় ও অপরটি কোটিদেশে ন্যস্ত। এই হাত দুটিতে ভুজবলয়। পরিধানে পীতবসন, অঙ্গে বহুমূল্য জড়োয়ার অলঙ্কার, কণ্ঠে মোতির মালা, কপালে একটি প্রকাণ্ড হীরক টিপ্ জ্বল্ জ্বল্ করছে। সজ্জিত পুষ্প-ভূষণে অপরূপ এক শোভন্ মূর্তি। দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে এই অলোকসামান্যরূপ—দেখে হয় না তৃপ্তি, মেটে না আশা তাই পশ্চাৎপদে দেবতার দিকে মুখ

রেখে ফিরে আসি শেষ দরজায়। সঙ্গে নিয়ে এক অম্লান-স্মৃতি। চারি প্রহরে নির্দিষ্ট সময়ে উৎসব হয় বালাজীর—ভোর ছটা হতে সাতটা পর্যন্ত হয় পূজা। যাত্রীদের দর্শন দেন সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত। দশটায় হয় ভোগ, এগারটায় হিসাব পরীক্ষা, দৈনন্দিন উৎসবের অঙ্গ এটিও। আবার বৈকাল ৩টা হতে ৫টা পর্যন্ত যাত্রীরা পায় দেবতার দর্শন, ৬টায় হয় আরাত্রিক, রাত্রি ১০টায় হয় শয়ন-আরতি—দৈনন্দিন উৎসবের পরিসমাপ্তি। আমরা যেদিন যাই সেদিন ছিল বিশেষ দর্শন। এজন্য যাত্রীদের ভিড়-বিহীন অবস্থায় হঠাৎ সেদিন কিছু ভাগ্যবান দর্শক পেয়ে যান বেঙ্কটেশের দর্শন। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে 'হিসাব পরীক্ষাও' বালাজী বেঙ্কটেশের উৎসবের এক অঙ্গ। এরূপ একটি প্রথা ভারতের কোন দেবমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় কিনা জানা নাই।

বেলা এগারটায় নাটমন্দিরের বেষ্টনীর মধ্যে একটি গালিচা বিছানো হয়, সেই গালিচার উপর সোনার সিংহাসনে সচল বালাজী মূর্তি বসান হয় (মূলমূর্তি নয়)। তাঁর মস্তকের উপর সোনার কালর যুক্ত এক সুবিশাল বহুমূল্য ছত্র শোভা পায়। ষোড়শোপচারে পূজা হয় দেবতার—আরাত্রিকও। পূজান্তে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান হিসাবরক্ষক, হাতে তাঁর হিসাবের খাতা। পাঠ করেন পূর্ব দিনের আয় ব্যয়ের হিসাব। পাঠশেষে তিনি তাঁর নিজ স্থানে গিয়ে বসেন। বালাজীকেও রাখা হয় বেদীর উপর।

মনে পড়ে বালাজী বেঙ্কটেশের দর্শনকালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দজীর এক অলৌকিক দর্শনের কথা। ১৯১৭ সালের মার্চ মাস সঙ্গে শর্বানন্দ স্বামী স্বামী শান্তানন্দ ও ঈশ্বর মহারাজ প্রথম দিন দর্শন করেই বলে ওঠেন "শর্বানন্দ এযে দেবীমূর্তি দেখছি সঙ্গে সঙ্গে হাতের ইসারায় বললেন এখন থাক্ পরে বলব। আস্তানায় ফিরে এসে বললেন 'আমি স্পষ্ট দেখলুম দেবীমূর্তি'। একটু খোঁজ কর দেখি"। অনুসন্ধানে জানা গেল সত্যই আদিতে এই মূর্তি দেবীমূর্তি ছিলেন। বালা নামটি স্ত্রী দেবতা বাচক। মন্দিরে গোপুরমের ভিতর দেবীর বাহন প্রকাণ্ড সিংহ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। প্রতি শুক্রবার প্রাতে বিগ্রহের অভিষেক বা মহাস্নান হয়। মোহান্তের ব্যবস্থায় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সেই সময়ে দিগম্বরী মূর্তি দর্শন করেছিলেন—"কালো পাথরে দণ্ডায়মান সাত-আট ফুট উচ্চ—পায়ে 'বিছা', তৃতীয় চক্ষুটি ঘষিয়া তোলা সত্বেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। রামানুজী প্রকাণ্ড ভিলকে এই চক্ষু আবৃত রাখা হয়"। সকলে মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এসে মন্দির পরিক্রমা করি—দেখি মন্দিরের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প-সম্পদ। দেখি অপরূপ শিল্প ও কারু শোভিত সুবর্ণ বিমান। মন্দিরের পশ্চাদ্দেশে দাঁড়িয়ে আছে একটি স্তম্ভ, ছয় ফুট উঁচু, ব্যাস তার চার ফুট ভিতরটি ফাঁপা—সেখানে যে যার ইচ্ছামত প্রণামী ফেলে দিচ্ছেন সামনের মুখটি দিয়ে।

দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য দেখে এলুম—আছে প্রতিটি বিষ্ণুমন্দিরে এক বা একাধিক সুবর্ণ গরুর স্তম্ভ, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মূল মন্দিরের সম্মুখে দেবতার দিকে মুখ করে। বিষ্ণুর বাহন গরুড় তাই এই ব্যবস্থা। তেমনি প্রতিটি শৈব-মন্দিরে এক বা একাধিক নন্দী-মূর্তি (বৃষভ) দেবতার দিকে মুখ করে বসে আছে মঞ্চের উপর প্রভুর একান্ত ভক্তরূপে। মন্দির

প্রবেশকালে দেখতে হবে—প্রণাম জানাতে হবে তাঁকেই প্রথম। ভগবানের চেয়ে ভক্ত বসে আছে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে। আছে দুর্গামন্দিরে তাঁর সিংহ বাহন সেই সঙ্গে সুব্রহ্মানিয়মের (কার্তিক) মন্দিরে আছে ময়ূর।

ধীরে ধীরে মন্দির পরিক্রমা করতে করতে চলে এলাম ভোগচত্বরে—যেখানে বালাজী বেঙ্কটেশের প্রসাদ বিক্রয় হচ্ছে ভক্ত-যাত্রীদের জন্য। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ১৲ টাকা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে বেলা ১২টায় উদরপূর্তি করলাম সকলেই। পর পর মন্দির চত্বর সব অতিক্রম করে তুপাশের সজ্জিত বাজার দেখতে দেখতে বেলা ১ টায় সকলে পৌঁছে গেলুম আমাদের ট্যাক্সিগুলির সামনে। একটা পাঁচ মিনিটে সকলে রওনা হয়ে এলুম বালাজী বেঙ্কটেশের দর্শন শেষে। রেণিগুন্টা ষ্টেশনে পৌঁছে গেলুম বেলা ২-১৫ মিনিটে। মাদ্রাজে একদিন বিশ্রামের পর ৩১শে ডিসেম্বর বেলা ১-৩৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়ল রেণিগুন্টা ষ্টেশন হতে মাদ্রাজের পথে। পৌঁছে গেলুম মাদ্রাজ রাত্রি ৯ টায়। ষ্টেশন হতে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল এগ্‌মোর বিবেকাজ ট্যুরিষ্ট হোমে—হলস্ রোড, শিশু হাসপাতালের সামনে। ব্যবস্থা ভালই।

●

॥ বঙ্গে সুসন্তান যদুলাল মল্লিক ॥

বনফুল

আধুনিক বাংলা ইতিহাস ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলা দেশের স্বর্ণযুগ। বাঙালী জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে এই স্বর্ণযুগের স্বর্ণ-দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়াছে। স্বাধীনচেতা বাগ্মী যদুলাল মল্লিক মহাশয়ের জীবনও এই স্বর্ণযুগের প্রভায় উদ্ভাসিত।

তিনি ধনকুবের ছিলেন, কিন্তু ধন-কুণ্ঠীর ছিলেন না। তাঁহার বিপুল ধনরাশি কেবল নিজের জন্যই তিনি ব্যয় করেন নাই, দেশের জন্যও মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আভিজাত্য আত্মকেন্দ্রিক ছিলনা, দেশ-কেন্দ্রিক ছিল, ধর্ম্ম-কেন্দ্রিক ছিল। তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি চরিত্রবান আদর্শনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের বাড়ির সিংহবাহিনী মূর্ত্তি এবং রাধাশ্যাম-সুন্দরের মূর্ত্তি সেকালে বহু উৎসবের এবং প্রচুর দানের উপলক্ষ ছিলেন। সেই সব উৎসবে বহু দরিদ্র ভূরিভোজন করিবার সুযোগ পাইতেন। বহু গুণী সমাদৃত ও সম্মানিত হইতেন। ইহাই তখনকার আভিজাত্য ছিল।

সকল নর দান, আত্মচিন্তা নয় সমাজচিন্তা সে যুগে আভিজাত্যের মূলমন্ত্র ছিল। যদুলাল মল্লিকও এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি কত লোককে যে অর্থসাহায্য করিতেন, কত দরিদ্র পরিবারে অন্ন যোগাইতেন, কত স্কুলে সাহায্য করিতেন, কত স্কুলের যে স্থাপিতা ছিলেন তাহার তালিকা সুদীর্ঘ। যদুলালই বোধ হয় বস্তি-উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম পথিকৃত।

তিনি যাহা ভালো বলিয়া মনে করিতেন তাহা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল তিনি স্পষ্টবক্তা ছিলেন। সে যুগে ইংরেজ প্রভুদের

মুখের উপর উত্তর দেওয়ার সাহস কম লোকের ছিল। যদুলাল কিন্তু সে দলের লোক ছিলেন না।

সেকালে করপোরেশনের কর্তা হুঁদে আই. সি. এস. হ্যারিসন সাহেবের সহিত তাঁহার যে বাগবিতণ্ডা হইয়াছিল তাহা তৎকালীন সংবাদপত্রে মুদ্রিত আছে। হ্যারিসন সাহেব তাঁহাকে 'ফাইটিং কক্' (লড়ায়ে মোরগ) আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু বস্তুত তিনি 'কক্' (মোরগ) ছিলেন না, ছিলেন পুরুষসিংহ।

তাঁহার সিংহ-বিক্রমই সে যুগের সমাজকে আশ্বাস দিয়াছিল, রক্ষা করিয়াছিল। বর্তমান কলিকাতা নগরীর ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন সে যুগের ধনী পুরুষসিংহেরাই। অনুসন্ধান করিলে যে কোনো ব্যক্তি জানিতে পারিবেন যে সে যুগের এমন কোনো সৎপ্রতিষ্ঠান নাই এমন কোনো সৎ অনুষ্ঠান নাই যাহা ইহাদের আত্মিক ও আর্থিক আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত। কোনও কোনও নারী-মনোরঞ্জনকারী লেখক সে যুগের চিত্র আঁকিবার প্রয়াস করিয়া নারী সমাজে বাহবা পাইয়াছেন কিন্তু দামী কার্পেটটার প্রকৃত রূপ যা' তাঁহারা তার সম্পূর্ণ রূপটা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই, কার্পেটের উল্টাদিকটাই ফুটিয়াছে মাত্র।

সে যুগের ধনীদের সত্য ইতিহাস যদি কেহ সংকলন করে তবে যদুলাল মল্লিকের নাম সে-ইতিহাসে সমুজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। এ রূপ একটি ইতিহাস সংকলিত হওয়া উচিত।

যদুলাল মল্লিক শুধু যে বিরাট ধনী এবং অকুণ্ঠোদার সমাজসেবক ছিলেন তাহাই নয়, তিনি একজন প্রকৃত ধার্মিকও ছিলেন। ইহার প্রমাণ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য ছিল। পরমহংসদেব মলিন-হৃদয় লোকদের আমোল দিতেন না। অতিশয় উচ্চস্বরের কষ্টিপাথরেই যদুলাল মল্লিক মহাশয়ের ধর্মনিষ্ঠতার যাচাই হইয়া গিয়াছে। আজ তাঁহার স্মরণসভায় তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

নমস্কার।

[১৮ই বৈশাখ ১৮৮১ (২রা মে ১৯৭৪) ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে বাগ্মী যদুলাল মল্লিকের ১৩০তম জন্মবার্ষিকীতে প্রধান অতিথির ভাষণ]

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : পণ্ডিত পদ্মলোচন ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

॥ পাঁচ ॥

লীলাবার্তা :

[হাড়ির গৃহে আহারেও অনাপত্তি]

মথুরবাবু মাঝে মাঝে পণ্ডিতগণের সভা আহ্বান ক'রতেন এবং সেই উপলক্ষে তাঁদের যথোপযুক্ত 'বিদায়' (টাকা-কড়ি ও বস্ত্রাদি) দিতেন। ঐরূপ এক সভায় একবার পণ্ডিতপ্রবর পদ্মলোচনকে আহ্বান জানানোর জন্য তাঁর অন্তরে একান্ত অভিলাষ জন্মে। কিন্তু তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারের কথা শুনে, নিজে এঁকে আমন্ত্রণ জানাতে ভরসা পান না।

'বলবতী ইচ্ছা পদ্মলোচনে আহ্বান।
কিন্তু সাহসেতে নাহি হয় সংকুলান ॥
কারণ লোকের মুখে ক'রেছে শ্রবণ।
শূদ্রদত্ত পণ্ডিতের না হয় গ্রহণ ॥'—পুঁথি, ১২৪

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে পণ্ডিত মহাশয়ের নিবিড় সৌহার্দ্যের কথা জেনে, মথুরবাবু ঠাকুরের উপর ঐ কাজের ভার দেন এবং তাঁর হ'য়ে এঁকে অনুরোধ জানিয়ে ঐ সভায় নিয়ে আসতে বলেন। তখন ঠাকুর মথুরকে বলেন—"পদ্মলোচন বড় আচারী, সে আসবে না।"

ঠাকুর ঐ কাজে অগ্রসর হ'তে নারাজ, দেখে মথুরবাবু হৃদয়কে ঐ কাজের ভার দেন এবং বলেন—"ভাই হৃদু, এত বড় বড় পণ্ডিতেরা সব আসবেন, আর এত নিকটে থেকে পদ্মলোচন আসবেন না, এতে আমার মনে খুবই দুঃখ হবে। তুমি কোন ফিকিরেও যদি তাঁকে আনতে পার তো আমি তাঁকে হাজার টাকা দান ক'রব।"

অবশেষে, হৃদয় পদ্মলোচনের নিকটে যান এবং সুকৌশলে এঁকে মথুরবাবুর ঐ অভিলাষ জানান। তাতে ইনি বিরক্ত হ'ন এবং হৃদয়কে বলেন—"না মশাই, আমায় দশ হাজার টাকা দিলেও সেদিন আমি তাঁর বাড়ি যেতে পারব না। বরং অন্য একদিন এমনি যাব।"

মথুরবাবুর আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য ক'রে অগত্যা একদিন ঠাকুর এঁকে বলেন—"হাঁগা, তুমি রাসমণির বাগানে যাবে ?"

পদ্মলোচন ঠাকুরের কথায় নরম হন এবং তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—"কেন যাব না ? আপনি হাড়ি-মুচির বাড়িতে থাকলে, আমি তো আমি, আমার চোদ্দ পুরুষ সেখানে যাবে। রাসমণি আর মথুরবাবু তো ভাগ্যবান। আপনি সাক্ষাৎ মা কালী। আপনাকে যখন এত

বড় ক'রে তাঁরা রেখেছেন, তখন রাসমণিও ধন্য, মথুরবাবুও ধন্য। আমি একটু ভাল হ'লেই যাব ; জানবাজারে মথুরবাবুর বৈঠকখানায় যাব।"—চরিত-১ম / ১০৩

●

এ-বিষয়ে 'লীলাপ্রসঙ্গে' উদ্ধৃত শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—"মথুর (এক সময়ে অন্য কারণে) যত পণ্ডিতদের ডাকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এক সভার যোগাড় ক'রেছিল। পদ্মলোচন নির্লোভ ও অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ ; সভায় আসবে না ভেবে, আসবার জন্য আমায় অনুরোধ ক'রতে ব'লেছিল। মথুরের কথায় তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম—'হাঁগা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে না' ? তাইতে ব'লেছিল—'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি। কৈবর্তের বাড়িতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা'।"—লীলাপ্রসঙ্গ-৪র্থ।১০৪

এ-প্রসঙ্গে কথামৃতে লিপিবদ্ধ ঠাকুরের উক্তি—"পদ্মলোচন ব'লেছিল,—'তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়িতে সভায় যাবো, তার আর কি ?—তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়ি গিয়ে খেতে পারি'।"—কথামৃত-৪র্থ।১।২।৬১

'ইহাও সামান্য কথা সঙ্গেতে তোমার।
হাড়ির বাড়িতে পারি করিতে আহার ॥'—পুঁথি, ১২৪

কিন্তু ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ঐ পণ্ডিতসভায় অথবা মথুরবাবুর জানবাজারের বৈঠকখানায় পণ্ডিত পদ্মলোচনের পক্ষে যাওয়া সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি। এঁর শারীরিক অসুস্থতা হঠাৎ আরও বৃদ্ধি পায়। এ-জন্য মথুরবাবুর ঐ সভানুষ্ঠানের পূর্বেই ইনি ওরূপ পীড়িত অবস্থায় সেই বাগানবাড়ি হ'তে ৺কাশীধামে যাত্রা করেন।

যাহোক, এঁর উল্লিখিত উক্তির পশ্চাতে নিহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি এঁর অপার শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালবাসাই এ-ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। অমন নৈষ্ঠিক আচারী ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য নিজ নিষ্ঠাচার ও চিরাগত সংস্কার পরিত্যাগ ক'রতেও পশ্চাৎপদ হন না।

[ঠাকুর কর্তৃক পণ্ডিতের জ্ঞানের সুখ্যাতি]

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বলেন যে, নিজ নিজ মতে ও পথে নিষ্ঠা থাকা খুবই ভালো। তবে, অন্ধ গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা ভালো নয়। তিনি আরও বলেন যে, যারা সমন্বয় ক'রতে পেরেছে, তারাই ধন্য।

ঠাকুরের এই উপদেশ শুনে পদ্মলোচন পরম আহ্লাদিত হন এবং তাঁকে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বলেন—"মশাই, ধর্মকর্ম সব এখন মুখে দাঁড়িয়েছে। সব কেবল মুখস্থ বিদ্যে, আর কূট তর্ক, আর দলাদলি। ইনি বলেন—'আমার বিষ্ণু বড়', উনি বলেন—'আমার শিব বড়'। সেদিন বর্ধমানে তো একটা মহাসভা ক'রে বড় বড় পণ্ডিতেরা বিচার ক'রতে ব'সলেন—বিষ্ণু বড়, না শিব বড়। কোন কোন পণ্ডিত শিবকে খুব বড় ক'রলেন ; আবার আর একজন বিষ্ণুকে খুব বাড়ালেন। শেষে, বিচারে কিছুই মীমাংসা হ'ল না। ক্রমে পণ্ডিতদের ঝগড়া আর কচ্‌কচিই বাড়তে লাগলো। মশাই লোকগুলো এতই অসার যে, যা অনুভূতির বস্তু, আর

আধেরে একই জিনিস, তার আস্বাদ-উপলব্ধির চেষ্টা ছেড়ে, এ বলে—'আমার দেবতা বড়', ও বলে—'আমার দেবতা বড়', আর ঝগড়া।

"শেষে, আমায় ধরে টানাটানি। বলে—মীমাংসা কর। তা ব'লুম, আমার চোদ্দপুরুষে কখন শিবও দেখিনি, বিষ্ণুও দেখি নি। কে বড় কে ছোট কেমন ক'রে বলি? তবে, শাস্ত্রে যেমন আছে ব'লতে পারি। শৈব শাস্ত্রে শিবকে বড় ক'রেছে: আর বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিষ্ণুকে বড় ক'রেছে। তা দুই বড়, কেউ ছোট নয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পদ্মলোচনের এই মীমাংসা শুনে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েন এবং সমাধিভঙ্গের পর এঁকে সম্ভাষণ ক'রে বলেন,—'তোমার জ্ঞান হ'য়েছে'।—চরিত-১ম/১০৩-১০৪ দ্রষ্টব্য।

[পণ্ডিত কর্তৃক ঠাকুরের মহিমা প্রচারের বাসনা]

তর্কালঙ্কার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন, তাঁর অতুলন মহত্ত্ব উপলব্ধি ক'রে ততই বিস্ময়াবিষ্ট ও আত্মহারা হন। ইনি তাঁর মধ্যে নিত্যই অতি আশ্চর্য সব আধ্যাত্মিক লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। শাস্ত্রাদিতে ইনি এ-যাবৎ কোথাও যে-সব ঐশ্বরিক বৈভবের বর্ণনা বা উল্লেখ খুঁজে পাননি, সেগুলিও তাঁর মধ্যে একাধারেই সহজভাবে প্রকটিত দেখেন।

এইরূপে পণ্ডিত মহাশয় নিজ প্রত্যক্ষ অনুভব ও অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞান-প্রসূত সূক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে অবশেষে, সিদ্ধান্ত করেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর কেবল অবতারই নন, সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম—সনাতন পুরুষ। যাহোক, দিন দিন তাঁকে ইনি যতই দেখেন, নির্বাক্ বিস্ময়ে ও ভক্তি-প্রেমে কেবলই অশ্রু বিসর্জন ক'রতে থাকেন।

অন্তর্যামী ঠাকুর এঁর মনোভাব বুঝতে পেরে, একদিন সহাস্যে এঁকে জিজ্ঞাসা করেন—'এখানকার (আমার) অবস্থা বিষয়ে তোমার কী বোধ হয়?'

উত্তরে পদ্মলোচন সজল নয়নে ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন—"আপনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষ। জীবোদ্ধার ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য এবার কলাংশে নন, বোধ অবতীর্ণ হ'য়েছেন। যদি এই ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করি, তাহ'লে দেশময় ঘুরে ঘুরে পণ্ডিতদের সভা ডেকে, আপনার অতুল মহিমা-কথা চারদিকে প্রচার ক'রে বেড়াব। তখন দেখব, আমার এই সিদ্ধান্ত কে খণ্ডন ক'রতে পারেন।"

'মুকতি যদ্যপি কভু পাই এ পীড়ায়।
দেশেতে পণ্ডিত যত আছে যে যেথায়।
নিমন্ত্রিয়া তে সবারে সভা সাজাইব।
ডাকিয়া হাঁকিয়া আমি সকলে কহিব।
এই রামকৃষ্ণ নামে নরদেহধারী।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভবের কাণ্ডারী।
উদ্ধারিতে জীবকুল শোক-দুঃখাতুর।
ধর্মধ্বজ একেবারে করিবারে দূর।

দয়াল ঠাকুর অবতীর্ণ ধরাধামে।
দেখিব আমার কথা খণ্ডে কোন্ জনে॥'—পুঁথি, ১২৪

"আমি একটু ভাল হলেই···জানবাজারে মথুরবাবুর বৈঠকখানায় যাব। যেখানে যত বড় বড় পাণ্ডত আছেন, মথুর বাবুকে দিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আনাব, আর আপনাকে নিয়ে বিচার ক'রব। দেখব আমার কথা কে খণ্ডন ক'রতে পারে।"—চরিত-১ম। ১০৩

এ-বিষয়ে 'লীলাপ্রসঙ্গে' উদ্ধৃত শ্রীশ্রীঠাকুরের বিবৃতি—"[পদ্মলোচন] বলেছিল,—'আমি সেরে উঠে সব পণ্ডিতদের ডাকিয়ে সভা ক'রে সকলকে ব'লবো' 'তুমি ঈশ্বরাবতার', আমার কথা কে কাটতে পারে দেখবো'।"—৪র্থ, ১০৪

এ-প্রসঙ্গে 'কথামৃতে' লিপিবদ্ধ ঠাকুরের উক্তি,—"পদ্ম বলেছিল—'তোমার অবস্থা সভা ক'রে লোকদের ব'লবো'। তারপর কিন্তু তার মৃত্যু হ'লো।"—৪র্থ। ২৭।১।৩০১

"পণ্ডিতের মনঃসাধ মনেতে রহিল।
দিনে দিনে অসুস্থতা বাড়িতে লাগিল॥"—পুঁথি, ১২৪

যাহোক, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অন্তরের ঐ বাসনা কার্যতঃ সফল হয় নি। কারণ এঁর ঐ পীড়া ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করে। তখন ইনি ৺বিশ্বনাথের টানে অবিলম্বে কাশীধামে গমনের জন্য প্রস্তুত হন।

[পণ্ডিত কর্তৃক ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণের বাসনা]

অসুস্থতার জন্য তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পক্ষে স্বয়ং দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হবার উপায় ছিল না। এজন্য ইনি ৺কাশীধামে যাত্রার পূর্বে একদিন নিজ পুত্রের হাত দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য-সামগ্রী তাঁর সেবার জন্য পাঠান। উল্লেখ, ঠাকুর ঐগুলি গ্রহণ ক'রে কিছু প্রসাদ দিলে ইনি তা ধারণ ক'রে কৃতার্থ হবেন এবং পবিত্রচিত্তে ৺বিশ্বনাথের শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হবেন।

যা হোক, এঁর পুত্র সেই সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য তাঁর সেবার জন্য তাঁকে দান ক'রে, পিতার জন্য তাঁর প্রসাদ চাইলে তিনি সহাস্যে বলেন—"প্রসাদ খেলে কি তোমার বাবার রোগ আরাম হবে?"

পুত্র উত্তরে জানান—"আজ্ঞে না, সেজন্য নয়। বাবা আপনার ভেতর ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখতে পান। আপনাকে স্বয়ং ভগবান ব'লে জানেন। তাই আপনার প্রসাদ খেয়ে কাশীযাত্রা ক'রবেন। এখানে ব্যারাম সারলো না।"—চরিত ১ম। ১০৫

পদ্মলোচনের পুত্রের প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে ভক্তবৎসল ঠাকুর তাঁর হাত দিয়ে ৺ভবতারিণীর প্রসাদ, নির্মাল্য এবং সেইসঙ্গে ঐ ভোজ্যের কিয়দংশ প্রসাদ ক'রে দিয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠান। সেই প্রসাদ ধারণ ক'রে ইনি যেমন পরিতৃপ্ত তেমনি চরিতার্থ হন।

[পণ্ডিত কর্তৃক ঠাকুরের চরণে বিদায় গ্রহণ]

পণ্ডিতজীর বিদায়কালে শ্রীশ্রীঠাকুর এঁর নিকট উপস্থিত হন। তখন ইনি তাঁর অভয় চরণে বিদায় প্রার্থনা ক'রে নিজ পুত্র এবং আরও কিছু সঙ্গী-ছাত্রাদিসহ কাশীধামে যাত্রা করেন এবং ৺বিশ্বনাথের চরণে উপনীত হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে লোকান্তরিত হন।

'বিদায় লইয়া তবে অভয় চরণে।
রক্ষা করিলেন দেহ গিয়া কাশীধামে॥'—পুঁথি, ১২৫

উপসংহার :

[রামকৃষ্ণ-কথামৃত]

"পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু আমি মা মা ক'রতুম। তবু আমায় মানতো।---এতো জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! কথা কয়ে এমন সুখ কোথাও পাই নি।"—১ম। ৬।১।১১১-১১২

[প্রশস্তি]

"ধন্য ধীরবর তব পাণ্ডিত্যও ধন্য।
এ মহালীলায় খ্যাতি রাখিলে অক্ষুণ্ণ॥
প্রাতঃস্মরণীয় তুমি, তোমার ভারতী।
প্রাতঃ সন্ধ্যা কেহ যদি করেন আবৃত্তি॥
শ্রীপ্রভু নিশ্চয় তাঁহে করিবেন পার।
ভয়ঙ্কর ভবসিন্ধু অতুল পাথার॥"—পুঁথি, ১২৪

(সমাপ্ত)

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

য়ুরোপীয় শিল্পকলার বিভিন্ন দিক : মাইয়োলিকা প্রসঙ্গে

(এক)

সাধারণ মাটিতে তৈরী সিরামিকপাত্রের ওপর টিন্ অক্সাইড্ মিশ্রিত অস্বচ্ছ সাদা গ্লেজ (চিক্কনলেপ) লাগিয়ে কাঁচা অবস্থায় (ভাটিতে পোড়াবার আগে) সেই গ্লেজএর ওপর ধাতবচূর্ণমিশ্রিত সিরামিকরঞ্জকের সাহায্যে চিত্রিত করে ভাটিতে পোড়াবার পর যে-সিরামিকপাত্র আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইতালীতে তৈরী হয়ে আসছে—কারিগরী সংজ্ঞা অনুযায়ী তারই নাম মাইয়োলিকা। উপাদান এবং নির্মাণপ্রণালী এক হলেও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে মাইয়োলিকা বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইতালীতে তৈরী মাইয়োলিকা ফ্রান্সে রপ্তানী হয়ে সেখানে নাম ধারণ করেছে 'ফায়েন্স্'। অবশ্য এর অন্যতম কারণ হলো, ইতালীর ফায়েন্জা নগরে সিরামিক উৎপাদন কেন্দ্রে যে-মাইয়োলিকা তৈরী হতো—তার অধিকাংশই বিক্রীর জন্যে চলে যেতো ফ্রান্সের বাজারে। ফায়েন্জা নগরের নামের অনুসরণে ওগুলো ফ্রান্সে পরিচিত ছিলো ফায়েন্স্ নামে। এভাবেই হল্যাণ্ডের ডেলফট্ নগরের সিরামিক নির্মাণকেন্দ্রে যেসব মাইয়োলিকা তৈরী হতো—সেগুলো যে কেবলমাত্র হল্যাণ্ডেই 'ডেলফ্ট্' নামে পরিচিত তাই নয়, ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন সিরামিক উৎপাদন কেন্দ্রে তৈরী মাইয়োলিকাও ওই দেশে (ইংল্যাণ্ডে) ডেলফ্ট্ নামেই পরিচিত হয়ে আসছে। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে—জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কে তৈরী মাইয়োলিকা কিন্তু ফ্রান্সের অনুসরণে ফায়েন্স্ নামেই পরিচিত। প্রাচীন মিশরে তৈরী স্বচ্ছ রঙীন গ্লেজযুক্ত সিরামিক্স্কে কারিগরী সংজ্ঞা অনুযায়ী মাইয়োলিকা কিংবা ফায়েন্স্ বলা চলে না। কিন্তু কোনো কোনো পুরাতাত্ত্বিক এ ধরণের মিশরীয় সিরামিক্স্কেও তাঁদের রচনায় ফায়েন্স্ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে তৈরী সিরামিক্স্এর নামকরণ সম্বন্ধেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সাধারণ মাটিতে তৈরী সিরামিক্স্এ টিন্ গ্লেজএর সাদা অস্বচ্ছ জমির ওপর চিত্রাঙ্কনের পর লেড্ অক্সাইড্ মিশ্রিত স্বচ্ছ গ্লেজএর আরও একটি প্রলেপ লাগিয়ে যেসব সিরামিকপাত্র, থালা, টালি ইত্যাদি তৈরী করা হয়—সেগুলো অবশ্য ইতালীতে মেজা-মাইয়োলিকা এবং জার্মানীতে হাব্ ফায়েন্স্ নামে অভিহিত হয়ে আসছে। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে সাধারণ মাটিতে তৈরী সিরামিক্স্এর ওপর টিন্ অক্সাইড্যুক্ত অস্বচ্ছ পুরু আবরণ (engobe) লাগিয়ে তার ওপর চিত্র অথবা নকশা আঁকবার পর লেড্ অক্সাইড্যুক্ত স্বচ্ছ গ্লেজএ ডুবিয়ে ভাটিতে পুড়িয়ে যে-সিরামিক্স্ তৈরী করা হয়—সেধরনের সিরামিক্স্ও কোনো কোনো ঐতিহাসিকের রচনায় মাইয়োলিকা অথবা ফায়েন্স্ নামে অভিহিত হয়েছে। বৃটিশ শিল্পসমালোচক এবং শিল্পিত সিরামিক্স্ বিশেষজ্ঞ জর্জ ষ্টাভেজ তাঁর রচনায় পাঠকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন।

এতো গেলো মাইয়োলিকার কারিগরী সংজ্ঞার কথা। মাইয়োলিকা নামের উৎপত্তির সঙ্গে যে-কাহিনী জড়িয়ে আছে—এবারে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। ইতালীর মূল ভূখণ্ডের

দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরে মেজোর্কা নামের ছোটো দ্বীপটি থেকেই নাকি মাইয়োলিকা নামের উৎপত্তি। কোনো এক সময়ে ইতালীবাসীদের ধারণা ছিলো, মেজোর্কা দ্বীপই হলো মাইয়োলিকার নির্মাণকেন্দ্র এবং ওই দ্বীপ থেকে জাহাজে করে মাইয়োলিকা চালান দেওয়া হয় ইতালীর বিভিন্ন বন্দরে। তাই মেজোর্কা এ পর নামের অনুসরণে ইতালীর অধিবাসীরা ওই সিরামিক্স্‌কে বলতে সুরু করলো মাইয়োলিকা অথবা মেজোলিকা। মেজোর্কা দ্বীপটি একসময়ে ইতালীতে মেজোরিকা অথবা মেজোলিকা নামেও পরিচিত ছিলো।

পরবর্তীকালে অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে, ওই সময়ে মেজোর্কা দ্বীপে কোনো সিরামিক নির্মাণকেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিলো না। তবে মাইয়োলিকার নাম মেজোর্কা দ্বীপের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেলো কিভাবে? জর্জ স্তাভেজ তাঁর রচনায় এ ঘটনার এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। স্তাভেজএর মতে, মাইয়োলিকার উৎপত্তিস্থল হলো স্পেন। স্পেনএর শহর ভ্যালেন্‌সিয়া এবং ভ্যালেন্‌সিয়া-র উপকণ্ঠ ম্যানিসেস্‌এ পঞ্চদশ শতকে প্রচুর সংখ্যক টিন্‌-গ্লেজযুক্ত চিত্রিত সিরামিক্স্‌ তৈরী হতো। ওই সিরামিক্স্‌ স্পেন থেকে জাহাজে করে চালান যেতো ইতালীর বিভিন্ন বন্দরে। ইতালীর তৎকালীন অভিজাতমহল স্পেনে তৈরী এধরণের সিরামিক্স্‌এর পৃষ্ঠপোষক এবং ক্রেতা ছিলেন। স্পেনের বন্দর থেকে ইতালীর বন্দরে যাবার পথে জাহাজগুলো দু'একদিনের জন্যে বিশ্রাম নেবার জন্যে থামতো মেজোর্কা দ্বীপে। এভাবেই মেজোর্কা দ্বীপের নামের অনুসরণে ওই স্পেনীয় সিরামিক্স্‌এর নাম হয়ে গিয়েছিলো মাইয়োলিকা অথবা মেজোলিকা।

স্পেনের ভ্যালেন্‌সিয়ায় তৈরী সিরামিক্স্‌এ যে-টিন্‌মিশ্রিত অস্বচ্ছ সাদা গ্লেজ লাগানো হতো—সে-গ্লেজএর উৎপত্তিস্থল কিন্তু স্পেন নয়। এই গ্লেজ আবিষ্কৃত হয়েছিলো মধ্যপ্রাচ্যে, কারুর কারুর মতে প্রাচীন মিশরে। বিশেষজ্ঞদের মতে টিন্‌-গ্লেজএর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে মেসোপটেমিয়ায়। এ্যমিরিয়ার রাজা টিগ্‌লাথ্‌ পিলেস্‌এর নামের শিলমোহরযুক্ত যে ইট প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে—সে-ইট টিন্‌-গ্লেজযুক্ত এবং বিশেষজ্ঞদের মতে ওই ইটের নির্মাণকাল ১১২০ থেকে ১১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। জর্জ স্তাভেজ তাঁর রচনায় একথা উল্লেখ করেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর আগেই মেসোপটেমিয়ায় গ্লেজযুক্ত ইট তৈরী হয়েছিলো। তবে যে-গ্লেজযুক্ত ইটের কথা জর্জ স্তাভেজ বলেছেন, সেই গ্লেজ তৈরী হয়েছিলো কোয়ার্টজ জাতীয় বালি এবং সোডার সংমিশ্রণে। গ্লেজ ও টিন্‌ অক্সাইড্‌এর ব্যবহার তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পরবর্তীকালে লেড্‌ অক্সাইড্‌ এবং বালির মিশ্রণে যে-স্বচ্ছ গ্লেজ তৈরী হয়েছিলো—সে-গ্লেজ, জর্জ স্তাভেজ-এর ধারণায়, আবিষ্কৃত হয়েছিলো ইটালীতে। প্রাচীন রোমের ঐতিহাসিক টলেমি-র রচনায় নাকি লেড্‌ মিশ্রিত গ্লেজএর উল্লেখ রয়েছে।

ধাতুচূর্ণের সাহায্যে সিরামিকরঞ্জক মধ্যপ্রাচ্যেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিলো বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। মেসোপটেমিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে প্রাপ্ত ইটে যে-সবুজাভ নীল রঙএর গ্লেজ দেখা যায়—তা তৈরী হয়েছিলো স্বচ্ছ গ্লেজএর সঙ্গে তাম্রচূর্ণের মিশ্রণে।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে আবিষ্কৃত অস্বচ্ছ সাদা টিন্-গ্লেজ এবং বিভিন্ন ধাতবচূর্ণের সাহায্যে সিরামিকরঞ্জক তৈরীর কলাকৌশল পরবর্তীকালে স্পেনের সিরামিকশিল্পীরা জানলেন কি করে? বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মুরদের মাধ্যমেই স্পেনীয়রা মধ্যপ্রাচ্যের টিন্-গ্লেজ এবং ধাতবচূর্ণের সাহায্যে সিরামিকরঞ্জক তৈরীর রহস্য অবগত হয়েছিলেন। দামাস্কাস্এর খলিফা ওমায়েদ্এর মুর সেনাপতি তারিক ৭১২ খৃষ্টাব্দে স্পেন আক্রমণ করে দখল করে নেন্। সেই থেকে স্পেন প্রায় পাঁচশো বছর মুরদের শাসনাধীন ছিলো। এই পাঁচশো বছরে স্পেনে যেমন মধ্যপ্রাচ্যে তৈরী সিরামিক্স্এর আমদানী হয়েছিলো, তেমনই অন্ততঃ কিছুসংখ্যক মুর সিরামিকশিল্পীরও স্পেনে আগমন ঘটেছিলো। এই মুর-সিরামিকশিল্পীদের কাছেই স্পেনের তৎকালীন সিরামিকশিল্পীরা টিন্ অক্সাইড্এর মিশ্রণে অস্বচ্ছ সাদা গ্লেজ তৈরীর রহস্য এবং বিভিন্ন ধাতবচূর্ণের সাহায্যে সিরামিকরঞ্জক তৈরীর কলাকৌশল জানতে পারেন।

—দিবাকর সেনরায়

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

যুগাচার্য (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৯, মার্চ)—স্বামী সত্যানন্দ। প্রাপ্তিস্থান: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলিকাতা-৩৬, ন্যাশন্যাল পাবলিশিং হাউস, ৪১সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, মহেশ লাইব্রেরী ২/১, শ্যামা চরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দক্ষিণেশ্বর বুক ষ্টল, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী। মূল্য—ছয় টাকা।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হতেই সূচিত হয় চরিত-গ্রন্থ রচনা। কাব্যে হলেও বাংলায় সর্বপ্রথম চরিতগ্রন্থ হল বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত; পরে ইদানীং কাল পর্যন্ত রচিত হয়েছে বহু জীবন-চরিত। তবে মহাপুরুষদের জীবন-চরিত, বিশেষ করে ধর্মীয় জীবন-চর্যা যাদের জীবনের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে আছে তার থাকে দুটি অংশ। একটি চরিতাংশ, অপরটি অমৃতাংশ। চরিতাংশ হল জীবনের সন, তারিখযুক্ত ঘটনাপঞ্জী, আর অমৃতাংশ হল জীবনে আচরণীয় তত্ত্বাংশের স্থূল, সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম বিবরণ ও বিশ্লেষণ। সৃজনশীল আদর্শ জীবনীকার তাঁরাই যাঁরা একটি মহৎ জীবনকে এই দুটি ধারার সংমিশ্রণে জনসাধারণের সামনে একটি জীবন্ত চিত্ররূপে তুলে ধরতে সক্ষম হন যা পাঠ মাত্রে পাঠক সমাজের মনে জাগে ঐরূপ জীবন যাপনের একটি আকুতি। স্বামী সত্যানন্দ রচিত আলোচ্য 'যুগাচার্য' গ্রন্থখানিও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামীঅভেদানন্দ মহারাজের মহান জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট আগমন হতে শুরু করে, তাঁর সেবা, দেহত্যাগের পর দুষ্কর তপশ্চর্যা ও দশবৎসর যাবৎ পরিব্রাজক বেশে দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে, কৌপীনমাত্র সম্বল করে সমগ্র ভারত ভ্রমণ, তারপর স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ২৫ বৎসর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার এবং ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮ বৎসর কাল গুরুভাবের

বিকাশ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করে স্বামীজী মহারাজের জীবনী যদি কোনদিন প্রকাশিত হয় (অবশ্য ২৫ বৎসর আমেরিকায় প্রচারক জীবনের ইতিহাস উদ্ধার সম্ভব হলে) তা হলে সে জীবনী গ্রন্থের পরিধি হবে অন্ততঃ দু'খণ্ডে সহস্রাধিক পৃষ্ঠা।

সে তুলনায় ১১৭ পৃষ্ঠার 'যুগাচার্য' গ্রন্থখানি অতি সংক্ষিপ্ত হলেও স্বল্প পরিসরে লেখক স্বামী অভেদানন্দের জীবনের মূল ঘটনাগুলি বিবৃত করে গুরু ঋণ পরিশোধের জন্য যে সচেষ্ট হয়েছেন এ জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

কিছু কিছু ভুলত্রুটি স্বীকার করে নিয়েও, যেমন ৩৭ পৃষ্ঠায় 'পরমহংস সন্ন্যাস' স্থলে হবে 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস' [শংকর পন্থীদের মতে] ৪৮ পৃষ্ঠায় 'প্রমদা চরণ রায়' স্থলে হবে 'প্রমদা দাস মিত্র' ৫১ পৃষ্ঠায় 'মেরী মারউইন স্পেন্' স্থলে হবে 'স্পেন্স', ৬৭ পৃষ্ঠায় 'Hindu Preacher প্রকাশের সন তারিখ হল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর, ৭১ পৃষ্ঠায় 'খ্রীষ্টান্' স্থলে হবে 'খ্রীষ্টো-থিয়োসফিক্যাল', ৮৯ পৃষ্ঠায় স্লেট রাইটিং-বাংলা, ইংরাজী সংস্কৃতে ও গ্রীক্ ভাষায় লেখা দ্রষ্টব্য Life Beyond Death এর Plateটি', ৯৮ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালোরে স্বামীজী মহারাজ প্রতিষ্ঠা ভিত্তি করেন 'Ramakrishna Institute'এর তারিখ হল ২০শে আগষ্ট। স্মৃতি সঞ্চয়ন : ২ পৃষ্ঠা-স্বপ্ন দৃষ্ট ঘটনামত স্বামীজী মহারাজই সুভাষচন্দ্র বসুকে আলিঙ্গন করেন—দ্রষ্টব্য 'যেমন শুনিয়াছি'—স্বামী স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ পৃষ্ঠা ২৬১)।

একথা লিখতে দ্বিধা নাই যে লেখক যখন যখন স্বামীজী মহারাজের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছেন তখন তাঁর শুরুগত—প্রাণতায় রচনার প্রকাশভঙ্গি হয়ে উঠেছে প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী এবং যাঁরা স্বামীজী মহারাজের পূত-সঙ্গলাভে হয়েছেন ধন্য সেগুলি পাঠে তাঁদের মর্মকোষে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে একটি আনন্দ-বেদনার সুর।

বিশেষ করে পরিশেষে লেখক স্বামীজী মহারাজের অন্তিম যাত্রার যে মর্মস্পর্শী বর্ণনাটু কু দিয়েছেন সেটুকু পাঠ করেও সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেরই চোখদুটি হয়ে উঠবে অশ্রু-সিক্ত এবং লেখকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁদের বলতে হবে সত্যই 'সে পর্যায়ের দৃশ্য সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল'। সেই সঙ্গে লেখকের স্মৃতি সঞ্চয়নের মাধ্যমে আবার যেন চোখের সামনে দেখতে পাই বিংশ শতাব্দীর সেই 'শংকরকে'। সুতরাং স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মত বিরাট পুরুষের জীবন ও বাণী যত প্রচারিত হয় দেশ ও জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল।

পরিশেষে বক্তব্য ভুল-ত্রুটিগুলি এত বিশদভাবে উল্লেখের একমাত্র কারণ এটি আমাদেরও গুরুর জীবনী, সুতরাং গ্রন্থখানি যথাসম্ভব তথ্যগত ও ঐতিহাসিক ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত হওয়া আমাদের কাম্য। পরবর্তী সংস্করণে উক্ত ভুল ত্রুটিগুলি সংশোধনের আশা রাখি।

—পরমানন্দ

●

BASUMATI CENTRAL LIBRARY

॥ সংঘ-বার্তা ॥

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব

গত ১৪ই এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের ১১৪তম পুণ্য জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয় যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে।

প্রথম দিনে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বিশেষপূজা, হোম এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় অভেদানন্দ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য ও সহশিল্পীবৃন্দ।

দ্বিতীয়দিনে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ (কোষাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড়) এবং সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীমৎ স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ (সাধারণ-সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড়)। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দার্শনিক ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী এবং শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। শান্তিপাঠ করেন স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ও সমবেত অতিথি ও ভক্তমণ্ডলীদের ধন্যবাদ জানান স্বামী পরমাত্মানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ছন্দম্-সঙ্গীত সংস্থার শিল্পীবৃন্দ।

উদ্বোধন ভাষণে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ বলেন, স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের আদর্শ প্রচারই হবে আজকের এই শুভজন্মোৎসব উদ্‌যাপনের লক্ষ্য। তাঁর স্মৃতিকে অবলম্বন ক'রে আমাদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করবো। আমরা যেন শান্তি লাভ করতে পারি। আজকের দিনে আমরা সংকল্প গ্রহণ করবো তাঁর আদর্শে উদ্বোধিত হতে।

ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, আমাদের দেশে 'ধর্ম' ব্যাপক ও মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যা সকলের মঙ্গল করবে তাই হচ্ছে ধর্ম—এটি ভারতবর্ষের অভিমত। এই ধর্মের প্রোজ্জ্বলিত উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁরই সুযোগ্য পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ সারাজীবন ঠাকুরের বাণী ও আদর্শ প্রচার করেছেন। দেশ, জাতি, মানুষ কিছুকেই তিনি অস্বীকার করেন নাই। তিনি বলেছেন সন্ন্যাসীর কাজ শুধু গুহায় বসবাস করা নয়, মানুষের কল্যাণ করা। কী গভীরভাবে তিনি আমাদের দেশকে ভালবেসেছিলেন তা তাঁর রচিত **India And Her People** পুস্তক পাঠ করলে বোঝা যায়। ভারতের ঐতিহ্য, ব্যথা বেদনা বিদেশীদের অত্যাচার সবকিছু তিনি তুলে ধরেছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে এই পুস্তকের মাধ্যমে। তাঁর আদর্শের অন্ততঃ কিছুটাও যদি আমরা গ্রাস করতে পারি তবে সার্থক হবে এই সভার কাজ।

শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর প্রয়োজনে তাঁর পাঠকদের সংগ্রহ করেছিলেন বিত্ত, শ্রীচৈতন্য বা সপ্তর্ষীমণ্ডলের পার্ষদদের মধ্যে থেকে। এইরূপ একজন অন্তরঙ্গ পা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। স্বামীজীর ঝড়ের মত বক্তৃতা হয়ত অনেকে বুঝতে পারেন নাই। কিন্তু বহু বিদেশী বলেছেন যে স্বামী অভেদানন্দের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা

তাঁদের ভারতীয় ভাবার্থ বুঝতে আরও বেশী সাহায্য করেছে। আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে তুলবার জন্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছেন বিদেশীদের কাছ থেকে। আজ থেকে ৫০ বৎসর পূর্বে তিনি দেশের কথা যা বলেছিলেন আজও তা প্রযোজ্য এবং সেগুলি পালন করলেই আমাদের মঙ্গল। জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল স্বামী অভেদানন্দের জীবনে। তাঁর অবদানের কথা বলে শেষ করা যায় না। অন্যকিছু না করলেও একমাত্র শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে রচিত তাঁর স্তোত্র দুটির জন্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে অমর হয়ে থাকতেন।

অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বলেন, স্বামী অভেদানন্দের জীবনে আমরা তীব্র ব্যাকুলতা দেখতে পাই। ঠাকুর-দর্শনের জন্যে তাঁর কি ব্যাকুলতা? এই ব্যাকুলতাই মানুষকে উন্নতির চরমশিখরে নিয়ে যেতে পারে। আর তপস্যাই এই ব্যাকুলতা এনে দিতে পারে। এই আদর্শই তিনি আমাদের গ্রহণ করতে বলেছেন। জীবনে উন্নতির মূলই হচ্ছে তন্ময়তা। আর এই তন্ময়তার প্রাঞ্জল উদাহরণ স্বামী অভেদানন্দ। মৃতের ন্যায় তন্ময় হয়ে পড়ে থাকতেন তিনি সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে। এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও আমরা অনেক নূতনত্ব দেখতে পাই। তুলনামূলক দর্শনতত্ত্বের প্রকৃত প্রবক্তা তিনিই। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলেছেন, বিজ্ঞান Objectকে জানছে। Subjectকে নয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের এই সমন্বয় সাধন করেছে বেদান্ত। স্বামী অভেদানন্দ এই বেদান্তের মূর্ত প্রতীক। সেই প্রতিভার মূল্যায়ণ এখনও হয়নি। হয়ত ১০০ বছর পর হবে।

শ্রীমৎ স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ বলেন, ১৯৩৭ সালে তিনি যখন স্বামী অভেদানন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন যে তিনি সন্ন্যাসী হওয়ার জন্যে এসেছেন, স্বামী অভেদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে বলেন, "বেশ। বেশ। নিজে মর; অন্যকে মরাও"; আবার বলেছেন, সন্ন্যাসী হতে হলে, ঠাকুর ও মায়ের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে হবে। এই সন্ন্যাসীরা কেন আসেন? স্বামী বন্দনানন্দজী বলেন, মানুষের সমস্যাগুলিকে সহজ করতে, পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে, পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিতে এবং নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে দেখাতে তাঁরা আসেন এই পৃথিবীতে। স্বামী অভেদানন্দের জীবনে এইসবগুলির একত্র সমাবেশ আমরা দেখতে পাই। তাঁর আদর্শ গ্রহণ করলে আমরা অবশ্যই জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবো।

●

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবার নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় নানান দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল'-এর উপরে (দ্বিতল) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারেও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রসারতাকে ত্বরান্বিত করবে। ইতি –

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সম্পাদক
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

Just Out *A New Book*

AN ENQUIRY INTO PSYCHOLOGY, SOUL AND ABSOLUTE

by

Swami Prajnanananda

এই গ্রন্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদগুলির পরিচয় দিয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছে।

আর আলোচনা করেছে স্বামী অভেদানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দোষ ও গুণগুলির বৈজ্ঞানিক বিচার।

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, আমেরিকার মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অধ্যাপক উলিয়াম জেম্‌স ও জসিয়া রয়েসের চারখানি আলোকচিত্র-সম্বলিত ডিমাই সাইজ— মূল্য—দশ টাকা।

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
19B, Raja Rajkrishna Street
CALCUTTA-700006

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিধানসরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫, ৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

রূপচর্চায়

কে.হোড়ের

প্রসাধনী

কে.হোড় এণ্ড কোং

ভর্তি চলিতেছে

কোচিং ম্যাগনেট

৬০/২এ, গৌরীবাড়ী লেন,

কলিকাতা-৪ (ত্রিতল)

★

অভিজ্ঞ শিক্ষিকা ও শিক্ষক দ্বারা
দায়িত্ব লইয়া পড়ান হয় :

১। প্রথম হইতে দশম শ্রেণী।

২। বয়স্ক চাকুরীরা ছাত্রছাত্রীদের
জন্য প্রাইভেট মাধ্যমিক।

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। অদ্যাবধি তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৫৩ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	২২·০০	সুলেখক শ্রী অনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহ সুবিস্তৃত ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙ্গালী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২০·০০	বীরত্বে বাঙ্গালী	৪·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙ্গালী	৮·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৪·০০	বাংলার ঋষি	৬·৫০
শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৩·০০
		বাংলার বিদুষী	৪·০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী		ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৮·০০
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩		(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)	

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1600)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6.00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes	
How To Be A Yogi		and its Guide Book	300·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Ideal of Education	3·00	The Steps Towards Perfection	2·00
India and Her People	12·00	The Vedanta Philosophy	
Life Beyond Death	16·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Memoirs of Ramakrishna	12·00	True Psychology	16·00
My Life Story	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
Mystery of Death	18·00	Yoga Psychology	16·00
Path of Relization		Yoga : Theory & Practice	10·00
Philosophy and Religion		Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I—III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 57
41st Year, November 1979
VOL. IX

Regn. No. : WB/NC-141
PHONE : 55-1800

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

কুক্‌মী

ভারতের সেরা

গুঁড়া মশলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুক্‌মী প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী
ফোন-৩৩-০১১৫
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

PRICE Rs. 1·50
Ramakrishna Vedanta Math.
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006.
মূল্য ১·৫০ টাকা

স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

একচল্লিশ বর্ষ
একাদশ সংখ্যা
পৌষ
১৩৮৬

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬'০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১'০০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১'০০ টাকা ও ৬'০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Viswavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২'৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার সমেত যে কোন দিন সকাল ৯-০০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

সদ্য প্রকাশিত হইল।

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সম্বন্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে
মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশন বিভাগ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ৫৫-১৮০০

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	১৪·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	প্রকাশের অপেক্ষায়	স্তোত্র-রত্নাকর	
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ দোত্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

আয়ুর্বেদীয় শোষধের শীর্ষস্থান

ভাঃ সেন্স

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।
১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০ নং বিধান সরণী, হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
"JEET" BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO. 12013, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিত্যানন্দ পারফিউমস প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-৯

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

পৌষ, ১৩৮৬

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

। উপদেষ্টামণ্ডলী ।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

। সহায়কমণ্ডলী ।

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ

শ্রীদেবাশীষ হোড়

শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :

ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ

শ্রীরঞ্জীরঞ্জন পোদ্দার

। প্রচ্ছদপট শিল্পী ।

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ :

শ্রীসুবোধ দত্ত

দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস

৬ নং ভাক্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৯।

। সাপ্তাহিক আলোচনা ।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায়।

• স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস সৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিশ্বভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল চার ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.

(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fitings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৮, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

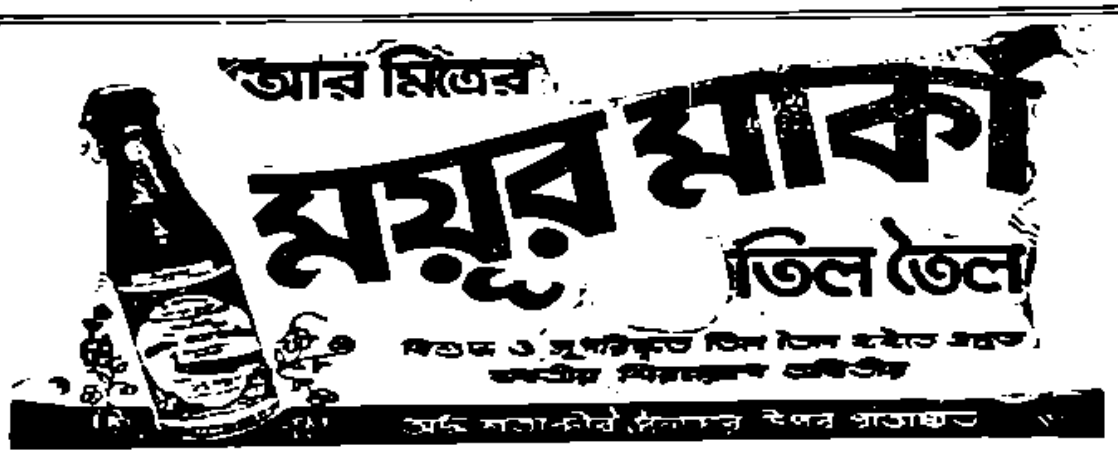

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, জগেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

পৌষ, ১৩৮৬

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৪৫৭	
২।	কীর্তনে নর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ	৪৬৩	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	৪৬৮	শ্রীমতী উল্কা ঘোষ
৪।	শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য ভবনাথ	৪৭০	ব্রহ্মচারী প্রণবেশচৈতন্য
৫।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	৪৭৫	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৬।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : ভাষাপদ ন্যায়বাগীশ	৪৭৭	শ্রীহরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৭।	বিংশ শতাব্দীর ধর্ম— স্বামী অভেদানন্দ (অনুবাদ)	৪৮২	শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৮।	ঈশ্বর কোথায়	৪৮৩	শ্রীঅমিতকান্তি সরকার
৯।	নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয়	৪৮৪	শিবানন্দ তীর্থনাথ
১০।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্প-সমালোচনা	৪৯১	
১১।	সংঘ-বার্তা	৪৯৪	

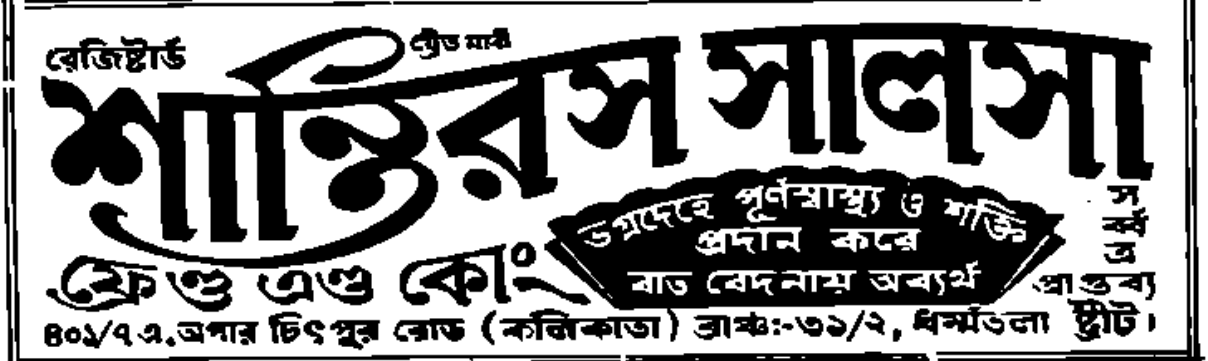

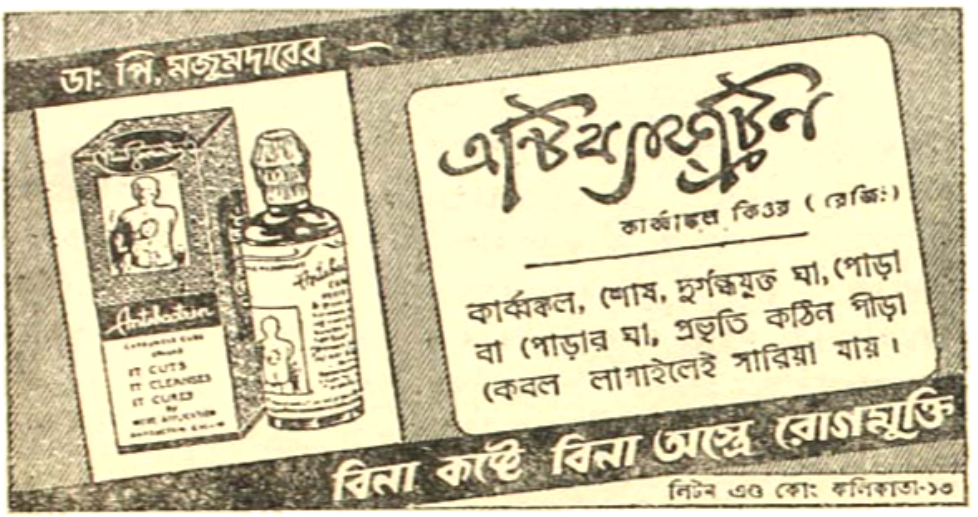

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

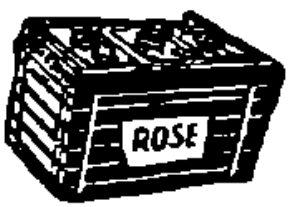

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMEO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Rd. Office :

87, Netaji Subhas Road
Calcutta-1

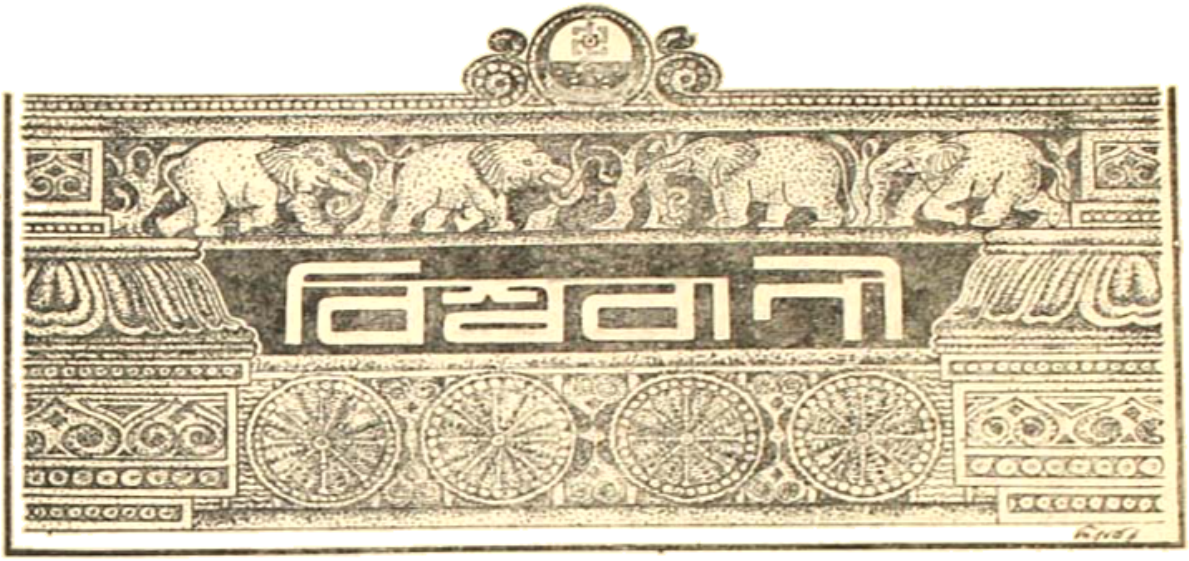

একচল্লিশ বর্ষ | একাদশ সংখ্যা | পৌষ ১৩৮৬

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ রামের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

(পূর্বাংশ)

"শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! বল্‌বো? —না, আজ কারণানন্দদায়িনী। কারণানন্দময়ী। সা রে গা মা পা ধা নী। নী-তে থাকা ভাল নয়,—অনেকক্ষণ থাকা যায় না। এক গ্রাম নীচে থাক্‌বো।

"স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। মহাকারণে গেলে চুপ। সেখানে কথা চলে না। ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আস্‌তে পারে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, (১৩৬৬), পৃঃ ১২৩।

প্রসঙ্গটির আরম্ভ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগে ষোড়শ খণ্ডে (প্রথম পরিচ্ছেদ)। শিরোনাম —'মহাষ্টমীদিবসে রামের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ'। বিজয় (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী), কেদার, রাম (রামচন্দ্র), সুরেন্দ্র, চুনী, নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), মাষ্টার (শ্রীম) এবং আরও অনেকে উপস্থিত।

শ্রীম লিখেছেন: "আজ রবিবার, মহাষ্টমী (শ্রীশ্রীশারদীয়া-দুর্গাপূজার), ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় প্রতিমা (শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা) দর্শন করিতে আসিয়াছেন। অবরের (সেনের) বাড়িতে শারদীয়া-দুর্গোৎসব হইতেছে। ঠাকুরের তিন দিন (সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে) নিমন্ত্রণ। অবরের বাড়ি প্রতিমা দর্শন করিবার পূর্বে রামের

বাড়ি হইয়া যাইতেন। বিজয় (বিজয়কৃষ্ণ), সুরেন্দ্র, চুনীলাল, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, বলরাম (বলরাম বসু), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বৃন্দাবনধামে বাস করিতেছেন"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণ ও কেদারকে লক্ষ্য ক'রে সহাস্যে বলেন: "আজ বেশ মিলেছে। দু'জনেই একভাবের ভাবী"। তারপর বিজয়কৃষ্ণের দিকে লক্ষ্য ক'রে বলেন: "হ্যাগা, শিবনাথ (শিবনাথ শাস্ত্রী) ? আর আপনি—"।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শেষ হ'তে না হ'তে বলেন: "আজ্ঞা হাঁ, তিনি (শিবনাথ শাস্ত্রী) শুনেছেন।....."।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বলেন: "মনে চারটি সাধ (বাসনা) উঠছে—

(১) "বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব।

(২) "শিবনাথের সঙ্গে দেখা করবো।

(৩) "হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে—দেখবো,

(৪) "আর আট-আনার কারণ অষ্টমীর দিন ভক্তের সাধকেরা পান করবে—তাই দেখবো, আর প্রণাম করবো"।

সত্যসংকল্প শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনের সাধ বা বাসনা, সুতরাং সেগুলি পূর্ণ অবশ্যই হবে। প্রথম সংকল্প সাধারণ। দ্বিতীয় সংকল্প শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। পূর্বেই শ্রীম এ'সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "ঠাকুর শিবনাথের বাড়ি গিয়াছেন তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য, কিন্তু দেখা হয় নাই। পরে বিজয় (বিজয়কৃষ্ণ) সংবাদ দিয়াছেন, কিন্তু শিবনাথ কাজের ভিড়ে আজও দেখা করিতে পারেন নাই"। আজ সেজন্যই তাঁর দ্বিতীয় মনের সাধ—'শিবনাথের সঙ্গে দেখা করবো'। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তখনকার দিনে ব্রাহ্মসমাজের একজন বাক্‌পটু নূতন ব্রাহ্মমতপ্রবর্তক সংস্কারবাদী বিচারী মানুষ। শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরেও কয়েকবার তিনি গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব।

তৃতীয় মনের সাধ বা বাসনা 'হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে, দেখবো'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে কি বৈদিক-মন্ত্রের মালা, কি তান্ত্রিক-মন্ত্রের মালা, কি হরিনামের মালা—সকল মালাই ছিল পবিত্র। মালা বিচিত্র রকমের হয়—রুদ্রাক্ষের মালা, স্ফটিকের মালা, শঙ্খের মালা, চন্দ্রকান্তমণির মালা, পলার মালা, রুক্ষপাথরের মালা, তুলসীর মালা এবং আরও অন্যান্য ধাতুর মালা। মালায় সাধারণত ১০৮টি রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক বা তুলসীগাছে তৈরী দানা থাকে। কিন্তু তার অর্ধেক ৫৪টি দানাও থাকে। তিব্বতী-সাধকরা ১০৭-টি দানার মালাও ব্যবহার করেন। জপের মালা-সম্বন্ধে বিভিন্ন তন্ত্রে ও বৈষ্ণব-গ্রন্থে পরিচয় দেওয়া আছে। এল. এ. ওয়াডেল (L. A. Waddel) তাঁর *Lamaism in Sikhim* ও *Lamaism in Tibet*-গ্রন্থদুটিতে এবং এইচ. এইচ. রিজ্‌লে (H. H. Risley) তাঁর *The Gazetteer of Sikhim*-গ্রন্থে তিব্বতে ও সিকিমে ব্যবহৃত জপের মালার কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়াডেল

সাহেব তিব্বতী-সাধকদের ১০৮-টি দানার তৈরী জপের মালার কথাও আলোচনা করেছেন, আর করেছেন 'মনিপদ্মে হুম্'-মন্ত্রে জপ করার ঘূর্ণায়মান-যন্ত্রের (Wheel) কথা। তাছাড়া তিব্বতের ও সিকিমের সাধকরা 'Wheel of Life'-চক্র ব্যবহার করেন মন্ত্রজপের সহায়করূপে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনামের মালার কথা বলেছেন। তুলসীর মালা বৈষ্ণব-সাধকরা গলায়ও ব্যবহার করেন। মালা মন্ত্রজপের সহায়ক-যন্ত্র বলে একান্ত পবিত্র। মন্ত্রজপ মালায় ও করে (অঙ্গুলির পর্বে) উভয়েই করা যায়। জপের মধ্যে উপাংশু-জপ অর্থাৎ মনে মনে জপই শ্রেষ্ঠ। জপ বলতে ইষ্টমন্ত্র (দেবতা বা দেবীর বীজমন্ত্র) মনে মনে উচ্চারণ করা বোঝায়। ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টদেবতাকে অভেদ বা অভিন্ন মনে ক'রে জপ করার নিয়ম। জপে প্রথমে ইষ্ট বা অভিপ্রেত (ইপ্সিত) দেবতার বীজাকারে নাম ও মূর্তি চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করতে হয়, ফলে মন স্থির ও একমুখী (কেন্দ্রগত) হয়, মন ও মন্ত্রনির্দেশক দেবতা বা দেবীর সঙ্গে মন একাত্ম হয়। তখন মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন রূপ ধারণ করে। ক্রমে মন সেই অভিন্ন রূপে নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং মন্ত্রসত্তা ও মন্ত্রধ্যানকারী-সত্তা অর্থে ধ্যেয় ও ধ্যাতা তাদাত্ম্য (একত্ব) প্রাপ্ত হয়। ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়—এই ত্রিপুটী বা তিনটি রূপের তখন একীভাব হয় এবং সেই একীভাবের চেতনায় সাধকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিশ্বব্যাপকচৈতন্য ব্রহ্মের সর্বাত্মক-অনুভূতি আসে। অনুভূতি আসে যষ্টি জীব (ধ্যাতা বা সাধক) ও সমষ্টি ঈশ্বর (ব্রহ্মচৈতন্য) এক ও অভিন্ন ব'লে। তখন দু'য়ের মধ্যে কোন ভেদ (পার্থক্য) থাকে না। সাধকের চেতনা তখন ব্রহ্মচৈতন্যসাগরে একাকার হয়। এরই অন্য নাম মুক্তি, ঈশ্বরানুভূতি বা ব্রহ্মানুভূতি। এই অনুভূতি হলে সাধকের জীবন অমৃতময় হয়।

জপের সার্থকতা ও চরমপরিণতি হয় ঈশ্বরানুভূতিতে অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতিতে। "হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে, দেখ্‌বো"—শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাসনার ও উক্তির সার্থকতা তাই। শ্রীভগবানে বা যেকোন দেবতায় ভক্তি বা অনুরাগযুক্ত আসক্তি (অনুরক্তি) না থাকলে কেউই জপ করে না এবং জপের সহায়ক মালার ব্যবহারও করে না। মালা উপায়, সহায়ক বা মাধ্যম (medium), কিন্তু জপই প্রধান। আবার জপও (জপকর্মই) সহায়ক বা উপায় ইষ্টদেবতার (অভিপ্রেত দেবতার) মন স্থির করার জন্য, কিন্তু দেবতাই প্রধান। পুনরায় দেবতাও সহায়ক বা উপায়, দেবতার প্রকৃত রূপ বা সত্তা যে চৈতন্য—তাতে মনকে লয় করাই প্রধান। এই ব্যষ্টি বা বিন্দু-চৈতন্য এবং সমষ্টি বা সিন্ধু-চৈতন্যরূপ ব্যাপকচৈতন্য ব্রহ্মেরই অভিন্ন রূপ। তারা পরিমাণে ও আকারে পৃথক হলেও শক্তি-সামর্থ্যের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয়ের মধ্যেই সমান,—যেমন ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দু ও বিশাল-ব্যাপক অগ্নিস্তূপ দুইই শক্তি-সামর্থ্যে ও কার্যকারিতায় এক ও অভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্ত সেজন্যই বিচারনিষ্ঠ হয়ে বলেছে, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—সাধারণ চেতনার প্রাণী অসাধারণ সর্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্য থেকে ভিন্ন নয়। কাল্পনিক আয়তনে ব্যষ্টি ও সমষ্টি—ছোট ও বড় বলে মনে হলেও উভয়েই বৃহৎ ও অসীম। অবশ্য আকার ও পরিমাণ এখানে নগণ্য।

জপ-ধ্যানের সার্থকতাও তাই যে, সীমিত ব'লে যা সাধারণত মনে হয়, দৃষ্টির ও চিন্তার প্রসারতায় সেটাই পুনরায় অসাধারণ ও অসীম ব'লে মনে হয়। মালায় বা করে (অঙ্গুলীতে) জপের

সংখ্যা রাখা একটি কালসীমার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ মাত্র। অধ্যাত্মসাধনার নিয়ম ও রীতিই তাই যে, সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের মাঝে উপনীত হওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে সসীম অজ্ঞানতাকে অসীম জ্ঞানে রূপান্তরিত করা। শ্রীরামকৃষ্ণের মালাজপের প্রতি লক্ষ্য রাখার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যই তাই। তিনি বলেছেন: "হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে, দেখ্‌বো"। এ'কথা বলার উদ্দেশ্য যে, ভগবদ্‌ভক্ত যারা তাদেরই অন্তরে থাকে হরির বা শ্রীভগবানের পবিত্র নামের প্রতি যথার্থ ভক্তি ও নিষ্ঠা এবং সেই ভক্তি ও নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখার (দেখার) অর্থই শ্রদ্ধার ও নিষ্ঠার আদর্শের প্রতি সমর্থন ও সম্মান জানানো।

যথার্থ ভগবদ্‌ভক্তমাত্রেই জানেন যে, নাম ও নামী এক ও অভেদ,[১]—ইষ্টের নাম বা বীজমন্ত্র ও ইষ্টদেবতা এক ও অভিন্ন। এই অভিন্নতার জ্ঞান নিয়েই ভক্তজনেরা যেকোন দেবতার নামজপ করেন। বারবার জপের ফলশ্রুতি সৃষ্টি করে এক পবিত্র-প্রেরণাময় সংস্কার—যে সংস্কারকে বলতে পারি সৃজনশীল ও কল্যাণময় সংস্কার। আবার এই সৃজনশীল শুভসংস্কারই ভক্তের অন্তরে সৃষ্টি করে এক অব্যক্ত-প্রেরণার আলোড়ন, আর সেই আলোড়নের জন্যই সাধকের মন ও বুদ্ধি রূপান্তরিত হয় পরিশুদ্ধ-চৈতন্যে। এই পরিশুদ্ধ-চৈতন্যই সাহায্য করে ভক্ত-সাধককে পরমচৈতন্য শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলনসাধন করাতে, কেননা চৈতন্যের সঙ্গেই চৈতন্যের মিলন হয়। তখনই ভক্ত-সাধক অমৃতত্ব লাভ ক'রে অতিক্রম করেন জন্ম-মৃত্যুর চক্র। মোটকথা জপের উদ্দেশ্য ও সার্থকতাই তাই, আর এই সার্থকতাকে দেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্য।

চতুর্থ সাধ বা বাসনা হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের "আট-আনার কারণ অষ্টমীর দিন তন্ত্রের সাধকরা পান করবে, তাই দেখ্‌বো, আর প্রণাম করবো"। দেবী দুর্গার তন্ত্রাচারে পূজার প্রবর্তন করেন বিশেষ ক'রে নবদ্বীপের স্মার্ত রঘুনন্দন। কথিত যে, 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'-পূজাপদ্ধতির অনুসরণে দশভুজা-দুর্গার পূজা করেন নাকি তিনি প্রথমে। তন্ত্রাচারী আগমবাগীশও সঞ্চারিত করেন তাতে প্রত্যক্ষপ্রেরণা।[২] অবশ্য বৈদিক মতেও সম্পন্ন হয় শ্রীশ্রীশারদীয়া দেবীর পূজা, কিন্তু আচারমূলক পূজানুষ্ঠান ও বিশেষ ক'রে তন্ত্রমতেই দেবীপূজা হয় অনুষ্ঠিত। তন্ত্রানুষ্ঠানে কারণের (আসব বা মদ্যের) বিশেষ ক'রে বাঙলার কুলাবধূরাই প্রচলন করেছেন। কারণবারি বা মদ্য শক্তি বা বল-বীর্যেরই পরিচায়ক, কিন্তু তার আসল অর্থ ঐ সকল বাহ্যবস্তু থেকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ। আমরা জানি যে, স্থূল ও সূক্ষ্মের পর কারণ এবং কারণের পর মহাকারণ। মহাকারণই সর্বাতীত পরমশুদ্ধচৈতন্য। এই পরমশুদ্ধচৈতন্যই আবার বিশুদ্ধ-ব্রহ্ম, আর বিশুদ্ধ-ব্রহ্মই মায়ালেশহীন তুরীয় ও সর্বাতীত-চৈতন্য ব্রহ্ম। তন্ত্রসাধনার চরম ও পরম-উদ্দেশ্য ঐ সর্বাতীত কারণ (মহাকালী) থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মহাকারণে (মহাশিবে) প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

১। আসলে যাঁরই নাম, তিনিই নামী।

২। (ক) নবদ্বীপের আগমবাগীশ 'তন্ত্রসার'-গ্রন্থের রচয়িতা। আগমবাগীশ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক (১৬শ শতক)।

(খ) আমার মুদ্রিত ও বর্ধিত সংস্করণ 'শ্রীদুর্গা'-গ্রন্থে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'-সংযোজিত থাকবে।

মহাকারণই সর্ববন্ধনহীন তুরীয়-চৈতন্য। তুরীয়-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই সাধকের আচার-অনুষ্ঠানমূলক বা আচার-অনুষ্ঠানহীন অধ্যাত্মসাধনা। এই সাধনাই সাধককে দেয় পরমসিদ্ধির কল্যাণময় আশীর্বাদ।

এ'সকল আলোচনার পরই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুদ্ধাচারের প্রসঙ্গ এনেছেন ও বলেছেন: "বেদ-পুরাণে বলেছে শুদ্ধাচার। বেদ, পুরাণে যা বলে গেছে—'কোরো না, অনাচার হবে', তবে আবার তাই ভাল বলেছে" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৭)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একথা বলার উদ্দেশ্য শুদ্ধাচার কাকে বলে তা নির্দেশ করা। বেদ-পুরাণ একরকমভাবে বলে শুদ্ধাচার কাকে বলে, আর তন্ত্রশাস্ত্র বলে অন্যরকম। শুদ্ধাচারের অভিধান বা অর্থ—যা 'ভাল' বা কল্যাণদায়ী। কলিতে (বর্তমান যুগে) শুদ্ধাচারই প্রবল। তাছাড়া দেব-দেবীদের পূজানুষ্ঠানে শুদ্ধাচারের প্রচলনই সর্বমতগ্রাহ্য। বৈদিকযুগে ছিল উপাসনার ও প্রার্থনার প্রচলন। অহংগ্রহ, প্রতিমা বা প্রতীক প্রভৃতি উপাসনার প্রচলন ছিল বৈদিকযুগে। বর্তমানযুগে শুদ্ধাচারেরই প্রচলন অধিক। অবশ্য বর্তমান কালে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় মতেরই প্রচলন আছে পূজায় ও আরাধনায়—'বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব'। শক্তিসাধনায় পশ্বাচার, দিব্যাচার বা কৌলাচার প্রভৃতি সাতটি আচারের কথা স্বতন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট তন্ত্রসাধনার সকল তথ্য ও রহস্যই পরিচিত, কেননা সাধনসিদ্ধা যোগেশ্বরী-ভৈরবীর সহায়তায় তিনি চৌষট্টিখানি তন্ত্রোক্ত সাধনারই অনুষ্ঠান করেছিলেন নিয়মিতভাবে। তন্ত্রসাধনায় কারণের বা মদ্যের ব্যবহার হয়—সেকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানতেন,—যদিও কারণ (পঞ্চম-কারের অন্যতম উপচার আসব বা মদ্য) তিনি নিজে কোনদিন গ্রহণ করেন নি। এ'প্রসঙ্গে তিনি বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তদের সমক্ষে একদিন বলেছিলেন: "কারণের বোতল একজন এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারলুম না"।

"বিজয়কৃষ্ণ বলেন: আহা!"

"শ্রীরামকৃষ্ণ: সহজানন্দ হ'লে অমনি নেশা হ'য়ে যায়, মদ খেতে হয় না। মা-র চরণামৃত দেখে আমার নেশা হয়ে যায়—ঠিক যেমন পাঁচ-বোতল মদ খেলে হয়"।

এরপর প্রসঙ্গ হ'ল 'জ্ঞানী ও ভক্তের অবস্থা'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন: "এ' অবস্থায় (ভক্তের অবস্থায়) সব সময় সব রকম খাওয়া চলে না"।

নরেন্দ্র (নরেন্দ্রনাথ—স্বামী বিবেকানন্দ) বলেন: "খাওয়া-দাওয়া-সম্বন্ধে যদৃচ্ছালাভই ভাল"।

"শ্রীরামকৃষ্ণ: অবস্থাবিশেষে উটি হয়। জ্ঞানীর পক্ষে[৩] কিছুতেই দোষ নাই। গীতার মতে জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীকে আহুতি দেয়"।

গীতার ৪।২৯ শ্লোকে অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেওয়ার কথা আছে—"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে, প্রাণাপানগতিরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ"। আবার মিতাহারীদের পক্ষে প্রাণবায়ুতে ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দেওয়ার কথা আছে—"অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্

৩। জ্ঞানী (ব্রহ্মজ্ঞানী) সকল দোষ-ত্রুটির পার।

প্রাণেষু জুহ্বতি" (৪।৩০)। এ'ভাবে গীতায় বারো রকমের আহুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "গীতার মতে জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীতে আহুতি দেয়" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃ: ১৯৬)। কুণ্ডলিনীশক্তি নিদ্রিতা বা সুপ্তা ব্রহ্মশক্তিই। নিদ্রিতা বা সুপ্তা অর্থে কুণ্ডলিনীর যথার্থস্বরূপ থেকে বিচ্যুতি। অবিচ্ছুরিত রূপই কুণ্ডলিনীর যথার্থ রূপ। সুপ্তা ব্রহ্মশক্তি জীব ও জাগ্রতা ব্রহ্মশক্তি শিব বা ব্রহ্ম। তন্ত্রে শক্তি ও শক্তিমান অভেদ —যেমন সূর্য ও তার কিরণ, জল ও তার তরঙ্গ অভেদ।[৪] শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন : "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ"—যেমন মণি ও তার জ্যোতিঃ এবং চলা-সাপ ও স্থির-সাপ অভেদ। সুতরাং তন্ত্রদৃষ্টিতে স্বরূপে অবিচ্ছুরিত কামকলা-কুণ্ডলিনী পরমাশক্তিরূপিণী শিব। বিচ্ছুরিত কুণ্ডলিনী পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা এই তিন রূপের (বিকাশের) পর বৈখরীনাদ-রূপে বাইরে প্রকাশ পায়। বৈখরীনাদ স্থূল-অক্ষর ও বর্ণ প্রভৃতি। অক্ষর এবং বর্ণমালাও শক্তিরূপিণী কালী—'কালী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে'—বলেছেন সাধক রামপ্রসাদ। মুণ্ডমালাতন্ত্রে পঞ্চাশটি বর্ণের নাম আছে—যেগুলি মহাশক্তিরূপিণী-কালীরই ভিন্ন ভিন্ন নাম, কিন্তু আসলে তারা এক ও অভিন্ন শক্তি। তাই জ্ঞানী শক্তিসাধক সকল-কিছু চিন্তা ও কর্মই আহুতি দেন মহাশক্তি-রূপিণী কুণ্ডলিনীতে, আর এই আহুতি সার্থক হয় কালীব্রহ্মরূপিণী শক্তিতে। গীতার "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ-ব্রহ্মণা হুতম্" (৪।২৪) মন্ত্রের সার্থকতাও তাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে তাঁর চতুর্থ সাধ বা সংকল্পের কথা বলেছেন : "আর আট-আনার কারণ অষ্টমীর দিন তন্ত্রের সাধকেরা পান করবে, তাই দেখ্‌বো, আর প্রণাম করবো"—এ'কথার অর্থ দুর্বোধ্য নয়। তান্ত্রিকাচারে শ্রীশ্রীমহামায়ার (শ্রীশ্রীদুর্গার) পূজায় কারণবারি মন্ত্রঃপূত ক'রে উৎসর্গ করার রীতি আছে এবং পূর্বাভিষিক্ত শক্তিসাধকরা পূজার পর যে চক্রের (বা ভৈরবীচক্রের) অনুষ্ঠান করেন, তাতে একটিতে কারণবারি গ্রহণ (পান) ক'রে জপ ও ধ্যান করার রীতি আছে।[৫] শ্রীরামকৃষ্ণদেব তা জানেন। সেজন্য নিজে কারণবারি তিনি গ্রহণ বা পান না করলেও কারণবারি দেখেই তাঁর "নেশা হয়ে যায়"। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "সহজানন্দ হ'লে (কুলকুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণে অপার্থিব আনন্দলীলার অনুভূতিহলে) সাধক আপনা-আপনিই ভাববিদ্যুৎ নেশায় আচ্ছন্ন হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "মদ খেতে হয় না। মা-র (শ্রীশ্রীভবতারিণীর) চরণামৃত দেখে আমার নেশা হয়ে যায়,—ঠিক যেমন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়"। এখানেও তেম্‌নি। তন্ত্রের সাধকরা (তন্ত্রের সাধকদের চক্রাধিপতিকে 'বীর' নামে অভিহিত করা হয়) মন্ত্রপরিস্তুত কারণবারি পান করলে কিছুটা অন্যমনস্ক ও ভাবোন্মত্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে, তাঁদের ঐ মত্ততা দেখে তাঁরও নেশার মতো মত্ততার অনুভব হয়, কারণ (মন্ত্রপুতঃ মদ) আর পান করতে হয় না।

অবশ্য এটি ব্রহ্মজ্ঞানীরই স্বভাবের কথা। দক্ষিণেশ্বরে ঘাসের উপর দিয়ে একজন চলে গেল—অম্‌নি শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরে ব্যথা অনুভব করলেন। গঙ্গার বুকে মাঝি-মাল্লারা মারামারি

৪। কাশ্মীরীয় ত্রিকতন্ত্রে এর উল্লেখ আছে।

৫। কেবল অভিষিক্ত-সাধকপক্ষে।

কথুলো, অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরে 'উহু' ক'রে আঘাত পেলেন। এই আঘাত পাওয়ার ও ব্যথা-অনুভবের মধ্যে বাইরের কষ্ট-যাতনা নাই, আছে একাত্মতার ও সমব্যথানুভূতির কথা। এই ভাবাবেশ আসে ব্রহ্মানুভূতি হ'লে। ব্রহ্মানুভূতির অপর নাম সমব্যথানুভূতি বা একাত্মানুভূতি। ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি তখনই হয়—যখন সিদ্ধসাধক সর্বত্রই এবং সর্বজীবে ও জড়ে ব্রহ্মচৈতন্যের স্ফূর্তি ও সত্তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, আর যদি এই অনুভূতি না আসে, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রহ্মানুভূতির পর্যায়ে সাধক উন্নীত হন নি। ব্রহ্মানুভূতি ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের সার্থকতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে এই অনুভূতির জলন্ত নিদর্শন পাই একবার নয়, বহুবারই।

●

॥ কীর্তনে নর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

স্বামী প্রভানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

নৃত্যশিল্প সম্বন্ধে শিল্পীর আত্মসচেতনতা, নৃত্যের রূপবন্ধ ও কল্পনা শাস্ত্রীয় নৃত্যের আদিকে পুষ্টিলাভ করে। কীর্তনের সহচর[২২] নৃত্য কিন্তু ভাবপ্রধান। এর স্বতঃস্ফূর্ততা ও সক্রিয় প্রাণশক্তি শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুশাসনের দিকে মনযোগী নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় কৃতী শিল্পীর ক্ষেত্রে আপাতবিরোধী এটুকু বিষয়ের মধ্যেও দেখা যায় সুসামঞ্জস্য। কীর্তন-নর্তনের জমজমাট আসরে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ত কীর্তনগানের ভাবের কলিত ও চারুরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে। কীর্তন ও নৃত্যে নিরত শ্রীরামকৃষ্ণের দেহপল্লবের হিল্লোল, ভাবের স্পন্দন, মুখছ্যুতির বিভা, ভ্রূভঙ্গিমার হান ইত্যাদিতে যে নাট্যশক্তি বিচ্ছুরিত হ'ত, তা আধ্যাত্মিকভাবে বিমণ্ডিত হয়ে শ্রোতা ও দর্শকদের অনাস্বাদিত রসমাধুর্য পরিবেশন করত।

অনন্ত গুণাধার শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তনের আসরে যে স্বপ্ন-আলোড়নকারী ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করতেন তার মধ্যে বহুবিধ অসাধারণত্ব থাকলেও সাধারণত্বের লক্ষণগুলি ছিল সুস্পষ্ট। তিনি কীর্তনের আসরে যে সঙ্গীতমালা গাঁথতেন তাদের ভাবানুষঙ্গ-সূত্রের মধ্যে একটি অখণ্ডতা ও স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। তিনি নানা পর্যায় হতে চয়ন করতেন ভক্তি-সুরভিত মালার ফুল। তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত কীর্তন গান যেন উন্মুক্ত করত একটি নাটকের দ্বার, পরিবর্তন করত দৃশ্য, ক্রমে পৌঁছে দিত সৃষ্টি পরিণতির দিকে। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সুরেন্দ্র, বাবুরাম, মাষ্টার, হরিশ, লাটু,

---

২২। ডঃ সুকুমার সেন প্রমাণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুরুলিয়াতে সহযোগে কৃষ্ণকাহিনী পদগীতির বই। জয়দেবের গীতগোবিন্দ অভিনীত হত। তিনি আরও প্রমাণ করেছেন যে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 'নাট' ও 'নাচ' অনেক সময় সমার্থক ছিল। (ডঃ সুকুমার সেন : "নট নাটা নাটক," ১৯৬৮)

হাজরা, মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত। জ্ঞানগর্বী পণ্ডিত পণ্ডিতকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিষ্টকণ্ঠে বুঝিয়ে বলেন, "যারই নিত্য, তারই লীলা। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই লীলার জন্য নানারূপ ধরিয়াছেন।" ভাবপ্রদীপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে মধুমাখা দিব্যকথার রাশ ঠেলে দেন জগন্মাতা। উপলব্ধির রসস্রুত হতে উৎসারিত হয় কিন্নরকণ্ঠের সংগীত। ঠাকুর প্রেমানন্দে প্রমত্ত। তাঁর গন্ধর্ববিনিন্দিত কণ্ঠে নিঃসৃত হয় সংগীতলহরী। রামপ্রসাদের 'কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দর্শন।' গানটি দিয়ে আরম্ভ হয়। সে-ভাবেরই রেশ প্রকটিত হয় দ্বিতীয় গানে, "মা কি এমনি মায়ের মেয়ে। যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে॥" সেই ভাবটিরই বিস্তাররূপে উপস্থাপিত করেন তৃতীয় গান, "প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলই জেনো ভাকাতি।" এবারে কীর্তনের নাট্যাংশে দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটে। মা-নামের সুধার মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে "আমি সুরা পান করি না, সুধা খাই জয়কালী বলে।" কীর্তনটিতে, সেসঙ্গে গায়কের দেহাঙ্গে গানের ভাবার্থ স্ফুরিত হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, যে শ্যামা-সুধা খেলে চতুর্বর্গ মিলে যায় সেই সুধা মানুষ খায় না কেন? উত্তরের মুখে তিনি পরিবেশন করেন পঞ্চম গান, "শ্যামাধন কি সবাই পায়, অবোধ মন বোঝে না একি দায়।" কমলাকান্তের এই গানের শেষে কিছুক্ষণের বিরতি পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবতন্ময়তা কিছুটা তরল হয়। সুরঝঙ্কার ও ভাবমূর্ছনার পরিমণ্ডল সম্পৃক্ত। পণ্ডিত মোহিত। তাঁর আকাঙ্ক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরকণ্ঠের কীর্তন আরও শোনেন। এদিকে সঙ্গীত-নির্ঝর শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লান্তি-বিহীন। এবার তিনি তুলে ধরেন শ্যামাসাধন ও তাঁর বিশ্ব সম্বন্ধে একটি চিত্রধর্মী কীর্তন গান, "শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়িতেছিল" ইত্যাদি। কলুষের কুবাতাস হতে রক্ষা পাবার জন্য তিনি জগন্মাতার শরণাগতির নির্দেশ দেন দুটি কালীকীর্তনের মাধ্যমে—"এবার আমি ভাল ভেবেছি" এবং "অতলপদে প্রাণ সঁপেছি।" দ্বিতীয় গানের "দুর্গানাম কিনে এনেছি" কলিটি শুনে পণ্ডিতের বুদ্ধির শান দেবার শিলা বিগলিত হয়ে অশ্রুধারায় ঝরে পড়ে। উপস্থিত সকলের হৃদয়ে ভাবের ঝড় ওঠে। ভাবসুধায় টলটলায়মান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গীতি-আলেখ্য নিয়ে অগ্রসর হন। 'কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।' 'দেহের মধ্যে ছজন কুজন'-রূপী ছাগল-গরু হতে রোপিত তরুটিকে রক্ষা করতে হবে। এরজন্য বাইরের কোন কিছুর আশ্রয় নিতে হবে না। তাঁর সুরেলা কণ্ঠে নির্দেশিত হয় সাধকের ইতিকর্তব্য। তিনি গান করেন, "আপনাতে আপনি থেকো মন যেয়ো নাক কারু ঘরে।" বিমুগ্ধ শ্রোতা পণ্ডিতের মনে গেঁথে দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ গানের সুরে বলেন, "মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড়।" পণ্ডিত বিচারমার্গী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বক্তব্য বিস্তার করেন একটি সুপ্রচলিত কীর্তন গানের মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণ গান করেন, "আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো।" গীতি-আলেখ্য শ্রোতাদের পৌঁছে দেয় কল্পলোকের অমরাবতীতে, শুদ্ধাভক্তির সরোবরের তীরে। এরজন্য ভিন্ন কোন সংলাপের প্রয়োজন হয় না। গানের সুসজ্জিত ভাবপুঞ্জ, কীর্তনীয়ার সুকণ্ঠে গীত সুর-তাল-সমন্বিত একাদশটি গান শ্রোতা ও দর্শকদের বিভিন্ন দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে শুদ্ধাভক্তির বৃন্দাবনে পৌঁছে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের গাওয়া কীর্তনে উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন, অপরের গীত কীর্তনেও বিহ্বল হয়ে পড়তেন। দেহ রোমাঞ্চিত হত, প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ে, মুখে দিব্য হাসির ছটা। বিশেষতঃ নরেন্দ্রপ্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞ ও উচ্চকোটির সাধকের কণ্ঠে গান শুনলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রদীপ দপ্ করে জ্বলে উঠত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে নরেন্দ্রের গান শুনলে তাঁর ভিতর যিনি আছেন, "তিনি সাপের ন্যায় ফোঁস করে যেন ফণা ধরে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন।" একটি মধুর ঘটনা। নরেন্দ্রনাথ তানপুরা সহযোগে গাইছেন,

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী।
(তুমি) নিত্যানন্দস্বরূপিণী॥
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী।

গান অগ্রসর হতেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হন। ভাব ক্রমেই গভীরতর হয়। "গানের সুরে সুরে মন ঊর্ধ্বে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, মুখাবয়ব অমানুষী ভাব ধারণ করিল, ক্রমে মর্মরমূর্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন।" কিছুক্ষণ পরে সমাধি হতে বুথিত হন। ভাবের প্লাবনের পুনরাক্রমণ হতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে যেন ব্যর্থ হন। দেশকালের বোধ চলে যায়। ভাবের ঘোরে বলেন, "এখনও তোমাদের দেখছি,—কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন চিরকাল তোমরা বসে আছ; কখন এসেছ, কোথায় এসেছ এসব কিছু মনে নেই।" ভিন্ন আসরে উপস্থিত ভক্তেরা আবার কখনও বা বিস্মিত হয়ে শুনতেন, "মা গো, একটু দাঁড়া মা। তোর ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ করতে দে মা।"

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্রের কমলকুটিরে কীর্তন-নর্তনে প্রমত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তিন অবস্থার মধ্যে বাইচ খেলতে থাকেন। এর সঙ্গে তুলনীয় "তিনদশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল। অন্তর্দশা বাহ্যদশা অর্ধবাহ্য আর।" (চৈতন্যচরিতামৃত/১৪৬) অর্ধবাহ্যদশায় সঙ্কীর্তন ও মধুর ভাবনৃত্ত। ভাবের গভীরে অন্তর্দশা সমাধি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ। সেবক হৃদয় তাঁকে ধরে থাকেন। ঠাকুর নিস্পন্দ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে। মুখে দিব্য হাসি। ভগবানের চিদানন্দরূপ দর্শন করছেন। সেই অপরূপ রূপ দর্শন করে তিনি যেন মহানন্দে ভাসছেন। সুদক্ষ ফটোগ্রাফার এই দুর্লভ চিত্রটি সাদাকালোর রূপবন্ধনে ধরে রেখেছেন। (১নং চিত্র)

এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনে যে ভাবোচ্ছ্বাসের উৎপ্লব উপস্থিত সকলকে আলোড়িত করত তার একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। প্রত্যক্ষদর্শী অশ্বিনীকুমার দত্ত একখণ্ড মধুর স্মৃতি উপহার দিয়েছেন। অশ্বিনীকুমার লিখেছেন, "কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেশব। কিছু হবে কি?' কেশবচন্দ্র সোৎসাহে

১নং চিত্র : এই গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্রটি 'কমলকুটিরে' গৃহীত হয়েছিল ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর। গভীর ভাবসমাধিস্থ বিশ্বয় চৈতন্যধারীর এই চিত্র বর্ণজগতে দুর্লভ একটি দলিল।

উত্তর করেন, 'হাঁ, হবে বৈকি' ! এই ইঙ্গিতবাক্যে অশ্বিনীকুমার সন্দেহ করেন, এঁরা সকলে বুঝি সুরাপানে মত্ত হবেন। তাঁর ভ্রান্তধারণা ভেঙ্গে যায়। পরমুহূর্তে দেখেন মনোমুগ্ধকর এক দৃশ্য। তিনি লিখেছেন, "যেই কথা সেই কাজ। মুহূর্তের মধ্যে সুরার ডাক পড়িল। ঘন রোলে খোল-কর্তাল বাজিল। হরিনামের গভীর ধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্ধে উত্থিত হইল এবং সেই দুই প্রমত্ত ভক্তবীর হরিরসমদিরা পানে আত্মহারা হইয়া পরস্পরের হস্তধারণ করতঃ প্রেমকম্পিত পদক্ষেপণে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন।" সেই কীর্তনানন্দের রূপ চাক্ষুষদর্শনের জন্য পাঠককে উপহার দিব একখানি মনোজ্ঞ চিত্র; সেখানে শ্রীচৈতন্য ও ঈশামসি অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ভগবৎসংকীর্তনের মাঝে বৈতনৃত্যে প্রমত্ত। এবং সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে ধর্মসমন্বয়ের মূলভাবটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এই তৈলচিত্রখানিকে[২৩] শ্রীরামকৃষ্ণ "সুরেন্দ্রের পট" বলে চিহ্নিত করেছিলেন; চিত্রপটের ভাব ও শিল্পসৌন্দর্যের তিনি প্রশংসা করেছিলেন। কেশবচন্দ্রও ছবিখানি দেখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "Blessed is he who has conceived this idea." (সেই পুরুষ ধন্য যার হৃদয়ে এই ভাব জাগরিত হইয়াছে।) এই তৈলচিত্র (২নং চিত্র) হতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নৃত্যরত মনোরম দৃশ্যটি ধারণা করা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্তন-নর্তনের উদ্দেশ্য ও গতিবিধি বিচিত্রভাবে স্ফূরিত হত। একটি সুন্দর উদাহরণ পাঠকের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরা যেতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ দেবীভক্ত, ধর্ম-মোক্ষ দূরেরই অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাভাজন। তার বাড়ীর দোতলায় কীর্তনের আসর বসেছে। সুকণ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথের সংগীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্তসুরে বাধা হৃদয়বীণা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ক্রমে ভাব উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন,

ভাবাবেগে ওঠে ঝড় অঙ্গ-আন্দোলন।
সাগরে তরঙ্গ যবে প্রবল পবন॥
মনোহরা এক ছড়া কুসুমের হার।
সুরেন্দ্র করিয়াছিল যতনে জোগাড়॥
শিয়রীতে প্রভুর গলে পরাইলে পরে।
অমনি লইয়া মালা ফেলিলেন ছুঁড়ে॥

সুরেন্দ্রের প্রাণে লাগে, নয়নে অশ্রু ঝরে। বিষণ্ণ সুরেন্দ্র পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বসেন। সম্মুখে উপস্থিত রাম, মনোমোহন প্রভৃতিকে দেখে বলেন, "আমার রাগ হয়েছে; রাঢ় দেশের বামুন এসব জিনিসের মর্যাদা কি জানে। অনেক টাকা খরচ করে এই মালা; ক্রোধে বললাম, সব মালা আর সকলের গলায় দাও। এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ; ভগবান পরসার কেউ নয়; অহঙ্কারের কেউ নয়। আমি অহঙ্কারী, আমার পূজা কেন লবেন? আমার

২৩। চিত্রটি 'প্রতিবাসী' 'জন্মভূমি' 'উদ্বোধন' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় ও কয়েকটি পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ পরমহংস কেশবচন্দ্রের [illegible]

(১নং চিত্র)

"সেই পরম পুরুষকে বন্দনা করিবার সময়ে এই ভাব আগরিত হইয়াছে।" আচার্য্য কেশবচন্দ্র

(২ নং চিত্র)

বাবিলনের পথে পথে নাম বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন শিবাই ভক্তরা : চিত্রটির বিশেষত্ব
এই যে, খ্রীষ্টীয়ানের পদযাত্রার চিত্রখানি মাটার বদলে মাটির ওপরে বস্ত্রাঞ্চল
ওপরে (দুষ্পাপ্য বায় এই মাটির ১২৯২) উপায়ে দেখা

(৩ নং চিত্র)

বাঁচতে ইচ্ছা নাই।" (কথামৃত ৫/পরি/১২) আকুল অশ্রুধারায় ভিজে তাঁর অহংকারের চিপি নরম হয়, অগ্রগতির পথের বাধা দূর হয়। বাহ্যতঃ অশ্রুধারায় বুক ভেসে যায়।

এদিকে কীর্তনীয়া নূতন এক গান ধরেছেন, "হৃদয় পরশমণি"। প্রেমোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নাচছেন। হঠাৎ পরিত্যক্ত মনোরম মালাখানি গলায় ধারণ করেন। আপাদবিলম্বিত কুসুমহারে শ্রীরামকৃষ্ণের রূপমাধুরী শতগুণে বৃদ্ধি পায়। পুঁথিকার বলেন,

"নয়ন-বিনোদ দেহে কি লাবণ্য খেলে।
শান্তিময় কান্তিছটা বদনমণ্ডলে।"

নেচে নেচে গান করেন আনন্দঘন শ্রীরামকৃষ্ণ। মাকে আবার জোগান "ভূষণ বাকি কি আছে রে। জগৎচন্দ্র হার পরেছি।' সুরেন্দ্র আনন্দে বিভোর। দেখেন 'প্রভুর গলায় মালা দুলিয়া দুলিয়া, হইতেছে আন্দোলিত পদ পরশিয়া।" সুরেন্দ্রের মনে ধারণা বদ্ধমূল হয়, ভগবান গর্বহারী, কিন্তু কাঙালের অকিঞ্চনের ধন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধমনে ফুট ওঠে, তিনি নটবর শ্রীগৌরাঙ্গের নগরসংকীর্তন দেখবেন। জগন্মাতা তাঁর কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে বাসগৃহের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখেন এক নয়নানন্দকর দৃশ্য। পঞ্চবটীর দিক হতে একটি বিরাট সংকীর্তনের দল বকুলতলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বকুলতলা হয়ে কালীবাড়ীর প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর হয়। মহাপ্রভু হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য ভাবে বিহ্বল। জনসমুদ্রের সর্বত্র আনন্দ ও উল্লাস পরিব্যাপ্ত। এই সংকীর্তন দলের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন বলরাম বসু ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলির মধ্যে একখানি ছিল সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের নগরসংকীর্তনের ছবি। দুরন্তে ছাপান মনোহর ছবিখানি। ১৮৮৫ খ্রীঃ ২০শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ এই চিত্রপটখানি দান করেছিলেন মাষ্টারমশাইকে। বর্তমানে এই ছবিখানি কথামৃত ভবনে (কলিকাতা-৬) সুরক্ষিত। (৩নং চিত্র)

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলাতে মহাপ্রভু বলেছেন, "নাম সংকীর্তন হইতে সর্বানর্থনাশ। সর্বশুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস।" ভাবচক্ষে মহাসংকীর্তন প্রত্যক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ যে প্রেমামৃত আস্বাদন করেছিলেন সে মহাসংকীর্তন বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে তাঁর নিজের জীবনে। ভাগ্নে হৃদয়কে সঙ্গে করে তিনি শিহড়গ্রামে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্মৃতিচারণ করেছিলেন, "ওদেশে যখন হৃদয়ের বাড়ীতে ছিলুম তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলুম গৌরাঙ্গভক্ত, গাঁয়ে ঢুকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলুম গৌরাঙ্গ। এমনি আকর্ষণ—সাতদিন সাতরাত লোকের ভীড়। কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচীলে লোক, গাছে লোক। নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলুম, সেখানে রাতদিন ভীড়।···রব উঠে গেল—সাতবার মরে সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে। পাছে আমার সর্দিগরমি হয়, হুদে মাঠে টেনে নিয়ে যেত; সেখানে আবার পিঁপড়ের সার। আবার খোল করতাল—তাকুটি, তাকুটি।·····আকর্ষণ কাকে বললেন, ঐখানেই বুঝলুম। হরিলীলার যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেলকি লেগে যায়।"

(কথামৃত ৪।২০।২) শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহ এই মনোহর সংকীর্তনের বর্ণনা দিয়েছেন, "কীর্তনের আরম্ভ হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহু বাহ্যচৈতন্য হারাইতে লাগিলেন, কখনও ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেন সর্বাঙ্গ অস্থিহীন—তাঁহার দেহসরসী যেন ভগবৎ-প্রেমানন্দ-মলয়ে তরঙ্গায়িত। আবার কখনও বা মহাভাবে সমাধিস্থ, নিস্পন্দ, স্থিরনেত্রে দরদরধারে প্রেমাশ্রু বহিতেছে। অমনি হৃদয় আসিয়া পশ্চাৎ হইতে অঙ্গ ধরিয়া কর্ণে প্রণবোচ্চারণ করিতেছেন। আবার ক্ষণেকপরে মহানন্দে উদ্দামনৃত্য ও মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন।···সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় একদৃষ্টে সেই আনন্দমূর্তি অবলোকন করিতেছেন।··· দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্ত গেলেন। অমনি পুনরায় শঙ্খ-কাঁসর ঘণ্টার রবে আনন্দের তরঙ্গ আরও হুহুঙ্কারের সহিত মাতিয়া উঠিল। কীর্তনের মধ্যস্থিত সহস্র সহস্র লোক সকলেই আত্মহারা, প্রেমের বন্যায় ভাসমান। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাপি কাহারও বাহ্য জ্ঞান নাই। পুনরায় রাত্রি আসিল এবং রাত্রি প্রভাত হইল।"[২৪] জীবনীকার রামচন্দ্র লিখেছেন, "এমন নৃত্য কেহ কখনও দেখে নাই, এসব কীর্তন কেহ শুনে নাই।"

এই ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিকার লিখেছেন,

অদ্যপি শিহরে এই কীর্তনের কথা !
দেখাশুনা যাহাদের, মনে আছে গাঁথা।
.....
স্মরণে অপার সুখ, সমস্বরে কয়।
আমরি আমরি কথা কহিবার নয়॥ (পৃঃ ২৩২) (ক্রমশঃ)

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ দুইজনে তীর্থযাত্রার একটি ছোটখাট ছক তৈয়ারী করিয়াই হিমালয়ের বুকে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা দুইজনে রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, বদরীকাশ্রম, ত্রিযুগীনারায়ণ, কেদারনাথ ও কেদারনাথ হইতে আবার ত্রিযুগীনারায়ণে উপনীত হইয়া উত্তরকাশী যাইবেন ইহাই স্থির ছিল। উত্তরকাশীর পথেই পড়ে গঙ্গোত্রী। এই পথ অতিশয় দুর্গম, তথাপি তাহাতে তাঁহাদের অন্তরে কোন ভয় ছিল না, কেননা যতই বাধা-বিপত্তি চলার পথে আসুক না কেন, ততই আগ্রহ বর্ধিত হয়। প্রথমে গঙ্গোত্রী যাইবার পথে তাঁহারা উত্তরকাশী হইতে ভাটমারীচটী উপস্থিত

২৪। শুদ্ধানন্দ স্বামী : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১০৪-৯

হইলেন। উত্তরকাশী-স্থানটি ঠিক পুণ্যভূমি কাশী বা বারাণসীর মতো।[১] হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরকাশী অবস্থিত। এইটিও একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এইখানে বহুস্থানের সাধু-সন্ন্যাসীরা বারোমাস থাকিয়া ধ্যান-ভজন, তপস্যাদি করিয়া থাকেন। ভাটমারীচটী হইতে দুইদিকে দুইটি পথ গিয়াছে—একটি গঙ্গোত্রীর দিকে, আর অপরটি যমুনোত্রীর দিকে। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ দুর্গম জঙ্গলের পথ অতিক্রম করিয়া ভিতরের রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথের দুইদিকে দেখিতে পাইলেন বহু সিন্ধির গাছ। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় মনোরম, মানুষকে যেন আর একটি নূতন রাজ্যে লইয়া যায়। সেইস্থানে চারিদিকে বরফের পাহাড়। শীতও তেমনই। একজন নানকপন্থী সাধুর সহিত সেইখানে তাঁহাদের আলাপ হইল। সাধুটি তাঁহাদের বিশেষ যত্ন ও সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ সাধুটীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা গোমুখের দিকে যাত্রা করিলেন। গোমুখ গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থান। বরফের নদী হইতে সাতটি ধারা যেইস্থানে মিলিত হইয়াছে ঐস্থানকেই গোমুখ বলে। ঐ স্থান বারোমাসই বরফে আবৃত থাকে। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হৃদয়কে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দের রাজ্যে লইয়া যায়।

ক্রমে কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ গঙ্গোত্রীতীর্থ দর্শন করিয়া পুনরায় ভাটমারীচটীতে উপস্থিত হইলেন। ঐখানে আসিয়া দেখিলেন যে, যাঁহারা যমুনোত্রীদর্শনে যাইবেন তাঁহারা যাত্রার জন্য সেইস্থানে প্রস্তুত হইয়া আছেন। অনেক গৃহস্থযাত্রীও ছিলেন। ঐ সকল যাত্রীদের নিকট হইতে তাঁহারা মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া আহার সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার পর পুনরায় পথ চলা আরম্ভ হইল। জঙ্গলের ভিতর দিয়াই তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বেশ কনকনে ঠাণ্ডা অনুভব করিতে লাগিলেন। কোনরকমভাবে কয়েকদিন দুইবেলা চলিতে চলিতে তাঁহারা অবশেষে যমুনোত্রীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যমুনোত্রীতেও অসম্ভব শীত। তবে যমুনোত্রীতে একটি গরম জলের কুণ্ড আছে। কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ ঐ স্থানের চারিপার্শ্বে অবস্থিত সমবেত যাত্রীদের নিকট হইতে মাধুকরী করিয়া আনিলেন। ঐ স্থানে অনেক সাধুকে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহারা ভিক্ষার চাল কাপড়ের মধ্যে বাঁধিয়া ঐ তপ্তকুণ্ডের জলে ডুবাইয়া দিতেছেন। তাঁহারাও ঐভাবে চাল কাপড়ে বাঁধিয়া তপ্তকুণ্ডের জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলেন। তাহাতে চালগুলি ফুটিয়া অন্নে পরিণত হইল ও সেইভাবে তাঁহারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। পরে দুইজনে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় লইলেন এবং শুষ্ক গাছপালা জ্বালিয়া কিছুটা ঠাণ্ডা হইতে অব্যাহতি পাইলেন। সারারাত্রি ঐ আগুনের পার্শ্বে থাকিয়া দুইজনে ধ্যান-জপ করিয়া কাটাইয়া দিলেন। পরের দিন ভোরের বেলায় তাঁহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে তিন চারদিন পরে সেই ভাটমারীচটীতেই পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথের ও পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ ভাটমারীচটী হইতে পুনরায় দুইজনে উত্তরকাশীর দিকে রওনা হইলেন এবং পদব্রজে চলিতে চলিতে প্রায় তিনদিনের পর পুনরায় উত্তরকাশী পৌঁছাইলেন।

১। যেমন দক্ষিণ-ভারতে কাঞ্চীপুরম্।

ভাটমারীচটী হইতে উত্তরকাশী প্রায় আশী-পঁচাশী মাইল দূরে অবস্থিত। উত্তরকাশীতে কিছুটা লোকালয় দেখিতে পাওয়া যায়। সেইখানে দোকান, ডাকঘর প্রভৃতি আছে। তাঁহারা দুইজনে একরাত্রি উত্তরকাশী থাকিয়া পরের দিন পুনরায় যাত্রা করিলেন। এইভাবে প্রতিদিন চলিতে চলিতে কয়েকদিনের মধ্যে দেরাদুন হইয়া হৃষিকেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই সকল স্থানের ছোট ছোট পার্বত্যপল্লী হইতে মাধুকরী করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন, আর পরিশ্রান্ত হইলেই গাছতলায় বিশ্রাম লইতেন।

●

৯ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ভবনাথ ৯

ব্রহ্মচারী প্রণবেশচৈতন্য

(তিন)

কলকাতার বাগবাজারের বলরামবসুর বাড়ী ঠাকুরের বৈঠকখানা। বহুবার এই বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছে। এ বাড়ীকে ঠাকুর 'কেল্লা' বলতেন। বলরামের বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর নিত্যপূজো ছিল বলে 'বলরামের অন্নকে' শুদ্ধ অন্ন বলতেন। মাঝে মাঝে আবার ঠাকুর রাত্রিবাসও করতেন। ভক্তেরা বলতেন 'বলরামমন্দির'। এখানে ভক্তসঙ্গে কত গান, নৃত্য, আনন্দ হয়েছে। এই বাড়ীর দ্বিতলের বৈঠকখানাটিতে ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে মজলিশে বসতেন আর সংলগ্ন ঘরটিতে ঠাকুর বিশ্রাম করতেন। এই স্থানটিতে এখন ঠাকুরঘর হয়েছে আর বৈঠকখানাটি নাটমন্দিরের মতন ব্যবহৃত হয়। এই বলরামবসুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছিল ১ই মে, ১৮৮৫ সালে। সেই সুপরিচিত দ্বিতল বৈঠকখানায় ভক্তদের সঙ্গে সহাস্য বদনে কথা বলছেন। ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের অবতার-প্রসঙ্গ হচ্ছিল। মাষ্টার মহাশয় ভবনাথকে যেন কি বলছেন। ভবনাথ বললেন, "ইনি (শ্রীম) বলেন, 'হাতী যখন দেখি নাই, তখন সে ছুঁচের ভিতর যেতে পারে কিনা কেমন করে জানব ? ঈশ্বরকে জানি না, অথচ তিনি মানুষ হয়ে অবতার হতে পারেন কিনা, কেমন করে বিচারের দ্বারা বুঝব ?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "সবই সম্ভব। তিনি ভেল্কি লাগিয়ে দেন! বাজীকর গলার ভিতর ছুরি লাগিয়ে দেয়, আবার বার করে। ইট-পাটকেল খেয়ে ফেলে।"[৩৬]

আলোচনা হচ্ছিল ব্রহ্মজ্ঞানের। ভবনাথ বললেন, "তবে মানুষ হিংসা করা যায় ? মেরে ফেলা যায় ?" শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন, "হাঁ, এ অবস্থায় হতে পারে। সে অবস্থা সকলের হয় না।—ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। দু-এক গ্রাম নেমে এলে তবে ভক্তি, ভক্ত ভাল লাগে। ঈশ্বরেতে বিদ্যা-অবিদ্যা দুই আছে। এই বিদ্যা যারা ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়, অবিদ্যা যারা

৩৬। কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৮৮

ঈশ্বর থেকে মানুষকে তফাত করে দূরে যায়। বিদ্যার বেলা—জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য। এই সব আশ্রয় করলে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছান যায়। আর এক ধাপ উঠলেই ঈশ্বর—ব্রহ্মজ্ঞান। এ অবস্থায় ঠিক বোধ হচ্ছে—ঠিক দেখছি—তিনিই সব হয়েছেন। তাদ্য গ্রাহ্য থাকে না। কারু উপর রাগ করবার যো থাকে না।" তিনি উপমা দিলেন দু'সাধুর সহরে রত্ন দেখে বেড়ানো। সব শুনে ভবনাথ বললেন, "এ খুব উঁচু কথা।"[৩৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বিখ্যাত পণ্ডিত, সাহিত্যিক প্রভৃতিদের নিজেই দেখতে যেতেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন। এভাবে তিনি আর্যসমাজের দয়ানন্দ সরস্বতী, শশধর তর্কচূড়ামণি, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সঙ্গে অবশ্য ভক্তেরা থাকতেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে। ভবনাথও সঙ্গে ছিলেন।[৩৮]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভবনাথ সম্বন্ধে একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন। একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গেছেন। "তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন; অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরমভক্ত বালক বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।"[৩৯]

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৪-পরগণা জেলার মল্লিকপুরের ভারদ্বাজ বংশীয় অভয় চরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা কিরণশশী দেবীর সঙ্গে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ভবনাথের বিয়ে হয়। বিয়ের আগে ভবনাথ-জননী দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনুমতি নিতে। ঠাকুর অনুমতি দিয়েছিলেন কিনা বলা মুস্কিল। হয়তো দিয়ে থাকতে পারেন। তবে তাঁর জননীকে ঠাকুর সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "ভবনাথকে সংসারী করো না। সংসারী করলে ফল শুভ হবে না।"[৪০] ফল যে শুভ হয়নি তার প্রমাণ ভবনাথের অকালে দেহত্যাগ। তবুও ঠাকুর নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন, তাঁর স্ত্রী যাতে ধর্মাকরণের সহায়ক হয়।[৪১] তাই বিবাহিত ভবনাথের প্রশংসা করে ভক্তদের বলতেন, "ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়। ঈশ্বরের কথা নিয়ে দু'জনে থাকে। আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি, তখন রেগে রোক করে বললে, কি। আমরাও আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?"[৪২] আবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর জন্য ভবনাথকে সাবধান করে বলে দিচ্ছেন ঠাকুর, "খুব বীরপুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিসনে। শিকনি ফেলতে

৩৭। তদেব , পৃঃ ১৬৮-৭১

৩৮। তদেব , পৃঃ ১

৩৯। উদ্বোধন, ১০ম বর্ষ, পৃঃ ২৬৫

৪০। শ্যামপুকুর বাটী। শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ—স্মরণিকা, ১৯৭৯, পৃঃ ৩৮

৪১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (২য় সংস্করণ)—বৈকুণ্ঠ নাথ সান্যাল, পৃঃ ৩৬৬

৪২। কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১১৩

কেলতে কান্না ! (নরেন্দ্র, ভবনাথ ও মাষ্টারের হাস্য)। ভগবানেতে মন ঠিক রাখবি ; যে বীরপুরুষ সে রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ ! পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কবি।"[৪৩]

ভবনাথ বিয়ে করার ফলে সংসারের কামেলায় জড়িয়ে পড়েন। ঠাকুরের কাছে যাতায়াতও কমে যায়। ঠাকুরও চিন্তিত হন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভবনাথ এলে ঠাকুর অনুযোগের স্বরে বলছেন, "তুই এত দেরীতে দেরীতে আসিস কেন ?" ভবনাথ হেসে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, পনরদিন অন্তর দেখা করি ; সেদিন আপনি নিজে রাস্তায় দেখা দিলেন, তাই আর আসি নাই।" ঠাকুর বললেন, "সে কিরে ? শুধু দর্শনে কি হয় ? স্পর্শন, আলাপ এসবও চাই।"[৪৪]

বিবাহিত ভবনাথ সমাধি অবস্থায় ঠাকুরকে স্পর্শ করবার অধিকারী ছিলেন। কারণ ভবনাথের মন ছিল শুদ্ধ ও পবিত্র। একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসবে সুপ্রসিদ্ধা কীর্তন-গায়িকা সহচরীর কীর্তন হচ্ছিল—গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসের গান। শুনেই ঠাকুর দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভক্তেরা ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। ভবনাথ ও রাখাল ঠাকুরকে ধরে আছেন—পাছে পড়ে যান। ভক্তেরা তাঁকে মণ্ডলাকারে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভাঙ্গার পর ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। কীর্তনী আবার কীর্তন আরম্ভ করতেই ঠাকুর সমাধিস্থ। ভবনাথের কাঁধে ঠাকুরের ভাঙ্গা হাতটি রয়েছে।[৪৫]

সমাধি অবস্থায় ভবনাথ ঠাকুরকে শুধু স্পর্শ করতেন না, খাইয়েও দিতেন। আর একবার ঠাকুরের জন্মোৎসবে বিখ্যাত কীর্তনীয়া নরোত্তম এসেছেন। কীর্তনের পর নরেন্দ্রনাথ মায়ের গান গাইছেন—'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।' শুনেই ঠাকুর সমাধিস্থ। একটু প্রকৃতিস্থ হলে ঠাকুর খেতে বসেছেন। তখনও ভাবের আবেশ রয়েছে। কিন্তু ভাত খাচ্ছেন দু'হাতে। ঠাকুর ভবনাথকে বলছেন, "তুই দে খাইয়ে।" ভবনাথ খাইয়ে দিলেন।[৪৬]

ভবনাথের প্রকৃতি অত্যন্ত সরল ছিল। ঠাকুর বলতেন, "ওরে অনেক তপস্যা, অনেক সাধনার ফলে লোকে সরল উদার হয়, সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না ; সরল বিশ্বাসীর কাছেই তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।"[৪৭] ভক্তদের তিনি সরল হতে বলতেন, কপটতা ছাড়তে বলতেন। সঙ্গে সঙ্গে ভবনাথের উদাহরণ দিতেন। বলতেন, "ভবনাথ কেমন সরল। বিবাহ করে এসে আমায় বলছে, স্ত্রীর উপর আমার এত স্নেহ হচ্ছে কেন ? আহা। সে ভারী সরল।"[৪৮]

বিয়ের পর ভবনাথ সংসার পালনের জন্য বরাহনগরে একটি স্কুলে শিক্ষকের কাজ নিয়েছিলেন। তবে একাজ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় কাজকর্মের চেষ্টাও করেছিলেন। তাই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত অনেক কমে গিয়েছিল। ঠাকুর এজন্য বেশ

৪৩। কথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৫৩
৪৪। কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৩৫
৪৫। কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২৯-৩৫
৪৬। কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১২৯
৪৭। লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব-উত্তরার্দ্ধ, পৃঃ ১২৪
৪৮। কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১০৯

চিন্তিতও ছিলেন। ভবনাথ মাষ্টার মহাশয়কে ধরেছিলেন কাজের জন্য। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগরের নূতন স্কুল হবে শুনলুম। আমারও তো খাটের জোগাড় করতে হচ্ছে।"[৩৯]

দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে নরেন্দ্র প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তেরা চড়ুইভাতি করতেন। ভবনাথ সে দলের মধ্যে ছিলেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন, "অনেক সাবধানে থাকলে ভক্তি বজায় থাকে। ভবনাথ, রাখাল এরা সব একদিন রান্না করে। ওরা খেতে বসেছে—এমন সময় একজন বাউল ঐ পংক্তিতে বসে বলে খাব। বল্লাম, খাঁটবে না। যদি কিছু থাকে তবে পরে খেও। সে রেগে চলে গেল।"[৪০]

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাঁর ঘরে ভক্তপরিবৃত হয়ে বসে আছেন। ভবনাথও আছেন। নানা প্রসঙ্গের পর ভবনাথ বিনীতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকের সঙ্গে মনান্তর থাকলে মন কেমন করে—তবে তো সবাইকে ভালবাসতে পারলাম না।" ভবনাথ সংসারী। সংসারে থাকলেই লোকের সঙ্গে বনিবনা হয় না। তাই সরল ভবনাথ নিজের মনের ক্ষোভ মিটাতে চাইছেন। ঠাকুরকে এর উপায় জিজ্ঞাসা করছেন। ঠাকুর উপায় বলে দিলেন। বল্লেন, "প্রথমে একবার তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা করে ভাব করবার চেষ্টা করবে। তাতে যদি না হয় তবে ওসব আর ভাববে না। তাঁর শরণাগত হও—তাঁর চিন্তা কর—তাঁকে ছেড়ে অন্য লোকের জন্য মন খারাপ করার দরকার নেই।" ভবনাথের কিন্তু সন্দেহ থেকে গেল। তিনি বললেন, "খ্রীষ্ট চৈতন্য এঁরা সব বলে গেছেন যে সকলকে ভালবাসবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ভাল ত বাসবে—সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বলে। কিন্তু যেখানে দুষ্টলোক সেখানে দূর থেকে প্রণাম করবে। কি চৈতন্যদেব? তিনিও 'বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সংবরণ।' শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁর শাশুড়ীকে চুল ধরে বের করা হয়েছিল।···অন্য লোকের মন পাওয়া গেল না বলে কি রাতদিন তাই ভাবতে হবে? যে মন তাঁকে দেব—সে মন এদিক ওদিক রাখে খরচ করব? আমি বলি মা, আমি নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল কিছুই চাই না কেবল তোমায় চাই? মানুষ নিয়ে কি করবে? তাঁকে পেলে সব পাবে।"[৪১]

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ভবনাথ, রাম, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "দেখছো কত রকম মত। মত, পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ।" ভবনাথ জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে উপায় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে গেলে পাকা সিঁড়িতে উঠা যায়, একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায়, এক গাছা দড়ি দিয়ে, এক গাছা বাঁশ দিয়ে, উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বরলাভ করতে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়। আর সব মতকে এক একটি পথ বলে জানবে। আমার ঠিক পথ, আর সকলের

৩৯। উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৪৪, পৃঃ ১৩৬

৪০। কথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১০৪

৪১। উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৪৪, পৃঃ ১৩৩

মিথ্যা, এরূপ বোধ না হয়। বিদ্বেষভাব না হয়।"[৫২] ঠাকুর সুন্দরভাবে 'ধর্মসমন্বয়' বুঝিয়ে দিলেন। ঠাকুরের এই উদার ধর্মমত পৃথিবীর সকল ধর্মের, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা সাদরে গ্রহণ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। ভবনাথের মনে ঠাকুরের এই শিক্ষা খুব দাগ কেটেছিল। ঠাকুরের মহাসমাধির পর ভবনাথ 'সখা' পত্রিকায় ১৮৮৮ সালের নভেম্বর সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিষয়—শ্রীরামকৃষ্ণ। তাতে তিনি ঠাকুরের ধর্মসমন্বয় ভাবটি সুন্দরভাবে পাঠকের চোখে তুলে ধরেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, কি শিখ, যিনি যে ধর্মাক্রান্ত হউন সকলকেই তিনি তাহাদের উপযোগী উপদেশ প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি কোন নূতন ধর্মমত প্রচার করেন নাই; যাহার যেরূপ বিশ্বাস তাহাকে তিনি তদনুরূপ সাধনা করিতে বলিতেন এবং তাহাদের পরিত্রাণ হইবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি সত্যবাদীকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন, নিজে যাহা বলিতেন তাহা নিশ্চয়ই করিতেন।"[৫৩] ভবনাথ আরো দুটো বই লিখেছিলেন—'নীতি কুসুম' ও 'আদর্শ নরনারী'। এথেকে ভবনাথের সাহিত্য-চর্চার কথা জানতে পারি।

সংসারে জড়িয়ে পড়লেও যখনই সময় পেতেন তখনই ঠাকুরের কাছে ছুটে যেতেন। কাশীপুরে ঠাকুর অন্তিম শয্যায় শায়িত। বালক ভক্তেরা প্রাণপণ সেবা করছেন। এখানেই ঠাকুর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গদের প্রভেদ করেছিলেন। বলেছিলেন, "…এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ, বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মশাই', জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ। ভবনাথকে দেখ্‌লে না? শ্যামপুকুরে বরটি সেজে এলো। জিজ্ঞাসা করলে 'কেমন আছেন?' তারপর আর দেখা নাই। নরেন্দ্রের খাতিরে ঐ রকম তাকে করি, কিন্তু, মন নাই।"[৫৪] ঠাকুর ভবনাথকে 'শুদ্ধাত্মা' বলতেন। তাঁকে 'নিত্যসিদ্ধ', 'ঈশ্বরকোটি' বলে ভক্তদের সামনে বলতেন। কিন্তু এখানে তিনি ভবনাথকে 'বহিরঙ্গ'দের মধ্যে পর্য্যায়ভুক্ত করলেন। প্রথমের দিকে তাঁর অসাধারণ পবিত্রতা, ঈশ্বরীয় গুণ দেখে ঠাকুর তাঁকে 'ঈশ্বরকোটি' বলেছিলেন। শেষেরদিকে সেই গুণগুলির সম্যকভাবে পরিস্ফুট না হওয়ায়, এবং ঠাকুর তাঁকে যা করতে বারণ করেছিলেন, তা করলে, বোধহয়, তাঁকে বহিরঙ্গ হিসাবে দেখেছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় যে ছয়জনকে 'ঈশ্বরকোটি' বলা হয়, তাঁদের মধ্যে ভবনাথের নাম নেই। গৃহীশিষ্যদের মধ্যে একমাত্র পূর্ণকে "ঈশ্বরকোটি' বলে গণ্য করা হয়।

কাশীপুরে ঠাকুরের অন্তিমকালে ভবনাথ উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরের মহাসমাধির পর যে গ্রুপ ফটো নেওয়া হয়, তার মধ্যে ভবনাথ নরেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। যে দুটি প্রাণ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণচরণতলে মিলিত হয়েছিলেন, সে দুটি প্রাণ চরম লগ্নের দিনেও পাশাপাশি থেকে তাঁদের প্রাণের আত্মারামকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সজল নয়নে বিদায় দিল।

৫২। কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৩৩

৫৩। সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (২য় মুদ্রণ) পৃঃ ৮৩

৫৪। কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২৮৭

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥*

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(এগারো)

সঙ্গীতের পাঠ্য, কথা বা সাহিত্য নিয়ে পূর্বে কিছু আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি সংক্ষেপে অলঙ্কার প্রভৃতি-সম্পর্কে নিয়ে। সাহিত্যে ও কাব্যে অলঙ্কারের মতো সঙ্গীতের স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, ও সঞ্চারী-বর্ণেরও পরিচয় দিয়েছি। অলঙ্কার সাহিত্যের শোভাবর্ধন করে। সঙ্গীতের অলঙ্কারও তাই।[১] কিন্তু প্রাচীন ও বর্তমান সঙ্গীতশাস্ত্রে ও সঙ্গীতে অলঙ্কারের অর্থ ও প্রয়োগরীতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সেজন্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০—খ্রীষ্টীয় ২০০ শতক) জাতিরাগে ও গ্রামরাগে এবং নাটকীয় সঙ্গীত ধ্রুবা প্রভৃতি রাগে যেভাবে অলঙ্কার ও রসের প্রয়োগ ও প্রকাশ ছিল বর্তমানযুগে (Modern Period-এ) রাগে ও গানে অলঙ্কার এবং রস-প্রভৃতির প্রয়োগবৈশিষ্ট্যে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়,[২] সেজন্য সঙ্গীতে প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করা অনেক সময়ে কঠিন।

অলঙ্কার রসের উদ্বোধক, সেজন্য অলঙ্কার সকল-শিল্পের মধ্যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। সৌন্দর্য্য ও রস কিংবা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সাধারণত পৃথক পৃথক বস্তু বা বিষয় বলে মনে হলেও অনেক ক্ষেত্রে উভয়কে একই সার্থকতার জন্য আমরা প্রয়োগ করি। যেমন পাশ্চাত্যদর্শনে Aesthetics-কে বলি সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, আবার ভারতবর্ষে ও ভারতীয় সাহিত্যে Aesthetics-কে বলি রসতত্ত্বের প্রকাশক ও উদ্বোধক। সেজন্য মোটামুটিভাবে Aesthetics পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে বিশেষ ক'রে ভারতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও তারা একই সার্থকতা সম্পন্ন করে। অথবা বলা যায় যে, অলঙ্কার হয়তো পাশ্চাত্যদর্শনে Aesthetics যে সার্থকতা সম্পন্ন করে, ভারতবর্ষে ও ভারতীয় সাহিত্যে ও কাব্যে অলঙ্কার অনেকটা সেই সার্থকতা সম্পন্ন করে এবং একথার অর্থ হ'ল পাশ্চাত্যদর্শনের Aesthetics যেমন সৌন্দর্য্য বা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের প্রকাশক, ভারতবর্ষে ও ভারতীয় সাহিত্যে ও কাব্যে অলঙ্কারও সেরূপ সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যতত্ত্বের প্রকাশক।

আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে বলেছেন : "তৎ (রস)-প্রকাশিনো বাচ্যবিশেষা এব রূপকাদয়োঽলঙ্কারা:"—যদিও রসরূপ সৌন্দর্য্য কাব্যেই প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়। ডক্টর ভি. রাঘবন তাঁর *Some Concepts of the Alamkāra-Sāstra* (Adyar, 1942)-গ্রন্থে তাই বলেছেন : "If Alamkāra is understood in their large sense as emphasising the need for a beautiful form in poetry, it is not very improper for the subject of poetics to be called Alamkara-sāstra".

---

* এই ধারাবাহিক প্রবন্ধ পরে "সঙ্গীতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও রসপ্রকাশ"-নামে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হবে।

১। সঙ্গীতের প্রসঙ্গাদি অলঙ্কারগুলির সার্থকতার পরিচয় দেব পরে।

২। বর্তমানকালে রাগে তথা সঙ্গীতে রসের প্রয়োগ ও সার্থকতার সৃষ্টি নাই বল্লেই চলে।

আনন্দবর্ধন সেজন্য ধ্বন্যালোকে (পৃঃ ৮৭) স্বীকার, করেছেন : "অলঙ্কারাণি হি নিরূপ্যমাণ-দুর্ঘটান্যপি রসসমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেঃ অহংপূর্বিকয়া পরাপতন্তি…" ।

এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে যে, 'তৎ (রস)-প্রকাশিনো বাচ্যবিশেষা এব রূপকাদয়োঽলঙ্কারাঃ' —কাব্যে অলঙ্কারই রসের প্রকাশ ও আস্বাদন দিয়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, সুতরাং অলঙ্কার রসের তথা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির পক্ষে অন্তরঙ্গ—না বহিরঙ্গ বস্তু ? অলঙ্কার শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার —দু'ভাগে বিভক্ত, সুতরাং রসসৃষ্টির ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির তাহলে দু'টি কারণ, সেজন্য একটিমাত্র কারণ না হওয়ার প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির কারণকে সীমাযুক্ত বলতে সীমিত করা হয়েছে। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অবশ্য এই সীমিত করার দোষের কথাই বলেছেন। তিনি তাঁর 'কাব্যবিচার'-গ্রন্থে (পৃঃ ৫৮) বলেছেন : "শোভাসৌন্দর্য্য যে কাব্যের নিদান—তাহা আলঙ্কারিক বামন বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এই শোভা ও সৌন্দর্য্যকে (সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকে) একান্তভাবে শব্দগত ও অর্থগত মনে করিয়া কাব্যকে একান্ত objective বা বহিরঙ্গ আলোচনা করিতে গিয়া কাব্য-সৌন্দর্য্যের যথার্থ স্থান কোথায় তাহা নির্ধারণ করিতে না পারিয়া (বামন ?) শব্দার্থের মোহজালে নিপতিত হইয়াছিলেন"। কিন্তু ডক্টর দাশগুপ্তের এই মন্তব্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখার বিষয়, কেননা আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন স্পষ্টই বলেছেন : "তস্মান্ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ" (ধ্বন্যালোক, পৃঃ ৮৭) ।

এ'প্রসঙ্গে ডক্টর ভি. রাঘবনের আলোচনা দ্রষ্টব্য ।, তিনি বলেছেন : "Such figures can hardly be considered 'Bahiranga' in Kavya, and comparable only to the 'Kataka' and 'Keyúra', the removable ornament. Therefore Ananda continues : 'তস্মান্ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ'। সেজন্য ডক্টর রাঘবন এ'প্রসঙ্গে (কাব্যমালা-সংস্করণের) নাট্যশাস্ত্রের (NS. XXII) শ্লোকের প্রমাণ দেখিয়ে বলেছেন : "They should properly be compared to the Alamkāras of damsels which Bharata speaks of under Sāmānyābhinayn, Bhāva, Hāva etc. and not to the Kataka and Keyúra". কথা এই যে, কটক, কেয়ূর প্রভৃতি অলঙ্কার শরীরের বহিরঙ্গ-সৌন্দর্য্য, কিন্তু হাব, ভাব প্রভৃতি সৌন্দর্য্য আন্তর-মনোভাবের অঙ্গ ও অলংকার, সুতরাং এ'ক্ষেত্রে বহিরঙ্গের প্রসঙ্গ ও আপত্তি থাকতেই পারে না।

অলঙ্কার যে রসসৃষ্টির ও সৌন্দর্যসৃষ্টির কারণ, সে'সম্বন্ধে ডক্টর কে. কৃষ্ণমূর্তি স্বীকার ক'রে বলেছেন : "Beauty in the world of human emotion, abiding or transitorily, is, again, *alamkára*" (vide *Some Thoughts on Indian Aesthetics and Literary Criticism*, p. 4). ডক্টর কৃষ্ণমূর্তি আরও বলেছেন : "The poet's material words and meanings may possess beauty by itself, and this is broadly spoken of *sabdálamkara* and *arthálamkara*. The former appeals to the ear, while the latter strikes the intellect." অবশ্য 'লোচন'-টীকায় অভিনবগুপ্ত বলেছেন : "দ্বিবিধম্ চারুত্বম্—স্বরূপরাত্মনিষ্ঠম্"। "চারুত্ব

—সৌন্দর্যম্" অলঙ্কার সেকথা আলঙ্কারিক ভামহও স্বীকার করেছেন : "সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ"। এজন্য ভক্টর রাঘবন পণ্ডিত অপ্পয়দীক্ষিতের প্রসঙ্গে বলেছেন : "Examining the field of poetic expression, Bhāmaha found Appayya-dikshita,. who has given as many as one hundred and twentyfive Alamkā'ras···". সেজন্য আনন্দবর্ধন বলেছেন : "অলঙ্কারাণামনন্তত্বাৎ"—অলঙ্কার অনন্ত বা অসংখ্য এবং সেই সকল অলঙ্কার রসানুবিদ্ধ সৌন্দর্যই সৃষ্টি করে।

আলঙ্কারিক ধারারাজ ভোজ অলঙ্কারকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন : "অলঙ্কারাশ্চ ত্রিধা,—বাহ্যাঃ, আভ্যন্তরাঃ, বাহ্যাভ্যন্তরাশ্চ। তেষু বাহ্যাঃ—বস্ত্র-মাল্য-বিভূষাদয়ঃ। আভ্যন্তরাঃ—দত্তপরিকর্ম- নবচ্ছেদ-অলঙ্কক্রিয়াদয়ঃ। বাহ্যাভ্যন্তরাঃ—স্নান-ধূপ-(বিন্যাসাদয়ঃ···"। আচার্য অভিনবগুপ্ত 'লোচন'-টীকায় এ'প্রসঙ্গে বলেছেন : "যেষামলঙ্কারাণাং বাচ্যত্বেন শরীরীকরণং শরীরভূতাং প্রস্তুতানাং অর্থান্তরভূততয়া অশরীরাণাং কটকাদিস্থানীয়ানাং শরীরস্থানাপাদনম্" (লোচন, পৃঃ ১১৭)। এ'ভাবে অলঙ্কার-সম্বন্ধে বিচিত্র আলোচনাই আছে, কিন্তু একথা ঠিক যে, রসের যেমন সার্থকতা আছে সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য, তেমনি আছে অলঙ্কারেরও। সঙ্গীতে প্রসন্নাদি অলঙ্কার স্বরের ও রাগের বিকাশে সৌন্দর্য, লাবণ্য ও লালিত্য সৃষ্টি করে, এজন্য ভারতীয় সাহিত্যে, কাব্যে ও সঙ্গীতে ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রকৃত নাম রসতত্ত্ব ও রসানুভূতি।[৩] সেজন্য ভারতীয় সঙ্গীতে রসতত্ত্ব ও রসাস্বাদনতত্ত্বই একান্তপক্ষে প্রযোজ্য, ঠিক পাশ্চাত্য এস্থেটিক বা সৌন্দর্যতত্ত্ব নয়।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

॥ এক ॥

পূর্বাভাষ :

'শ্যামাপদ ন্যায়রত্ন খ্যাত সাধারণে।
লুটাইলা সেবা মোর প্রভুর চরণে।' পুঁথি, পৃঃ ৫৫৩

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ একটি স্বল্পখ্যাত চরিত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের রঙ্গমঞ্চে শেষ অঙ্কে এই পণ্ডিত মহাশয়কে মাত্র একটিবার উপস্থিত দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য নাম ও অলৌকিক মহিমা-কথা শ্রবণে আকৃষ্ট হ'য়ে, অন্তরের আধ্যাত্মিক পিপাসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে, যে-সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত তাঁর শ্রীচরণতলে উপনীত হ'য়েছিলেন, পুতাত্মা ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁদেরই অন্যতম।

৩। Aesthetics.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, কথামৃত প্রভৃতি প্রামাণ্য ও আকর গ্রন্থে এই পণ্ডিতপ্রবর সম্পর্কিত কিছু কিছু বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। অনুরাগী ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য এই নিবন্ধে সেই সমস্ত নির্ভরযোগ্য বিবরণীই সযত্নে পরিবেশিত হ'ল।

পরিচিতি :

'পণ্ডিতের শিরোমণি জনৈক ব্রাহ্মণ।
অধীত বিবিধ শাস্ত্র ন্যায় ব্যাকরণ॥
ভাগবত গীতগাথা পুরাণ অবধি।
শ্যামাপদ নাম ন্যায়বাগীশ উপাধি॥'-পুঁথি, পৃঃ ৪৮৩

পণ্ডিতপ্রবর শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন একজন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক। ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতিতেও ছিলেন ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ন্যায়শাস্ত্রের উভয় শাখায় (প্রাচীন ও নব্য) অসাধারণ কৃতবিদ্যতার জন্য ইনি 'ন্যায়বাগীশ' ও 'ন্যায়রত্ন' উপাধিতে বিভূষিত হন।

'বিদ্বান্‌মণ্ডলী মধ্যে সবে জানে তাঁয়।
বাসস্থান আঁটপুরে হুগলি জেলায়॥'-পুঁথি, পৃঃ ৪৮৩

পণ্ডিত শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশের নিবাস ছিল হুগলি জেলায়, আঁটপুর নামক স্থানে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীমান্ বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ)-এরও পৈত্রিক বাসভূমি ছিল ঐ গ্রামে। সেই সূত্রে বাবুরামের মাতা-পিতা প্রভৃতি এই পণ্ডিত মহাশয়কে বিশেষভাবে জানতেন। বাবুরামের ভগ্নীপতি বাগবাজার নিবাসী জমিদার ভক্তবর বলরাম বসুর সঙ্গেও মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয় ছিল।

যা হোক, বিবিধ শাস্ত্রের অধ্যাপনা, সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রকৃষ্ট বিচার-মীমাংসা এবং যজন-যাজনাদি বৈধী ক্রিয়া-কর্মে ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ দক্ষতা ও সুনাম ছিল। ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য ইনি বিদ্বৎসমাজে সর্বত্রই বেশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন।

'ধনিগণে নানা কর্মে করে নিমন্ত্রণ।
বিদ্যাবলে বহু অর্থ করে উপার্জন॥'-পুঁথি, পৃঃ ৪৮৩

ধর্মপ্রাণ জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অনেকেই শ্যামাপদ পণ্ডিতের গুণমুগ্ধ ছিলেন। শাস্ত্রীয় তত্ত্বের সুমীমাংসা, পণ্ডিতবিদায়, পুরাণ-গীতা-ভাগবতাদি পাঠ এবং যাজনিক ক্রিয়া-কাণ্ড উপলক্ষে দূরাঞ্চলের বিশিষ্ট গৃহস্থগণও এঁকে পরম সমাদরে তাঁদের গৃহে আমন্ত্রণ করতেন। উত্তরপাড়ার ঘনামধন্য রাধা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এঁর একান্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। বিশেষ ধর্মীয় কৃত্য, পূজোৎসব ও পালপার্বণাদিতে ইনি মধ্যে মধ্যে তাঁর ভবনে আগমন ক'রতেন। যা হোক, অগাধ বিদ্যাবলে ও যাজনিক ক্রিয়া-কলাপে অসাধারণ নৈপুণ্যের গুণে ইনি প্রচুর অর্থকড়ি ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন।

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ছিলেন অত্যন্ত ধীর-স্থির, বিনয়ী, সদাচারী ও সত্যাশ্রয়ী। এঁর ন্যায়নিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য সর্বসাধারণে এঁকে বিশেষ মান্য

ও ভক্তিশ্রদ্ধা ক'রতেন। তারা নিজেদের পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তি, পারস্পারিক দেনা-পাওনা অথবা অন্য কোন সংক্রান্ত বাদ-বিসম্বাদের সুমীমাংসা সাধনের জন্য এঁর শরণাপন্ন হ'তেন। ঐরূপ বিতর্কিত বিষয়ে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই সাগ্রহে এঁর সালিশী প্রার্থনা ক'রতেন। তার ফলে, ঐ সালিশী কর্মেও এঁকে প্রায়ই নিযুক্ত হ'তে হ'ত। সেই উপলক্ষে ইনি কেবল স্বগ্রামে বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহেই নয়, দূরান্তরের পল্লীতলিতেও গমন ক'রতেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তখনকার দিনে গ্রামবাসীরা বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ সুধীদেরই সালিশীতে আহ্বান ক'রতেন। যা হোক, ন্যায়বাগীশ মহাশয় ঐরূপ সালিশীতে আহূত হ'য়ে একান্তই নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-মীমাংসাদি ক'রতেন। এঁর ওপর ব্যবস্থা ও বিধানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হ'ত।

পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের পুত্র-কন্যাদিও ছিল। তবে, পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তাদের নামোল্লেখ অথবা কোন বিবরণী পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে মনে হয়, এখনও অনুসন্ধানের অবসর আছে। কোনও উৎসাহী সুধী এ-সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ দিলে অনুরাগী ভক্তবর্গ সবিশেষ চরিতার্থ হবেন, আশা করি।

লীলাবার্তা :

[গোড়ার কথা]

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, ১২৯২ সাল। ভাদ্রমাসের গোড়ার দিকের ঘটনা। পণ্ডিত শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ মহাশয় বাজনিক কোনও ক্রিয়া-কাণ্ড উপলক্ষে উত্তরপাড়ার রাজবাড়িতে আসেন। ঐ সময়ে একদিন ইনি দেখেন যে, রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নিজ সদর বৈঠকখানায় ব'সে একটি পুস্তক পড়ছেন। তা দেখে, ইনি সবিনয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি কী পুস্তক পড়ছেন—

উত্তরে রাজা জয়কৃষ্ণ এঁকে সসম্মানে বলেন—এটি একটি গল্পপুস্তক—উপন্যাস, নাম 'গুপ্তকথা'।

রাজার কথা শুনে ন্যায়বাগীশ মহাশয় বিস্মিত ও হতবাক্ হন। অবশেষে, ইনি তাঁকে বলেন—'দেখুন আয়ু তো প্রায় শেষ হ'য়ে আসছে। এখন আর গল্পউপন্যাস পুস্তক পড়া কেন? যে-সব পুস্তকে তত্ত্বকথা আছে, এখন সেই সব, পুস্তক পড়ুন।'

এঁর ঐ কথার জবাবে রাজা জয়কৃষ্ণ এঁকে একান্ত বিনীতভাবে বলেন—'দেখুন ভট্টাচায্, মশায়, আমি বহু ধর্মপুস্তক ঘেঁটেছি এবং তত্ত্বকথাও অনেক পড়েছি; কিন্তু বেশ বুঝছি, শুধু ওসব পড়ে-শুনেই কিছু হয় না।'

জয়কৃষ্ণের কণ্ঠে স্পষ্ট কথা শুনে সরলহৃদয় পণ্ডিত মহাশয় চমকিত ও চিন্তান্বিত হন এবং সেই মুহূর্তেই যেন সম্বিৎ ফিরে পান, তার ফলে, নিজ জীবনব্যাপী অত পড়াশোনা এবং শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্ক সমস্তই যেন এঁর নিকট একান্তই নিষ্ফল বলে মনে হয়।

'মন্ত্রপূত বাণ যেন লক্ষ্য ভেদ করে।
তেমতি পশিল বাক্য দ্বিজের অন্তরে॥

চমকিত হইয়া ভাবে মনে মন।
নিজে বহু করিলাম শাস্ত্র আলাপন॥
কি ফল হইল তার বুঝিতে না পারি।
শাস্ত্রপাঠ মাত্র কিন্তু বস্তু নাহি হেরি॥
শাস্ত্রালাপে বস্তু নাই কি করি এখন।
শক্তি নাই আচরিতে সাধন-ভজন॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৩

বস্তুতঃ, রাজা জয়কৃষ্ণের ঐ উক্তি ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের অন্তরে এক উদ্দাম আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এঁর বিচারশীল মনে এক নতুন ভাব-চেতনার উদয় হয়। তখন ইনি ভাবেন যে,—'এতকাল আমি কেবলই নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ববিষয়ে কূট বাদ-বিসম্বাদ ক'রেছি মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এ-সবের দ্বারা আমি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সত্যবস্তুর সন্ধান বা তার কিঞ্চিৎ আভাসও পাই নি। সে পরম বস্তু লাভের জন্য এখন একনিষ্ঠভাবে যে, সাধন-ভজন ক'রব, সেরূপ উৎসাহ ও সামর্থ্য আমার নেই। অতএব এখন সে-জন্য কী করা যায়?'

'ভাবিতে ভাবিতে কথা স্মৃতিপথে আসে।
শাস্ত্রে কয় বস্তু মিলে সাধু-সহবাসে॥
তবে এবে সাধুজন পাই কোন্‌খানে।
হেনকালে শ্রীপ্রভুর নাম পড়ে মনে॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৩

পণ্ডিত মহাশয় ঐ বিষয়ে ভেবে-চিন্তে তখনই সিদ্ধান্ত করেন—'তত্ত্বদর্শী সাধু-মহাত্মার পবিত্র সহবাস ও কৃপালাভই এখন একমাত্র উপায়। কিন্তু অমন মহাপুরুষ পাওয়া যাবে কোথায়?'

যখন ঐ বিষয়ে এঁর মনে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, সে-সময় এঁর হৃদয়-আকাশে হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মহাত্মা পরমহংসদেবের কথা ভেসে ওঠে। তখন ইনি কতকটা আশ্বস্ত হন এবং অন্তরে অনেকটা বল-ভরসা লাভ করেন।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ন্যায়বাগীশ মহাশয় বহু পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম ও নানা মাহাত্ম্য-কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তাঁকে দর্শন ও তাঁর পুণ্য সঙ্গলাভের জন্য এতদিন এঁর অন্তরে তেমন আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয় নি। অবশেষে, ঘটনাক্রমে সেদিন এঁর জিজ্ঞাসু মনে তাঁরই কথা সহসা ভেসে ওঠে।

'বহু পূর্বাবধি ছিল দ্বিজের শ্রবণ।
শ্রীপ্রভু পরমহংস সাধু একজন॥
অনেক মহিমা-খ্যাতি নানাজনে রটে।
বহু লোকসমাগম প্রভুর নিকটে॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৪

[দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিতের আগমন]

পণ্ডিত মহাশয় আর কালবিলম্ব না করে, সে-দিনই উত্তরপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করেন। সেই দিনটি ছিল ১২ই ভাদ্র, ১২৯২ সাল; বৃহস্পতিবার, শ্রাবণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া; ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮৫ খৃঃ।

যা হোক, দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সময় পথে এঁর মনে, নিজ অভীষ্টসাধন বিষয়ে কত ভাব-তরঙ্গই না ওঠা-নামা ক'রতে থাকে—কখন হর্ষ, কখন বিষাদ ; কখন উত্তেজনা কখন বা অবসাদ।

'নহে অতি দূর পথ গঙ্গার ওপার।
কি কতি দেখিতে কিবা ভিতরে ব্যাপার।
এতেক ভাবিয়া দ্বিজবর ত্বরান্বিত।
মন্দিরে মধ্যাহ্নগতে হৈল উপনীত।'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৪

পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য যখন দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে উপস্থিত হন, তখন মধ্যাহ্ন সবেমাত্র উত্তীর্ণ হ'য়েছে। সেখানে পৌঁছে ইনি প্রথমে, ঐ ঠাকুরবাড়িতে পরমহংসদেব কোথায় থাকেন, সে সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেন। তারপর সেই অনুসারে অগ্রসর হ'য়ে, ইনি তাঁর ঘরে সটান জুতাপায়ে প্রবেশ করেন।

ইনি তখন দেখেন যে, সেই ঘরে ছোট খাটটির উপর একজন ব'সে আছেন—তাঁর পরনে একখানি লালপেড়ে সাদা ধুতি মাত্র ; তাঁর চেহারাও অতি সাধারণ, আর বসার ভঙ্গিমায়ও কেমন কেমন যেন একটা আলু-থালু ভাব।

'সহজ সরল ভাব বালকের প্রায়।
খট্টায় আসীনা এবে রামকৃষ্ণরায়।'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৬

পণ্ডিত মহাশয় আরও দেখেন—সেই সাধারণ মানুষটির সামনে, মেজেতে অনেকে ব'সে আছেন। তাঁরা সবাই বীরে-নম্র ও নিস্তব্ধ। তাঁদের বেশভূষা মূল্যবান ও সুরুচিসম্পন্ন ; আর চেহারাও পরিমার্জিত ও সম্ভ্রান্ত।

ইনি লক্ষ্য করেন—ঐ ঘরটিও বেশ গোছগাছ ও পরিচ্ছন্ন। দরজাগুলির চৌকাঠে ও পাল্লায় রঙ, দেওয়া ; দেয়ালগুলি চুণকাম করা এবং নানা দেবদেবীর মনোহর পটমালায় সাজানো। বড় খাটটিতে গদি আঁটা এবং ধবধবে বিছানা-চাদর বালিশ-তাকিয়া প্রভৃতি বিছানো ; আর সেই খাটের উপরিভাগে চাঁদোয়ার মত করে পরিষ্কার মশারি টাঙানো। ছোট খাটটির কাছে মেজেতে একটি পরিচ্ছন্ন পা-পোশ পাতা। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গঙ্গাজলের জালা। তার পাশে পাটাতনে নানারকমের সুস্বাদু ফল-মূল ; মিষ্টি-মণ্ডা-মিঠাই প্রভৃতি সাজানো ও ঝকঝকে জলপাত্র। উপরে শিকায় থরে থরে হাঁড়ি সাজানো। দেওয়ালের গায়ে হুঁকারাখার ঝুলি (স্ট্যাণ্ড), তাতে হুঁকা শোভিত ; হুঁকার মুখে বকুলপাতার নল বসানো। তাকের নীচের পাটাতনে সুগন্ধি তামাক, গুল, টিকে, কাঠকয়লা, কল্কি, চিম্‌টা প্রভৃতি। ঘরের পূর্বকোণে আলনায় পরিচ্ছন্ন জামা, কাপড়, চাদর, ন্যাপার প্রভৃতি পরিপাটি ক'রে সাজানো।

ঐ ঘরের পরিবেশ দেখে পণ্ডিত শ্যামাপদ বেশ ধাঁধায় পড়েন। ইনি কোথায় এবং কার কাছে এসে পড়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহান্বিত হন। কারণ, সাধু-সন্ত বা পরমহংসমহাত্মাদের জীবনযাত্রা ও বেশভূষাদি বিষয়ে এঁর এতকালের যা ধারণা, সেখানে কোথাও তার মিল খুঁজে পান না। তাছাড়া, তাঁদের চেলাদের চেহারা ও পরিচ্ছদ যেমন হওয়া উচিত, উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে সে-সবেরও কোন মিল এঁর চোখে পড়ে না। অথচ ইনি যে-ভাবে খুঁটি-নাটি খোঁজ-খবর নিয়ে ঐ ঘরে এসেছেন, তাতেও তো কোন ভুল হয় নি। সুতরাং ব্যাপারটা কি ? (ক্রমশঃ)

॥ বিংশ শতাব্দীর ধর্ম—স্বামী অভেদানন্দ ॥

অনুবাদক : শ্রীভূপতি মোহন মুখোপাধ্যায়

বিশ্বজনীন ধর্ম নাম ও রূপের অপেক্ষা রাখে না। বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রাখে এই ধর্ম। বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে এই বিশ্বজগতের উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণই হচ্ছে এক সত্তা বা অস্তিত্বমাত্র। বেদান্ত প্রপঞ্চময় বিশ্বের বিবর্তনও অনুমোদন করে এবং বিশেষ-সৃষ্টির মতবাদ বর্জন করে। বেদান্তে মহাজাগতিক ক্রমবিকাশ পদ্ধতির বিষয় বলা হয়েছে : "সেই এক সত্তা হ'তে মহাকাশ সৃষ্টি হয়েছে, মহাকাশ হতে বায়বীয় অবস্থা, বায়বীয় অবস্থা হ'তে তাপ, তাপ হ'তে তরল, অতঃপর কঠিন পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়েছে উদ্ভিদ জগৎ, অনুন্নত প্রাণীজগৎ এবং সর্বশেষে এই অনুন্নত প্রাণী হ'তেই আবির্ভূত হয়েছে প্রাণীশ্রেষ্ঠ মনুষ্য"। সুতরাং বেদান্ত প্রতিপন্ন করে যে যাবতীয় বিভিন্ন নাম-রূপ ও শক্তিসমন্বিত প্রপঞ্চময় এই জগতের উদ্ভব হয়েছে এক শাশ্বত মহাজাগতিক শক্তি হ'তে। সংস্কৃত ভাষায় এই শক্তির নাম প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতিই হচ্ছে যাবতীয় অভিব্যক্তির জননিত্রী। এই প্রকৃতি অধিভৌয় এবং বিশ্বজনীন। বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর ব্যক্তিক, নৈর্ব্যক্তিক আবার এই দুইয়ের অতীত। এই ধর্ম অনুযায়ী কোন প্রাণবীজই অকারণসম্ভূত নয়, বরং শাশ্বত। এগুলি প্রাণের শাশ্বত বীজকণিকা যা' কার্যকারণের নিয়মাধীন। এগুলি অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। প্রাণের এই বীজকণিকানিচয় স্বাধীন কার্যকারক, যাদের অবলম্বন ক'রে সুপ্তশক্তি প্রকাশ হয় মাত্র। তাই বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, মন এবং বস্তু সেই একই সত্তার অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রকাশ।

প্রাচীন যুগের সত্যান্বেষীরা যে বর্তমান যুগের মূল ভাবটি, অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং সেই এক সারবস্তু হচ্ছে বিশ্বজগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ—আবিষ্কার করেছেন, তা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এইগুলি মহত্তম সত্য। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান যখন এই সকল সত্যকে প্রমাণ করেছে এবং সনাতন সত্যগুলিকে অনুমোদন করেছে, তখন সেই সকল সত্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। কারণ, আমরা দেখি যে, বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হ'তে বিচার ক'রে সেই একই সত্যে উপনীত হয়েছেন। প্রাচীন ভারতের মহান্ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাগণ তাঁদের আত্মিক ধারণা ও সত্যদর্শন হ'তে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছেছেন ; অপরদিকে আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুগত জগৎ হ'তে আরম্ভ ক'রে সেই একই সত্যে উপনীত হয়েছে। এই দুইয়ের সমন্বয় হ'লে যথার্থ বিজ্ঞান ও যথার্থ ধর্মের মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য ঐকতান সৃষ্টি হ'বে।

কার্যের মধ্যেই কারণ নিহিত ; কারণ ও কার্য হচ্ছে একই অস্তিত্বের অমূর্ত ও মূর্ত অবস্থা। আধুনিক বিজ্ঞান সবেমাত্র এই সত্যকে আঁকড়িয়ে ধরতে আরম্ভ করেছে। ভারতবর্ষে কিন্তু অতি প্রাচীনকাল হ'তেই এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান বিশ্বজগতের বহির্বিষয়ক সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে, আর ধর্ম শাশ্বত সত্যকে উপাসনা করতে সচেষ্ট ; কিন্তু শাশ্বত সত্যের উপাসনা অবশ্যই নির্ভর করে সেই সত্য আবিষ্কারের উপর। শাশ্বত সত্যকে আমরা যদি না-ই জানি তবে কেমন করে সেই সত্যের

উপাসনা করতে পারি ? আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে যা' কিছু সামঞ্জস্যহীন, আমরা অবশ্যই তেমন প্রতিটি বিষয় দূরে সরিয়ে রাখব। সুতরাং এই ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যা' পৃথিবীর সকল ধর্মকে নিজ অঙ্গে ধারণ করেছে। এটি এমনই এক সার্বজনীন ধর্ম, আর একেই পূর্বে "নামহীন ধর্ম" বলে উল্লেখ করেছি। অন্য কোন ধর্মই কিন্তু এতখানি সার্বজনীন হ'তে পারে না ; কারণ অন্যান্য ধর্ম কম-বেশী তা'দের প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এমনিভাবে খ্রীষ্টধর্ম গড়ে উঠেছে খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে, বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধকে, মুসলমানধর্ম মুসলমানকে, আর শ্রীযুক্ত এডিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে "খ্রীশ্চিয়ান সায়েন্স" ধর্ম। যে সকল ধর্ম তা'দের প্রবর্তককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তেমন কোন ধর্মই সার্বজনীন হ'তে পারে না। কারণ, ঐ ব্যক্তির সর্বজনগ্রাহ্য না-ও হ'তে পারে। অধিকন্তু, আমরা দেখি যে, বেদান্তধর্ম কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং যে-সকল আধ্যাত্মিক অনুশাসন দ্বারা আমাদের এই আত্মিক জীবন পরিচালিত, এই ধর্ম সেই সকল অনুশাসনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বিগত পাঁচ হাজার বৎসর যাবৎ এই ধর্ম বেঁচে আছে এবং আগামী দিনেও এই ধর্ম পৃথিবীর সকল জাতির ধর্ম হ'বে। এইটি বেদান্ত ধর্ম। এই ধর্ম কেবলমাত্র মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে, এবং বিস্তারিত আলোচনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে বিজ্ঞানের উপর। এ-ধর্ম স্বীকার করে ব্যক্তি-ঈশ্বরকে পূজা করতে হয় প্রেমভক্তি দ্বারা। এ-ধর্ম শিক্ষা দেয়, ঈশ্বর এক সত্তা,—আমরা তাঁর অংশমাত্র। তারপর খ্রীষ্ট যেমন বলেছেন, "আমি আর আমার পিতা এক", তেমনি বেদান্তের অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়, "আমিই তিনি।"—আমরা সকলেই পরমাত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন,—আমাদের পৃথক পৃথক আত্মা বিশ্বব্যাপী সেই বিরাট পুরুষেরই অনন্ত অভিব্যক্তিমাত্র। তিনিই এই বিশ্বজগতের নিয়ন্তা। বিশ্বসৃষ্টি সেই অদ্বিতীয় পুরুষের সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং তাঁ'কে বলা হয় আদি নিয়ন্তা।

●

ঈশ্বর কোথায়

শ্রীঅজিতকান্তি সরকার

(কাব্যসুধানিধি)

ঈশ্বর কোথায় ?—
মন্দিরে মসজিদে মাঠে অথবা গীর্জায় !
শাস্ত্রে কয়—সর্বভূতে বিরাজে ঈশ্বর,
প্রভুর আনন্দধাম অনন্ত এ বিশ্ব-চরাচর।
কেমনে পূজিব তাঁরে—খুঁজি কোথায়—
কে দেবে সন্ধান তার ?—বুঝি না ত' হায়।
হঠাৎ অন্তর থেকে কহিলেন দয়াময় স্বামী—
হে পুত্র, এই ত' আমি।
তোমার হৃদয় মাঝে পেতেছি আসন,
আমারে পূজিছে সে-ই—'জীবে প্রেম করে যেইজন'।

●

CALCUTTA

॥ নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয় ॥

শ্রীশিবানন্দ তীর্থনাথ

হিন্দুরাজাদের রাজত্বকালে সংস্কৃত নাটক ও নাট্যাভিনয়ের চরম উৎকর্ষ ও ব্যাপক প্রসার ঘটলেও বাংলাদেশে অভিনয়ের সূচনা কবে হয়েছিল, কেমন করে হয়েছিল, কারা প্রথম এর প্রবর্তন করেছিলেন, তার উপাদানই বা কি কি ছিল, সেদিন বাঙালী-অন্তরে তা' কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল—অতীতের সেই ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির কোন্ অতল গহ্বরে! কেবলমাত্র সূচনালগ্নের ইতিবৃত্তই নয়, অবলুপ্তি ঘটেছে আদি ও মধ্যযুগের বাংলা নাট্যশিল্প ও মঞ্চকলার বিবর্তনের ইতিহাসেরও। বিগতদিনের সেই লুপ্ত ইতিহাসকে আজ আর পুনরুদ্ধার করবার নেই কোনও উপায়। তবু মেঘাচ্ছন্ন অমারাত্রির অন্ধ-তমসার বুক চিরে বিদ্যুতের চকিত হিরণ্যদ্যুতির মত কাব্যে, নাটকে ও শিল্পকর্মাদিতে মাঝে মাঝে নাটক ও অভিনয়ের যে উল্লেখ রয়েছে; তা' থেকে বাঙালীজাতির নাট্যানুরাগ ও অভিনয়প্রীতির আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসরচনার উপাদান হিসাবে এই উল্লেখগুলি যত দুর্বলই হোক্ না কেন, তথ্য ও তত্ত্বরূপে যত নগণ্য বা তুচ্ছই হোক্ না কেন, বাঙালীর নাট্যশিল্প ও মঞ্চকলার ইতিহাসরচনায় এগুলির অবদান অনস্বীকার্য।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজত্বকালে নৃত্য-গীত-অভিনয় প্রভৃতি ইসলামধর্মের পরিপন্থী বলে শাসকগোষ্ঠীর প্রবল বিরোধিতায় বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নাট্যশিল্প ও মঞ্চকলায় প্রভূত অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাট্যানুরাগ ও অভিনয়প্রীতি ছিল অসামান্য, তার পরিচয় সর্বত্র দীপ্যমান। গার্হস্থ্য নবদ্বীপলীলায় তিনি যেমন নৃত্য-গীত-অভিনয়ে অভিভূত হয়ে পড়তেন, তেমনি সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করবার পর সুদূর নীলাচলে দিব্যোন্মাদ অবস্থাতেও যেতেন আত্মহারা হয়ে। বলা বাহুল্য, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই তাঁর পার্ষদদের মধ্যে নাট্যচর্চা ও নৃত্য-গীত-অভিনয় ছিল অব্যাহত। তাঁর পার্ষদেরা অনেকেই ছিলেন বিদগ্ধ নাট্যকার ও নিপুণ শিল্পী। রায় রামানন্দের "জগন্নাথবল্লভঃ নাটকম্", রূপ গোস্বামীর "বিদগ্ধমাধবঃ নাটকম্" ও "ললিতমাধবঃ নাটকম্", কবিকর্ণপুরের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্" প্রভৃতি তারই স্বাক্ষর বহন করছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্ষদেরা কেউই বাংলাভাষায় নাটক লেখেন নি, সমস্ত নাটকই সংস্কৃতভাষায় রচিত। মনে হয়, এই নাটকগুলি রচনার পশ্চাতে একমাত্র নাট্যানুরাগই নয়, বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন প্রচার-বাসনাও সমভাবে বিদ্যমান ছিল। সেইজন্য তাঁরা যখনই নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন, তখনই আঞ্চলিক ভাষা পরিত্যাগ করে সর্বভারতীয় সংস্কৃতভাষাকেই ভাবপ্রকাশের বাহনরূপে গ্রহণ করেছেন। এখানে স্মরণ রাখতে হবে, মধ্যযুগে বাংলাদেশে বাংলা নাটক দেখা না গেলেও বৃহৎবঙ্গে আসাম নেপাল প্রভৃতি স্থানে বাংলা নাটকের প্রচলন ছিল।[১]

১। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি "বহির্বাংলায় বাংলা নাটক : নেপাল"-প্রবন্ধে, কালি ও কলম, পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৬৮ সাল।

শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ রায় রামানন্দ কেবলমাত্র একজন বিশিষ্ট নাট্যকারই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমকালীন যুগের অন্যতম কলানিপুণ প্রয়োগশিল্পী। নাটক লিখেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, সেই নাটক অভিনয় করবার জন্য শিল্পীদেরও তিনি উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে নৃত্য-গীত-অভিনয়ে পারদর্শী করে তুলতেন। এমনকি, তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার প্রসাধন-ব্যবস্থাও করতেন তিনি। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী এর সুন্দর বর্ণনা করেছেন :

"দুই দেবকন্যা হয় পরমসুন্দরী।
নৃত্যগীতে নিপুণ সেই বয়সে কিশোরী॥
তাঁহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতে শিক্ষা-আবর্তনে॥
... ...
স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সম্মার্জন॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্বাঙ্গ-মণ্ডন।
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন॥
... ...
তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সকায়ি-সাত্ত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
... ...
ভাব-প্রকটন-শান্ত রায় যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥"[২]

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ছিলেন একজন প্রতিভাবান নট ও নাট্য-পরিচালক। নৃত্য-গীত-অভিনয়ে একদিকে যেমন তিনি সকলকে অতিক্রম করে যেতেন, অন্যদিকে তিনিই ছিলেন সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্য-পরিচালক। নট-প্রতিভা ও পরিচালন-প্রতিভার এমন অপূর্ব সমন্বয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে ত' দুর্লভই, আধুনিক যুগেও বড় একটা দেখা যায় না। তিনি যখন যে চরিত্রে অভিনয় করতেন, তখন সেই চরিত্রের ভাবের দ্বারা এতদূর আবিষ্ট হয়ে যেতেন যে নিজের সত্তা পর্যন্ত তখন ফেলতেন হারিয়ে। ফলে তাঁর অভিনয়কালে অভিনেয়-চরিত্র ও অভিনেতার মধ্যেকার কৃত্রিম ব্যবধান হত অপসৃত, আসল ও নকল মিলে মিশে যেত একাকার হয়ে। যে কোনও অভিনেতার পক্ষে এইরূপ ভাবাবিষ্ট হওয়া কম কথা নয়!

২। রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত", তৃতীয় সংস্করণ, চৈতন্যাব্দ ৪৯৭, বঙ্গাব্দ ১৩৯৯, অন্ত্যলীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, শ্লোক—১১-১২, ১৫-১৬, ২০-২২, পৃষ্ঠা—২১৭-২২০, ২২৭।

পার্ষদদের নিয়ে একাধিকবার মহাপ্রভু নৃত্য-গীত-অভিনয়ের আয়োজন করেছেন নীলাচলে এবং বিপরীতধর্মী বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভাবাবেশে সুন্দর অভিনয় করেছেন :

"কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিনে নন্দ-মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তসব।
দধি-দুগ্ধ-ভার সবে নিজস্কন্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি 'হরি হরি'॥
... ...
অদ্বৈত কহে,—'সত্য কহি, না করহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ'॥
তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥
... ...
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুইপাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড়, দেখি লোক হাসে॥
অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥
... ...
বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে॥
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
... ...
'কাঁহা রে রাবণা।' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে'॥
গৌসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্বলোক 'জয়জয়' বলে বারবার॥
... ...
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশীযাত্রা দেখিল সকলি॥"[৩]

৩। ড: রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত", মধ্যলীলা, প্রথমখণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, চৈতন্যাব্দ ৪৮০, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, শ্লোক—১৮-১৯, ২৪-২৬, ৩৪-৩৭, পৃষ্ঠা—৬১০-৬১৭।

মহাপ্রভুর নাটক ও সঙ্গীতানুরাগ সম্বন্ধে অন্যত্র কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী বলেছেন,

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ।[৪]

নৃত্য-গীত-অভিনয়ের প্রতি মহাপ্রভুর এই আসক্তির কথা ছিল সর্বজনবিদিত। চৈতন্যচরিত রচয়িতারা সকলেই তা' একবাক্যে স্বীকার করেছেন ও তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কবিকর্ণপুরের নাটকে গৌরাঙ্গ-পার্ষদ গঙ্গাদাস একস্থানে বলেছেন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করতে থাকলে গৌরচন্দ্র সুমধুরকণ্ঠে গান করছেন করতালি দিয়ে, আবার গৌরচন্দ্র নৃত্য করতে থাকলে বক্রেশ্বর গান করছেন—উভয়েরই সমান আনন্দানুভূতি।

"বক্রেশ্বরে নৃত্যতি গৌরচন্দ্রো, গায়ত্যমন্দং করতালিকাভিঃ।
বক্রেশ্বরো গায়তি গৌরচন্দ্র, নৃত্যত্যসৌ তুল্যসুখানুভূতিঃ।"[৫]

নাট্য-পরিচালক হিসাবেও মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দক্ষতা ছিল অসামান্য। নাটক পরিচালনা করতে হলে পরিচালকের যে যে গুণ থাকা প্রয়োজন, সেই সেই গুণাবলীর আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। অভিনেতাদের ব্যক্তিগত চরিত্রানুযায়ী ভূমিকা-বণ্টনে, অভিনয়ে চরিত্রোপযোগী সাজ-পোষাক ও অঙ্গসজ্জার দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুতিতে, বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকীয় গতি সৃষ্টিতে—সর্বত্রই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলাদেশে সুলতানী আমলে হোসেন শাহের রাজত্বকালে নবদ্বীপলীলায় সপার্ষদ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁর মেসোমশাই আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের গৃহাঙ্গণে যে নাট্যাভিনয় করেছিলেন, সমগ্র মধ্যযুগে এত বিস্তৃত অভিনয়-বর্ণনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাংলা নাট্য-শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই বর্ণনা শিবরাত্রির সলতের মত একক মহিমায় অম্লান জ্যোতিতে দীপ্যমান। নাটক এর আগেও ছিল; বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে তার অভিনয়েরও যে প্রচলন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিত্যানন্দের বাল্যকালের ভাবাবেশপূর্ণ অভিনয়লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্বে দশরথবেশী এক অভিনেতার অপূর্ব অভিনয়-দক্ষতার উল্লেখ করেছেন বৃন্দাবনদাস। রাম-বনবাসের পর অভিনয় করতে করতে রাম-বিরহজনিত শোকে অধীর হয়ে ভাবাবেশে তিনি দেহত্যাগ করেন।[৬] কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এর বেশী অভিনেতার পরিচয় বা অভিনেয় নাটক সম্বন্ধে জানবার উপায় নেই। শ্রীগৌরাঙ্গ-সকলেই নয়, এমন কি বাংলাভাষা ও সাহিত্য যখন সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে নি, সেই উদ্ভবকালের সান্ধ্যভাষাতেও

৪। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত", মধ্যলীলা, প্রথমখণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, শ্লোক—৮৯, পৃষ্ঠা—৮৮।

৫। মহীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্", চতুর্থাঙ্ক, পৃষ্ঠা—১২৬।

৬। ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত "শ্রীচৈতন্যভাগবত", আদিখণ্ড, আষাঢ়, ১৩৭৩ সাল, ১৮৮৮ শকাব্দ, ৪৮১ চৈতন্যাব্দ, জুন, ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ, ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক—২৬৯, পৃষ্ঠা—২২৪।

বাঙালীজাতির নাট্যপ্রীতি ও অভিনয় প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়।[১] কিন্তু কেবলমাত্র উল্লেখ ব্যতীত সেই নাটকগুলি ও তাদের অভিনয় সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমকালে ও অব্যবহিত পরবর্তীকালে রচিত দুটি সংস্কৃত ও একটি বাংলা গ্রন্থে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহাঙ্গনে তাঁর অভিনয়ের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত গ্রন্থ দুইখানি রচনা করেছেন মুরারি গুপ্ত ও কবিকর্ণপুর এবং বাংলা গ্রন্থটি লিখেছেন বৃন্দাবন দাস। মুরারী গুপ্ত ছিলেন মহাপ্রভুর পার্ষদ, নবদ্বীপলীলার একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের অনেক ঘটনারই তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ দর্শক, আলোচ্য অভিনয়েরও তিনি ছিলেন একজন অভিনেতা। সেইজন্য তাঁর রচিত প্রথম চৈতন্যজীবনীকাব্য "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্"-এ বাস্তব ঘটনার স্পর্শ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি "মুরারী গুপ্তের কড়চা" নামেও প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ কবিকর্ণপুরের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্"। কবিকর্ণপুর কিন্তু নাম নয়, উপাধি ; তাঁর নাম হল পরমানন্দ সেন। নীলাচলে মহাপ্রভু-পার্ষদ শিবানন্দ সেনের তিনি তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যকালে পুরীধামে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন বলে তাঁকে বলা হত পুরীদাস। দশ অঙ্কে বিভক্ত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্" কালীমিশ্রের বিখ্যাত সংস্কৃত রূপক-নাটক "প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্"-এর আদর্শে রচিত। মানবজীবনে মৈত্রী ও প্রেমাভক্তির প্রাধান্য দেখাতে গিয়ে নাট্যকার নাটকটিতে রূপকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এরই ফলে নাটকটি হয়ে উঠেছে মূলত রূপকধর্মী এবং সংঘাতমুখর বাস্তবজীবন থেকে সরে এসেছে অনেকটা। তবু প্রথম চৈতন্যজীবননাট্য হিসাবে এর মূল্য অপরিসীম। বাংলা গ্রন্থটি হল বৃন্দাবন দাসের "শ্রীচৈতন্যভাগবত" কাব্য। কাব্যটি বাংলাভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনের কেবল প্রথম আকর গ্রন্থই নয়, সমগ্র চরিত-কাব্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে এটি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থটি এতদূর সমাদৃত যে এই কাব্যকে বলা হয় "শ্রীমদ্ভাগবতম্" মহাকাব্যের ন্যায় অমৃততুল্য এবং কবিকে মহাকবি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সঙ্গে তুলনা করে অভিহিত করা হয় "ব্যাসাবতার মহাকবি" অভিধায়। বৃন্দাবন দাস ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীবাস আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর পুত্র। নারায়ণী দেবী ছিলেন মহাপ্রভুর আশীর্বাদ-ধন্যা, নবদ্বীপলীলার সাক্ষী। সন্ন্যাস অবলম্বন করে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরই বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অবধূত নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য। বাল্যকালে তিনি মহাপ্রভু-পার্ষদ ও মহাপ্রভুর সমসাময়িক অনেক ব্যক্তিরই নিকটসান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। সেইজন্য প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও তিনি সকলের কাছ থেকে শ্রীগৌরাঙ্গজীবনের বহু তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনীর সমাবেশের ফলে তাঁর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব যথাযথ রূপ লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

মুরারী গুপ্তের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্" কাব্যের দ্বিতীয় প্রক্রমের পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গে, কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেনের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্"-এর তৃতীয় অঙ্কে

১। সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকদের রচিত "চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়"।

এবং বৃন্দাবন দাসের "শ্রীচৈতন্যভাগবত" কাব্যের মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভিনয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মুরারী গুপ্তের সূত্রাকারে রচিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সঙ্গে বৃন্দাবন দাসের বিস্তৃত বর্ণনার বহুলাংশে মিল থাকলেও কবিকর্ণপুরের রচনার সঙ্গে বিশেষ কোনও মিল নেই, অধিকন্তু অভিনেয় নাটক, চরিত্র ও অভিনেতাদের নামের তালিকায় বিরাট পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই পার্থক্য সম্বন্ধে প্রধানত চারটি কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে।

। এক। মুরারী গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস উভয়েই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনকাহিনীকে ভিত্তি করে জীবনী রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথমজনের কাব্যে যা' সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত, দ্বিতীয়জনের কাব্যে তা' বিষদভাবে চিত্রিত। কিন্তু কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর জীবনকে আশ্রয় করে লিখলেও তা' নিছক জীবনীগ্রন্থ মাত্র নয়, ভাগবতী-তনু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অলৌকিক জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। কাব্য ও নাটক এক নয়। নাটক রচনায় নাট্যকারের কিছু কিছু স্বাধীনতা সর্বজনস্বীকৃত। নাটকের প্রয়োজনে নাটকীয় গতি সৃষ্টি করতে নাট্যকার কাহিনী-বিন্যাস, ঘটনা-চয়নে ও চরিত্র-চিত্রণে ইচ্ছানুযায়ী অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। সাধারণতঃ জীবনীলেখকের সে অধিকার নেই। কাহিনী ও চরিত্র অবিকৃত রেখেই তাঁকে জীবনী রচনা করতে হয়। সেইজন্য কবিকর্ণপুরের রচনায় কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব নয়।

। দুই। মুরারী গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস দুজনেরই কাব্য জীবনীকাব্য বা চরিতকাব্য। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ঘটনাবহুল জীবনেতিহাসের লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা করাই কাব্য দুটির অন্যতম লক্ষ্য—বিশেষ কোনও তত্ত্বকথা প্রচার-বাসনা নয়। তত্ত্বকথা আছে বটে, কিন্তু তা' এসেছে জীবনকাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে। সেইজন্য জীবনী এখানে মুখ্য, তত্ত্বকথা গৌণ। কিন্তু কবিকর্ণপুরের নাটকে তত্ত্বকথার প্রাধান্য ঘটেছে। তত্ত্বকথাকে মূল উপজীব্য করে তিনি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপ্রাকৃত জীবনের লীলা-কাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন। কেন না, তাঁর নাটক, সাধারণ জীবনী-নাটক বা চরিত-নাটক বলতে আমরা যা' বুঝি, তা' নয়। পূর্বেই বলেছি, নাটকটি মূলত রূপকধর্মী। বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে বিশেষ বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি বিভিন্ন রূপকের সাহায্যে নাটকটি রচনা করেছেন। এইভাবে তত্ত্বকথা প্রাধান্যলাভ করায় জীবনী বহুলাংশে হয়ে পড়েছে গৌণ। ফলে কবিকর্ণপুরের নাটকে কাহিনীগত অল্প-স্বল্প বিকৃতি দেখা গেলে আশ্চর্য হবার কোনও কারণ নেই।

। তিন। মুরারী গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস উভয়েই নবদ্বীপবাসী। প্রথম ব্যক্তি এই অভিনয়ের একজন প্রত্যক্ষদর্শক ও অভিনেতা। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষদর্শী

না হলেও স্বীয় পরিবারের ও সমকালীন বহু লোকেরই মুখে এঁর কথা শুনেছিলেন। সেইজন্য তাঁদের রচনায় তথ্যগত কোনও বিভ্রান্তি থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর আশীর্বাদধন্য হলেও থাকতেন নবদ্বীপ থেকে অনেকটা দূরে কাঁচড়াপাড়ায়। নবদ্বীপলীলা তিনি নিজের চোখে দেখেন নি, শুনেছেন অপরের কাছে। শোনা কথা ও চোখে দেখার পার্থক্যের জন্যও হয়ত বা তাঁর রচনায় তথ্যগত কিছু কিছু ভ্রান্তি থাকতে পারে।

। চার। হয়ত বা মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহাঙ্গণে একাধিকদিন অভিনয় করে থাকবেন। মুরারী গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস তার একটি দিনের উল্লেখ করেছেন, কবিকর্ণপুর অপর দিনের কথা বলেছেন। এভাবে আলোচনা করলে তিনটি গ্রন্থেরই বিষয়বস্তুকে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে বটে, তবু সন্দেহ জাগে যিনি পার্ষদ ও লীলাসহচর অভিনেতা মুরারী গুপ্তের কাব্যে এর কোনও কথা নেই বলে। যাইহোক, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভিনয় কাহিনী বিবৃত করতে আমি প্রথমে মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থদুটি অনুসরণ করেছি। পরে কবিকর্ণপুরের নাটকের আলোচনা করব।

[ক্রমশঃ]

●

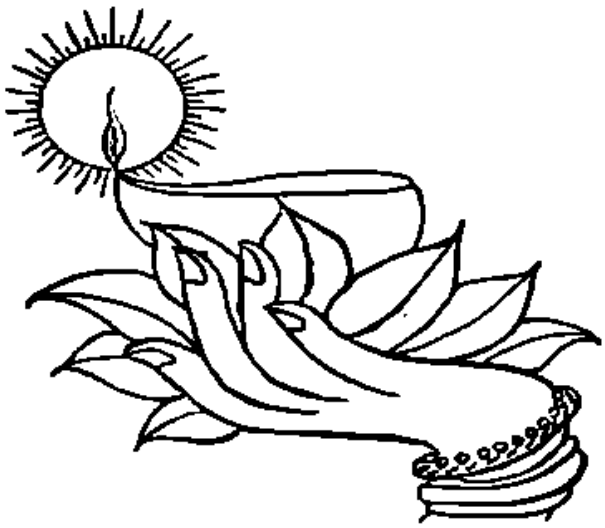

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

য়ুরোপীয় শিল্পকলার বিভিন্ন দিক : মাইয়োলিকা প্রসঙ্গে

(তিন)

ইতালীতে মাইয়োলিকার উদ্ভব সম্বন্ধে চীনের সঙ্গে একটি যোগসূত্রের সম্ভাবনার কথা কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বিবেচনা করেছেন। এঁরা মনে করেন, চীনা পোর্সিলেনএর অনুসরণ করতে গিয়েই ইতালীয়ান সিরামিকশিল্পীরা মাইয়োলিকা তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো দূরপ্রাচ্য পর্যটন করে স্বদেশে ফিরে আসেন ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে। মার্কো পোলো ছিলেন ইতালীর ভেনিস নগরের বাসিন্দা। ভেনিসএর শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ এবং অভিজাত ধনাঢ্য মহলে মার্কো পোলো বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে, মার্কো পোলো চীন সফরকালে স্থানীয় শিল্পকলার নিদর্শন কিছু কিছু সংগ্রহ করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে সেগুলো সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। চৈনিক পোর্সিলেনএর অন্ততঃ কয়েকটি নমুনা যে ওইসব শিল্পনিদর্শনের মধ্যে ছিলো—এটা সহজেই ভাবা যায়। তৎকালীন ভেনিসএর অভিজাতমহলে দূরপ্রাচ্যভ্রমণের কাহিনী বর্ণনাকালে প্রাচ্যদেশীয় শিল্পকলার অন্যান্য নিদর্শনের সঙ্গে চৈনিক চিত্রিত পোর্সিলেনএর সংগ্রহ মার্কো পোলো অবশ্যই দেখিয়ে থাকবেন। য়ুরোপীয় শিল্পকলার ইতিহাসপাঠে জানা যায়, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দেই য়ুরোপের কয়েকটি প্রধান শহরে চৈনিক পোর্সিলেনপাত্র, ফুলদানি, পুতুল ইত্যাদি প্রাপ্ত সংস্কৃতি এবং শিল্পকলার অতুলনীয় নিদর্শনরূপে পরিচিত ছিলো। এই পরিচিতি, মনে হয়, মার্কো পোলো তথা ভেনিসএর অভিজাত মহলের মারফতেই য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে প্রচারিত হয়েছিল।

পনেরোশো খৃষ্টাব্দের মধ্যেই য়ুরোপ এবং দূরপ্রাচ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন সুরু হয়ে যায়। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী পনেরোশো খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে কোনো ইতালীয়ান বণিক মারফৎ চৈনিক পোর্সিলেনএর কিছু নিদর্শন ইতালীর কারেনজা নগরীতে এসে পৌছায়। নগরের অভিজাতমহলে ওই পোর্সিলেনএর নমুনাগুলো বিশেষ সাড়া জাগিয়ে তুললো।

সিরামিকপাত্র যে ওইরকম ধবধবে সাদা, হালকা ওজনের, বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত এবং সর্বোপরি ঈষৎ স্বচ্ছ (translucent) হতে পারে—এ ছিলো তাঁদের ধারণার বাইরে। কারণ তখনও পর্যন্ত য়ুরোপে শিল্পিত সিরামিক্স্‌এর নিদর্শন তৈরী হচ্ছে কেবলমাত্র সাধারণ মাটির মণ্ডে অথবা কায়ার ক্লে, কোয়ার্টজ্‌ ও ফেল্‌স্‌পারচূর্ণ মিশ্রণের ষ্টোনওয়্যারজাতীয় মাটির মণ্ডে। ফায়েনজা-র অভিজাত শিল্পরসিকমহল চৈনিক পোর্সিলেনএর নিদর্শনগুলো দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা স্থির করলেন, ওই ধরণের সিরামিক্স্‌ ফায়েনজাতেই তৈরী করাতে হবে। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় সিরামিকনির্মাতারা চৈনিক পোর্সিলেনএর অনুরূপ সিরামিক্স্‌ তৈরীর চেষ্টা সুরু করে দিলেন। কিন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ফায়েনজা-র সিরামিকনির্মাতারা চৈনিক পোর্সিলেনএর অনুরূপ সিরামিক্স্‌ নির্মাণে সক্ষম হলেন না। এর কারণ হলো এই যে, পোর্সিলেনজাতীয় মিশ্রিত মাটির মণ্ডের অন্যতম প্রধান উপাদান কেওলিন (kaolin) অথবা চীনামাটির রহস্য তাঁদের কাছে ছিলো অজ্ঞাত। পোর্সিলেন তৈরী করা সম্ভব না হলেও ফায়েনজা-র সিরামিকনির্মাতাদের নিরলস প্রচেষ্টায় একধরণের সাদা আবরণমণ্ডিত সাধারণ মাটিতে তৈরী সিরামিকপাত্রনির্মাণের সূত্রটি আবিষ্কৃত হয়ে গেলো। এই সাদা রঙএর সিরামিক-আবরণটির নাম এনগোব্‌ (engobe)। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণ মাটির মণ্ডে তৈরী সিরামিকপাত্রের সাদা অথবা রঙীন আবরণরূপে যে-এনগোব্‌ ব্যবহার করা হয়ে থাকে—সেই এনগোব্‌এর অন্যতম প্রধান উপাদান হলো কেওলিন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে পনেরোশো খৃষ্টাব্দের ইতালীয়ান সিরামিকনির্মাতাদের কাছে কেওলিনএর রহস্য ছিলো অজ্ঞাত। তাহলে ফায়েনজা-র তৎকালীন সিরামিকনির্মাতারা যে-এনগোব্‌ তৈরী করলেন—তাতে কেওলিনএর বদলে অপর কোন্‌ উপাদান ব্যবহৃত হয়েছিলো? মনে হয়, ফায়েনজা-র তৎকালীন সিরামিকনির্মাতারা তাঁদের তৈরী সাদা এনগোব্‌এর মিশ্রণে কেওলিনএর পরিবর্তে ব্যবহার করেছিলেন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কায়ার ক্লে—যাতে লৌহকণিকার অবস্থিতি প্রায় ছিলোনা বললেই চলে। এই এনগোব্‌এর মিশ্রণে কায়ার ক্লে ছাড়াও অন্যান্য উপাদানের মধ্যে সম্ভবতঃ ছিলো ফেল্‌স্‌পার, কোয়ার্টজ এবং মারবেল পাথরের চূর্ণ। উল্লিখিত এনগোব্‌ আবিষ্কারের পেছনে ফায়েনজা-র সিরামিকনির্মাতাদের যে নিরলস প্রচেষ্টা এবং আয়াসসাধ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিলো—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গ্লেজএর সঙ্গে এনগোব্‌এর তফাৎ হচ্ছে এই যে, গ্লেজ যেমন ভাঁটির যথোপযুক্ত উত্তাপে গলে গিয়ে ঠাণ্ডা হবার পর সিরামিক্স্‌এর গায়ে গলিত কাঁচের আবরণের মতো লেগে থাকে, এনগোব্‌ও তেমনি সাদা অস্বচ্ছ আবরণের মতো সিরামিকএর গায়ে লেগে থাকে বটে, কিন্তু গ্লেজএর মতো দৃঢ় কিংবা স্থায়ীভাবে নয়। যে-তাপাঙ্কে গ্লেজ সম্পূর্ণভাবে গলে যায়—সে-তাপাঙ্কে এনগোব্‌ কিন্তু গলেনা। এনগোব্‌স্থিত দুটি উপাদান কোয়ার্টজ এবং ফেল্‌স্‌পার গ্লেজএর গলনাঙ্কের তাপমাত্রার সামান্যমাত্র গলে গিয়ে একটু নরম হয় এবং এনগোব্‌স্থিত তৃতীয় উপাদান কায়ার ক্লে অথবা কেওলিনএর আবরণটিকে সিরামিকপাত্রের ওপর ধরে রাখে। ওই তাপমাত্রায় কায়ার ক্লে অথবা কেওলিন মোটেই গলেনা কিংবা নরমও হয়না। এনগোব্‌-মণ্ডিত সিরামিকপাত্রের ওপর স্বচ্ছ গ্লেজ

লাগিয়ে তা যথোপযুক্ত উত্তাপে ভাঁটিতে পোড়ালে ওই গ্লেজএর আবরণ এনগোব্‌এর প্রলেপকে ধরে রাখে সিরামিকপাত্রের গায়ে। ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন ধরণের সিরামিক মণ্ড এবং গ্লেজএর সংকোচন একেক রকমের হয়ে থাকে। কোনো সিরামিকমণ্ডে তৈরী সিরামিকস্‌এ ব্যবহার্য গ্লেজএর সংকোচন যদি ওই সিরামিকমণ্ডের সংকোচনের অনুরূপ না হয়, তবে ভাঁটিতে পোড়াবার পর ঠাণ্ডা হলে ওই গ্লেজএর আবরণে অবশ্যই চিড় ধরে যাবে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওই গ্লেজ টুকরো টুকরো হয়ে সিরামিকস্‌এর গা' থেকে উঠে আসতে পারে। গ্লেজএর চিড় ধরাকে Crazing এবং টুকরো হয়ে উঠে আসাকে Chipping বলা হয়। এনগোব্‌স্থিত কোয়ার্টজ এবং ফেলস্‌পারএর সংকোচন যদি সিরামিকমণ্ডের সংকোচনের অনুরূপ না হয়, তবে গ্লেজএর মতোই এনগোব্‌এ-ও ওই একই রকম crazing এবং chipping ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। সহজেই অনুমান করা যায়, একই তাপাঙ্কে সিরামিকমণ্ড এবং এনগোব্‌এর সামঞ্জস্যপূর্ণ সংকোচন নির্ধারণ করতে হলে বেশ কয়েকবার পরীক্ষানিরীক্ষার পরই তা সম্ভব হতে পারে। বর্তমানকালে কারিগরী এবং প্রয়োগবিজ্ঞানের উন্নত অবস্থায় আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত পরীক্ষাগারে এ-ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজ অপেক্ষাকৃত সহজ বলে মনে হলেও প্রায় পাঁচশো বছর আগে—অর্থাৎ পনেরোশো খৃষ্টাব্দে এ-ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছুটা দুরূহ এবং আয়াসসাধ্যই ছিলো। সেকালের সীমিত ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইতালীয় সিরামিকশিল্পীদের এনগোব্‌ তৈরীর প্রচেষ্টায় সাফল্য অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। সাদা রঙএর এনগোব্‌ আবিষ্কারের ফলেই সাধারণ মাটিতে তৈরী সিরামিকস্‌এর ওপর সাদা জমি তৈরী করে ওই জমিতে বিভিন্ন সিরামিক-রঙ-এ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে নকশা আঁকা সম্ভব হলো। এনগোব্‌এর সাদা জমিতে নকশা অথবা চিত্র এঁকে সিরামিকপাত্র স্বচ্ছ গ্লেজএ ডুবিয়ে ভাঁটিতে পোড়াবার পর যখন বের করে আনা হতো, তখন ওইটিকে পোর্সিলেনএর সঙ্গে নিকট-সাদৃশ্যযুক্ত বলেই মনে হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃষ্টিবিভ্রম জাগাতে সক্ষম হলেও এনগোব্‌মণ্ডিত সাধারণ মাটিতে তৈরী সিরামিকস্‌কে যেমন কারিগরী সংজ্ঞা অনুযায়ী পোর্সিলেন বলা চলেনা, তেমনই কারিগরী সংজ্ঞা অনুযায়ী এ-ধরণের সিরামিকস্‌ (এনগোব্‌-মণ্ডিত)-কে মাইয়োলিকা অথবা ফায়েন্‌স্‌ও বলা চলেনা। কিন্তু কোনো কোনো পুরাতাত্ত্বিক তাঁদের রচনায় এনগোব্‌মণ্ডিত প্রাচীন সিরামিকস্‌এর নিদর্শনকে কখনো কখনো মাইয়োলিকা অথবা ফায়েন্‌স্‌ নামে অভিহিত করেছেন। কেউ কেউ বা গ্লেজযুক্ত যে কোনো প্রাচীন সিরামিকস্‌কেই বলেছেন ফায়েন্‌স্‌। যেমন, ইতালীয়ান ঐতিহাসিক সারজিয়ো বোস্‌টিক্কো প্রাচীন মিশরের সিরামিকস্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একজায়গায় বলছেন, 'During the New Kingdom (1580—950 B. C.) the glazed ware often called 'faience' played an important role'. য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে এনগোব্‌মণ্ডিত সিরামিকস্‌ 'মেজা মাইয়োলিকা' নামে পরিচিত হলেও ইতালীতে কিন্তু এ-ধরণের সিরামিকস্‌কে বলা হয় 'বিয়ান্‌চেটো'।

—দিবাকর সেনরায়

॥ সংঘ-বার্তা ॥

॥ শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১২৭তম জন্মোৎসব ॥

গত ১০ই ডিসেম্বর পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১২৭তম জন্মোৎসব যথোচিত মর্য্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে। প্রত্যূষে বিশেষ পূজা, হোম ও মঙ্গলারাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় এক সাধারণ-সভায় সভানেতৃত্ব করেন, ডঃ রমা চৌধুরী এবং প্রধানা অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ডঃ উমা রায়। সভায় মায়ের জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু।

ডঃ রায় তাঁর ভাষণে শ্রীশ্রীমাকে আদ্যাশক্তিস্বরূপা বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে-শক্তি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে শ্রীশ্রীমা হলেন সেই শক্তি। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই সবসময়ই সেই মহাশক্তি কাজ ক'রে চলেছে। অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ, শ্রীশ্রীঠাকুর কর্তৃক বিবাহের পাত্রীরূপে শ্রীশ্রীমায়ের খবর দেওয়া, স্বামী অভেদানন্দ কর্তৃক সরস্বতীরূপে বর্ণনা, জয়রামবাটিতে বগলারূপে দুষ্টের দমন, দুর্গারূপে গিরিশঘোষের বাড়ীতে গমন, ষোড়শীরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা গ্রহণ, শ্রীশ্রীঠাকুর-কর্তৃক ভবতারিণীরূপে শ্রীশ্রীমাকে বর্ণনা, দক্ষিণেশ্বরে শক্তিরূপে আগমন, হাতের বালা খুলবার সময় ঠাকুর কর্তৃক তা-না করতে নির্দেশ, সর্বোপরি এক মহাশক্তিরূপে রামকৃষ্ণ মিশনকে গড়ে তোলা—এই সবের মধ্যেই আমরা সেই একই মহাশক্তির প্রকাশ দেখতে পাই।

ডঃ চৌধুরী বলেন শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সবটুকু সার একটি পরিপূর্ণ প্রাণে। মায়ের স্নেহের কোন তুলনাই হয় না। আমাদের সৌভাগ্য আদ্যাশক্তি, জগদেশ্বরী, ভগবতী মা একজন সামান্যা নারীরূপে আমাদের মা-রূপে এই ধূলিধূসরিত মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁকে বোঝা সহজ নয়। তিনি কৃপা ক'রে তাঁর সন্তানদের মুখে ভাষা দিয়েছেন তাই তাদের লেখা থেকে আমরা শ্রীমাকে কিছুটা জানতে চেষ্টা করতে পারি। অহেতুকী করুণার মূর্তি শ্রীশ্রীমা। আমরা যদি তাঁর আদর্শে কর্ম করি তবে আমরা তাঁর করুণা পাব। সূর্য যেমন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কিরণ দান করেন, মার কাছেও তেমনি ছিলনা কোন ভেদাভেদ। বিশেষতঃ সাধারণ মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগাতেই যেন তিনি এসেছিলেন—তাই বুঝি তাঁর অতি সাধারণ বেশ।

সুখে-দুঃখে সর্বদাই আমরা ভাববো—আমাদের মা আছেন। শেষের দিনে যা বলবো—মা তুমিই সব, তুমিই সব—আজও তাই বলবো—আর তা বলবো সারাজীবন। তবেই আমাদের শান্তি ও আনন্দ আসবে।

সভায় শান্তিপাঠ করেন স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ, ধন্যবাদ জানান স্বামী পরমাত্মানন্দ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী আলো বসু।

●

লব্ধপ্রতিষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া— কুষ্ঠ-কুটীর

সর্ব্বজনসমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

অসাড়কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসালয়ে অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত রোগের জন্য যাঁহারা সর্বচিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর পি, বি, ৭, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৫৯)

শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। গৌরাঙ্গকথা (১ম—৩য়) ১ম খণ্ড ৪·০০ ২য় খণ্ড ৪·০০ ৩য়-৫·০০
৩। চণ্ডীচিন্তা ৪·০০
৪। উদ্ধব-সন্দেশ ৫·০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতম ১০ম স্কন্ধ (২য়-৪র্থ) ৫২·৫০
৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ ৫·০০
৭। উপনিষদ্-ভাবনা (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫১, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিউবুলেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট স্থগার-অফ্-মিল্কবোলে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র মাতৃভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০
(মূল অবয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-মর্ম ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ২০·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৪·০০

নিষ্কামী ধর্মশিক্ষা ৪·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ৫·০০

বীরত্বে বাঙালী ৪·০০

বিজ্ঞানে বাঙালী ৮·০০

বাংলার ঋষি ৩·৫০

বাংলার মনীষী ৩·০০

বাংলার বিদুষী ৪·০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization		Why a Hindu Accepts Christ and	
Philosophy and Religion		Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	8·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I - III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISWAVANI

R. N. 13733 57
41st Year. January 1980
VOL. XI

Regn. No. WB/NC-141
PHONE : 55-1800

18 JAN 1980

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

কুক্‌মী
ভারতের সেরা
গুঁড়া মশলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুক্‌মী প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিঃ
৯৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭
ফোন-৩৩-০১১৫

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

PRICE Rs. 1·50
Ramakrishna Vedanta Math.
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006.
মূল্য ১·৫০ টাকা

স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ
দ্বাদশ সংখ্যা
মাঘ
১৩৮৬

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা সাথে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি. রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

দুলালের তালমিছরী

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও তদ্ভবপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	১৫·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	প্রকাশের অপেক্ষায়	স্তোত্র-রত্নাকর	
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান.	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৫·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৫·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৪৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

স্বাস্থ্যকীয় সেভেন্স সীতারাম

ডাঃ সেনেক্স

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৫৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।
১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০ নং বিধান সরণী, হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

GRAM : PURNIDRESS ESTD. 1930 PHONE : 33-4632

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

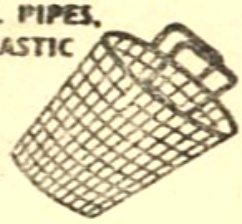

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি ৬

ফোন: ৩৫- ৩৭৩১

কেশগুচ্ছে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৪৪-১৮০০

শ্রাবণ, ১৩৮৬

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১১ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ :
শ্রীকুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাক ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায়। –

• স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস সৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিমলকৃষ্ণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল চার ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street, Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১১৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

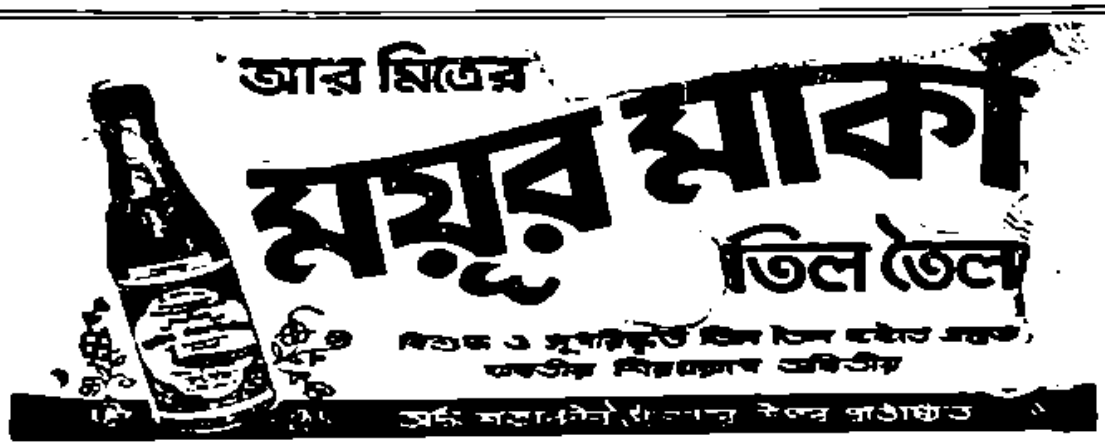

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা—৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

মাঘ, ১৩৮৬

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৫১৫	
২।	কীর্তনে নর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ	৫০২	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	৫০৭	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৪।	শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য ভবনাথ	৫০৯	ব্রহ্মচারী প্রণবচৈতন্য
৫।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ	৫১২	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৬।	জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের বলাসখা	৫১৭	শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
৭।	শিবরাত্রি গীতি-আলেখ্য	৫১৮	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৮।	বিংশ শতাব্দীর ধর্ম— স্বামী অভেদানন্দ (অনুবাদ)	৫২৫	শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৯।	নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয়	৫২৭	শিবানন্দ তীর্থনাথ
১০।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্প-সমালোচনা	৫৩২	
১১।	গ্রন্থ-সমালোচনা	৫৩৫	
১২।	সংঘ-বার্তা	৫৩৬	
১৩।	বর্ষসূচী	৫৩৭	

বেনারসী জিন্স সাড়ী পোষাক

শৈলেন্দ্রলাল মণিলাল ষ্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট - কলি:১২
(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)
বহুবাজার ৩৫-৮৬৩৭ ○ শ্যামবাজার ৫৫-২০০৭

কাশ্মিরী শাল বিছানা হোসিয়ারী

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক
শান্তিরস সালসা
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং
ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে বাত বেদনায় অব্যর্থ
সর্বত্র প্রাপ্তব্য
৪০২/৭এ, আপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট।

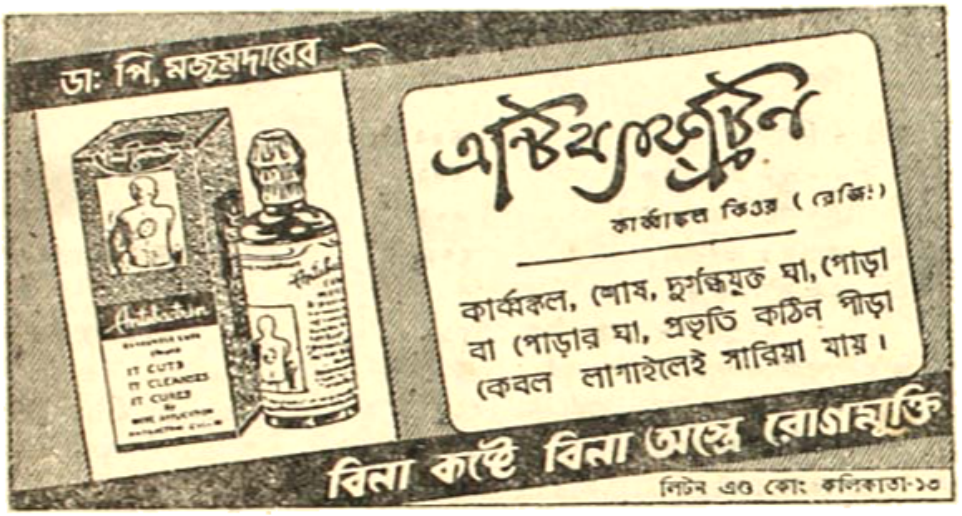

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

89, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

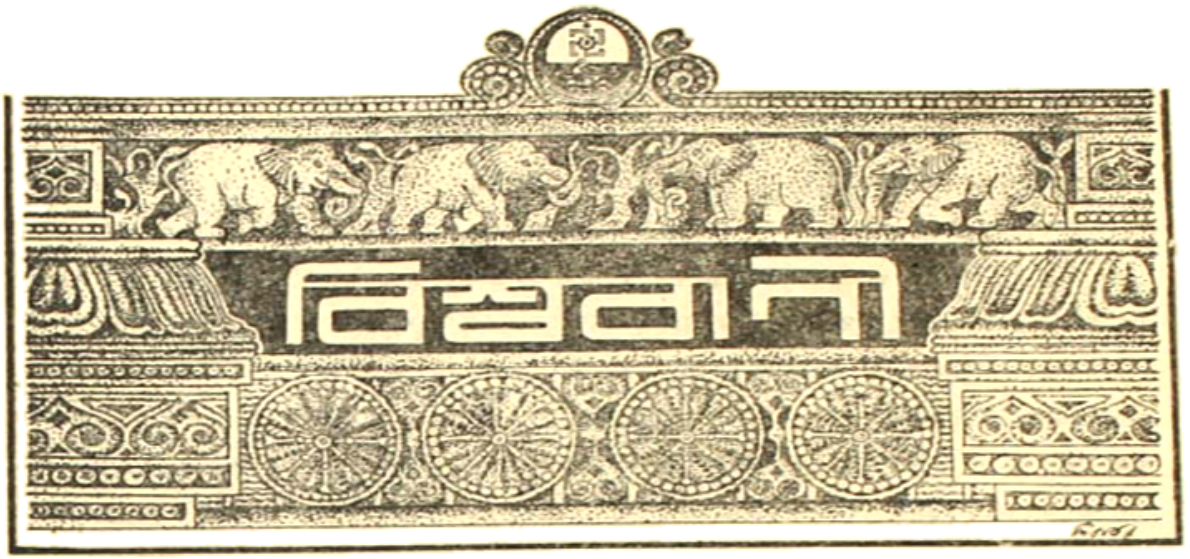

একচল্লিশ বর্ষ | দ্বাদশ সংখ্যা | মাঘ ১৩৮৬

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ রামের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

(দ্বিতীয়াংশ)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিভিন্ন অবস্থায় ও বিচিত্র প্রসঙ্গের সময়ে সমাধি হ'ত। সমাধি সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত, বা সবীজ ও নির্বীজ, বা সবিকল্প ও নির্বিকল্প। সমাধি-সম্বন্ধে যোগদর্শনে (পাতঞ্জলদর্শনে) ঋষি পতঞ্জলি বিশেষভাবে পরিচয় দিয়েছেন, আর বলেছেন তাঁর ভাষ্যকাররা। তন্ত্রশাস্ত্রে ও অন্যান্য যোগশাস্ত্রেও বিভিন্ন রকম সমাধির কথা আছে। ধর্মমেঘসমাধি, জড়সমাধির কথাও আছে পাতঞ্জলদর্শনে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে আরও বিভিন্ন অবস্থার সমাধি ও তার লক্ষণ সকলে চাক্ষুষভাবে লক্ষ্য করেছেন। বসে এবং দাঁড়িয়েও তার (শ্রীরামকৃষ্ণের) সমাধি হ'ত। ভাবসমাধি মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে হ'তই। এখানে দাঁড়ানো-অবস্থাতেই তিনি সমাধিস্থ হলেন। তবে একথা মনে রাখা উচিত যে, সমাধি যোগসাধনার চরম ও পরম-অবস্থা—তা সে সবিকল্প হোক, আর নির্বিকল্পই হোক। অবশ্য নির্বিকল্প বা নির্বীজ-সমাধি একেবারে শেষের কথা। অদ্বৈতবেদান্তসাধনায় সমাধির প্রসঙ্গ আচার্য শঙ্করের সময়ে থাকলেও[১] বেদান্তের বাধসমাধি ও যোগের লয়সমাধি ঠিক একরকম বা সমান নয়। অদ্বৈতবেদান্তের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং যোগদর্শনের ধারণা, ধ্যান ও সমাধির

১। বেদান্তের প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারীরা বিভিন্ন যোগেরও উদাহরণ দিয়েছেন অধ্যাত্মসাধনার বিষয়বস্তু জানার জন্য।

অবস্থা ও প্রকৃতিসম্বন্ধে পূর্বেও আমরা কিছু আলোচনা করেছি। 'বেদান্তসার'-গ্রন্থের 'বালবোধিনী'-টীকাকার আপোদেব বলেছেন : 'ধ্যানধারণাসমাধিত্রয়ং মনোবিষয়ত্বাৎ সম্প্রজ্ঞাত-সমাধেঃ অন্তরঙ্গম্—যমাদিকং তু বহিরঙ্গম্', অর্থাৎ যোগের ধ্যান-ধারণা-সমাধি সম্প্রজ্ঞাতসমাধির অন্তরঙ্গসাধন, আর যম-নিয়ম-প্রাণায়ামাদি বহিরঙ্গসাধন। সবিকল্পসমাধিতে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই ত্রিপুটি থাকে, এজন্য অখণ্ড-ব্রহ্মবস্তুতে চিত্ত বা চিত্তবৃত্তি একীভূত (লয়) হলেও আনন্দের আস্বাদন (দ্বৈতভাব) থাকে—'সমাধ্যারম্ভসময়ে সবিকল্পকানন্দাস্বাদনম্', কিন্তু নির্বিকল্প বা নির্বিকল্পক-সমাধিতে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় (ত্রিপুটি) থাকে না—'নির্বাতদীপবৎ অচলং সৎ অখণ্ড-চৈতন্যমাত্রং অবতিষ্ঠতে'—একমাত্র চৈতন্যমাত্রই থাকে, চৈতন্য ও তার আস্বাদন—এই দ্বৈতভাব বা দ্বৈতজ্ঞান থাকে না,—'বাসনাকল্পনান্তরং চিত্তং স্বত এব প্রত্যক্‌প্রবণং ভবতি। ন আস্বাদয়েৎ-ইতি···সবিকল্পকরসং বিষয়প্রপঞ্চভারত্যাগজন্যং ন আস্বাদয়েৎ, ন অনুভবেৎ।·····অতঃ প্রজ্ঞয়া যুক্তং ভবেৎ স্থিতপ্রজ্ঞঃ জীবন্মুক্তঃ'। গীতার ২।৫৫ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞসম্বন্ধে 'প্রজহাতি যদা কামান্··· আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে' বলা হয়েছে। বেদান্তের বাধসমাধিতে একমাত্র একরস ও অখণ্ড-ব্রহ্মেরই সত্তা বা সত্তানুভূতি থাকে, কিন্তু যোগের লয়সমাধিতে নির্বিকল্পসমাধির আনন্দরসের আস্বাদন থাকে, সুতরাং জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়-রূপ ত্রিপুটিও থাকে। এজন্য সদানন্দ-যতি 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে জীবন্মুক্তের পরিচয় দিয়ে বলেছেন : 'জীবন্মুক্তঃ নাম স্বস্বরূপাখণ্ড (শুদ্ধ)-ব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে (সতি) অজ্ঞানতৎকার্য-সঞ্চিতকর্ম-সংশয়-বিপর্যয়াদীনাং অপি বাধিতত্বাদ্ অখণ্ডব্রহ্মরহিতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ'। এর টীকাকার বলেছেন যে, যোগসাধনায় নির্বিকল্পসমাধির ও অদ্বৈতবেদান্তসাধনায় নিদিধ্যাসনের পর বাধসমাধিতে সকল-রকম বন্ধনরহিত হয়ে সাধক 'ব্রহ্মনিষ্ঠো জীবন্মুক্ত ইতি লক্ষণম্'—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। এখানেই উপনিষৎ 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' বলেছে। 'পরাবর' অর্থে সাধক ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন। 'বালবোধিনী'-টীকাকার আপোদেব এ' প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সিদ্ধসাধক তখন পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক—এই তিন রকম শক্তির বা অবস্থার অতীত হয়ে পরমপরিশুদ্ধ হয়, আর এই অবস্থাই ঠিক-ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানের ও ব্রহ্মত্বের অবস্থা।

এ'বিচার ও অনুভূতি একান্তই কঠিন, কিন্তু অধ্যাত্মসাধনার চরমস্তরে চিত্তশুদ্ধির (মন চৈতন্যে রূপান্তরিত হওয়ার) পর তবে এই চরম-অবস্থার সম্যকরূপে ধারণা ও অনুভূতি আসে। সাধারণ জীবনে, অশুদ্ধ ও চঞ্চল মনের (চিত্তের) অবস্থায়, অর্থাৎ অজ্ঞান থাকাকালে এই ব্রহ্মজ্ঞানের, ব্রাহ্মীস্থিতির বা ব্রহ্মানুভূতির কোন ধারণাই হয় না। এজন্য অধ্যাত্মসাধনার প্রয়োজন, সাধনাব্যতীত এই অবস্থার ধারণা বা প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি ও বিভিন্ন রকম সমাধি প্রভৃতির কথা আমরা পড়ি ও শুনি, কিন্তু তাঁর সেই সকল সমাধি বা ব্রহ্মলীন-অবস্থা-সম্বন্ধে যথার্থ-অনুভূতি লাভ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন সময়ে সমাধিস্থ হতেন এবং সেই সমাধির অবস্থা তিনি নিজে সম্যকভাবে অনুভব করতেন এবং সমাধির আনন্দে সমাধিসাগরে ডুবে আত্মহারা হয়ে থাকতেন,

অথচ সেই অতীত পরম ও চরম-অবস্থার কী অনুভব করতেন—তা সাধারণ অজ্ঞানবিলাসী মানুষকে তিনি বলতে পারতেন না, কেননা সেই অবাক্ত অবস্থার কথা সাধারণকে বলা বা জানানো কঠিন।

এখানে এ'প্রসঙ্গে শ্রীম (মাষ্টার মহাশয়) শ্রীশ্রীকথামৃতে (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৩) লিখেছেন : "মনে চারিটি সাধ উঠেছে। বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব।··· আট-আনার কারণ (দুর্গাপূজার) অষ্টমীর দিন তন্ত্রের সাধকরা পান করবে তাই দেখ্‌বো, আর প্রণাম কর্‌বো। নরেন্দ্র (নরেন্দ্রনাথ, পরে স্বামী বিবেকানন্দ) সম্মুখে বসিয়া। এখন (তখন) বয়স ২২।২৩। কথাগুলি (পূর্বোক্ত কথাগুলি) বলিতে বলিতে ঠাকুরের দৃষ্টি নরেন্দ্রের উপর পড়িল। ঠাকুর দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও সমাধিস্থ হইলেন। নরেন্দ্রের হাঁটুতে একটি পা বাড়াইয়া দিয়া ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য, চক্ষু স্পন্দহীন"। স্পন্দহীন হবারই কথা। সমাধির মধ্যে সাধক যখন ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হন এবং ব্রহ্মসত্তা ও তাঁর নিজের সত্তাকে এক ও অভিন্ন জ্ঞান করেন, তখন বাহ্যজ্ঞান ও বাইরের কোন স্পন্দন ও চেতনাই থাকে না। তিনি তখন আপনাতেই আপনি—ব্রহ্মে বা ব্রহ্মজ্ঞানে একাকার হন। কিন্তু অবতারপুরুষরা বিশ্বকল্যাণসাধনের জন্য ঐ অবস্থা থেকে অজ্ঞানের জগতে পুনরায় ফিরে আসেন (ব্যুত্থিত হন) এবং অজ্ঞানমালিন্য তাঁদের আর স্পর্শ করতে পারে না, এবং তার কারণই হ'ল যে, অজ্ঞান তখন তাঁদের কাছে জ্ঞানে (অখণ্ড-ব্রহ্মজ্ঞানে) রূপান্তরিত হয়, জ্ঞানের সীমাহীন সাগরেই তাঁরা সর্বদা ভাসমান অর্থাৎ ডুবে থাকেন। এটিও অনুভূতির বা সম্যক্‌দর্শনের কথা, সাধারণ অজ্ঞানবিলাসী মানুষের কাছে তা আশ্চর্যবস্তুর মতো মনে হয় এবং সেই অবস্থা তাদের বোধের, জ্ঞানের বা প্রতীতির বিষয় হয় না।

"ঠাকুর দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও সমাধিস্থ হইলেন"। অদ্ভুত ও অলৌকিক সেই সমাধি। শ্রীম লিখেছেন : "নরেন্দ্রের হাঁটুতে একটি পা বাড়াইয়া দিয়া ঐভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য, চক্ষু স্পন্দহীন"। অবশ্য বিভিন্ন রকমভাবে—বসা-অবস্থায়, দাঁড়ানো-অবস্থায়, কোন-কিছু ভাবের বস্তু দেখার ও ভাববিদগ্ধ সঙ্গীতাদি শোনার সময়েও তিনি একবার নয়—মুহুর্মুহুঃ বা বারংবার সমাধিস্থ হতেন। যে সমাধি যোগীদের ও জ্ঞানীদের পক্ষে একান্ত অভ্যাস ও বহুযত্নসাধ্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পক্ষে সেই সমাধি অনায়াসসাধ্য ও অনায়াসলভ্য ছিল।

অলৌকিক ও অত্যদ্ভুতচরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিও অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ ছিল। শ্রীম লিখেছেন (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৩) : "অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও আনন্দের রেশ ছুটিয়া যায় নাই।[২] ঠাকুর আপনা-আপনি (অস্ফুটভাবে) কথা

২। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমাধি (বা সকল সমাধির সমাধি) কি সবিকল্প (সবীজ)—না নির্বিকল্প (নির্বীজ)? কেননা সমাধির শেষে (ব্যুত্থানদশায়) তিনি সমাধিতে যে আনন্দ অনুভব করতেন—তার রেশ জাগ্রত (ব্যুত্থান) অবস্থায়ও থাকতো। এখানেও তাই ('এখনও আনন্দের রেশ ছুটিয়া যায় নাই')। সম্প্রজ্ঞাত, সবীজ বা সবিকল্প-সমাধির অবস্থায় ত্রিপুটী (জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়) থাকে, সুতরাং রসাস্বাদও ('সবিকল্পকানন্দাস্বাদ') থাকে, কিন্তু নির্বিকল্পসমাধিতে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় ও কোন দ্বৈতভাবই থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব (ঈশ্বরের) অবতার, জীবকল্যাণসাধন-রূপ কর্মই তাঁর জীবনের ব্রত, তাই মুক্তি,

কহিতেছেন। ভাবস্থ হইয়া (তখনও সমাধির ভাব বা রেশ কাটে নাই) নাম করিতেছেন। বলিতেছেন—সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ—হলবো ?—না, আজ কারণানন্দদায়িনী। কারণানন্দময়ী !"

"আজ কারণানন্দদায়িনী। কারণানন্দময়ী"। এই কথাগুলির তাৎপর্য গভীর রহস্যপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্বে চতুর্থ সাধ বা বাসনার উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "আট-আনার কারণ অষ্টমীর (দুর্গাষ্টমীর) দিন তন্ত্রের সাধকেরা গান করবে। তাই দেখ্‌বো আর প্রণাম কর্‌বো"। প্রসঙ্গ এখানে তন্ত্রের অর্থে তান্ত্রিকাচারের। বেদান্তে ব্রহ্মচৈতন্যের নাম "সচ্চিদানন্দ" (সৎ+চিৎ+আনন্দ=অস্তি+ভাতি+প্রিয়), আর তন্ত্রে তিনিই বা সেই এক সত্তাই কারণানন্দদায়িনী ও কারণানন্দময়ী। তন্ত্র ও তন্ত্রাচার-অনুসারে সাধনায় শিব ও শক্তির একাত্মক বা অবিনাভাব-সামরস্যের তত্ত্বোপলব্ধি হয়। তখন শিব নিত্য ও শক্তি লীলা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : 'যিনিই নিত্য, তিনিই যা তাঁরই লীলা'; অর্থাৎ নিত্য ও লীলা—শিব ও শক্তি এক ও অভিন্ন পরমতত্ত্বে ও স্বরূপে, কিন্তু বিরূপে বা বিকাশে একটু পৃথক বা ভিন্ন। লীলার উভয়ে পৃথক বা ভিন্ন এ'অর্থে যে, লীলায় রূপের ও নামের মধ্যে পার্থক্য বা ভিন্নতা থাকে। বরফ ও জল স্বরূপে বা তত্ত্বত এক জল হলেও নামে ও রূপে পরস্পরপৃথক। তন্ত্রসাধনায় (শক্তিসাধনায়) কারণানন্দ। কারণানন্দ বল্‌তে কারণরূপ সর্ববীজময়ী অমাকলা বা চন্দ্রকলারূপ মহাপ্রকৃতি এবং এই প্রকৃতিকে কালী বা মহাকালীরূপে গ্রহণ করা ও তাঁর প্রকৃতসত্তা ও স্বরূপের অনুভূতি লাভ করা। কালীই কুলকুণ্ডলিনী ('কুল' অর্থেও কালী এবং অবিচ্ছুরিত-অখণ্ড-কুণ্ডলিনীও কালী বা মহাপ্রকৃতি)। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন—

'ডুব দে রে মন কালী বলে,
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।'

কুল, কুণ্ডলিনী ও কালীর কুল একই অর্থের ও তত্ত্বের প্রকাশক। সেজন্য কারণানন্দদায়িনী কিংবা কারণানন্দময়ী বলতে সর্ববীজময়ী ও সর্বসৃষ্টিরূপিণী কালীই। এই কালী বা মহাকালীই প্রকৃতি বা মহাপ্রকৃতি—যিনি অমাকলা বা চন্দ্রকলারূপে প্রণব বা ওঙ্কারের তথা অ+উ+ম বা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শীর্ষে অবস্থিত বা প্রতিষ্ঠিত। এই অমাকলারূপী চন্দ্রকলাই শিব-মহেশ্বরের শিরোভূষণ (অর্ধচন্দ্র বা শশীকলা)। অর্ধচন্দ্র বা শশীকলা অব্যক্ত বা অব্যাকৃত-প্রকৃতি—যা থেকে ব্রহ্মা (সৃষ্টি), বিষ্ণু (স্থিতি) ও মহেশ্বর (প্রলয়) রূপ ধারণ করেন

মোক্ষ, নির্বাণ প্রভৃতি লাভ তাঁর কাছে অতিতুচ্ছ কথা। তাছাড়া তিনি ঈশ্বরকোটির পর্যায়ভুক্ত। ঈশ্বরকোটির মহামানবরা ব্রহ্মসমাধির (নির্বিকল্পের) পরও কর্মভূমি-বিশ্বসংসারের সমাজে নেমে আস্‌তে (ব্যাখিত হতে) পারেন। এ' সম্বন্ধে কি অবতার ও কি ঈশ্বরকোটির মহামানব-সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম বা যুক্তি নাই। ঈশ্বরকোটি-সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে অবশ্য এ' সম্বন্ধে পুনরায় কিছু আলোচনা কর্‌বো। শ্রীম লিখেছেন : "অনেকক্ষণ পরে (শ্রীশ্রীঠাকুরের) সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও (সমাধিতে) আনন্দের রেশ কাটিয়া যায় নাই"। এখানে অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে ঐ একথা যে, অবতার, অবতারকল্প-মহামানব বা ঈশ্বরকোটি-পর্যায়ের মহামানবদের পক্ষে সবিকল্প-সমাধি যেমন সহজসাধ্য, তেমনি নির্বিকল্পসমাধি। আসলে যুগে যুগে তাঁদের আসা (পৃথিবীতে অবতরণ) লোককল্যাণসাধনের জন্য।

(সৃষ্টি হয়)। চন্দ্রকলার উপরে বা শিরে বিন্দু—ব্রহ্ম। সুতরাং কারণ বলতে তন্ত্রমতে অমাকলা বা চন্দ্রকলা প্রকৃতি বা অব্যাকৃতি-মহাপ্রকৃতি।[৩] শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন : "স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। মহাকারণে গেলে চুপ। সেখানে গেলে কথা চলে না—'অবাঙ্‌মনসগোচরম্'। সুতরাং কারণ ও মহাকারণের ধারণা বিভিন্নভাবে গ্রহণ করা হয়। যেমন—

(১) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্রকলা ও বিন্দু।

(২) বৈখরীনাদ, মধ্যমা, পশ্যন্তী, পরা-কুণ্ডলিনী ও অবিচ্ছুরিত-কুণ্ডলিনী মহাশক্তি।

এ'দুটির মধ্যে চন্দ্রকলা-প্রকৃতি = কারণ ও বিন্দু = মহাকারণ, কিংবা পরানাদ (প্রথম-বিচ্ছুরিত নাদ) = কারণ এবং অবিচ্ছুরিত-শুদ্ধাশক্তি-কামকলা-কুণ্ডলিনী = মহাকারণ। অবশ্য কামকলা ও কুণ্ডলিনী এক ও অভিন্ন। কিন্তু বেদান্তে কারণ = ঈশ্বর, কিংবা অব্যক্ত-মায়ার অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর এবং মহাকারণ = তুরীয়-বিশুদ্ধব্রহ্ম। বেদান্তে প্রকৃতপক্ষে দুটি (বা দু'জন) ঈশ্বর = মায়ার অধীশ্বর বা মায়াধীশ ঈশ্বর ও মায়াসবলিত-ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা। বেদান্তে মায়াধীশ-ঈশ্বর কারণব্রহ্ম-রূপে ও মায়াসবলিত-ঈশ্বর কার্যব্রহ্ম-রূপে পরিচিত। এজন্য বেদান্তে কারণ = মহাপ্রকৃতি বা অব্যাকৃতি-মায়া এবং মহাকারণ = তুরীয় বা মায়ানির্মুক্ত বিশুদ্ধ-ব্রহ্ম। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেব "আপনা-আপনি কথা কহিতেছেন, ভাবস্থ হইয়া নাম করিতেছেন"। তিনি প্রথমে বলিতেছেন—'সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ' ও পরে বলিতেছেন—'কারণানন্দদায়িনী। কারণানন্দময়ী'। শ্রীম শ্রীশ্রীকথামৃতে (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯৩) লিখেছেন : "ঠাকুর বলিতেছেন—সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ—বল্‌বো ?—না, আজ কারণানন্দদায়িনী। আনন্দময়ী।' 'আজ' বলতে যেহেতু তিনি তন্ত্রপ্রসঙ্গে ("আট-আনার কারণ অষ্টমীর দিন তন্ত্রের সাধকেরা গান করবে, তাই দেখ্‌বো—আর প্রণাম কর্‌বো") ব্রহ্মময়ীর নাম করছেন, সেহেতু সচ্চিদানন্দ = সৎ + চিৎ + আনন্দ (অস্তি-ভাতি-প্রিয়) বেদান্তে-কথিত ব্রহ্মের নাম না ক'রে বলেছেন তন্ত্রোক্ত কালীব্রহ্মের[৪] নাম—'কারণানন্দদায়িনী! কারণানন্দময়ী।' এই প্রসঙ্গের ও চিন্তার বিষয়ানুসারেই তিনি নামের উল্লেখ করেছেন। তিনি তন্ত্রপ্রসঙ্গের প্রাধান্য দিয়েও বেদান্তের উপমা দিয়েছেন : "সা রে গা মা পা ধা নী। নী-তে থাকা ভাল নয় (কেননা ·তা না হলে লীলা হয় না ও বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য রক্ষিত হয় না), অনেকক্ষণ থাকা যায় না (কেননা সর্বাতীতচৈতন্য তুরীয়-ব্রহ্মে দেশ-কাল-নিমিত্তের বালাই নাই, সেজন্য দেশ-কালাতীত সত্তায় এক ও

৩। গীতার ৩।২৭ শ্লোকে 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ' প্রকৃতি শ্লোকে প্রকৃতিসম্বন্ধে বলতে গিয়ে অদ্বৈতাচার্য মধুসূদন-সরস্বতী বলেছেন : "প্রকৃতির্মায়া সত্ত্বরজস্তমোময়ী বিদ্যাঽজ্ঞানাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তিঃ—'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্তু মহেশ্বরম্' ইতি শ্রুতেঃ (শ্বেতাঃ উঃ ৪।১০)"। অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে প্রকৃতি ঈশ্বর বা পরমেশ্বরের শক্তি হলেও বিদ্যা অর্থে জ্ঞানরূপ চৈতন্য নয়, ব্রহ্মচৈতন্য থেকে পৃথক, কেননা এই সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মায়া (সৃষ্টিবীজসমষ্টি) থেকে বিশ্বচরাচরের পৃথকভাবে সৃষ্টি হয়, কিন্তু তন্ত্রসৃষ্টিতে এই প্রকৃতি মহামায়া আদ্যাশক্তি।

৪। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন : 'কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম, (আমি) ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি'। এখানেও মহাশক্তি-কালীই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাও তাই।

অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তাই মাত্র থাকে, আর অন্য-কিছুর সত্তা থাকে না, বা রাখা যায় না)। লীলার জন্যই থাকা[৫] এবং লীলাসৌন্দর্যের উপভোগ ও রসাস্বাদন করা, অন্যথা সর্বাতীত তুরীয়-রাজ্যে 'কেন কং পশ্যতি, কেন কং জিঘ্রতি ?—কে কাকে দেখ্‌বে, কে কাকে উপভোগ করবে, কারণ তখন দুই দুই বা দ্বৈতই তো থাকে না। সেজন্য লীলারসসৌন্দর্যকামী শ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্রের দৃষ্টিতে এক গ্রাম নীচে[৬] থাকতে চাইছেন : "নী-তে থাকা ভাল নয়—মনেকক্ষণ থাকা যায় না। এক গ্রাম (ধাপ) নীচে থাক্‌বো"। আসলে সৃষ্টিবীজময়ী প্রকৃতিতে বা কারণেই তিনি থাকতে চাইছেন—"কারণানন্দদায়িনী। কারণানন্দময়ী !" কারণেই লীলা, আনন্দপ্রাচুর্য ও আনন্দের[৭] অনুকৃতি, আর মহাকারণে[৮] সবই চুপ বা নিস্তব্ধ—'অবাঙ্‌মনসগোচরম্'। এ'কথার বা এ'তত্ত্বের সমর্থনে তিনি পরে বলেছেন : "স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। মহাকারণে গেলে চুপ। সেখানে কথা চলে না"। কথা বলা ও কথা শোনার জগৎ দেশ-কালের সীমার জগৎ। দুই থাক্‌লেই পরস্পরের মধ্যে মিলন ও বিচ্ছেদের প্রশ্ন ও আকুতি জাগে, আর থাকে কথা বলার ও কথা শোনার ইচ্ছা ও আগ্রহ। কিন্তু যেখানে Silence বা চিরকালের নিস্তব্ধতা, সেখানে বলার ও শোনার প্রশ্ন কিছুই নাই। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন : "মহাকারণে গেলে চুপ। সেখানে কথা চলে না। উপনিষৎও বলেছে—'যতো বাচা: নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ',—বাক্য ও মনে ফিরে আসে, অর্থাৎ তুরীয়ব্রহ্মের স্বরূপের বর্ণনা করতে পারে না বাক্য ও মন।

৫। 'লীলার জন্যই থাকা'। লীলা গুণের বিকার, সুতরাং লীলা মহাচৈতন্যের স্বরূপ থেকে বিচ্যুতি ও পৃথক। এই পৃথক বিচ্যুতিই নিত্য থেকে লীলার বা বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি। সৃষ্টি থাক্‌লেই দ্রষ্টার কল্পনা সার্থক এবং ঐ কল্পনাই দ্বৈতজ্ঞানরূপ অজ্ঞান সৃষ্টি করে। গীতায় (৩।২৭) শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির গুণ তিনটি—সত্ত্বরজস্তম:। গুণই বিকার। তাই মধুসূদন-সরস্বতী বলেছেন : 'প্রকৃতে গুণৈর্বিকারৈ: কার্যকারণরূপৈ:'। কার্য ও কারণ, প্রকৃতির গুণ বা গুণময়ী প্রকৃতিই সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করেন দ্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারণা, ভূমি ও ভূমার ধারণা এবং এই ধারণাই দ্বৈতজ্ঞান—যা এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান থেকে পৃথক। মধুসূদন-সরস্বতী এর অর্থ করেছেন যে, যখনই জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে বিভাগ বা পার্থক্য সৃষ্টি হ'ল তখনই 'সর্বেষাং জড়ানাং বিকারিণাং ভাসকত্বেন'—পার্থক্য-চিন্তা, কিন্তু দেশকালাতীত ব্যাপক-ব্রহ্মচৈতন্যে দেশকালরূপ মায়া বা প্রকৃতি না থাকায় সেখানে জ্ঞান ও অজ্ঞান—দুই দুই জ্ঞান (অজ্ঞান) থাকে না। দ্বৈতজ্ঞানেই ব্রহ্মকে আনন্দরস বলে এবং সেই আনন্দরস উপভোগ করেন সাধক সবিকল্পসমাধিতে। এই আনন্দ বা ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হ'লেও সৃষ্টির আনুকূল্যে সৃষ্টি-দ্রষ্টা-এই দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞানের ধারণা সৃষ্টি করে। নির্বিকল্পসমাধিতে একমাত্র অদ্বিতীয় বা এক (জ্ঞানই অদ্বয়-ব্রহ্মজ্ঞানই) থাকে।

৬। 'এক গ্রাম নীচে' বলতে নির্বিকল্পের পর সবিকল্পে (সমাধিতে), কিংবা সর্বাতীতত্তুরীয়চৈতন্য থেকে এক ধাপ নীচে মহাপ্রকৃতিতে বা ঐশ্বর্যময় ঈশ্বরচৈতন্যে স্থিত হতে চাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

৭। এই আনন্দ সগুণ-ব্রহ্ম—যা থেকে সৃষ্টি হয়—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি'।

৮। মহাকারণ বলতে সর্বাতীত (কার্য-কারণাতীত) ব্রহ্মচৈতন্য। নির্বিকল্পসমাধির অবস্থায় এই সর্বাতীত-চৈতন্য অনুভূতিস্বরূপ হয়। এই অবস্থায় 'স্বপ্রকাশজ্ঞান: স্বরূপোঽসৌ আত্মা' অনুভূতির বিষয় হয় এবং এই নির্বিষয়জ্ঞানই নির্বিকল্পসমাধিতেই সাধক অনুভব করেন "জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়োর্দ্বৈতচৈতন্যয়োর্বিকারি-নির্বিকারয়োস্তত্ত্বং যথাত্মাং বেত্তী"।

এর পরে ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটির প্রসঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা উপরে উঠে (সমাধি-সাগরে ডুবে যায়), আবার নীচেও (কর্মজগতেও) আসতে পারে। ছাদের উপরে উঠে আবার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে নীচে (অজ্ঞানের সংসারে বা জগতে) আনাগোনা করতে পারে। অনুলোম, বিলোম। সাততোলা বাড়ি, কেউ বারবাড়ি-পর্যন্ত যেতে পারে। রাজার ছেলে, আপনার বাড়ি সাততোলায় যাওয়া-আসা করতে পারে। এক এক রকম তুব্‌ড়ী আছে। একবার এক রকম ফুল ফুটে গেল, তারপর খানিকক্ষণ আর এক রকম ফুল কাটছে। তারপর আবার আর এক রকম। আর নানা রকম ফুলকাটা ফুরোয় না"। পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ তুব্‌ড়ীর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন: "আর একরকম তুব্‌ড়ী আছে—আগুন দেওয়ার একটু পরেই ভস্‌ ক'রে উঠে ভেঙ্গে যায়। যদি সাধ্যসাধনা ক'রে উপরে যায়—তো আর এসে খবর দেয় না। জীবকোটির সাধ্যসাধনা ক'রে সমাধি হ'তে পারে। কিন্তু সমাধির পর নীচে (কর্মের বলতে) আসতে বা এসে খপর (খবর) দিতে পারে না" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯৩—১৯৪)।

ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি কারা—এ'দের বিভাগ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বরূপেরও পরিচয় দিয়েছেন। সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এই প্রবন্ধের পাদটীকায়। সমস্যা ও প্রশ্ন এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবকল্যাণের ব্রত নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ এবং নিজেই নিজের স্বরূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: 'এবার স্বয়ং ছদ্মবেশে রাজার রাজা-পরিভ্রমণ', অর্থাৎ তিনি অবতার, পৃথিবীতে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতরণ। আর যদি তাঁকে সিদ্ধসাধকের কোঠায় ফেলা যায়, তবে বলা যায় তিনি ঈশ্বরকোটির শ্রেণীভুক্ত, সুতরাং নির্বিকল্পসমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁর পক্ষে কর্মের ও অজ্ঞানের সংসারে ফিরে আসা কিছু অসম্ভব নয়। কোন কোন সমাধির অবস্থায় তাঁর কাণে 'জল খাবো', 'তামাক খাবো' প্রভৃতি ইচ্ছাবুলক শব্দ শোনালে তিনি সমাধির অবস্থা থেকে সাধারণজ্ঞানের জগতে ফিরে আসতেন।

শ্রীম শ্রীশ্রীকথামৃতে (২য় ভাগ, পৃঃ ১৯৩) লিখেছেন: "অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা উপরে (সমাধিতে—নির্বিকল্প ও সবিকল্প—উভয় সমাধির অবস্থায়) উঠে আবার নীচেও (অজ্ঞান ও কর্মের সংসারের মধ্যে ফিরে) আসতে পারে"। সিঁড়ি জ্ঞানের বা অনুভূতির স্তরমাত্র। সংসারের সাধারণজ্ঞান স্বরূপ সিঁড়ি দিয়ে তাঁরা অসাধারণ-ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চরমস্তরে (ভূমিতে) আরোহণ ও প্রতিষ্ঠিত হয়েও আবার জীবকল্যাণসাধন করার জন্য অজ্ঞানের জগতে নেমে (ফিরে) আসতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবনে এর নিদর্শন বহুবারই পাওয়া গেছে। তাঁদের অনুলোম বা সমাধিভূমিতে ওঠা ও বিলোম বা সমাধির উচ্চভূমি থেকে নীচে সংসারভূমিতে শুধু নামাই নয়—বহুবারই আনাগোনা (ওঠানামা) করতে পারেন এবং এই যাওয়া-আসা ছিল তাঁর মধ্যে অনায়াসসাধ্য, মোটেই কষ্টকল্পিত ছিল না। সমাধির ভূমিতে ওঠার ও তা থেকে নামার উদাহরণ তিনি সাততোলা বাড়ির, নানান রকমের তুব্‌ড়ী প্রভৃতির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন। এই উদাহরণগুলি থেকে অসাধারণ-অজাগতিক-ব্রহ্মজ্ঞান থেকে সাধারণ-জাগতিক সংসারের খুঁটিনাটির জ্ঞানেরও বিচক্ষণ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আরও পাওয়া যায় যে, যথার্থজ্ঞানী বলতে তত্ত্বজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী যাঁরা—তাঁরা কোনদিনই বিশ্বসংসারের খুঁটিনাটির অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করেন না, ছোট-বড়র জ্ঞান থেকে তাঁরা কোনদিনই বঞ্চিত নন। তার কারণই হ'ল যে, তাঁদের পরমার্থিক-দৃষ্টিতে অচেতন-চেতন, জড়-চৈতন্য, পার্থিব-অপার্থিব সকলের মধ্যেই তাঁরা এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যরূপ মহাপ্রাণচৈতন্যের অনুস্যূতি ও লীলারূপ দেখেন এবং সেজন্য তাঁদের কাছে কোনটাই হেয় বা উপাদেয় বলে গণ্য হয় না।

●

॥ কীর্তনে নর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

স্বামী প্রভানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মহাসংকীর্তনের ভাবৈশ্বর্য 'ইয়ংবেঙ্গলদের' দেখাবার জন্য ব্যগ্র হন শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। শ্রীরামকৃষ্ণের গলার ক্যান্সার রোগের সূচনা পরিস্ফুট। অনেকের নিষেধ অগ্রাহ্য করে, তিনি সাবধানে থাকবেন, সমঝিয়ে চলবেন ইত্যাদি ভরসা দিয়ে নৌকায় করে পানিহাটির উৎসবে যান। সেদিন জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী। সেখানে চিড়ার মহোৎসব, আনন্দের মেলা, হরিনামের হাটবাজার। শ্রীরামকৃষ্ণ সদলবলে পানিহাটি পৌঁছান দুইপ্রহরে। মণিসেনের বাড়ীতে নাটমন্দির থেকে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নজরে পড়ে, শিখাসূত্রধারী, তিলকচন্দ্রাঙ্কিত, দীর্ঘস্থূলবপু গৌরবর্ণ এক পুরুষ; পরিধানে ধোপদুরস্ত বেলির উনপঞ্চাশের ধুতি, ট্যাকে একগোছা পয়সা, ভাবাবিষ্টের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যরত। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন "ঢং দেখা"। এদিকে নকল ইঙ্গিত করে আসলের, ভেক স্মরণ করিয়ে দেয় সত্যবস্তুকে। শ্রীরামকৃষ্ণের পরিকরগণ তাঁর মন্তব্যের তাৎপর্য অবধারণ করার পূর্বেই তিনি এক লাফে অবতীর্ণ হন কীর্তনদলের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধিতে সুস্থির গম্ভীর, তাঁর প্রসন্ন বদনে হাস্যদীপ্তি। কিঞ্চিৎ ভাবসম্বরণ হলে তিনি মধুর নৃত্যের ছন্দে দোলায়িত হন, উপস্থিত সকলের অন্তরে দোলের সৃষ্টি করেন। প্রত্যক্ষদর্শী শরৎচন্দ্র বর্ণনা করেছেন, "তিনি কখনও অর্ধবাহ্যদশা লাভপূর্বক সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে এবং কখনও সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবেগে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখনও অগ্রসর এবং কখনও পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 'সুখময় সাগরে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্য মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।··· কিন্তু দিব্যভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রুদ্র-মধুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত, তাহার আংশিক ছায়াপাত ও ঐসকল আমাদিগের নয়নগোচর

(চিত্র ২৮ ৪)

হয় নাই। প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত, উহা বুঝি কঠিন অস্থি-উপাদানে নির্মিত নহে, বুঝি আনন্দসাগরে উত্তালতরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে। আসল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাকেও বুঝাইতে হইল না। [২৫] প্রায় আধঘণ্টা পরে তিনি রাঘবপণ্ডিতের বাটীর দিকে অগ্রসর হন। পর্যায়ক্রমে অবস্থাত্রয়ের মধ্যে ভাসমান শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহে পরিবর্তনশীল ভাববিচ্ছুরণ দেখে দর্শকগণ অননুভূত রসাস্বাদ লাভ করেন।

কীর্তন নৃত্যে তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের সমন্বয় ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যছন্দের মধ্যে পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠতা ও উদ্দামতার সঙ্গে কোমল করুণ রসের সমন্বয় খোল-করতালের তালে তালে মধুময় পরিমণ্ডল রচনা করে। প্রত্যক্ষদর্শী কথামৃতকার মন্তব্য করেছেন, "পেনেটির মহোৎসবে সমবেত সহস্র নরনারী ভাবিতেছে, এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চয়ই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। দুই একজন ভাবিতেছে, ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই গৌরাঙ্গ।" (কথামৃত ৪।৬।১)

মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দামনৃত্যের যে ভাবরূপটি পুঁথিকারের চক্ষে প্রত্যক্ষ হয়েছিল সেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেশরি-বিক্রম-নৃত্যে শিল্পীর আকুল গাত্র পুলকিত।

শিল্পীর ছন্দায়িত দেহভঙ্গিমার মধ্যে লক্ষ্য করেন পুঁথিকার :

নৃত্যে মোর শ্রীপ্রভুর কয়,
আকর্ণ পূরিত টানে　　যেইরূপ ধনুর্গুণে,
বাণুকী ছাড়িতে যায় শর।
বাম হস্ত প্রসারিত　　সরল শরের মত,
দক্ষিণ বুকের দিকে মোড়া,
ঠিক যেন আধাআধি　　গলা কিম্বা কণ্ঠাবধি,
বক্ষে লগ্ন অঙ্গুলির গোড়া।
ধরে অঙ্গে মহাবল　　পদচাপে ধরাতল,
অবিকল হেলাহেলি করে।
কভু অঙ্গ এত ঢলে　　পড়ে যেন ভূমিতলে,
পড়ি পড়ি কিন্তু নাহি পড়ে ॥[২৬]

সংকীর্তনে গণমানসের সাযুজ্য বাংলার সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণকৃত সংকীর্তনে ঐতিহ্যানুগ সাধারণধর্ম তো ছিল। সেই সঙ্গে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনবত্ব, স্বকীয়তা, সর্বোপরি নির্ভুত উদ্বেলতানতা। সংকীর্তন প্রিয় রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন স্বীয় ধারণা : 'আমরা অনেক

২৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩-৫। শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মত্ত ভাবমূর্ত্যটি একটি রেখাচিত্রে পরিস্ফুট করেছেন (চতুর্থ চিত্র দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও বইয়ে ছবিটি ছাপা হয়েছে।

২৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, ঐ, পৃঃ ৫৭১।

সংকীর্তন ও প্রেমিক ভক্ত দেখিয়াছি···অনেক লয়-মান-সংযুক্ত নৃত্যও দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের নৃত্য ও সংকীর্তনের ভাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না।···হরিভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা সেই সংকীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেগে পুলকিত হইতেন। একথা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু যাঁহারা তমোগুণের আকর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানিতেন না,···যাঁহারা ভাব ও প্রেমকে মস্তিষ্কের বিকার বলিয়া ঘোষণা করিতেন, তাঁহারাও প্রেমে বিহ্বল হইয়া সংকীর্তনে নৃত্য করিয়াছেন।"[২৭] কীর্তনে বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্তনে প্রধান উপজীব্য ভাব। ঈষৎ অঙ্গভঙ্গী ও প্রবল বা স্পষ্ট অঙ্গভঙ্গী ভাবের গভীরতার সঙ্গে প্রকটিত হত।

অধ্যাত্মভাবসম্পৃক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সংকীর্তন ও নৃত্যের কল্যাণপ্রসূ প্রভাব ছাড়াও নান্দনিক মূল্যবিচার করেছেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী। লিখেছেন বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, "চিরঞ্জীব শর্মার একতারা বাদনে 'নাচরে আনন্দময়ীর ছেলে তোরা ঘুরে ফিরে' গীতশ্রবণে ভাবাবেশে গলিত কাঞ্চনবপু প্রভু ভক্তগণকে স্বর্গসুখ বিতরণমানসে বামবাহু উত্তোলন ও দক্ষিণভুজ কুঞ্চনে, বামপদ আগে ও দক্ষিণচরণ পিছে বাড়াইয়া এমন মধুর নৃত্য করেন, তাহা বর্ণনাতীত। আপনি যেতে জগৎ মাতায় এই প্রথম দেখিলাম। এ নৃত্যদর্শনে ভক্তের তো কথাই নাই, দর্শকেরাও সংক্রামিত হইয়া নৃত্য করিতেছে বোধ হল। যেন সমগ্র ভবনটিই নাচিতেছে।"[২৮]

আধ্যাত্মিকভাবের সঞ্চরণ ও গাঢ়তরকরণই শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্য ও সংকীর্তনের মুখ্য লক্ষ্য। সেসঙ্গে নান্দনিক গুণযুক্ত শিল্পানুভূতিও কিভাবে উদ্ভূত হ'ত সেটা বিশেষ লক্ষণীয়। মুক্তপ্রাঙ্গণে পাণিহাটিতে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা দেখেছি, মণিমল্লিকের বাড়ীর দোতালায় নৃত্যকারী শিল্পীকে দেখেছি। গৃহাভ্যন্তরে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "অপূর্ব দৃশ্য! গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে;··· আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখনও দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখনও বা ঐরূপে পশ্চাতে হাঁটিয়া আসিতেছেন এবং ঐরূপে যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেইদিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাহার অনায়াসগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব নৃত্য—তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গ-বিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম-রাহিত্য নাই;···নির্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া বৎস যেমন কখনও ধীরভাবে এবং কখন দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দসাগর—ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গ সংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন।"[২৯]

২৭। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ৬৯

২৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৬

২৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১৩৭২। পঞ্চমখণ্ড, পৃঃ ৩১

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চারিদিকে বিকীর্ণ হচ্ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের অন্তরের দীপ জ্বলে উঠেছিল। ভাবোজ্জ্বল পরিবেশে মৌতাত সৃষ্টি হয়েছিল।

নৃত্য-নাট্যে অসাধারণ প্রতিভাধর গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনৃত্য ও তার বিপুল প্রভাব সম্বন্ধে 'নৃত্য'-প্রবন্ধে লিখেছেন, "কঠোর তিতিক্ষাশালী প্রকাশানন্দ যে, গৌরাঙ্গের নৃত্যদর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন একথা প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রত্যয় করিতে বাধ্য, আমরা যে রামকৃষ্ণদেবের নৃত্য দেখিয়াছি। 'নদে টলমল করে' মৃদঙ্গতালে গান হইতেছে, রামকৃষ্ণ নাচিতেছেন ; যে ভাগ্যবান দেখিয়াছেন—আমরা দর্শন করিয়াছি,···তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাবপ্রবাহে পৃথিবী টলটলায়মানা ! কেবল নদে টল্‌মল্ করিতেছে না, সমস্তই টলটলায়মানা। যে সে নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। নাচের এতদূর শক্তি। সৌন্দর্য যে তাহার ভিত্তি।"[৩০] শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যের সমাপ্তি ভক্তিরসমার্গে সন্দেহ নাই, কিন্তু নৃত্যকলাবিদ গিরিশচন্দ্রের মূল্যায়নে শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যের শক্তি ও সৌন্দর্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কাব্য, সুর ও নৃত্যের ত্রিবেণীসঙ্গমে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধ সর্বানুস্যূত অখণ্ড পরমসত্তা বিচিত্রবৈভবে অভিব্যক্ত।

নৃত্যশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি বিষয়ে স্বকীয়তা বিশেষ লক্ষণীয়। নাতিদীর্ঘ, ক্ষীণকায়, চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত, মুখমণ্ডলে সাত্ত্বিকভাবের বিভা, বয়সটা পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু নৃত্যরত শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের দেহবল্লরীতে স্ফুরিত পৌরুষদৃপ্ত তেজ, প্রাণবন্ত শক্তির মাধুর্য দর্শকমাত্রকেই বিস্মিত করত। শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্তন ও নৃত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মহেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন, "পরমহংস মশাই-এর কীর্তনের মধ্যে···ভাবের আধিক্য হওয়ায় তাঁহার অঙ্গসঞ্চালন হইত ;···দেহভাবরাশির শক্তি ধারণ করিতে পারিত না বলিয়া, কখনো বা অঙ্গসঞ্চালন হইত, কখনো বা দেহ নিস্পন্দ হইয়া যাইত। সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে একপ্রকার আভা বাহির হইত।···সাধারণ লোকের কীর্তন হইল 'গতি' হইতে 'ভাব' এ··· পরমহংস মশাই-এর নৃত্য হইল 'ভাব' হইতে 'গতিতে'।···সাধারণ লোকের নৃত্য হইল 'নরনৃত্য'। পরমহংস মশাই-এর নৃত্য হইল 'দেবনৃত্য', যাহাকে চলিত কথায় বলে 'শিবনৃত্য'। ···এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে সকলেই নিশ্চল ও বিভোর হইয়া যাইত ; যেন সকলের মনকে তিনি একেবারে ভাবলোকে লইয়া যাইতেন।···সকলেই যেন নির্বাক, নিস্পন্দ পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া থাকিত, সকলেই অভিভূত ও তন্ময় হইয়া পড়িত, সকলেরই মন তখন উচ্চস্তরে চলিয়া যাইত।···পরমহংস মশাই যেন ভাবমূর্তি ধারণ করিতেন এবং স্বয়ং চাপরাশমাট ভাবমূর্তি লইয়া, সকলের ভিতর অন্তর্বিস্তর সেই ভাব উদ্বোধিত করিয়া দিতেন।···কীর্তনেও যে গভীর ধ্যান হয়, এইটি সর্বদাই অনুভব করিতাম।···একটি বিষয় আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতাম যে, কীর্তনকালে পরমহংস মশাই-এর পদসঞ্চালন প্রথম যে পরিধির ভিতর হইত, তাহার পর উহা এক ইঞ্চি আগেও যাইত না বা পিছনেও যাইত না, ঠিক যেন কাঁটায় কাঁটায়

৩০। গিরিশগ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫০

যাপ করিয়া তাহার পদসঞ্চালন হইত।"[৩১] এসকল টেকনিকের বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ভাবের আত্মপ্রকাশের সামগ্রিকরূপ হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যকলা ছিল স্বতস্ফূর্ত, বলিষ্ঠ ও নবনব রসতরঙ্গে উৎপ্লাবিত।

সঙ্গীত নৃত্যনাট্য বিষয়ে রসজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণের অপর একটি বৈশিষ্ট্য সমকালীন ব্যক্তিদের এবং তৎপরবর্তীকালের রামকৃষ্ণজীবন অনুধ্যানকারীদের বিস্মিত করেছে। অনেকবারই লক্ষ্য করা গেছে দীর্ঘকাল নৃত্যগীত করে অপরে শ্রান্তক্লান্ত বিশ্রামকাতর কিন্তু দৃঢ়োৎসাহসমন্বিত শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকতর উল্লাসে সংপ্রসঙ্গ বা সঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করেছেন। স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমানুষিক ক্ষমতা সম্বন্ধে যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন, "ভগবতী তনু ব্যতীত মানবদেহ এরূপ বস্তা ধারণে কদাচ সমর্থ হয় না।"

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের অপর একটি অতিমানবিক শক্তিও কম বিস্মিত করে না। স্বার্থ-ভোগসুখ-স্পৃহাশূন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ছিল। তাছাড়াও সাধারণ ভাবভূমি উত্তরণ করে তিনি উচ্চ-উচ্চতর পর্যায় হতে রূপরসাত্মক জগৎমালক নব নব-ভাবে উপলব্ধি করতেন। সেই সঙ্গে তাঁর সমগ্র মন একতানে একটি বিষয়কে গ্রহণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে তদনুকূল অনুষ্ঠান করতে অভ্যস্ত ছিল। মনমুখের ঐক্যসিদ্ধির ফলেই উদ্দেশ্যের বিপরীত কোন কর্ম তিনি করতেন না বা করতে পারতেন না। সেইসঙ্গে 'ভাবমুখে' অবস্থিতি শিল্পী-বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনালোককে একটি দুর্লভ অনুভূতিতে অনুরঞ্জিত করেছিল। লীলাপ্রসঙ্গকারের ভাষায় ভাবমুখে থাকার তাৎপর্য হচ্ছে: "যাহা হইতে যতপ্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেই বিরাট আমিই তুমি, তাহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাহার কার্যই তোমার কার্য – এই ভাবটি ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া জীবন যাপন করা ও লোককল্যাণ সাধন করা।" শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর ও মনের এ'সকল বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলে অনুমান করা যায় অধ্যাত্মশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক উপলব্ধি। তিনি বলেন: "আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠল, আবার ঐতেই লয় হয়ে গেল।" (কথামৃত ১।১৩.৬) এই জগৎ-মালকে রসাস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ শিল্পী তাঁর চূড়ান্ত অনুভূতি ব্যাখ্যা করে সাদাসিদে ভাষায় বলেছেন, "যখন অন্তর্মুখ সমাধিস্থ—তখনও দেখছি তিনি। আবার যখন বাইরের জগতে মন এল, তখনও দেখছি তিনি।" (কথামৃত ৪।২০।৬) তাছাড়াও তাঁর নিশ্চিত উপলব্ধির অন্তর্গত মৌল ভাব: "এক এক সময় ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি।" (কথামৃত ৫ পরিশিষ্ট)

সূক্ষ্ম-অনুভূতিসম্পন্ন বিশ্বাত্ম শ্রীরামকৃষ্ণের আন্তর উপলব্ধির ঐশ্বর্যই চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, নাট্যে স্ফুরিত হয়েছিল। বিশ্বাত্মার ছন্দে ছন্দায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের চলন-বলন ধরণ-ধারণ অতি চারুদর্শন, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কাজ ও চারু শিল্প নয়নানন্দকর, তাঁর বিবিধ বিচিত্র শিল্পচর্চা শিল্পশাস্ত্রের অন্দরমহলে প্রবেশ করেও তাদের শাসনের উঁচু প্রাকার অতিক্রম করেছে।

৩১। মহেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম, পৃ: ১১৪-১৬

সেকারণেই সর্বানন্দী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অপূর্ব শিল্পচর্চার দ্বারা ধোকার টাঁটি সংসারক্ষেত্রকে 'মজার কুঠি'তে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কল্পনা করতে পারি, মজার কুঠি এই সংসারমঞ্চে "রামকৃষ্ণদেব এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া আবার কখনও বা তালে তালে করতালি দিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতেছেন।...আবার কখনও 'লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা' উদ্দামনৃত্য, যেন সেই ননীর মত কোমল দেহে সিংহের বল। গানের ভাব অনুযায়ী তাল ও লয় তরঙ্গ, তাল ও লয়ের তরঙ্গের সঙ্গে শরীরের তরঙ্গ, তাহার সহিত সমস্ত ভক্তবর্গের মনে ভাবতরঙ্গ যেন ভগবৎপ্রেমের বন্যা। ঘর দ্বার পৃথ্বী বায়ু আকাশ সমস্ত বিশ্বসংসার যেন সেই প্রেমপ্রবাহে স্পন্দিত ও আত্মহারা।"[৩২]

এই প্রেমহিল্লোলে শোভমান ভাবোল্লাসপূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে দেখে, "ডুবলো নয়ন ফিরে না এলো। গৌর রূপসাগরে সাঁতার ভুলে, তলিয়ে গেল আমার মন।" শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ঋষির প্রজ্ঞা ও শিল্পীর সূক্ষ্মানুভূতি মিলিত হয়েছে, দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের চলমান সমন্বয় ঘটেছে। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, "ঠাকুর নিজে একজন কত বড় আর্টিস্ট ছিলেন।" "সর্ববিদ্যার সহায় যুগাবতার" শ্রীরামকৃষ্ণকে আশ্রয় করে গণজীবনের দিকে দিকে নবোন্মেষ ঘটেছিল, এখনও ঘটে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে "ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে। ভারতবর্ষের চিরাচরিত লোকশিক্ষার বাহন কীর্তন, নর্তন, নাট্য, মূর্তিগড়ন ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় এই সুকুমার শিল্পগুলি সার্থক মর্যাদায় উদ্বুদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবহেলিত শিল্পীগণ সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা লাভ করে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। এই বাস্তব মূল্যায়নেও শ্রীরামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর সর্বশিল্পী-সমাদৃত শিল্পঘনমূর্তি। নান্দনিক তত্ত্বের মাপকাঠিতে তিনি শিল্প মোৎসার্ট, কিন্তু সামগ্রিকদৃষ্টিতে তিনি সচ্চিদানন্দসাগরের আনন্দফোটমাত্র।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পুনরায় কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ। সেই পবিত্র হৃষিকেশে উপস্থিত হইলেন। দুইজনে কেদার-বদরী তীর্থস্থানে যাইবার পূর্বে এইস্থানে গঙ্গার ধারে ঘাসপাতের তৈয়ারী ঝুপড়ীতে কিছুদিন বাস ও অধ্যাত্মসাধনায় দিনযাপন করেছিলেন। এক পাঞ্জাবী নানকপন্থী সাধুর সহিত তাঁহাদের এইস্থানে একান্ত হৃদ্যতা হইয়াছিল। দুইজনে যখন নিরাপদে তীর্থ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন তখন ঐ সাধু তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সেই ঘাসপাতের ঝুপড়ী তৈয়ারী করিয়া কিছুদিন হৃষিকেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেইকথা পূর্বে বলিয়াছি।

৩২। শুকদাস বর্ধন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, পৃঃ ২৪৯-৫

কালীপ্রসাদ ছিলেন চিরদিনই জ্ঞানপিপাসু। তাঁহার জীবনে সর্বদাই চিন্তা ছিল কিভাবে ঈশ্বরীয় জ্ঞান অর্জন করা যায়। সেইজন্য তিনি যখন যেইস্থানে গমন করিতেন সেইখানেই জ্ঞানী ও পণ্ডিত সাধুর সন্ধান করিতেন। তদানীন্তনকালে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে কৈলাসমঠের মোহান্ত ধনরাজ-গিরির নাম প্রসিদ্ধ ছিল। ধনরাজ-গিরি ছিলেন অদ্বিতীয় ষড়্‌দর্শনবিৎ পণ্ডিত এবং যথার্থ বৈরাগ্যবান জ্ঞানী সন্ন্যাসী ছিলেন। সেই জ্ঞানী সন্ন্যাসী ধনরাজ-গিরির নিকট কালীপ্রসাদ প্রত্যহ শাঙ্করভাষ্যসমেত সমগ্র বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন। ধনরাজ-গিরির অনুভূতিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার আত্মজীবনী 'আমার জীবনকথা-গ্রন্থে' এই সম্বন্ধে: "আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অপূর্ব শাস্ত্রবিচারশৈলী লক্ষ্য করিয়া ধনরাজগিরি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মনে পড়ে যে, স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে হৃষিকেশে উপস্থিত হইয়া ধনরাজগিরিকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন তিনি আমার কৃতসী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—'অভেদানন্দ ? অলৌকিকী প্রজ্ঞা'। স্বামিজী শুনিয়া ভবিষ্যতে আমাকে ধনরাজগিরির ঐ কথা এমনই গর্বের সহিত বলিয়াছিলেন—যাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতার প্রশংসায় কতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন।"

হৃষিকেশে থাকাকালীন কালীপ্রসাদ একান্তভাবে জপ-ধ্যান প্রভৃতি কঠোর তপস্যা এবং শাস্ত্রবিচারাদি করিতেন। সর্বদাই তাঁহার মনে জ্ঞান-বিচার চলিত। সেইজন্য তিনি একদিন চিন্তা করিলেন কিভাবে জীবনে অভেদজ্ঞানে (অদ্বৈতজ্ঞানে) সিদ্ধ হওয়া যায়। অভেদজ্ঞান বলিতে রক্ত-মাংসের শরীর জীবাত্মা দেহ ও মনের সকল সংস্কার দূর করিয়া কিভাবে পরমাত্মার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, জীবই যে শিব—এই অদ্বৈতজ্ঞানে আলোকিত হইতে পারেন। সেই সময়ে তিনি বিষ্ঠা ও চন্দন সমজ্ঞান করিয়া সাধন করিয়াছিলেন। এই সমজ্ঞানের সাধনায় তাঁহার মনে অনুভূত হইয়াছিল যে, একমাত্র জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতি।

বিষ্ঠা ও চন্দন সমজ্ঞানরূপে সাধন করিয়া কালীপ্রসাদের মনে অপূর্ব এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উদয় হইয়াছিল। তখন একদিন তিনি চিন্তা করিলেন যে, অভেদজ্ঞানে সিদ্ধ হইয়াছেন কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। সুতরাং তিনি নিজের শরীরে কঠিন অসুখ প্রার্থনা করিলেন। সত্য সত্যই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনদিনের মধ্যেই কালীপ্রসাদের শরীরে জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস ও রক্তামাশা দেখা দিল। পূর্ব হইতেই তুলসী মহারাজ সঙ্গে ছিলেন। তিনি একান্তভাবে চিন্তিত ও অসহায় হইয়া পড়িলেন। রোগাক্রান্ত কালীপ্রসাদকে লইয়া একা তুলসী মহারাজ কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে হৃষিকেশের জনমানবশূন্য প্রান্তস্থানে দেখিতে পাইলেন যে, হরিভাই (স্বামী তুরীয়ানন্দ), শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) ও সন্ন্যাল মহাশয় (তখন স্বামী কৃপানন্দ) তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে হৃষিকেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা হৃষিকেশে আসিয়া শুনিতে পাইলেন যে, সেইখানে একজন সাধু-মহাত্মা অসুস্থ ও একান্ত অসহায়।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ভবনাথ ॥

ব্রহ্মচারী প্রণবেশচৈতন্য

(চার)

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সমাজে ভবনাথ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন শুধু একটি কাজের জন্য। সেটি হল শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো তোলার ব্যবস্থা করা। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য নরনারীর বাড়ীতে ঠাকুরের যে ফটোটি পূজিত হচ্ছে, সেটি তোলাবার ব্যবস্থাপনায় ভবনাথের অনবদ্য কৃতিত্ব ও ঋণ অনস্বীকার্য। কলকাতায় তখন সবেমাত্র ক্যামেরা চালু হয়েছে। একদিন তিনি ঠাকুরের কাছে ফটো তোলার জন্য প্রার্থনা করলেন। ঠাকুর কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। ভবনাথের এক ফটোগ্রাফার বন্ধু ছিল—অবিনাশ দাঁ। বরাহনগরে তাঁর বাড়ী। ভবনাথ সেদিন ঐ ফটোগ্রাফার বন্ধুকে সঙ্গেকরে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এসেছিলেন। ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর রাধাকান্তজী মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন এবং সব শুনলেন। তিনি গিয়েই ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আরম্ভ করে দিলেন। তখন ঠাকুর রাধাকান্ত মন্দিরের বারান্দায়। প্রসঙ্গ করতে করতে ঠাকুর রাধাকান্তজীর মন্দিরের বারান্দায় বসে পড়লেন। তখন নরেন্দ্রনাথ ফটোগ্রাফারকে ফটো নিতে ইঙ্গিত করলেন। কিছুদিন পরে ফটো ঠাকুরকে দেখান হল। ফটোটি সম্বন্ধে ঠাকুর নিজেই মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, "ইহা অতি উচ্চ যোগাবস্থার মূর্তি—কালে এই মূর্তির ঘরে ঘরে পূজা হইবে।"[৫৫] এমন কি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর স্বয়ং নিজের ফটো ফুল-বেলপাতা দিয়ে পূজাও করেছিলেন।[৫৬] আবার একখানি ফটোও ঠাকুর নিজের ঘরে রেখেছিলেন।[৫৭] কিন্তু আমরা এই ফটো কোন জায়গাতে তোলা হয়েছিল সে বিষয়ে, একটু আলোচনা করব। কারণ, এনিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলছেন শিবমন্দিরের সিঁড়িতে বসে সমাধিস্থ হয়েছিলেন, কেউ বলছেন রাধাকান্তজীর মন্দিরের বারান্দায়। তবে লীলাপ্রসঙ্গে বা কথামৃতে ফটো তোলার বিবরণ আমরা পাইনি। প্রথমোক্ত মত—শিবমন্দিরের সিঁড়িতে বসা—শ্রীম দর্শনে পাই। শ্রীম দর্শনে শ্রীম বলছেন, "এ' খানা সকল মঠে পূজিত হয়। এই ছবিখানা দেখাইয়া ঠাকুর একদিন বলেছিলেন—'এর পর এ' খানা ঘরে ঘরে পূজিত হবে।' এই খানাতে মন একেবারে পরব্রহ্মে বিলীন। বাহ্য জগতের জ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত। মন পরমাত্মাতে সচ্চিদানন্দ সাগরে মিশে এক হয়ে গেছে। একাকার—সমাধিস্থ। এটি ১৮৮২-৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নেওয়া হয়। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে শিবমন্দিরের সিঁড়িতে ঠাকুর বসা ছিলেন। একজন ভক্ত ভবনাথ ফটোগ্রাফারকে আনিয়ে

৫৫। লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, সাধক ভাব, পৃঃ ৩৮০ এবং শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ (১৩৬১), পৃঃ ১৩৩

৫৬। শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ৩৯২

৫৭। কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২০৩

ঐটি নেয়।"[৫৮] দ্বিতীয় মতটি—রাধাকান্তজী মন্দিরে তোলা—আমরা সবাই জানি। দ্বিতীয় মতের পক্ষে তথা ঠাকুরের সব ফটোগুলির সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী বিশ্বাত্মা-নন্দজী (ইনি বর্তমানে ফ্রান্সের গ্রেজ্ (Greatz) কেন্দ্রে আছেন, পূর্বজীবনের নাম—জন ইয়েল, সংবাদিক) একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন বেদান্ত কেশরীতে।[৫৯] প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী সংখ্যায়।[৬০] তিনি ঠাকুরের এই ফটোটি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ,[৬১] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের লিখিত 'মন ও মানুষ', ঠাকুরের শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত', 'মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ', স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ[৬২] কথিত বিবরণ হতে। স্বামী নির্বাণানন্দজী শুনেছিলেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কাছে। তিনি এ বিষয়ে 'উদ্বোধন'[৬২(ক)] একটি ছোট্ট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী লিখেছেন, "Picture (যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি) was taken on the veranda of the Radhakanta temple at Dakshineswar. Ramakrishna was seated on the western side of the Radhakanta temple, facing across the courtyard toward the northern group of Siva temples. The most authentic account of the circumstances of this photo comes from Swami Nirvanananda, who published the following small report in the Udbodhan in 1963."[৬৩] দেখা যাচ্ছে স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের বিবরণকে প্রামাণিক হিসাবে ধরেছেন। সেসঙ্গে তিনি এর সমর্থনসূচক তথ্য পেয়েছেন উল্লিখিত প্রবন্ধ ও বইগুলি থেকে। আর এও অনুমান করা যায় যে মাষ্টার মহাশয় এ ঘটনাটি শুনেছিলেন। ঐ নির্দিষ্ট দিনে তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং স্থানের গরমিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা ছাড়া শিবমন্দিরের সিঁড়িতে সুখাসীনে বসে সমাধিস্থ হওয়া বেশ কষ্টকর ব্যাপার। অনুমান সঠিক বা ভুল সে বিচারের ভার পাঠকের উপর। অতিরিক্ত যে কয়টি অতিরিক্তাল

৫৮। শ্রীম দর্শন—স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ, ৫ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১৫০-৩৬ (১ম সংস্করণ) এ ছাড়া শ্রীম-দর্শনে অন্যান্য খণ্ডে এমত পাওয়া যায়। যথা: ২য় খণ্ড, ৮ম অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম অধ্যায়। ৮ম খণ্ড, ২য় অধ্যায়—সবগুলিই ১ম সংস্করণের।

৫৯। রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ শাখা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা।

৬০। এই সংখ্যায় (জানুয়ারী, ১৯৭৭) 'বেদান্ত কেশরী' অনুসন্ধিৎসু ও উৎসাহী পাঠকদের পড়তে অনুরোধ করছি।

৬১। উদ্বোধন, ৬৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫২৯-৫৩৩

৬২। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ।

৬২। (ক) উদ্বোধন, ৬৪তম বর্ষ, পৃঃ ৬৫৫

৬৩। Vedanta Kesari, January, 1977, P. 271.

ঠাকুরের বসা ফটো (আমাদের আলোচিত) পাওয়া যায়, তার একটিকে বর্তমান লেখকের অতি নিকট থেকে দেখবার বহুদিনের সৌভাগ্য হয়েছিল।এটি বর্তমানে বেলুড়মঠে আছে। সেটি লক্ষ্য করে এবং পুরানো 'উদ্বোধন' সংখ্যার বড় সাইজের ঠাকুরের ফটোটি দেখলে বোঝা যায় যে ফটোটি রাধাকান্ত মন্দিরে তোলা। আর যে কয়েকটি অরিজিন্যাল ফটো পাওয়া যায়, সেগুলি হল : [৩৪] (১) শ্রীমায়ের পূজিত ফটো উদ্বোধন শ্রীমায়ের বাটীতে পূজো হচ্ছে। (২) গোপালের মা পূজিত ফটো বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে আছে, (৩) বেলুড়মঠে ঠাকুরের শয়ন ঘরে এবং (৪) চতুর্থ অরিজিন্যালটি কলিকাতার অদ্বৈত আশ্রমকে দেওয়া হয়, তা থেকে জনসাধারণের জন্য প্রিন্ট করা হয়। ঠাকুরের ফটো সম্বন্ধে এখানেই শেষ করছি।

এখন আমরা ফিরে যাব ভবনাথের শেষজীবনের দিকে অর্থাৎ ঠাকুরের মহাসমাধির পর তাঁর জীবনে। ভবনাথের দুই মেয়ে ছিল। একটি মেয়ে মাত্র আড়াই বৎসর বয়সে মারা যায়। অন্য মেয়েটির নাম প্রতিভাদেবী। প্রতিভাদেবীকে স্বামীজী খুব ভাল বাসতেন, স্নেহ করতেন। ছোট বেলায় তাঁকে স্বামীজী আদর করে কোলে তুলে নিতেন। ভবনাথের কন্যার বিয়ের সময় বেলুড়মঠ থেকে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল।

ঠাকুরের মহাসমাধির পর ভবনাথ বরাহনগরের অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জি লেনের বাড়ী বিক্রি করে দক্ষিণ কলিকাতায় ভবানীপুরের গিরিশ ভাক্তার রোডের বাড়ী কিনেছিলেন। সেখানেই স্ত্রী-কন্যাসহ থাকতেন। এ সময় তিনি সরকারী বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের চাকুরী নেন। ফলে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হত। সেজন্য বরাহনগর মঠে যাতায়াত ভবনাথের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। যদিও তাঁরই একান্ত চেষ্টায় মাত্র দশ টাকায় বাড়ীটি ভাড়া পাওয়া গিয়েছিল।[৩৫]

সরকারি চাকুরীর জন্য ভবনাথকে কলকাতা ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে নাকীপুর, সাতক্ষীরা প্রভৃতি জায়গাতে ঘুরতে হত। ফলে কালাজ্বরের কবলে পড়েন। পূর্ববঙ্গ থেকে কালাজ্বর নিয়ে ভবনাথ কলকাতায় বাদুড়বাগানে বোনের বাড়ীতে উঠলেন। ঐ সময় কলকাতায় প্লেগ দেখা দেয়। সকলে জোর করে মধুপুরে ভবনাথকে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে একমাস বোনের বাড়ী থাকার পর মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভবনাথ এ ধরাধাম ত্যাগ করে চিরদিনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ লোকে চলে গেলেন।[৩৬]

●

৩৪। Vedanta Kesari, January, 1977, P. 273-74.

৩৫। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড (১৩৭০), পৃঃ ২০৮

৩৬। উদ্বোধন, ৬৮তম বর্ষে (পৃঃ ৩১৯-২০) অজিত সেন। উদ্বোধন, ৭২তম বর্ষে সতীশচন্দ্র নাগ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ এবং বরাহনগর পিপলস লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত "ভবনাথ [স্মরণী" হইতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

॥ দুই ॥

লীলাবার্তা :

[পণ্ডিত কর্তৃক ঠাকুরের পরিচয় লাভ]

অবশেষে, ন্যায়বাগীশ মহাশয় নিজের ঐ সন্দেহ নিরসনের জন্য, সেই কক্ষে সমবেত ভক্তদের দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—'এখানে পরমহংস কে আছেন ?'

'অকুতোসাহস হৃদে বীরের মতন।
জিজ্ঞাসিল ভক্তগণে প্রভু কোন্ জন ॥
আগন্তুক দ্বিজের দেখিয়া ধারা-রীতি।
ভক্তগণ জড়বৎ স্তম্ভিত প্রকৃতি ॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৬

পণ্ডিত শ্যামাপদকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্যের মত, জুতাপায়ে ঐ ঘরে উপস্থিত দেখে ভক্তগণ শঙ্কিত হন ; তার উপর বিদ্যাভিমানে এঁর গর্বিত হাবভাব লক্ষ্য ক'রে এবং সেই সঙ্গে এঁর অবিনীত কথা শুনে তাঁরা একেবারেই স্তম্ভিত হ'য়ে যান। তাঁরা তখন লজ্জায় জড়সড় ও নির্বাক্ হয়ে কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখপানে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত ক'রতে থাকেন।

তাঁদের নিরুত্তর দেখে, পণ্ডিত সেইভাবে আবার জিজ্ঞাসা করেন—'এখানে পরমহংস কোন্ জন ? আমি তাঁকেই দেখতে এসেছি।'

'পরশিয়া দ্বিজ পুনঃ করিল জিজ্ঞাসা।
কে বটে পরমহংস দেখিবারে আসা ॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৬

উপস্থিত ভক্তেরা তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখকমলে মৃদুমন্দ হাসির রেখা দেখতে পান। তার ফলে, তাঁরা আশ্বস্ত হ'য়ে, তাঁর প্রতি আগন্তুক পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন এঁর মন মহারঙ্গ-কৌতুকে ভরে ওঠে এবং ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে একজন নগণ্য ব্যক্তি ভেবে, তাঁর খাটের উপরে গিয়ে বসেন।

'শ্রীঅঙ্গে না হেরি কোন সাধুর লক্ষণ।
জটা ভস্ম বাঘছাল সৈন্যিক বসন ॥
ব্রাহ্মণ সামান্য জ্ঞান করিয়া তাঁহায়।
একাসনে শ্রীপ্রভুর বসিল ঘটায় ॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৬

[ঠাকুরের সঙ্গে পণ্ডিতের রহস্যালাপ]

পণ্ডিত শ্যামাপদ এসে পাশে ব'সলে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ স্বভাববশে, এঁকে বিনীতভাবে নমস্কার ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানান। কিন্তু তাতে ইনি তেমন মনোযোগ দেন না ; বরং কৌতুক-ভরে কেবলই তাঁর মুখপানে চাইতে থাকেন এবং সমস্ত ব্যাপারটাকেই একান্ত হাস্যকর ব'লে সিদ্ধান্ত করেন।

তারপর ইনি রঙ্গ-পরিহাসের সুরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেন—'আপনিই পরমহংস ? আপনাকে দেখে কিন্তু চেনা যায় না। আমি দেখছি, আপনি বেশ মজায় এখানে রয়েছেন। কিন্তু এমন জমজমাট আসর আপনি ক'রলেন কেমন ক'রে ? আমি তো সারাটা জীবন এতশত শাস্ত্র-পুঁথি ঘেঁটেও পোড়া উদরটারও পোষণ ক'রতে পারছি না। আর আপনি তো কিছু না শিখে-পড়ে, শুধু 'পরমহংস' নামটি নিয়েই এমন সুন্দর পসার জমিয়ে ব'সেছেন। কিন্তু এতসব ক'রলেন কী বলে ও কৌশলে ?

'বড়ই মজায় ভাই আছ এইখানে।
জমাট আসর হেন করিলে কেমনে ॥
আজন্ম ঘাঁটিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ অগণন।
না পারি করিতে পোড়া উদর-পোষণ ॥
লইয়া পরমহংস নাম মাত্র এক।
কেমনে করিলে তুমি পসার এতেক ॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৬

পণ্ডিতের কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর এঁর মুখপানে চেয়ে, বালকের মত কেবল মৃদুমন্দ হাস্য করেন। পণ্ডিত কথা ব'লতে ব'লতে আবার সেই ঘরের চারদিকের যত সব জিনিসপত্র, বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখতে থাকেন। সেই অবসরে শ্রীশ্রীঠাকুর এঁর সঙ্গে মধুর রঙ্গ-লীলা শুরু করেন। ঐ ঘরের যে-সব জিনিসপত্রে এঁর সন্ধানী দৃষ্টি পৌঁছে না, তিনি সেগুলিও সহাস্যবদনে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে এঁকে দেখিয়ে দেন।

'দেখিতে না পায় যাহা নিজে দ্বিজবর।
রঙ্গহেতু রঙ্গপ্রিয় লীলার ঈশ্বর।
অঙ্গুলি নির্দেশ করি দেন দেখাইয়া।
প্রফুল্ল মুখারবিন্দে হাসিয়া হাসিয়া ॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৬

বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতের সঙ্গে বালক-স্বভাব শ্রীশ্রীঠাকুরকে মধুর রঙ্গ ক'রতে দেখে উপস্থিত ভক্তগণ আহ্লাদিত হন। সেই অবকাশে পণ্ডিত শ্যামাপদ সেখানে উপস্থিত ভক্তদেরও প্রত্যেককে বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করেন। তারপর ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে উপহাস করে আবার বলেন—'আপনি এঁদের কী ক'রে বশ ক'রলেন ? এঁদের চেহারা, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আচরণ দেখে তো মনে হ'চ্ছে, এঁরা সবাই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের ভদ্র সন্তান। দেখুন, আপনি নিজে যা হ'য়েছেন এবং যেভাবে কাটাচ্ছেন, তাতে ক্ষতি নাই; বরং এতে আপনার অনেক লাভই হ'চ্ছে। কিন্তু এইসব নিরীহ, শিক্ষিত ও ভদ্র সন্তানদের এভাবে নষ্ট করা আপনার পক্ষে কখনই উচিত নয়।

'চেহারা সুবেশে বেশ হয় অনুমান।
সম্ভ্রান্ত বংশের সব ভদ্রের সন্তান ॥
নিজে হইয়াছ যাহা ক্ষতি নাহি তায়।
পরের ছাওয়ালে নষ্ট শোভা নাহি পায় ॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৬

শ্রীশ্রীঠাকুর আগন্তুক পণ্ডিতের মুখে অত অশোভন কথা শুনেও এঁকে কিছুই বলেন না ; বরং নীরবে মধুর হাস্য ক'রতে থাকেন। তাতে ইনি তাঁর বিষয়ে আরও নিরাশ হন।

[ভক্তদের সঙ্গে পণ্ডিতের কথাবার্তা]

তারপর পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ভক্তদের সম্বোধন ক'রে ব'লতে শুরু করেন—'শাস্ত্রে পরমহংস কাকে বলে, আপনারা শুনুন'—এই ব'লে ইনি বেদান্তাদি শাস্ত্র থেকে ঐ বিষয়ে নানা শ্লোক উদ্ধার ক'রে পরমহংসের লক্ষণগুলি একে একে বর্ণনা করেন। বস্তুতঃ, বিদ্যামদে গর্বিত এই পণ্ডিত শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়েই ঐ বিষয়ে নিজ জ্ঞান ও চর্চানুসারে, সাধ্যমত সমস্তই তাঁদেরকে শোনান।

'পণ্ডিতের চূড়ামণি বিদ্যাবন্ত বটে।
বিশেষ করিল ব্যাখ্যা শাস্ত্রে যাহা রটে।'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৩

যা হোক, ভক্তদের নিকট ঐভাবে নিজের জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা জাহির করার পর পণ্ডিতের মন অনেকটা হাল্কা হয়। তারপর মনে হয়, ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলাপনাদি করে—তাঁর নিবাস, টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষাদীক্ষা, কী সূত্রে সেই কালীবাড়িতে আসা, সেখানে কতকাল বাস ক'রছেন, যাজনিক ক্রিয়াকর্ম ও পূজা-পাঠাদি বিষয়ের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সংবাদ সাগ্রহে তাঁর নিকট হ'তে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরও কথাপ্রসঙ্গে এই পণ্ডিত মহাশয়ের বাসস্থান, কাজকর্ম, উত্তরপাড়ায় আগমনের হেতু, কী উদ্দেশ্যে সেই কালীবাড়িতে আসা প্রভৃতি সম্বন্ধে এঁরও খোঁজ-খবর নেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হুগলি জেলার কামারপুকুরের অধিবাসী এবং শ্যামাপদ পণ্ডিতও ঐ জেলারই আঁটপুরেরর বাসিন্দা। এই পরিচয়ে মনে হয়, উভয়েই আহ্লাদিত হন এবং পরস্পর অতি নিকট সম্পর্ক ও মমতা-প্রীতির এক মধুর আকর্ষণ অনুভব করেন।

[পণ্ডিত কর্তৃক সৎপ্রসঙ্গ]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথাপ্রসঙ্গে শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের নিকট কিছু তত্ত্ব-কথা শুনতে চান। তখন ইনি ঐ বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপন করেন। এঁর কথাবার্তা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দিত হন এবং বুঝতে পারেন যে, ন্যায়-বেদান্তাদি শাস্ত্র ইনি ভালভাবে চর্চা ক'রেছেন ; তাছাড়া ইনি বেশ সরল, অকপট ও স্পষ্টবাদী। সেই কারণে তিনি স্বভাবতঃই এঁর প্রতি বিশেষ করুণা-পরবশ হ'য়ে ওঠেন এবং এঁকে যথেষ্ট সমাদর ও আপ্যায়ণ করেন।

তারপর ক্রমশঃ সন্ধ্যা-আগতপ্রায় দেখে, পণ্ডিত মহাশয় উত্তরপাড়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ এঁকে সবিনয়ে বলেন—'সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে, আজ আর আপনার গিয়ে কাজ নেই। আপনি আজ এখানেই থেকে যান। এই অসময়ে অতটা পথ হেঁটে যেতে

কষ্ট হবে। এখানে রাত্রে থাকলে, আপনার কোন অসুবিধাই হবে না। যত্ন-সমাদর, রাত্রের সেবা, সবই পাবেন এখানে'।

'বুঝি না বুঝিলা কিবা প্রভুর কথায়।
থাকিব বলিয়া তবে দ্বিজ দিল সায়।'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৭

শ্রীরামকৃষ্ণের মমতাপূর্ণ ঐ অনুরোধ পণ্ডিত মহাশয় অবশেষে, এড়াতে পারেন না; সেদিন সেখানেই রাত্রিবাস ক'রতে সম্মত হন।

তারপর ইনি সেখানকার মনোহর পুরীস্থিত দেবদেবীর বিগ্রহসমূহ ও মন্দিরগুলি দর্শনের জন্য বাহিরে যান এবং দর্শনাদি সেরে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ফিরে আসেন। সেই অবসরে ঐ ঘরে আরও কিছু ভক্তের সমাগম হয়।

[ঠাকুরের ভাবাবেশ]

"সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া পণ্ডিত 'সন্ধ্যা করিতে যাই', বলিয়া গঙ্গার তীরে চাঁদনীর ঘাটে গমন করিলেন।"—কথামৃত ৪র্থ। ২৪।১।২৮৫।

কিঞ্চিৎ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরও নিজ আসন ত্যাগ ক'রে বাহিরের গোল বারান্দায় আসেন। তখন ভক্তেরাও সাগ্রহে তাঁকে অনুসরণ করেন।

'মন্দির হইতে ক্রমে আসিয়া বাহিরে।
উপনীত পুষ্পোদ্যানে জাহ্নবীর তীরে।'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৭

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ পুষ্পোদ্যানে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হ'য়ে গঙ্গা, আকাশ, বৃক্ষরাজি, কুসুমমালা ও ঠাকুরবাড়ির মনোরম শোভা উপভোগ ক'রতে থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য ভাল নেই, কয়েকমাস ধ'রে ক্রমাগত গলরোগে ভুগছেন। ইদানীং তাঁর কাতরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও লোকহিতসাধনের চেষ্টার বিরাম নেই। অনুরাগী ভক্তদের পেলে, তিনি ঐ ব্যাধির যাতনার কথা ভুলে যান এবং তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় তত্ত্বালাপনে মত্ত হন; আবার উপযুক্ত আধার পেলে, তাকে অযাচিতে পরমার্থদানেও কৃতার্থ করেন।

'দয়াময় প্রভুদেব দয়ার সাগর।
ভাবরূপ তরঙ্গ তাহাতে নিরন্তর।'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৭

সেখানে তাঁর শ্রীঅঙ্গে সহসা দিব্য আবেশের সঞ্চার হয়। তখন তিনি ঐ ভাবের প্রেরণায় টলমল ক'রতে থাকেন এবং ঐ অবস্থায় ধীরে ধীরে নিজ ঘরে ফিরে এসে ছোট খাটটিতে বসেন।

তখন ভক্তেরা অনেকেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘরে ফিরে আসেন এবং তাঁদের কেহ কেহ বাহিরে সেই উদ্যানেই থেকে যান। যা হোক, শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ খাটে একটু ব'সেই, ভাবের প্রাবল্যে আবার উঠে পড়েন এবং সেই ঘরের দেয়ালে শোভিত দেবদেবীগণের চিত্রপটগুলির সামনে গিয়ে, করতালি দিয়ে মধুর কণ্ঠে নামগান ক'রে, পাদচারণ ক'রতে থাকেন।

[পণ্ডিতের অভাবনীয় অনুভূতি লাভ]

'শুন তবে হেথা কিবা করে দ্বিজবর।
বসিয়া সন্ধ্যার কর্মে ঘাটের উপর॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৭

পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য চাঁদনীর ঘাটে গঙ্গায় মুখ-হাত ধুয়ে, সেখানে এক নির্জন স্থানে সান্ধ্য-সন্ধ্যা ক'রতে বসেন। প্রথমে ইনি বাহ্য কৃত্যগুলি যথাবিধি সমাপন করেন; তারপর ইষ্টমূর্তির ধ্যান-ধারণায় ক্রমশঃ প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও ইনি ধ্যানে ইষ্টমূর্তির চিন্তা-ভাবনা ক'রতে পারেন না। সেই মূর্তির পরিবর্তে বার বার কেবল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসন্ন-প্রশান্ত রূপ এঁর হৃদয়কমলে উদ্ভাসিত হ'তে থাকে।

'ধিয়ানে ইষ্টের মূর্তি দেখিতে না পায়।
হাজির সেখানে প্রভু রামকৃষ্ণরায়॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৮

তার ফলে, ভট্টাচার্য মহাশয় বিষম সমস্যায় পড়েন। তখন ইনি মনে মনে ভাবেন যে, অতক্ষণ ধরে পরমহংসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভ এবং তাঁর সঙ্গে বিচিত্র রহস্য-পরিহাস ও কথোপ-কথনাদির প্রভাবেই, নিশ্চয় এমনটি হ'চ্ছে।

তারপর ইনি নানা যুক্তি-বিচার দ্বারা পরমহংসের চিন্তা মন থেকে দূর ক'রতে চেষ্টা করেন এবং সেই সঙ্গে নিজ অভীষ্ট দেবতার মূর্তি ধ্যানের জন্য একান্তভাবে যত্নশীল হন। কিন্তু কিছুতেই ইনি তা ক'রতে সমর্থ হন না; তার স্থলে কেবলই পরমহংসের শ্রীমূর্তি জল্‌জল্ ক'রতে থাকে।

'আজীবন যেই ইষ্টদেবের মুরতি।
স্মরণ মনন ধ্যান করে নিতি নিতি॥
অন্তরের পটে আঁকা ছিল মূর্তিমান।
আজি সে মুরতি দ্বিজ দেখিতে না পান॥
... ...
নয়ন মুদিলে হৃদে ইষ্ট নাহি মিলে।
কেবল প্রভুর মূর্তি তাহার বদলে॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৮

ক্রমাগত এমন ঘটতে দেখে, পণ্ডিত মহাশয় শেষে বুঝতে পারেন যে—'পরমহংসের দিব্য মহিমার প্রভাবেই আমার এমনটি হ'চ্ছে। তিনি নিশ্চয়ই, নিজ অপার গুণে, আমায় অযাচিতে কৃপা ক'রেছেন। তারই ফলে, আমার চৈতন্যোদয় হ'চ্ছে; আর যিনি আমার পরমারাধ্য অভীষ্ট দেবতা, তিনিই নরনারীরে এখানে পরমহংসরূপে সাক্ষাৎ বিরাজিত'।

'চৈতন্য উদয় এবে প্রভুর কৃপায়।
ইষ্ট যিনি তিনি এই রামকৃষ্ণরায়॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৮

(ক্রমশঃ)

॥ জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যসখা ॥

শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবনের অনুপম লীলায় যাঁরা ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত তাঁরাও নিঃসন্দেহে দেশবাসীর স্মরণ-মননের দাবীদার। কিন্তু এঁদের মধ্যে দু'একজন দেখা যায় উপযুক্ত স্মরণ ও চর্চার অন্তরালেই আজও থেকে গেছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেতিবৃত্তে অতি সামান্য পরিসরে দু'একটি উল্লেখমাত্রেই সীমিত হয়ে আছেন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলায় তাঁদের ভূমিকার গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য কোনোক্রমেই অল্প মূল্যের বলা চলে না। শ্রীনিবাস ওরফে চিনু শাঁখারী এই ধারণার একটি জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকালে যাঁরা তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় ও মধুর প্রেম-সম্বন্ধে স্বয়ং কৃতার্থ হয়েছিলেন, শ্রীনিবাস শাঁখারী সেই অগ্রন্থীবৃন্দের অন্যতম। আবার গৃহস্থ হয়ে যাঁরা আধ্যাত্মিকতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা প্রভৃতি সাধুজনোচিত গুণরাশি নিজজীবনে প্রকটনপূর্বক দেখিয়েছিলেন, শ্রীনিবাস তাঁদেরও মধ্যে অতি উচ্চাসনের অধিকারী।

শ্রীনিবাস ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যসখা। তিনি শাঁখারী বংশে জন্মগ্রহণ করলেও ভগবদ্ভক্তিতে অনেক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বড় ছিলেন। সাধন করতে করতে তাঁর ভেতরে এক সময়ে কিছু বিভূতি সিদ্ধাই ফুটেছিল। বালক গদাধরের সঙ্গে এই সৌম্যমূর্তি পরমবৈষ্ণবের এক মধুর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। গদাধরকে দেব-অংশসম্ভূত বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল এবং তিনি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহও করতেন। তাই কখনো কখনো গদাধরকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি আদর করতেন আর বলতেন, 'ওরে গদাই, তোকে দেখে আমার গৌরকে মনে হয়।'

শ্রীনিবাসের আশ্রম ও একটি ছোট্ট দোকান ছিল গদাধরের বাড়ীর নিকটেই। দোকানে অল্প আয়। গদাধর যখনই দোকানে এসে বসে, তাঁর মনে হয়, কোথাও যেন আর কষ্ট নেই। রাত যতোই অন্ধকার হোক, গদাধর যেন চিরন্তন সুপ্রভাত। যাই একটু বাড়তি রোজগার হয় তাই দিয়ে মিষ্টি কিনে গদাধরকে খাওয়ান। গদাধর খায় আর শ্রীনিবাস চেয়ে দেখেন। ওদিকে খদ্দের এসেছে দোকানে, সে খেয়াল নেই। গদাধরকে যেন চিনতে পেরেছেন শ্রীনিবাস।

গদাধর কামারপুকুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, খবর পৌঁছেছে শ্রীনিবাসের দোকানে। তাই পরিপাটি করে মালা গেঁথে, কোঁচড়ে করে মিষ্টি নিয়ে এলেন তিনি। মাঠে ডেকে এনে পরিয়ে দিলেন মালা। গদাধর বলে, 'কি যে করো তুমি, এখন কি যাত্রা হচ্ছে যে তুমি আমায় মালা পরাচ্ছো? তার চেয়ে মিষ্টির ঠোঙাটা দাও।' 'দিচ্ছি গো দিচ্ছি—'বলে মিষ্টিগুলো নিজের হাতে খাওয়াতে লাগলেন শ্রীনিবাস। জলে চোখ ভেসে যাচ্ছে। করজোড়ে বলছেন, 'গ্রাম ছেড়ে শহরে চলেছো, মর্ত ধামে তোমার কত লীলাখেলা হবে, কিছুই দেখতে পাবো না। ক'দিন আর বাঁচবো? তবু আজ যে আমাকে একটু ভাল করে চিনতে দিলে, আমার পায়ের কড়ি হয়ে রইলো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সঙ্গে কামারপুকুরে ফিরলেন। ইতিপূর্বে প্রায় সাড়ে ছ'বৎসরকাল শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে আগমন করেননি সুতরাং শ্রীনিবাস প্রমুখরা তাঁকে দেখবার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন, তাই ছুটে এলেন। ভক্ত শ্রীনিবাসকে পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিবারবর্গের সকলে বিশেষ আনন্দিত হলেন। ভক্তিমতী ব্রাহ্মণীও শ্রীনিবাসের বিশ্বাস-ভক্তিদর্শনে পরিতুষ্টা হলেন। মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্গে অতিবাহিত হল এবং শ্রীশ্রীরঘুবীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হলে শ্রীনিবাস প্রসাদ পেতে বসলেন।

প্রসাদ পাবার পর এঁটো পরিষ্কার করতে যাচ্ছে শ্রীনিবাস। ব্রাহ্মণী তাঁকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, 'থাক, এ এঁটো আমি তুলবো।' শ্রীনিবাস তা মানতে মোটেই রাজি নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণীর রূঢ় নিষেধের কাছে তাঁর আর হাত উঠলো না। অগত্যা নিরস্ত হয়ে শ্রীনিবাস নিজ বাড়িতে ফিরলেন।

আনুমানিক বাংলা ১২২৫-২৬ সালের নিকটবর্তী কোনো সময়ে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর বয়ঃক্রম যখন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর তখন তাঁদের একমাত্র কন্যা বিলাসিনীকে রেখে তাঁর পত্নী মারা যান।[২] শ্রীনিবাসের কন্যাটি ছাড়া আর কেউ আপনজন ছিল না। তিনি সংসারের অসারতা বুঝে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেননি। শ্রীনিবাস সৎগুরুর অনুসন্ধান করতে থাকেন, অবশেষে হরিসভার নিকটবর্তী নদেপাড়ার বৈষ্ণবদের মঠের মোহন্ত এক পরমধার্মিক সর্বত্যাগী কৃষ্ণভক্তের সন্ধান পান এবং তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীনিবাস কালে তাঁর কন্যা বিলাসিনীর বিবাহ দেন। কিন্তু দৈবচক্রে বিলাসিনী স্বামীর প্রাণান্ত ঘটে। সেই থেকে একমাত্র স্নেহের কন্যাকে নিজের কাছে রেখে দেন। পরে তাঁকেও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করান। তাঁর আশ্রমের ঈশানকোণে একটি গৃহে নিমকাঠের নির্মিত মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের প্রতিমূর্তি এবং মৃত্তিকার সুন্দর গঠনযুক্ত রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি বিরাজ করত। শ্রীনিবাস সদাসর্বদা এই দেবতাদের পূজার্চনার সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি কোনোসময়ই আহার্যবস্তু বা অর্থ জমা করে রাখতেন না। যদিও কোনো সময় কিছু জমা হলে, তৎক্ষণাৎ তিনি হরিনাম সংকীর্তন করে সাধু-সন্ন্যাসী, অনাথ-আতুরদের সেবাকার্য করে তা ব্যয় করে দিতেন। অহিংসাধর্ম পালনে শ্রীনিবাস এতদূর যত্নবান ছিলেন যে, কীট পতঙ্গাদিকেও কখনো কোন কারণে আঘাত করতেন না।

শ্রীনিবাস পাঁচরীর অদ্ভুত শক্তির একটি গল্প আছে, এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিচিত কয়েকজন কামারপুকুরে শ্রীনিবাসের বাড়িতে গিয়ে অতিথি হলেন। তখন আমের সময় নয়, তাঁরা কিন্তু তাঁদের চিনুদাদাকে বললেন, 'আমাদের আমের টক্ দিয়ে মৌরলামাছ খেতে বড় ইচ্ছা।' অতিথি নারায়ণ, তাঁরা আম দিয়ে টক্ খাবেন বলছেন। মাছ যদিও জোগাড় হল কিন্তু আম এখন কোথায় পাই? চিনুদা ভেবেই অস্থির, কেমন করে মুখ রক্ষা হবে। কাজর

১। শ্রীনিবাস শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা প্রায় ১৫। ১৬ বৎসরের বড় ছিলেন। শ্রীনিবাসের কন্যা বিলাসিনী প্রভৃতি শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা শুনেছিলেন।

২। বিলাসিনী জন্ম হয়েছিলেন ১২৫০-৫২ সাল নাগাদ এবং তিনি প্রায় ৮০-৮২ বৎসর জীবিত ছিলেন।

হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি উপায়ান্তর না দেখে জোড় হাতে গলায় কাপড় দিয়ে একটি আমগাছের তলায় গিয়ে বললেন, 'আমার ভিটেয় আজ ছলনা করতে নারায়ণ অতিথিরূপে এসে বলছেন, অসময়ে আম দিয়ে মাছের টক্ খাবেন। আমি বড় গরীব। দীনহীন পথের কাঙাল। কেমন করে তাঁদের তুষ্ট করবো? দেবতা। কি দয়া করবেন না?'—তারপর আশ্চর্য। সত্যি-সত্যিই গুটিকয়েক কাঁচা আম গাছ থেকে মাটিতে পড়লো। চিনুদা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচতে নাচতে তাই দিয়ে টক্ রাঁধিয়ে তাঁদেরকে পরিতুষ্ট করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরিণত বয়সেও শ্রীনিবাসের সঙ্গে যে তাঁর প্রেম-সম্পর্ক অটুট ছিল, তা বলাই বাহুল্য। সাধনার অন্তে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মাঝে মাঝে কামারপুকুরে এসে অবস্থান করতেন, তখন শ্রীনিবাস বহুক্ষণ তাঁর সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে কালযাপন করতেন। সরল-বিশ্বাসী শ্রীনিবাসের ভক্তি-ভালবাসার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং অনেকের নিকট উল্লেখ করতেন। জানা যায়, ওই লোকগুলি শ্রীনিবাসের এই অদ্ভুত শক্তির কথা পরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন এবং তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, 'যে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন' ইত্যাদি।

শ্রীনিবাস শেষ বয়ঃক্রমকালে বহু পাষণ্ড ব্যক্তিকে সৎপথে এনে দীক্ষিত করেন এবং সন্ন্যাস বা বৈষ্ণবধর্মের নানা অনুষ্ঠান করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আনুমানিক তাঁর লোকান্তরকাল বাংলা ১২৯৬-৯৮ সাল। মৃত্যুর পর তাঁরই দীক্ষিত শিষ্যগণ তাঁর নশ্বর দেহখানি শোভাযাত্রা-পূর্বক মুকুন্দপুরে বুড়োশিবের মন্দিরের পশ্চিমদিকে সমাধি দেন। এর কিছুকাল পরে সমাধিস্থানে তাঁর ভক্ত-শিষ্য-কর্তৃক শ্রীনিবাসের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি মন্দির নির্মিত হয়। বর্তমানে কেবল তাঁর সমাধিমন্দির ও বাস্তুভিটা ভিন্ন তাঁর বসতবাটীর অপর কোনো চিহ্ন বিদ্যমান নেই। শ্রীনিবাসের ভিটাটি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান থেকে কিছু পূর্বেই অবস্থিত। সম্প্রতি এই স্থানটি শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

●

।। শিবরাত্রিগীতি-আলেখ্য ।।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

প্রথমে শঙ্খবাদন। শঙ্খ ধীরে ধীরে ও স্তবপাঠ সুরে (সমবেত-কণ্ঠে)—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং,
সুরতরুবরশাখা লিখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং,
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।

৪

শঙ্খ, ডমরু, ঘণ্টা, শিঙ্গা প্রভৃতি বেজে উঠলো। পরে সমবেতভাবে শিবসংগীত—

কেদারা—কাওয়ালী

জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারী,
পাশী পশুপতি পিণাকধারী।
শিরে জটাজুট কণ্ঠে কালকূট,
সাধকজনগণ-মানসবিহারী॥
ত্রিলোকপালক ত্রিলোকনাশক
পরাৎপর প্রভু মোক্ষবিধায়ক,
করুণা-নয়নে হের ভক্তজনে,
লয়েছি শরণ পদে তোমারি॥

শিবচতুর্দশী সমাগত। এই চতুর্দশী পরমকল্যাণময় শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিব মঙ্গলময়। পরমশান্তি তিনি দান করেন শরণাগত ভক্তজনকে।

মাঘ ও ফাল্গুনের মিলনমুহূর্তে কৃষ্ণাচতুর্দশীই (শিবরাত্রি বা শিবচতুর্দশী)। ফাল্গুনমাস নিয়ে আসে নবকুসুমান্বিত সবুজসুষমামণ্ডিত সরস-বসন্তের আগমনবার্তা। শীতের জড়তা-গ্লানিমা ও অবসাদ দূর ক'রে নববসন্ত। শিবচতুর্দশী বিশ্বের জীবনছন্দে দেয় দোলা; বিশ্বচরাচরের অন্তরে আনে প্রদীপ্ত প্রেরণা ও নবজাগরণের শুভ-আশীর্বাদ।

শিব বেদের রুদ্রদেবতা। উপনিষদে ও পুরাণে শিব-পঞ্চানন। বৈদিকসাহিত্যে শিবকে জ্যোতিষ্কদেবতা সূর্য বলেও কল্পনা করা হয়েছে। শিব পুনরায় রাত্রিদেবতা অগ্নি। তেজোময় অগ্নি রাত্রির অন্ধকার দূর করে। সূর্যও তাই। প্রাচীন ভারতে অগ্নি তাই পৃথিবীবাসী সূর্য বলে কল্পিত। কল্যাণময় শিব সর্বপ্রাণীর অন্তরের অশান্তি ও অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ করেন, সেজন্য সূর্য, অগ্নি ও শিব এক ও অভিন্ন। পবিত্রতাকামী সাধক ও ভক্তগণ শিবচতুর্দশীর রাত্রে শিবের আরাধনায় রত হয়ে শিবনাম গান করেন—

(কেদারা—ঢিমা-ত্রিতাল)

'শিব শিব' বল জীব, ঘুচিবে অশিব সব,
শিবনাম ভরসা করি বিশ্ব পালেন কেশব।
বিরিঞ্চি করেন সৃষ্টি, শিবপদে রাখি দৃষ্টি,
কালচক্র গ্রহ-বৃষ্টি শিবনামে পরাভব॥
শিব এ' বিশ্বের সার, জ্ঞানগুরু বিশ্বাধার,
শিব-বিনা নাহি আর নিস্তার-কারণ।
অতএব শিবনাম গান কর অবিরাম,
পাইবে পরমধাম নামের গুণ কি কব॥

ফাল্গুনের এই পবিত্র কৃষ্ণা-চতুর্দশীর রাত্রে চার প্রহরে শিবের চারটি রূপের ধ্যান ও আরাধনা করেন ভক্তজন। প্রথম প্রহরে ঈশান, দ্বিতীয় প্রহরে অঘোর, তৃতীয় প্রহরে বামদেব ও চতুর্থ প্রহরে শিব সদ্যোজাত। ঈশান আকাশের অধিদেবতা, অঘোর তেজের, বামদেব জলের ও সদ্যোজাত পৃথিবীর অধিদেবতা। সুতরাং ভূততত্ত্বরূপ ক্ষিতি, অপ: তেজ: ও আকাশেরই পূজা ও ধ্যান করা হয় শিবচতুর্দশীতে। এই প্রধান সূক্ষ্ম-ভূতচতুষ্টয়ের অধিষ্ঠাতা ভূতনাথ-শিবের আরাধনা ক'রে মুক্তিকামী মানুষ জীবনে পায় পরমশান্তি ও পরমসান্ত্বনা।

শিবচতুর্দশীর রাত্রে শিব-আরাধনা সংসারবিরাগী এবং সংসারের ধনী ও নির্ধন সকলের পক্ষেই সহজ সরল, কেননা পূজার সামগ্রী-এর সামান্য—একটি বিল্বপত্র ও অন্তরের শ্রদ্ধানিবেদন এই শিবপূজার প্রধান উপকরণ। সাধক ঐশ্বর্যহীন নিরাভরণ এই আরাধনাকে স্মরণ করে তাই গেয়েছেন,

ছায়ানটবিশ্র—কাওয়ালী.

বেলপাতা নেয় মাথা পেতে গাল বাজালে হয় খুসী।
মান অপমান সমান তো তার, তার কাছে নয় কেউ দোষী॥
এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে সে তার ডাকে,
'বম্ ভোলা' বোল বলে কেন লওনা যেচে যা খুসী;
যা ফেলে দেছে নেয় সে বেছে, ভাল-মন্দ নাই হুঁসই॥

এই শিব-আরাধনাময় শিবব্রত শিবমাহাত্ম্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। দেব-দানব-গন্ধর্বসেবিত রম্য-কৈলাসশিখর। পবিত্র আকাশগঙ্গাপ্লাবিত তটভূমিতে ভূষারধবল মহাদেব ও গলিত-কাঞ্চনবর্ণা পার্বতী আসীনা। সিদ্ধচারণগণ উদাত্তকণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে শিব-পার্বতীর বন্দনায় রত। স্বর্গবাসিনী অপ্সরা ও দেববালাগণ নৃত্যসহযোগে ভূতনাথ-শিবের গুণগান করছে—

ঝিঁঝোটি—দাদ্‌রা

শঙ্কর মহাদেব দেব সেবক সুর জাকে।
ভস্ম-অঙ্গ শীর্ষ-গঙ্গ, বাহন অতিবল-প্রচণ্ড,
গৌরী অরধাঙ্গ সঙ্গ ভস্ম রঙ্গ ছাকে॥
ধ্যাবত সুর নর-মুনীশ, গাবত গিরিজা গিরীশ,
গাবত নহী পার শেষ ব্রহ্মাদিক থাকে॥
বর্ণত জন তুলসীদাস, গিরিজাপতি চরণ-আশ,
ঐ সে ঘর বেশ নাথ ভক্তহেতু তাকে॥

শিবসংগীতে ভোলানাথ সর্বদাই পরমপরিতুষ্ট। পার্বতীও সুখপ্রসন্না। গিরিজা সহাস্যে শিবপূজাতিথির মাহাত্ম্য কি জিজ্ঞাসা করলে দেবাদিদেব প্রাণীহিংসক এক ব্যাধের কাহিনী প্রকাশ করলেন দেবীকে।

পরমপবিত্র শিবপুরী বারাণসী। মহাদেব শিবের সেখানে চির-অধিষ্ঠান। পুণ্য বারাণসীর একপ্রান্তে বাস করতো বর্বরকায় কৃষ্ণবর্ণ অতিনির্মম প্রকৃতির এক ব্যাধ। পিঙ্গলবর্ণ তার চক্ষু ও কেশজাল। প্রাণীহিংসাই ছিল তার জীবনের একমাত্র বৃত্তি। বর্বা ও মুষলের আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করতো সে প্রাণীসকলকে। একদিনের কথা। মুষলহস্তে বহির্গত হোল ব্যাধ এক গভীর জঙ্গলে ও পশু শিকার করলো অগণিত মনের আনন্দে। ক্রমে সন্ধ্যা হলো সমাগত। মাংসভার স্কন্ধে নিয়ে সে চলে গৃহাভিমুখে। কিন্তু এতই পশু হত্যা করেছিল সেদিন যে, পশুভারে পরিশ্রান্ত হয়ে সে বিশ্রাম গ্রহণ করলো এক বিশাল বিল্ববৃক্ষমূলে ও নিদ্রাভিভূত হলো কিছুক্ষণ পরে। ঘনবৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন অরণ্যের প্রাকৃতিক ঘন-অন্ধকার আরো ঘনীভূত ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে।

অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর ব্যাধ জাগ্রত হয়ে দেখলো ঘন-তমসায় আবৃত চতুর্দিক। পথের চিহ্নমাত্র নাই কোনদিকে। শ্বাপদসঙ্কুল ছিল সেই গভীর অরণ্য। সম্মুখে দেখলো বৃক্ষবাহী অসংখ্য লতা। লতাসূত্রে বন্ধন করলো সে' মাংসভার ও বিল্ববৃক্ষের একটি শাখার সঙ্গে রাখলো তা সংলগ্ন ক'রে। ক্ষুধার্ত, শীতার্ত ও কম্পিত সে। নীহারবারিসিক্ত তার সর্বকলেবর। দৈবযোগে বিল্ববৃক্ষের মূলে ছিল একটি অপরূপদর্শন বাণলিঙ্গ। শিবরাত্রি-তিথিযুক্ত ছিল সেই গভীর নিশা। অতর্কিতে আন্দোলিত হলো ব্যাধের হস্ত। করস্পর্শে আন্দোলিত বিল্বশাখা ও পতিত হলো হিমসিক্ত একটি বিল্বপত্র বাণলিঙ্গের মস্তকে। সেই পরমমুহূর্তে শিবপূজার অনুষ্ঠান করলো ব্যাধ অজ্ঞাতে ও অতর্কিতে। পরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো সে ক্ষণেকের জন্য। তখন স্বপ্ন দেখলো এক অপরূপ।

তন্দ্রার ঘোরে পূজায় রত ব্যাধ দেখ্‌লো আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত এক দেবলোক। আসীন সেই লোকে প্রমথগণসঙ্গে ভোলানাথ-শিব। ভাঙ্‌পানে ঢুলু ঢুলু শিবের নেত্র, কর্ণে ধুতুরার ফুল, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত ভুজঙ্গমাল্যে সুশোভিত শিবের কলেবর ও কালীনামগানে সততই বিভোর। ভূত, প্রেত, পিশাচগণের সঙ্গে শিব হলেন নৃত্যরত। দেববালাগণ সেই নৃত্যকে ছন্দায়িত করে গান করতে লাগল তখন—

ঝিঁঝোটি—একতালা

ভাঙ্ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ
ভূতগণসঙ্গে নাচিছে।
সদা কালী কালী কালী বলে মধুর ডমরু বাজিছে॥
শিরেতে শোভিছে জটাজুটবন্ধী,
ললাটে শোভিছে দেবী মন্দাকিনী ;
চরণ ধারিয়া ভূধর ধরণী
কুলু কুলু ধ্বনি করিছে॥

বামেতে শোভিছে ভুবনমাতা,
কি কব রূপ কি কব কথা,
চারিপাশে হেমলতা জড়িত জড়িত রয়েছে।
কর্ণেতে শোভিছে ধুতুরার ফুল,
ধুতুরা পানে আঁখি ঢুলু ঢুলু,
কালীধ্যানে ব্যাঘ্রচর্ম খসিয়া খসিয়া পড়িছে।

ব্যাধ সেই দৃশ্য দেখে রোমাঞ্চিত ও পুলোকিত হলো। সে ভয়ে ও বিস্ময়ে ধীরে ধীরে দেবাদিদেব মহাদেবের সম্মুখে উপনীত হয়ে প্রণাম জানালো। আলোকস্নাত হলো তার সর্বকলেবর। সকল দৈন্য ও মালিন্য যেন ধৌত হলো চিরকালের জন্য। হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হলো অব্যক্ত এক ব্যঞ্জনা। সে বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে গান ক'রে বন্দনা জানালো আবার শিবকে—

বর্ণাট—একতালা

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম্ বম বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল-মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে,
উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল।[১]

ভোলানাথ শিব ব্যাধকে আশীর্বাদ করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাধের তন্দ্রা হলো ভঙ্গ। সে সুখস্বপ্ন চিন্তা করে বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে থাকলো ক্ষণকালের জন্য। রাত্রি ক্রমশঃ অতিক্রান্ত হলো। প্রভাতের শুভ্র-আলোকচ্ছটায় বিশ্বজন জাগ্রত হলো। প্রকৃতিও মুখরিত পক্ষীকুলের কলতানে। ব্যাধ অবশেষে মাংসভার স্কন্ধে নিয়ে চলে নিজ গৃহাভিমুখে। তার জীবনগতির মধ্যে এলো অভাবনীয় এক অপার্থিব পরিবর্তন। পশুশিকার থেকে সে ক্রমশঃ হলো চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত।

ক্রমে একদিন ব্যাধের জীবনপ্রদীপ হলো নির্বাপিত। তখন ভয়ঙ্করমূর্তি এক যমদূতের হলো আবির্ভাব। সে পাশবদ্ধ করলো ব্যাধের আত্মাকে যমলোকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু ঘটনার হলো বিপর্যয় অপ্রত্যাশিতভাবে। অকস্মাৎ আবির্ভূত হলো দিব্যদেহী এক শিবদূত। আলোকদীপ্ত হলো চতুর্দিক। শিবচতুর্দশীব্রতে ব্যাধের শিবপূজার কথা জ্ঞাপন করলো শিবদূত যমদূতকে। তখন ধর্মরাজে রূপান্তরিত ব্যাধের আত্মাকে প্রণাম জানিয়ে যমদূত হলো অন্তর্হিত। ব্যাধের আত্মাকে তখন নিয়ে গেল শিবদূত অমৃতময় শিবলোকে। ব্যাধের আত্মা পুলকে অবলোকন করলো সেই দিব্য-শিবপুরী। গন্ধর্ব, কিন্নর ও দেবতাদের শিবমাহাত্ম্যগানে তখন শিবপুরী হলো মুখরিত। আনন্দোজ্জ্বল শিবপুরী। সেই অপূর্ব শোভা দর্শন ক'রে ব্যাধের আত্মা

হলো কৃতকৃতার্থ। সে ধ্যাননিবিড় চিত্তে শ্রবণ করলো চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত প্রণব-গম্ভীর শিব-সংগীত—

বসন্ত—তেওরা

ডমরু হর-করে বাজে বাজে।
ত্রিশূল-ধর-অঙ্গ ভস্ম-ভূষণ,
ব্যালমালা গলে বিরাজে॥
পঞ্চবদন পিণাকধর শিব,
বৃষভবাহন ভূতনাথ,
রুণ্ড মুণ্ড গলে বিরাজিত,
অজর অমর দিগম্বর রে॥[১]

সমাপ্ত হলো সংগীত। অমরলোকবাসীদের সঙ্গে মিলিত-কণ্ঠে ব্যাধ দেবাদিদেব মহাদেবকে জানালো ভক্তিবিজড়িত প্রণাম—

ওঁ বন্ধুকাভং ত্রিনেত্রং শশীশকলধরং
স্মেরবক্ত্রং বরেণ্যম্।
হস্তৈঃ শূলং কপালং বরদমভয়দং
চারুহারং নমামি॥

[আকাশে মেঘলোকে শঙ্খ, ঘণ্টাদির ধ্বনি]

মুহূর্তমধ্যে ভদ্রালোকপ্রাপ্ত ব্যাধের জ্যোতির্ময় আত্মা শিবদেহে বিলীন হয়ে গেল।

কীর্তন—একতালা

সত্যং শিব-সুন্দর-রূপ ভাতি হৃদি-মন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা
ডুবিব রূপ-সাগরে॥[২]

●

১। দুটি গান স্বামী বিবেকানন্দের রচিত।

২। কয়েকবছর পূর্বে অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও'-তে (বেতারে) দু'বার অভিনীত ও প্রচারিত এ'টি হয়েছিল। গানগুলিতে সুরারোপ করেছিলেন সুরশিল্পী অনিল বাগচী মহাশয়।

॥ বিংশ শতাব্দীর ধর্ম—স্বামী অভেদানন্দ ॥

অনুবাদক : শ্রীভূপতি মোহন মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বিজ্ঞানের এমন একটি মতবাদ আছে যা' খ্রীষ্টের জন্মেরও বহু শতাব্দী পূর্বে বেদান্তে উক্ত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা পড়েছি যে, কোন উদ্‌ঘাটনের পরেই বিবর্তন ঘটে থাকে আর সেই বিবর্তন কিছু সময়ের জন্য বিদ্যমান থাকে ;—এ'কে চক্র বা যুগ বলে। এই চক্রটি উদ্‌ঘাটন-চক্রের অনুবর্তী। এই উদ্‌ঘাটন ও আবর্তন-চক্রের শৃঙ্খল শাশ্বত। সুতরাং ক্রমবিকাশ-চক্রের আদি আছে ; কিন্তু পদার্থ, শক্তি ও বিশ্বপ্রকৃতি অনাদি।

এইপ্রকারে দৈহিক আকৃতির একটি আদি থাকতে পারে, কিন্তু যা' প্রতিটি জীবাত্মার ভৌতিক দেহকে প্রাণবন্ত করে ও বেঁচে থাকে, সেই সারবস্তু হচ্ছে অনাদি। প্রতিটি জীবাত্মাই আবার কারণ ও কর্মফলের নিয়মের অধীন, যা'কে বেদান্তে কর্মের অনুশাসন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কারণ ও কর্মফল এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার এই সূত্র পর্যালোচনা করলে আমরা পাপ দুঃখ, পীড়া ও জাগতিক কষ্টভোগের কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। বেদান্ত আমাদেরকে এমন শিক্ষা দেয় না যে, অসৎ-এর স্রষ্টা একজন এবং সৎ-এর স্রষ্টা অপর একজন। বেদান্ত এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে যে, যতক্ষণ সৎ আছে, ততক্ষণ অসৎও আছে। একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সুতরাং আমরা যদি একটিকে গ্রহণ করি তবে অপরটিকেও আমাদের গ্রহণ করতে হয়। দু'টিকেই বর্জন কর,—দেখবে আত্মা সৎও নয়,—অসৎও নয়। যা' অসৎ তা' আমাদের অজ্ঞানতামাত্র ; উপযুক্ত জ্ঞান ছাড়া আমরা যা' কিছু করি তা' ভ্রম। প্রতিটি ভ্রম কিন্তু পরিণামে মহান্ শিক্ষক। সুতরাং, প্রতিটি পাপকর্মের একটি নিজস্ব মূল্য আছে। ঐ প্রকার প্রতিটি কর্মই জীবাত্মাকে শিক্ষা দেয় সেই কর্মের নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মটিকে। এইভাবে যাবতীয় পাপকার্যই এক একটি প্রকাণ্ড ভ্রম। আমরা ঐরূপ ভ্রম করতে বাধ্য হই, ঐ কারণ আমরা এই পৃথিবীতে জন্মেছি এবং আমাদের অভীষ্ট বস্তুটিকে পাওয়ার জন্য আমরা সর্বক্ষণ নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি। অজ্ঞানতার মধ্যে জন্মে আমরা ভ্রম করতে বাধ্য। সুতরাং আমাদের ভ্রমের জন্য আমরা স্রষ্টাকে কেন দোষারোপ করব ? বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, সৎ-এর স্রষ্টাও নেই, আবার অসৎ-এর স্রষ্টাও নেই ; কিন্তু কর্মের অনুশাসনই (কারণ ও কর্মফলের নিয়ম) পৃথিবীতে অবস্থিত যাবতীয় অসাম্য ও বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যা করবে এবং ঈশ্বরকে পুরস্কারদাতা ও শাস্তিদাতা হিসাবে মনে করা চলে না। ঈশ্বর কখনও দুষ্টকে শাস্তি দেন না কিংবা পুরস্কৃত করেন না ধার্মিককে। পরন্তু, যা'কে আমরা শাস্তি বলে থাকি তা' হচ্ছে আমাদের নিজেদের ভ্রমেরই প্রতিক্রিয়া ; যে আত্মা হ'তে ক্রিয়াটি আরম্ভ হয়েছে সেখানে তা' প্রত্যাবর্তন করবেই। যা'কে আমরা পুরস্কার বলে গ্রহণ করে থাকি, তা-ও কিন্তু আমাদের নিজ নিজ সৎকর্মের প্রতিক্রিয়াই। সুতরাং ঈশ্বরকে কেন দোষারোপ করব আমরা ? ঈশ্বর হচ্ছেন প্রেমসিন্ধু, জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের অনন্ত সমুদ্র।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, বিশ্বজগতের উৎস অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। বেদান্তও শিক্ষা দেয় যে ইহা মনের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; কিন্তু আত্মা দ্বারা ইহাকে উপলব্ধি করা যায়; কারণ ইহা আমাদের মন ও হৃদয় অপেক্ষা নিকটতর, ইহা আমাদের আত্মার আত্মা এবং আমাদের অস্তিত্বের সারাংশই হচ্ছে সেই উপাদান। অতিচেতন (Super-consciousness)-স্তরের উচ্চতর অবস্থায় প্রবেশ করলে তা' অনুভব করা যায়। এইপ্রকারেই ইহা বর্তমানের অদ্বৈতবাদ-বিশিষ্ট বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। বেদান্তের মতে সেই এক সারবস্তু (ব্রহ্ম) কিন্তু অচেতন নয়, বরং তা' যাবতীয় বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস; অন্যথায় আমরা যদি একথা স্বীকার না করতাম, তবে প্রশ্ন উঠত, আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি হ'ল কোথা হতে? যে বস্তুর বুদ্ধিমত্তা নেই, তেমন কোন বস্তু হ'তে কি বুদ্ধির উৎপত্তি হ'তে পারে? শূন্য হ'তে কোন কিছুর উৎপত্তি যেমন অসম্ভব, এ-ও সেই রকম। সুতরাং বিজ্ঞানের জড়বাদী অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা বেদান্ত অধিক যুক্তিসঙ্গত ও অধিক বিজ্ঞানসম্মত। বেদান্ত ধর্মকে বিজ্ঞানভিত্তিক করেছে, কারণ ধর্মকে বেদান্ত বিজ্ঞান মাধ্যমে,—অন্য কথায়, আরোহী ও অবরোহী তর্কশাস্ত্রের স্বীকৃত নিয়মবিধির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে। এবং এইটি নিজ গতিমধ্যে যুক্তির প্রাধান্য মেনে নিয়েছে। এই দুইটি বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে, এমন যে-কোন তত্ত্বই সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আমরা যদি পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মমতসমূহের উপর তর্কশাস্ত্রের নিয়মবিধি প্রয়োগ করি, তবে প্রতি পদক্ষেপে আমরা দেখব যে ঐগুলি যুক্তির সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না, বরং শেষপর্যন্ত খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে। বিশ্বজনীন বেদান্ত ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মই তর্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। বিজ্ঞান ও ধর্মের মতবিরোধ বেদান্তের সর্বজনীন ধর্মেই সমাপ্ত হয়েছে। হার্বার্ট স্পেন্সার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বেদান্ত প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে তাঁর চিন্তাধারার সগোত্র একটি দর্শন আছে দেখে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেছেন।

নীতিশাস্ত্রের প্রাথমিক মূলতত্ত্বগুলিই বেদান্ত শিক্ষা দিয়ে থাকে, অধিকন্তু তা' নীতিশাস্ত্রকে যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে; কারণ প্রকৃত নীতিশাস্ত্র অবশ্যই বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'বে, অন্যথায় তা' মূল্যহীন। নীতিশাস্ত্রের মহত্তম অনুশাসন শিক্ষা দেয় যে, "তোমাদের প্রতিবেশীকেও তোমরা নিজেদের মত ভালবেসো", তা' কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীকে নিজেদের মত ভালবাসবার কোন যুক্তিই প্রদান করে না। খ্রীষ্ট এটি প্রচার করেছিলেন; কিন্তু তিনি তা'র কোন যুক্তি প্রদান করেন নি। বেদান্তে আমরা তা'র যুক্তি খুঁজে পাই। বেদান্ত "তৎ-ত্বম্-অসি" বলে ঐ একই শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের কোন উপকার করেছে বলে আমরা তাদেরকে ভালবাসব না; কিন্তু যেহেতু আত্মিক দিক হ'তে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে এক এবং আমরা সকলেই এক অনন্ত ঈশ্বরের সন্তান, সেইজন্যই আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসব। ভালবাসা দ্বারা বুঝায় "একত্বের ভাব প্রকাশ।" নীতিশাস্ত্রগুলির ভিত্তি হওয়া উচিত সেই আত্মিক একত্ব, আর তা' হ'লেই আমরা কা'রও পীড়াদায়ক কিছু করতে বা অন্যের স্বার্থহানি করে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারব না।

বেদান্তের সত্য সম্পূর্ণরূপেই বিজ্ঞানসম্মত এবং সে কারণেই তা' জগতের সম্মুখে প্রচারিত হওয়া উচিত। আর তা' হ'লেই আমরা যে শুধুমাত্র পৃথিবীর বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির মধ্যে শান্তি ও ঐক্য খুঁজে পা'ব তা নয়, অধিকন্তু প্রকৃত ধর্ম ও প্রকৃত বিজ্ঞানের মধ্যেও ঐক্য খুঁজে পা'ব। বিংশ শতাব্দীতে ঐ ঐক্যেরই প্রয়োজন। ম্যাক্সমুলার বলেছেন: "সকল দর্শনের মধ্যে বেদান্ত সর্বাধিক উন্নত এবং তা' সকল ধর্মের মধ্যে সর্বাধিক স্বস্তিদায়ক। প্রত্যেক ধর্মেরই এ'তে স্থান আছে বল্‌লেও যেন ঠিক ঠিক বলা হয় না,—এইটি সকল ধর্মের সঙ্গেই আলিঙ্গনাবদ্ধ"।

(সমাপ্ত)

●

॥ নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয় ॥

শ্রীশিবানন্দ তীর্থনাথ

(পূর্বানুবৃত্তি)

গয়াধামে ৺শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব ফিরে এসেছেন জন্মভূমিতে। কিন্তু এই দর্শন তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। কেননা, এখানেই ঘটেছে পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গে উত্তারণ। নবদ্বীপে যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন তিনি অন্য মানুষ—পাণ্ডিত্যবর্জিত, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল, তথাগতপ্রাণ। তারপর দিন পর দিন পার্ষদদের নিয়ে নৃত্য ও গীত সম্বলিত সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধিকার অপ্রাকৃত বৃন্দাবন লীলারস আস্বাদন করতে লাগলেন। একদিন তাঁর ইচ্ছা হল, নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী অঙ্কবদ্ধ নাটক অভিনয় করার। তিনি পার্ষদদের ডেকে বললেন,

" "আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে।" "৮

অভিনেয় নাটকের নাম বোধহয় "রুক্মিণী-সংবাদ"। কিন্তু অভিনয়ের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা' দেখে মনে হয় নাটকের বিষয়বস্তু ছিল শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে মথুরাগমনে শ্রীরাধাবিরহ ও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তথাগতপ্রাণা বিদর্ভরাজকন্যা রুক্মিণী-হরণ।

নাটক অভিনয় করতে হলে অভিনেতাদের চরিত্রের অনুরূপ নানাপ্রকার পোষাক পরিচ্ছদ যে একান্ত অপরিহার্য, একথা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অজ্ঞাত ছিল না। সদাশিব—বুদ্ধিমন্ত খানকে ডেকে তিনি পোষাকাদি প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন, এতে তাঁর অঙ্গসজ্জার বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বললেন,

" "শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর' সভাকার॥" "৯

৮। ড: রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, ফাল্গুন ১৩৮০ সাল, ১৯০৮ শকাব্দা, ৪৩১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ, শ্লোকার্ধ—৩, পৃষ্ঠা ৭৩।

৯। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৮০, পৃষ্ঠা ৭৪।

শুধু তাই নয়, নাটকে কে কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, তাও তিনি পার্ষদদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তিনি বললেন, গদাধর পণ্ডিত হবেন রুক্মিণী, ব্রহ্মানন্দ সাজবেন "তাঁর বুড়ী—সখী স্বপ্রভাত", নিত্যানন্দ আমার (মহাপ্রভুর) বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল বা কোটাল, নারদ সাজবেন শ্রীবাস পণ্ডিত, তাঁর সখী বা চেলা হবেন শ্রীবাসেরই ভাই শ্রীরাম। মহাপ্রভুর নির্দেশ শুনে শ্রীবাসেরই আর এক ভাই বললেন, আমি "দেউড়িয়া" বা দীপাধারী হব। এই সময় অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর নিকটে জানতে চাইলেন, নায়কের ভূমিকা কে গ্রহণ করবেন? উত্তরে তিনি জানালেন, সিংহাসনে উপবিষ্ট গোপীনাথের বিগ্রহই নায়কের কাজ করবেন। তাঁর এই উক্তিতে মনে হয়, নাটকটিতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ্যে কোনও ভূমিকা ছিল না। সব সময়েই তিনি ছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে নেপথ্যে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নায়িকা শ্রীরাধা বা লক্ষ্মীর ভূমিকায় রূপায়োপ করেন নাট্য-পরিচালক শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই অভিনয়ের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের গৃহপ্রাঙ্গণ। মুরারি গুপ্ত বলেছেন, একদিন সহাস্য মুখমণ্ডল মুখচন্দ্র প্রভু সুন্দর নারীবেশ ধারণ করে সপার্ষদ চন্দ্রশেখরের গৃহাঙ্গণে নৃত্য করেছিলেন।

" "একদা সমভিধায় সুবেশং যোষিতাং স্বিতসুধামুখচন্দ্রঃ।
চন্দ্রশেখরগৃহাঙ্গণে বিভুর্নর্তনং নিজজনৈঃ চ চকার ॥" "১০

মহাপ্রভুর নির্দেশে আনন্দিতচিত্তে বুদ্ধিমন্ত খান গুজরাটের অন্তর্গত "কণ্টিবার" প্রদেশের (বর্তমান কাঠিবার বা কাঠিয়াবার) চন্দ্রাতপ কেটে পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করলেন এবং অভিনয়ের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম এনে রাখলেন তাঁর কাছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যথাযথ হয়েছে দেখে মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, তারপর সমবেত বৈষ্ণবদের পরিহাস করে বললেন।

"প্রকৃতি-আবেশে নৃত্য হইবে আমার।
দেখিবে যে জিতেন্দ্রিয়—তার অধিকার॥
সেই সে যাইবে আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেইজন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥" "১১

মহাপ্রভু লক্ষ্মীবেশে "অঙ্গ-নৃত্য" করবেন জেনে সবাই উৎফুল্ল হয়েছিলেন, কিন্তু এইকথা শুনে সকলেরই অন্তর বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সর্বাগ্রে অদ্বৈত আচার্য মাটিতে দাস কেটে বললেন।

"আজি নৃত্য-দরশনে মোর নাই কার্য॥" "১২

১০। মুরারিগুপ্ত কৃত প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্", চতুর্থ সংস্করণ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৯, দ্বিতীয় প্রক্রমে পঞ্চদশ সর্গঃ, শ্লোক ৮, পৃষ্ঠা ৭৯।

১১। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ১৮, ১৯, পৃষ্ঠা ৭৫।

১২। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোকার্ধ ২২, পৃষ্ঠা ৭৫।

শ্রীবাস পণ্ডিত এই উক্তির সমর্থন করে বললেন, আমারও ওই একরকম। পার্ষদদের কথায় মহাপ্রভু মৃদু হেসে বললেন, তোমরা না গেলে কাদের নিয়ে নৃত্য হবে? তোমাদের কোনও চিন্তা নাই।

" "মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহ বোধ না পাইবা।" "১৩

মহাপ্রভুর পুনরাদেশে সকলে আনন্দিত হলেন। যথাসময়ে সদলবলে মহাপ্রভু উপস্থিত হলেন যোগেশ্বরাই চন্দ্রশেখরের আচার্যের বাড়ীতে। পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে শচীদেবীও গেলেন সেখানে লক্ষ্মীদেবীর রূপসজ্জায় পুত্রের অদ্ভুত নৃত্য দেখবার জন্য। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন সমস্ত বৈষ্ণব পরিবারেরা। এই নৃত্য-গীত-সম্বলিত অভিনয়ের দর্শকমণ্ডলী ছিল সীমাবদ্ধ। সর্বসাধারণের সেখানে কোনও প্রবেশাধিকার ছিল না। যাঁরা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের একান্ত আপনজন-প্রিয় পরিকর তাঁরা ও তাঁদেরই পরিবারবর্গকে কেবলমাত্র প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এখানে লক্ষণীয়, দর্শক হিসাবে সেখানে সকলের উপস্থিত হবার অধিকার না থাকলেও রসজ্ঞ সামাজিকরূপে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কোনও কোনও মহিলাও স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কবিকর্ণপুরের নাটকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, সেকথা পরে আলোচনা করব।

সকলে উপনীত হলে মহাপ্রভু সবাইকে অঙ্গসজ্জা করতে নির্দেশ দিলেন। আদেশ শুনে অদ্বৈত আচার্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

" "মোরে আজ্ঞা প্রভু! কোন্ কাচ করিবার?" "১৪

মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, সব ভূমিকাতেই তোমার সমান দক্ষতা। অতএব ইচ্ছানুসারে তুমি অঙ্গসজ্জা কর। এই কথা শুনে অদ্বৈত আচার্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। এমন কি, বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন, কি করবেন তা' বুঝতে পারছেন না। কোনও একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করার মত মানসিক স্থৈর্য তাঁর নেই।

" "বাহ্য নাহি অদ্বৈতের, কি করিব কাচ।
ঝুলুটী করিয়া নাচে শান্তিপুরনাথ।
সর্বভাবে নাচে মহা-বিভূবর-প্রায়।
আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়।" "১৫

মুরারি গুপ্ত বলেছেন, তাঁর পশ্চাতে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ বৈষ্ণবরাজ ঈশ্বরাংশজাত পরমপূজ্যশ্রীযুক্ত মহাত্মা অদ্বৈতবর অনুচরগণসহ অনুক্ষণ ধীর দেহকান্তি বিস্তারণ করতে করতে

১৩। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অনুভাষ্য, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ২৩, পৃষ্ঠা ৭৩।
১৪। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অনুভাষ্য, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোকার্ধ ৩৩, পৃষ্ঠা ৭৩।
১৫। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অনুভাষ্য, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৩৩-৩৬, পৃষ্ঠা ৭৭।

প্রবেশ করলেন এবং হরিপদরসার্দ্রচিত্তে মত্তসিংহের ন্যায় দুর্দম্য অন্তঃকরণে নৃত্য করতে লাগলেন।

"প্রাবিশদ্ভবনং বৈষ্ণবরাজো রাজমান ইব তিগ্মমরীচিঃ।
আক্ষিপন্নিব সুধামিব কান্তিমঞ্চারুবদনঃ স মহাত্মা॥
ঈশ্বরস্য কলয়া তু বিজাতোঽবৈতবর্ষা ইতরৈরদৃশ্যৈঃ সঃ।
আননর্ত্ত হরিপদরসার্দ্রো মত্তসিংহ ইব দুর্দ্দমনান্তঃ॥"[১৬]

সকলের সাজসজ্জা সমাপ্ত হলে মুকুন্দ দত্ত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে দেবপ্রশস্তি-বাচক নান্দীপাঠ করে নাটকের সূচনা করলেন।

"কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
'রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ' "॥[১৭]

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "মুকুন্দ দত্ত কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলেন—রাম কৃষ্ণ নরহরি (নরশ্রেষ্ঠ) গোপাল ও গোবিন্দ এই শ্রীকৃষ্ণের নামের বিশেষণ দিয়া। রাম কৃষ্ণ আদি কোন মানুষের নাম নহে। নরহরি স্থানে "বোলহরি" পাঠ পাইয়াছি পুরানো পুঁথিতে"॥[১৮] তারপর রঙ্গভূমিতে এলেন কোতোয়ালের রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে হরিদাস।

"প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস॥
মহা-পাগ শোভে শিরে, ধটী পরিধান।
দণ্ডহস্তে সভারে করয়ে সাবধান॥"[১৯]

এইভাবে লাঠি হাতে সমস্ত রঙ্গভূমিতে ঘুরে ঘুরে তিনি সকলকে সাবধান করে বেড়াতে লাগলেন।

"আরে আরে ভাই সব। হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥
... ...
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বোল কৃষ্ণ-নাম।
দণ্ড করি হরিদাস করয়ে আহ্বান॥"[২০]

১৬। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্", দ্বিতীয় প্রক্রমে ষোড়শঃ সর্গঃ, শ্লোক ৩-৪, পৃষ্ঠা ৮১।

১৭। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৫৮, পৃষ্ঠা ৭৭।

১৮। লেখককারকে লিখিত পত্র, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ সাল।

১৯। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৫৯-৬০, পৃষ্ঠা ৭৭।

২০। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৬১ ও ৬৩, পৃষ্ঠা ৭৭।

মুরারী গুপ্ত বলেছেন, তখন পূর্ণচন্দ্রতুল্য হরিদাস দণ্ড ধারণ করে প্রবেশ করলেন এবং জিজগতের পরিতপ্ত মনুষ্যগণকে সম্বোধন করে কীর্তন করতে লাগলেন।

"প্রাবিশত্তদনু দণ্ডধরোদ্যতঃ পূর্ণচন্দ্রসদৃশো হরিদাসঃ।
কীর্তনং কুরু হরেরিতিবাদী বোধয়ন্ত্রিজগতীঃ পরিতপ্তাম্।"[২১]

হরিদাসের অভিনয় দর্শনে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে হাসির রোল উঠল। সকলে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? এখানে এসেছ কেন? হরিদাস উত্তর দিলেন, আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল। সর্বকালে আমি শ্রীকৃষ্ণকে জাগ্রত করি, বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করে প্রভু আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সবসময়েই তিনি প্রেমভক্তি বিতরণ করবেন। লক্ষ্মীবেশে তিনি এখন নৃত্য করবেন। তোমরা সতর্কভাবে সেই প্রেমভক্তি লুটে নাও।

"এত বলি দুই গৌরু মোচড়ায় হাতে।
ঝড় দিয়া বুলে গুপ্ত-মুরারির সাথে।"[২২]

এই "গুপ্ত-মুরারি"-ই হল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্" কাব্যের কবি মুরারি গুপ্ত; শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবাল্য বন্ধু, নবদ্বীপলীলার অন্তরঙ্গ সঙ্গী। প্রথমদিককার অভিনেতাদের তালিকায় নাম না থাকলেও এখানে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বর্ণনা দেখে অনুমতি হয়, তিনি কোতোয়াল হরিদাসের সহচর বা পার্শ্বরক্ষকের অভিনয় করেছেন।

অল্পকাল পরে নারদের বেশে উল্লাস করতে করতে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রবেশ করলেন।

"মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ি, কোটা সর্ব্ব-গায়।
বীণা কান্ধে, কুশ হস্তে চারিদিকে চায়।"[২৩]

মুরারি গুপ্তও হরিদাস সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, নারদের বেশে শ্রীপতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস সেখানে প্রবেশ করলেন। দেবর্ষিরূপে তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

●

২১। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্", দ্বিতীয় প্রক্রমে ষোড়শ : সর্গঃ, শ্লোক ১, পৃষ্ঠা ৮১।
২২। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৬৮, পৃষ্ঠা ৭৮।
২৩। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৫১, পৃষ্ঠা ৭৮

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

য়ুরোপীয় শিল্পকলার বিভিন্ন দিক : মাইয়োলিকা প্রসঙ্গে

(চার)

গড়ন এবং অলংকরণে প্রকৃত দেশজ লক্ষণযুক্ত ইতালীয়ান সিরামিক পাত্রের নির্মাণকাল শুরু হয়েছিলো আনুমানিক খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী থেকে। এর পূর্ববর্তী কালে ইতালীতে যেসব সিরামিক্স্‌এর নিদর্শন নির্মিত হয়েছে—সেগুলোর অধিকাংশই, জর্জ স্যাভেজএর মতে, গ্রীক সিরামিক্স্‌এর অনুকৃতি মাত্র। ইতালীর আরেটিয়াম সিরামিক নির্মাণ কেন্দ্রটিকে জর্জ স্যাভেজ রোমক সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম সিরামিক নির্মাণ কেন্দ্ররূপে নির্দেশ করেছেন। প্রাচীন রোমক সিরামিক পাত্রের সুপরিচিত নিদর্শনরূপে আখ্যাত 'সামিয়ান' পাত্রের নির্মাণকেন্দ্র ছিলো সামোস্ দ্বীপ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লিনি-র বিবরণে এ-তথ্য জানা যায়। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অব্যবহিত পরবর্তী কাল (আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) পর্যন্ত ইতালীতে যেসব শিল্পিত সিরামিক্স্ তৈরী হয়েছিলো—তার অধিকাংশই লাল এবং কালো রঙএর। কারণ ওগুলো তৈরী হতো সাধারণ মাটিতে। প্রাচীন রোমের কোরামএ নির্মিত এধরনের কিছু সিরামিকপাত্রে খানিকটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। এই পাত্রগুলো মোটা দানার সাধারণ মাটিতে তৈরী। পাত্রগুলো 'গ্রাফিটো' (Sgrafitto) রীতিতে অলংকৃত এবং স্বচ্ছ হলদেটে রঙএর মেজএ আবৃত। সিরামিক্স্ রঙ অথবা মেজ লাগাবার পর কাঁচা অবস্থায় ওই রঙ অথবা মেজএ আঁচড় (Scratch) কেটে যে-অলংকরণের পর সিরামিক্স্‌এ স্বচ্ছ মেজ লাগিয়ে ভাঁটিতে পোড়ানো হয় কোরামএ নির্মিত যে-পাত্রগুলো পাওয়া গেছে—সেগুলোর কোনো কোনোটির মেজএ কপার অক্সাইড্ মিশিয়ে সবুজ রঙ করা হয়েছে। এধরনের সিরামিকপাত্রগুলোর গঠন এবং অলংকরণ প্রাচীন চীনের 'তাঙ্' বংশের রাজত্বকালীন 'গব্‌রি' এবং প্রাচীন ইরানের 'রাগেশ' নামীয় সিরামিকপাত্রের গঠন এবং অলংকরণের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে চৈনিক ও ইরানী অলংকরণের তুলনায় ইতালীয় অলংকরণ নিকৃষ্ট মানের। উল্লেখ্য, ওয়ারেন ই. ক্রকস্ তাঁর রচনায় প্রাচীন রোমের সিরামিক নির্মাণ কেন্দ্ররূপে কোরামএর কথা লিখলেও অপর বিশেষজ্ঞ জর্জ স্যাভেজ এসম্পর্কিত রচনায় কোরামএর উল্লেখ করেননি।

এ-তো গেলো আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালের কথা। এর পরবর্তী-কালে ইতালীতে যেসব শিল্পিত সিরামিক্স্ নির্মিত হয়েছে—সেগুলো শিল্পকলার ইতিহাসে 'মেজা মাইয়োলিকা' নামে পরিচিত। মেজা মাইয়োলিকা কথাটি অবশ্য জর্জ স্যাভেজএর মতে ভুল প্রয়োগ। যাই হোক, 'মেজা' শব্দটির বাংলা অর্থ হলো 'অর্ধ' অথবা 'অর্ধেক'। সুতরাং মেজা মাইয়োলিকার বাংলা নামকরণ করা চলে। অর্ধ মাইয়োলিকা। মেজা মাইয়োলিকা পাত্রগুলোর পুরোটা কখনো এন্‌গোব্ অথবা মেজএ আবৃত করা হতোনা। সিরামিকপাত্রের উচ্চতার দুই তৃতীয়াংশ এন্‌গোব্, কিংবা সাদা অস্বচ্ছ মেজএ আবৃত করে ওই আবরণের ওপর সিরামিক রঙএ অলংকরণ করবার পর ভাঁটিতে পোড়ানো হতো। এন্‌গোব্ এবং মেজকে সাদা ও অস্বচ্ছ করে তুলবার জন্যে তাতে টিন্ অক্সাইড্ মেশানোর সূত্রটি যে মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভাবিত হয়েছিলো—সেকথা আগেই বলা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে আবিষ্কৃত টিন্‌মেজ কি ভাবে

মুরদের মাধ্যমে স্পেনে এলো এবং স্পেন থেকেই বা কিভাবে ইতালীতে টিন্ গ্লেজ এর আগমন ঘটলো—সে-কাহিনীও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সে যুগে টিন্ ধাতু ছিলো একান্তই দুষ্প্রাপ্য। সেজন্য তখন টিন্ অকসাইড্ সোনার মতোই দামী ছিলো। সুতরাং এনামেল্ অথবা গ্লেজএ অতি সামান্য পরিমাণে টিন্ অক্সাইড্ ব্যবহৃত হতো। সেযুগে সাধারণতঃ টিন্ অকসাইড্ আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে নিয়ে ওই ছাই এনামেল্ কিংবা গ্লেজএর সঙ্গে মেশানো হতো। ইতালীতে শিল্পীত সিরামিক্স্এ গ্রাফিটো অলংকরণ রীতি সুরু হবার পূর্ববর্তীকালে—অর্থাৎ আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে যে-ধরনের স্বচ্ছ গ্লেজ ব্যবহার করা হতো—সেই গ্লেজ তৈরী হতো প্রধানতঃ সিলিকা (বিশুদ্ধ বালি) এবং লেড্ অক্সাইড্এর মিশ্রনে। একথা আগেই বলা হয়েছে, ওই স্বচ্ছ গ্লেজকে অস্বচ্ছ এবং সাদা করে তুলবার জন্যে তাতে মেশানো হতো টিন্অক্সাইড্। ওয়ারেন ই. কক্সএর মতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের আগে ইতালীতে টিন্ গ্লেজ কেবলমাত্র কয়েকটি সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হতো। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই ইতালীতে কিছুটা ব্যাপকভাবে টিন্ গ্লেজএর ব্যবহার সুরু হয়। ওই সময়ে স্পেনের সঙ্গে ইতালীর ঘনিষ্ট যোগাযোগের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিলো বলে কক্স মনে করেন। এই সময়ে ইতালীর মাইয়োলিকা অপর একটি নামেও পরিচিত ছিলো নামটি হলো 'রাফেলি' (Raffaelle)। রাফেলি-র সঙ্গে ইতালীর জগতবিখ্যাত চিত্রকর রাফায়েলএর নাম যুক্ত হয়ে আছে। রাফায়েল অঙ্কিত বেশ কিছু চিত্রের অনুসরণে একসময়ে ইতালিতে সিরামিকপাত্র, থালা ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে। ওইসব চিত্রিত সিরামিক্স্ই রাফেলী নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে ইতালীর যেসব সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রে মাইয়োলিকা অথবা গ্লেজ মাইয়োলিকা নির্মিত হতো—সে-কেন্দ্রগুলোর নাম হলো লা' ফ্রাট্টা, সিস্টা ডি ক্যাষ্টেলো, পাভুয়া এবং পাভিয়া। সিস্টা ডি ক্যাষ্টেলোতে যেসব মাইয়োলিকা নির্মিত হতো—সেগুলো 'আলা ক্যাষ্টেলানা' নামে পরিচিত। পাভুয়া-র এক সিরামিকশিল্পীর অঙ্কিত বড়ো আকারের গোলাকৃতি একটি সিরামিক পদক (medallion) পাওয়া গেছে। পদকটিতে শিল্পী মিকোলেটি-র নাম স্বাক্ষরিত রয়েছে। পদকে অঙ্কিত চিত্রের বিষয়বস্তু হলো কয়েকজন সন্ত পরিবৃত উপবিষ্টা ম্যাডোনা। পাভিয়া-র সিরামিক নির্মাণকেন্দ্র-নির্মিত বেশ কিছু সংখ্যক মাইয়োলিকায় 'কুমিরো' পদবীযুক্ত শিল্পীদের স্বাক্ষর দেখা যায়। বাদামী এবং সবুজ রঙএর গ্লেজএ এই স্বাক্ষরগুলো করা হয়েছে।

'অরভিয়েটো' পাত্র নামে পরিচিত মাইয়োলিকা নির্মিত হতো ইতালীর অরভিয়েটো সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রে। ইতালীর রোম, সিয়েনা, করটোনা, পেরুজিয়া এবং কাস্তেলদা-র সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রগুলোতে ও অরভিয়েটো-র সাদৃশ্যযুক্ত মাইয়োলিকা নির্মিত হতো। সোড়ার দিকে যে-অরভিয়েটো মাইয়োলিকা পাত্রগুলো নির্মিত হয়েছিলো—সেগুলোর পুরোটা গ্লেজ-এ আবৃত করা হতোনা। সাধারণতঃ এই পাত্রগুলোর উচ্চতার দুই তৃতীয়াংশ অথবা চার পঞ্চমাংশ টিন্ গ্লেজ-এ আবৃত করে অলংকরণ করা হতো। এধরনের পাত্রগুলোকেই ওয়ারেন ই. কক্স প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্লেজ মাইয়োলিকা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে পাত্রগুলোর

ওপর থেকে তলা পর্যন্ত এবং থালাগুলোর কিনারা পর্যন্ত সাদা অস্বচ্ছ গ্লেজ অথবা এনামেল্ লাগানো হলেও ওই পাত্রগুলোর ভেতরের দিকে এবং থালাগুলোর পেছন দিকে লাগানো হতো স্বচ্ছ লেড্ গ্লেজ। এসব মাইয়োলিকা পাত্র এবং থালার অধিকাংশই সাধারণ মাটির মতো কুমোরের চাকে নির্মিত হতো। যে কয়টি সিরামিক রঙ এধরনের মাইয়োলিকায় ব্যবহার করা হয়েছে—সে কয়টি হলো কপার অক্সাইড্ এবং কোবাল্ট অক্সাইড্ থেকে তৈরী সবুজাভ ও হালকা নীল, ম্যাঙ্গানিজ থেকে তৈরী লালচে বেগুনি এবং হলুদ। পাত্র এবং থালার ওপর 'রিলিফ' (relief) পদ্ধতিতে প্রতিকৃতি এবং বিভিন্ন ফলের আকৃতি অবলম্বনে জমি থেকে কিছুটা উঁচু নকশা তৈরী করে তার ওপর উল্লিখিত রঙ এ অলংকরণ করা হয়েছে।

পনেরোশো খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে যেসব মাইয়োলিকা ইতালীর বিভিন্ন সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রে তৈরী হতে থাকে—সেগুলোর অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে কোবাল্ট থেকে তৈরী গাঢ় নীল, লোহা থেকে তৈরী মেটে লাল ও চকোলেট এবং হালকা জাপানী ও হালকা হলুদ রঙ। অলংকরণের বিষয়বস্তুর মধ্যে মানুষের প্রতিকৃতি, অঙ্ক-জানোয়ার, মাছ, পাখি, দানব এবং বিকটাকৃতি জন্তুর আকৃতি দেখা যায়। খ্রীষ্টধর্মের প্রতীক ক্রুশও ব্যবহৃত হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। প্রধানতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকেই ইতালীয় মাইয়োলিকায় বিভিন্ন সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রের নাম এবং শিল্পীদের স্বাক্ষর দেখা যেতে থাকে।

মধ্যযুগ এবং রেনেসাঁ (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী)-র মধ্যবর্তীকালে ইতালীতে নির্মিত মাইয়োলিকায় যে-গ্লেজ লাগানো হতো—তা ছিলো অপেক্ষাকৃত পুরু এবং ওই গ্লেজ-এর রঙ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হতো হালকা ছাই রঙএর। অলংকরণের বাইরের রেখা আঁকা হতো ম্যাঙ্গানিজ থেকে তৈরী লালচে বেগুনি রঙএ। এই লালচে বেগুনি রঙএর ব্যবহার স্পেনীয়দের কাছ থেকে ইতালীয়ানরা শিখেছিলেন। এসময়ে তৈরী মাইয়োলিকার অলংকরণে নীলচে সবুজ রঙএর প্রাধান্য চোখে পড়ে। অলংকরণের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে অঙ্ক-জানোয়ার, মনুষ্যমূর্তি এবং প্রতিকৃতি। গড়নের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ করা যায় পাত্রগুলোর দুদিকে চ্যাপ্টা হাতল এবং গোলাকৃতি বড়ো থালার কিনারার উঁচু বেড় অথবা 'রিম্' (rim)-এর কথা।

খ্রীষ্টীয় পনেরো শতকে ফ্লোরেন্স-এর সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রে যেসব মাইয়োলিকা নির্মিত হয়েছিলো—সেগুলো য়ুরোপীয় শিল্পকলার ইতিহাসে 'ইম্প্যাস্টো য়ু ফ্লোরেনটাইন্ অয়্যার' নামে আখ্যাত হয়ে আসছে। পূর্বোক্ত নীলচে সবুজ রঙএ অলংকৃত মাইয়োলিকার সঙ্গে তুলনা করলে ইম্প্যাস্টো য়ু অয়্যার এর অলংকরণের বৈশিষ্ট্য সহজেই নজরে পড়ে। ওয়ারেন ই. কক্সএর মতে ইতালীয় ইম্প্যাস্টো য়ু অয়্যারএর অলংকরণের সঙ্গে চৈনিক সিরামিক অলংকরণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া মিশর এবং সিরিয়ায় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত সিরামিক্স্এর অলংকরণশৈলী ও ইম্প্যাস্টো য়ু অয়্যার-এর অলংকরণরীতিতে প্রভাবিত করেছিলো বলে কক্স মনে করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিশর এবং সিরিয়ায় নির্মিত অধিকাংশ সিরামিক্স্এর অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে আণ্ডার গ্লেজ নীল এবং কালো রঙ। আণ্ডার গ্লেজ রঙ বলতে বোঝায়, যে-রঙ সিরামিকসএ ব্যবহার করা হয় আণ্ডার দি গ্লেজ—

অর্থাৎ ব্রেজএর তলায়; অবশ্যই স্বচ্ছ ব্রেজএর তলায়। ফ্রান্সের রুয়েন-এ মিউজি সিরামিক্ (সিরামিক সংগ্রহশালা)-এ রক্ষিত ইম্প্যাস্টো ব্লু অয়্যারের নিদর্শন একটি গোলাকৃতি থালায় চিত্রিত হয়েছে এ্যাডাম ও ইভ্‌এর চিত্র। চিত্রটির অঙ্কনরীতির সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সিরামিক অঙ্কনরীতির বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অপর একটি ইম্প্যাস্টো ব্লু অয়্যারএর নিদর্শন চিত্রিত থালা রয়েছে ফ্রান্সএর সিভ্‌রিসএর মিউজি সিরামিক্‌এ। থালাটিতে অঙ্কিত হয়েছে একটি কুলমর্যাদার নকশাচিহ্নিত ঢাল, সাতটি ছোটো জানোয়ার এবং একটি মানুষের প্রতিকৃতি। এ-থালাটির চিত্রাঙ্কনরীতিও মধ্যপ্রাচ্যের সমকালীন সিরামিক অঙ্কনরীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

—দিবাকর সেনরায়

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

শ্রীশ্রীসারদাদেবী আত্মকথা। সঙ্কলন—অভয়া দাশগুপ্ত। প্রকাশক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা—৭০০২৯। মূল্য—সাত টাকা।

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী আজ জগজ্জননীরূপে পূজিতা। বিশ্ববন্দিতা এই মায়ের বাল্যজীবন, সংসারজীবন সমানভাবেই আকর্ষণীয় ও মানব-জীবনের প্রতিটি ধাপই আমাদের জানতে হবে। তবেই জীবনকে আমরা প্রকৃতরূপে গড়ে তুলতে পারবো। মহাদেবী শক্তিরূপিনী মায়ের আদর্শ হয়ত কোন সময়ে প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে কিন্তু মানবী জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে সব সমস্যার সমাধান হবে। এই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থখানি আমাদের নতুন অনুপ্রেরণা যোগাবে। মায়ের-কথাগুলি ধারাবাহিকভাবে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করে প্রতিটি কথাকে স্পষ্ট ও অর্থময় করে তুলতে চেয়েছেন লেখিকা। বইটির বহুল প্রচার কাম্য।

—রমণীরঞ্জন পোদ্দার

প্রাপ্তি স্বীকার

সত্য-লিপি (প্রথমখণ্ড), গুরুপূজা-গ্রন্থমালা—৯, শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজ কর্তৃক তাঁর শিষ্য-ভক্তগণকে লিখিত ১০০খানি চিঠির সংকলন। প্রকাশক—শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সরস্বতী, ফুলবাড়ী শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারস্বত সঙ্ঘাশ্রম, পো: ফুলবাড়ী, কুচবিহার। প্রাপ্তিস্থান: (১) প্রকাশকের নিকট। (২) আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, পো: হালিসহর, ২৪-পরগণা। (৩) মহেশ লাইব্রেরী, ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। (৪) সর্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন, পো: ও জেলা হাওড়া। (৫) দি নিগমানন্দ সোসাইটি, ২০০ এন্, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য চার টাকা।

সব্যসাচী সত্যানন্দ, গুরুপূজা গ্রন্থমালা—৮। পৃ: ২০ দীন সন্তান। দক্ষিণা—ষোল আনা। প্রকাশক—শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সরস্বতী, ফুলবাড়ী শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সঙ্ঘাশ্রম, পো: ফুলবাড়ী, কুচবিহার। প্রাপ্তিস্থান: (১) প্রকাশকের নিকট, (২) আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, পো: হালিসহর, ২৪ পরগণা (৩) মহেশ লাইব্রেরী, ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, (৪) দি নিগমানন্দ সোসাইটি, ২০০ এন্, শ্যামাপদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবার নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ার নানান দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল'-এর উপরে (দ্বিতল) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারেও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রসারতাকে অরযুক্ত করবে। ইতি—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সম্পাদক
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

স্বীকৃতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

	দাতার নাম	টাকা
৭৫১।	শ্রীঅশোকনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৮/১, বেদিয়াডাঙ্গা মসজিদবাড়ী লেন, কলিকাতা-৭০০০২৯	১০·০০
৭৫২।	শ্রীমতী রেণুকা ঠাকুর C/o. শ্রীকরালীপদ ঠাকুর পোঃ কালনা, জেলা—বর্দ্ধমান	১০·০০
৭৫৩।	শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র কর্মকার, ৩৬, দেবেনবাবা রোড, কাচরাপাড়া, ২৪ পরগণা	১০·০০
৭৫৪।	ডাঃ উৎপলদাস, সুভাষপল্লী, পোঃ বার্ণপুর, জেলা বর্দ্ধমান	১১·০০
৭৫৫।	শ্রীঅমিতবরণদাস অধিকারী, পোঃ ও গ্রাম—দেবীপুর, জেলা—বর্দ্ধমান	১০·০০
৭৫৬।	শ্রীপ্রশান্তকুমার বাগচী, অফিস্ অফ্ দি রিজিওন্যাল কন্ট্রোলার অফ্ এ্যাকাউন্টস্ ক্যালকাটা রিজিয়ন্, কলিকাতা-৭০০০০২	১০·০০
৭৫৭।	শ্রীসমরেন্দ্রকুমার ঘোষ C/o. মেসার্স ষ্টীলবীরোলিং কোং ৪০সি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০০১৬ (দুই দফে মোট)	৬·০০
৭৫৮।	শ্রীপ্রতীপকুমার সেন, ১/১এ, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকতা-৭০০০০৬	সোনার রিং
৭৫৯।	শ্রীইন্দ্রনাথ রায়, ৮/১১১, বিজয়গড় কলোনী, কলিকাতা-৭০০০৩২	৫·০০

॥ বর্ষসূচী ॥

অমরনাথ দর্শন নতুন পথে—শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—৩৭১
আধুনিক শিক্ষার জনক ডেভিড হেয়ার—শ্রীরতন দাসগুপ্ত—৩৮
আপেক্ষিকতার পটভূমিকায় প্রকৃতির রূপ—শ্রীমতী চামেলী বসু—৩৫৫
ঈশ্বর কোথায়—শ্রীঅজিত কান্তি সরকার—৪৮৩
একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা—শ্রীআশুতোষ ঘোষ—৩২১
কংস কারায় এল ভগবান—শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত—৩৭
কীর্তনে নর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী প্রভানন্দ—৩৩০, ৪৬৭, ৫০২
গুহ্যকালী—শ্রীদত্যেশ্বর অধিকারী—৩৭৮
গুরুনানকের সমন্বয় সাধনা—ডঃ প্রণব রঞ্জন ঘোষ—২৮৭
গ্রন্থ-সমালোচনা—৫৫, ১২১, ২৩৬, ৪০৬, ৪৫৩, ৫৩৫
চিত্তাকর্ষক বাদামি—শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ—৩৪৫
চিন্ময়ী মাকে হের—শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস—৩৪৩
চোরের দেবতা—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য—৩৬৫
জাগ্রতদুর্গা: শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী—শ্রীমৃদুল কান্তি ধর—৪২৭
জ্যোৎস্নায়ে—ডঃ রমা চৌধুরী—৩১৮
জীবনীতে উপেক্ষিত-শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যসখা—শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়—৫১৭
দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে—শ্রীআশুতোষ ঘোষ—৭২, ১০৮, ১৪০, ১৮৬, ২২৭, ২৭১, ২১৪, ৪৪৫
দুর্গাস্তুতি—অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য—২৭৯
দেবশর্মার আত্মত্যাগ—অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী—৩৩
দেবীতীর্থ ক্ষীরভবানী—শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ—২৮
নববর্ষ—১
নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয়—শিবানন্দ তীর্থনাথ—৪৮৪, ৫২৭
প্রণতি—শ্রীনারায়ণ সেনগুপ্ত—৪৩১
প্রার্থী—শ্রীবিনয় ভূষণ দাসগুপ্ত—৩২৫
প্রাচীন ভারতীয় ভাষা—পৈশাচী—ডঃ রামজীবন আচার্য—১৪৮
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কালবিচার—শ্রীজয়জিৎ রায়—৪৫, ১১৫, ১৫০, ১৯৪
বরণ শুধু করতে তোমায় চাই—শ্রীশান্তশীল দাশ—৩০১
বাণী ও বিচার—৫৭, ৯৫, ১২৬, ১৬১, ২০৩, ২৪১, ৩৭১, ৪১১, ৪৫৭, ৪৯৫
বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়গানে রামপ্রসাদ—অধ্যাপক ডঃ রামজীবন আচার্য—৩২৬
বঙ্গের সুসন্তান যদুলাল মল্লিক—বনফুল—৩৯৭

বঙ্কিমচন্দ্রের 'তত্ত্বমূলক' উপন্যাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—২৯১
বিজ্ঞানীর ধর্মচেতনা—শ্রীমতী চামেলী বসু—২২২
বিংশ শতাব্দীর ধর্ম—স্বামী অভেদানন্দ (অনুবাদ)
—শ্রীভূপতি মোহন মুখোপাধ্যায়—৮৮, ১৫৪, ২৪৭, ৩৯১, ৪৪৭, ৪৮২, ৫২৫
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধর্ম ও স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীমিহির লাল দত্ত—২১৫
বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম—শ্রীআশুতোষ ঘোষ—৩১
ব্রাহ্ম আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী প্রভানন্দ—২৩, ৭৬, ১৮, ১৩২, ১৭০, ২১৫, ২৫০, ৩৮০, ৪১৯
ব্রহ্ম-বিজ্ঞান—শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—৪১৭
বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ—ডঃ সুবর্ণা চৌধুরী—৩০২
ভারতীয় সংস্কৃতি-চেতনার মিলনের সুর—শ্রীরণজিৎ কুমার সেন—২৮৩
মাতৃ আগমনে—শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ—২৯০
মাতৃসঙ্গীত—শিবানন্দ তীর্থনাথ—৩৭৬
যুগাবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য—৮
যুগপ্রবর্তক রামমোহন—শ্রীতারকনাথ ঘোষ—১১০
যোগ-সমন্বয়—ডঃ নীরদ বরণ চক্রবর্তী—৩৬১
যোগে প্রাণশক্তির বিকাশ—স্বামী পরমাত্মানন্দ—৩৪০
রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র—২৯৮
রাকু ইয়াকী—শ্রীদিবাকর সেনরায়—৮৫, ১১৮
রূপান্তরের পথ—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র—৪৯
শতবর্ষের আলোকে কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী—শ্রীরণজিৎ কুমার সেন—৪০
শিবরাত্রি রীতি-আলেখ্য—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—৫১৯
শিল্পিত সিরামিক্স্—শ্রীদিবাকর সেনরায়—১৫৬
শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা—শ্রীদিবাকর সেনরায়—১১৮, ২৩৪, ২৭৫, ৪০৪, ৪৪৯, ৪৯১, ৫৩২
শিকাগো ধর্মসভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরা—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ—৩১১
শ্যামাসংগীত—শ্রীসুরেশ চৌধুরী—৩০৫
শ্রীশ্রীকাত্যায়নী দুর্গা—স্বামী অভেদানন্দ—২৮০
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণতি—শ্রীমণিমোহন রায়—২
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাঙ্গনে : দয়ানন্দ সরস্বতী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—৩, ৫৫
শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ-অভেদানন্দ—
শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ—৮৪, ১১৩, ১৫৮, ১৮৪, ২৩০, ২৬২, ৩৯০, ৪৪০, ৪৬৮, ৫০৭
শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে পণ্ডিত পদ্মলোচন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—১৪৪, ১৭৬, ২১০, ২৬৭, ৩১৯
শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য ভবনাথ—ব্রহ্মচারী প্রণবেশ চৈতন্য—৩৮৪, ৪৪১, ৪৭০, ৫০৯
শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—৪৭৭, ৫১২
সঙ্গীতে সাহিত্য ও রসের সার্থকতা—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—১৮, ৬৮
সঙ্গীতে রস ও সাহিত্যের সার্থকতা—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—১০৪
সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—১৩৭, ১৮১, ২১৯, ২৬৪, ৩৮৭, ৪৩৪, ৪৭৫
সংঘবার্তা—৯০, ১২৪, ১৫৯, ২০২, ২৩৮, ২৭৮, ৩৭০, ৪০৮, ৪১৪, ৫৩৬
সাহিত্য অলঙ্কার ও রস—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—৩০১
সার্থকতা—শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী—৩৬১
স্বামী অভেদানন্দ (জীবননাট্য)—শ্রীবিমল মুখর্জি—১৪, ৮০, ১০১, ১৩৬, ১৯০
সৌরসেনী : প্রাচীন ভারতের ভাষা—ডঃ রামজীবন আচার্য—২৩২

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

১। গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করুন।

২। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতিকে অক্ষুন্ন রাখুন।

৩। শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার সংগ্রামকে শক্তিশালী করুন।

৪। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাকে গ্রামে গ্রামে প্রসারিত করুন।

৫। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করুন। শিক্ষায় শ্রমজীবী জনসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

৬। ক্ষেতমজুর বর্গাদার সহ সমস্ত কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করুন। কৃষির উন্নতি ও ভূমি সংস্কারের কাজ জোরদার করুন।

৭। এই রাজ্যের শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করুন।

৮। জনগণ ও সরকারের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করুন।

৯। প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

আই সি এ ১০৮৬/৮০

With the compliments of

BATLIBOI & COMPANY LIMITED

Regd. Office : **P. O. Box 190A V. B. Gandhi Marg, Fort, Bombay—400 023**

Machinery Division :

26, R. N. MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA-700 001.

Tel : 23-8631/4
Telex : 021-7269
Cables : BATLIBOICO

Just Out *A New Book*

AN ENQUIRY INTO PSYCHOLOGY, SOUL AND ABSOLUTE

by

Swami Prajnanananda

এই গ্রন্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদগুলির পরিচয় দিয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছে।

আর আলোচনা করেছে স্বামী অভেদানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দোষ ও গুণ গুলির বৈজ্ঞানিক বিচার।

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, আমেরিকার মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অধ্যাপক উলিয়াম জেম্‌স ও জসিয়া রয়েসের চারখানি আলোকচিত্র-সম্বলিত ডিমাই সাইজ— মূল্য—দশ টাকা।

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
19B, Raja Rajkrishna Street
CALCUTTA-700006

ফোন : ৪৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিপ্রাদাসগুলী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫, ৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৪৪ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহজ ভূমিকাসহ)	ব্যায়ামে বাঙ্গালী ৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ২০·০০	বীরত্বে বাঙ্গালী ৪·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)	বিজ্ঞানে বাঙ্গালী ৮·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৪·০০	বাংলার ঋষি ৬·৫০
শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা ৪·০০	বাংলার মনীষী ৩·০০
	বাংলার বিদুষী ৪·০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী	ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·০০
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩	(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র ভদ্রস্থায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

জ্যোতির্বাণী

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয় মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক : শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী

সাংখ্যাদিতীর্থ, দর্শনাচার্য, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের, রাজ্যপাল-অনুমোদিত সদস্য।

ডাইরেক্টরী পত্রিকার প্রধান জ্যোতিষী।

এই পত্রিকায় প্রতি মাসে বিস্তৃত ব্যক্তিগত রাশিফল থাকে। বেদ, দর্শন, তন্ত্র, জ্যোতিষ ও ধর্ম-সম্পর্কীয় আলোচনা থাকে।

প্রতি সংখ্যা ২ টাঃ। ২০·০০টাকা পাঠাইয়া বার্ষিক গ্রাহক হইলে ডাক-ব্যয় লাগে না।

৬/১, বিন্দু পালিত লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬
ফোন : ৫৫-৫১১৫

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6.00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes	
How To Be A Yogi		and its Guide Book	300·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Ideal of Education	3·00	The Steps Towards Perfection	2·00
India and Her People	12·00	The Vedanta Philosophy	
Life Beyond Death	16·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Memoirs of Ramakrishna	12·00	True Psychology	16·00
My Life Story	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
Mystery of Death	18·00	Yoga Psychology	16·00
Path of Relization		Yoga : Theory & Practice	10·00
Philosophy and Religion		Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
The History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

WB/
PHONE : 55-1

20 FEB 1980

কুকমী
ভারতের
গুঁড়া মশলা

অতুলনীয়

জনপ্রিয় প্যাকেটের
ব্রাণ্ডের
কোনও নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী ফোন-৩৩-০১
কমল চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

PRIC Ramakrishna Math. Rajkrishna